কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
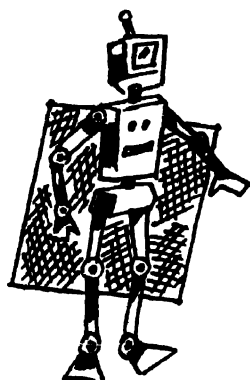
পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি 1960

KISHORE KALPABIJNAN SAMAGRA
by
Sunil Gangopadhyay

প্রচ্ছদ
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

অঙ্গসজ্জা
সুদীপ্ত মণ্ডল

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009

শুরুর আগে

ইস্কুলের গণ্ডি ছাড়াবার পর বাবা আমাকে জোর করে বিজ্ঞান পড়তে বাধ্য করেছিলেন। যদিও আমার ঝোঁক ছিল কলাবিভাগের দিকে। তখন বাবার এই সিদ্ধান্তে আমার প্রতিবাদহীন ক্ষোভ ছিল, কিন্তু পরবর্তী জীবনে সামান্য দু-বছরের বিজ্ঞান পাঠের বিশেষ সুফল আমি বোধ করেছি। আমি প্রায় কিছুই বিজ্ঞান শিখিনি, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি একটা ঝোঁক তৈরি হয়েছে। এখন আমি সহজবোধ্য বিজ্ঞানের বই এবং পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞানের পৃষ্ঠাগুলি নিয়মিত পড়ি।

বিজ্ঞানের মধ্যেও আমার বিশেষ আগ্রহ পদার্থবিদ্যায় এবং বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যায় অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘটেছে। তারই অন্তর্গত মহাকাশ বিজ্ঞান, যে মহাকাশ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই। বহু যুগ ধরে মহাকাশ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। এ যুগে বিজ্ঞানীরা মহাকাশের যতটুকু রহস্যের উন্মোচন করেছেন, তাতে আমরা এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছি যে এই মহাকাশের পরিচয় আমাদের সব কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। এই অসীম, অনন্তের মধ্যে আমাদের পৃথিবী খুব ছোট্ট একটা বিন্দু মাত্র! সম্প্রতি সূর্যের বুকে সামান্য একটা কালো ফুটকি দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ওই ফুটকিটার মধ্যে অন্তত সাতখানা পৃথিবী এঁটে যেতে পারে। আমাদের আকাশের রাজা এই সূর্যও আবার মহাকাশের অন্য অনেক অতিকায় নক্ষত্রের তুলনায় নিতান্তই এক শিশু!

বাংলায় বয়স্ক পাঠকদের মত এখনও কোনও সার্থক বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস রচিত হয়নি। ছোটদের জন্য লিখেছেন কেউ-কেউ, তবে সেগুলি ঠিক বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা নয়, তার নাম দেওয়া হয়েছে, কল্পবিজ্ঞান। অর্থাৎ বিজ্ঞানের একটু আভাস-মাত্র আর অনেকখানিই কল্পনা! এই কল্পবিজ্ঞানই এ যুগের রূপ কথা। আমিও ছোটদের জন্য সেরকম কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি অনেক লিখেছি। এসব কাহিনিতে ছোট ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান শেখাবার কোনও চেষ্টা নেই কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের কৌতূহল ও আগ্রহ জাগানোই আমার উদ্দেশ্য। কাহিনিগুলিকে আকর্ষণীয় করার জন্য আমি বিশ্বমামা কিংবা নীল মানুষের মতন চরিত্র সৃষ্টি করেছি।

আমার এই কল্পবিজ্ঞান ভিত্তিক সমস্ত ছোটগল্প এবং উপন্যাস একত্র করে এই বই প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন পত্র ভারতী, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

উপন্যাস

গল্প

তিন নম্বর চোখ

এবার পুজোর ছুটিতে সুজয় তার বাড়ির সকলের সঙ্গে জলগাঁও বেড়াতে গিয়েছিল। জলগাঁও-তে ওর মামা চাকরি করেন। স্টেশনের কাছেই তাঁর বাড়ি, খুব সুন্দর বাড়িটা। সব দেওয়ালের রং সাদা, আর দরজা-জানলাগুলোর রং ফিকে নীল,বাড়ির সামনে বাগান। গেটের দু-পাশে ঠিক দারোয়ানের মতো দুটো বড়-বড় গুলমোহর গাছ। সোনালি রঙের অজস্র ফুল ফুটে থাকে তাতে।

সুজয় প্রত্যেক বছর পুজোর ছুটিতেই বেড়াতে যায়। সুজয়ের বাবা তো রেলে কাজ করেন, তাই বেড়াতে বেরুলে ওদের রেলের টিকিটের পয়সা লাগে না। সুজয়ের বাবার কাছে পাশ থাকে—সেই পাশ নিয়ে ওরা যতদূর ইচ্ছে যেতে পারে। সেই জন্যই খুব দূরে-দূরে বেড়াতে যায় ওরা। দিল্লি গেছে, দার্জিলিং গেছে, হায়দ্রাবাদে গেছে। সব বারই খুব মজা হয়। কিন্তু এবার যা একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল, সেরকম আর কখনও হয়নি। তারপর থেকে সুজয়ের জীবনটাই বদলে গেল।

জলগাঁও জায়গাটাতে এমনিতে দেখবার বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু মামাবাড়ির বাগানটাতে ছুটোছুটি করতেই খুব ভালো লাগে। তাছাড়া তার দুই মামাতো ভাই রাণা আর খোকনের সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা হল। রাণা আর খোকনের সঙ্গে এর আগে দেখা হয়েছিল সেই চার বছর আগে, বড়দির বিয়ের সময়।

সুজয়ের নিজের কোনও ভাই নেই। বড়দির বিয়ে হয়ে গেছে। ছোড়দির সঙ্গে আগে সুজয়ের খুব ভাব ছিল, কিন্তু ছোড়দি কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে সুজয়ের সঙ্গে আর কানামাছিও খেলে না, ক্যারামও খেলতে চায় না। এবার বেড়াতে এসে সুজয় তার খেলার সঙ্গী পেয়েছে। রাণা সুজয়ের সমান বয়েসি, আর খোকন ওদের চেয়ে দেড় বছরের ছোট। খোকনের বয়েস এখন এগারো।

অবশ্য রাণা আর খোকনও অনেকটা বদলে গেছে। ওরা নাগপুরে সাহেবি স্কুলে পড়ে। সেখানকার ছাত্রাবাসেই থাকে—ছুটির সময় শুধু বাড়িতে আসে মা-বাবার কাছে। ওরা একদম বাংলা বই পড়ে না। খোকন তো বাংলায় কথা বলতেও অনেকটা ভুলে গেছে।

ওরা মহাদেবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধের গল্প জানে না, দুর্যোধন কেন কৃষ্ণকে নিজের দলে নিতে পারেনি—সেই গল্প জানে না, হনুমান আর লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে হেরে গিয়েছিল তাও বলতে পারে না। সুজয় যখন খেলতে-খেলতে এই

সব গল্প বলে—তখন ওরা কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু ওরা দু-জনেই ক্রিকেট খুব ভালো খেলে। খোকন এমন গুগ্‌লি বল দেয় যে, মনে হয় বড় হয়ে নির্ঘাত চন্দ্রশেখর হবে।

সারাদিন ক্রিকেট খেলা আর ছুটোছুটি আর হাসাহাসি। এর নাম ছুটি। কলকাতা থেকে কতদূরে এই জলগাঁও, এখানে জীবনটাই মনে হয় অন্যরকম।

সুজয়ের একটা এয়ার গান আছে। কাকাবাবু আগের বছরের জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন। কলকাতায় সুজয় সেই বন্দুকটা ব্যবহার করতেই পারেনি। কলকাতায় বাগান নেই, ফাঁকা জায়গা নেই। পার্কেও এত মানুষ-জন থাকে যে কখন কার গায়ে যে লাগবে, তার ঠিক নেই। সুজয় অবশ্য পাখি মারতেও চায় না। সে জানে, এয়ার গান দিয়ে বাঘ-ভাল্লুক মারা যায় না, কিন্তু একটা শেয়ালও কি মরবে না?

সুজয়, রাণা আর খোকন সন্ধের পর জলগাঁও-এর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। শহর ছাড়িয়ে একটু মাঠের দিকে গিয়ে ঝোপের পাশে বন্দুক হাতে নিয়ে বসে থাকে। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ওরা রোজই শেয়ালের ডাক শোনে, কিন্তু কোনওদিন কোনও শেয়াল চোখে দেখেনি। রাণার ধারণা, শেয়াল ঠিক অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতন দেখতে।

কলকাতায় থাকতে সুজয় একা একা রাস্তায় বেরোতে পারে না। কিন্তু রাণা আর খোকন এখানে যখন-তখন বাড়ি থেকে বেরুতে পারে। ছোট শহর, হারিয়ে যাবার তো ভয় নেই। যত দূরেই যাও, ট্রেনের আওয়াজ ঠিক শোনা যাবেই—আর তাহলেই বুঝতে পারা যাবে, কোন দিকে স্টেশন। আর ট্রেনের আওয়াজ শুনলেই বোঝা যায়, ক'টা বাজে।

অনেকক্ষণ মাঠের ধারে বসে থেকেও ওরা একটাও শেয়াল দেখতে পেল না। এমনকি শেয়ালের ডাকও শুনতে পাচ্ছে না। শেয়ালগুলো কি জেনে গেছে যে, ওরা বন্দুক হাতে নিয়ে লুকিয়ে আছে? শেয়ালের তো দারুণ বুদ্ধি।

একটা ট্রেনের আওয়াজ শুনেই ওরা বুঝলো, নাগপুর প্যাসেঞ্জার চলে যাচ্ছে। তার মানে এখন সওয়া আটটা বাজে। এবার রাত্তিরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এখন ওদের খোঁজাখুঁজি করবে সবাই।

সুজয় বলল, চল ভাই, এবার বাড়ি যাই।

রাণা বলল, খেয়েদেয়ে আবার আসবি? বেশি রাত্তিরে নিশ্চয়ই শেয়ালগুলো বেরুবে।

খোকন একটু বোকাসোকা ধরনের। সে জিগ্যেস করল, হ্যাঁ রে দাদা, ফক্সগুলো শুধু নাইট-এ বেরোয় কেন?

রাণা বলল, ওরা খাবার খুঁজতে বেরুবে না? ওদের বুঝি খিদে পায় না?

খোকন বলল, আমারও খিদে পেয়েছে।

সুজয় ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বন্দুকটা তুলে নিয়েছে কাঁধে। সামনের মাঠটায় কুচকুচে অন্ধকার। আকাশে আজ তারা দেখা যাচ্ছে না, চাঁদও নেই, কিন্তু আকাশ ঠিকই আছে। যত অন্ধকার রাতই হোক, আকাশ ঠিক দেখা যায়।

রাণা বলল, চল, বাড়িতে খেয়েদেয়ে নিয়েই আমরা চুপি-চুপি আবার চলে আসব।

সুজয় বলল, মামাবাবু রাগ করবেন না?

রাণা বলল, বাবা জানতেই পারবেন না। তুই আর আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। তারপর একটু বাদে বাথরুমের পাশের দরজা দিয়ে বাগানের পেছন দিকটায় বেরিয়েই এক দৌড়। ফেরার সময় আবার চুপি-চুপি পেছন দিক দিয়ে ঢুকব। তুই পাঁচিল টপকাতে পারবি তো?

খোকন বলল, তোমরা দু-জনে শুধু আসবে? আমাকে আনবে না?

রাণা বলল, না। শুধু আমি আর জয়।

খোকন বলল, হ্যাঁ, আমিও আসব।

রাণা ধমক দিয়ে বলল, না। তোর আসা চলবে না। তাহলে সবাই জেনে যাবে।

খোকন বলল, তাহলে আমি বাবাকে বলে দেব।

রাণা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমনসময় মাঠে কিসের যেন একটা শব্দ হল। ওরা চমকে ঘুরে তাকাল। শেয়াল-টেয়াল কিছু নয়, ক্যাচ-ক্যাচ শব্দ। রাণা সেদিকে টর্চ ফেলতেই দুটো বড়-বড় চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। তাতে কিন্তু ওরা একটুও ভয় পেল না। কেননা ব্যাপারটা তক্ষুনি বোঝা গেল। একটা গরুর গাড়ি আসছে। রাত্তিরবেলা গরু কিংবা ঘোড়ার চোখে আলো ফেললে তাদের চোখগুলো অদ্ভুতভাবে জ্বলজ্বল করে।

গাড়িটা কিন্তু গরুর গাড়ি নয়। এদিকে গরুর গাড়ির বদলে ঘোড়ায় টানা গাড়ি দেখা যায়। সুজয় বলল, ও একটা ঘোড়ায় টানা গরুর গাড়ি।

রাণা হেসে ফেলল সে কথা শুনে। ওরা গরুর গাড়িকে বলে বয়েল গাড়ি। আর এগুলোকে ওরা নাম দিয়েছে ঠেকা। সে হাসতে-হাসতে বলল, ঘোড়ায় টানা গরুর গাড়ি আবার কি? একি সোনার পাথর বাটি নাকি?

সুজয় লজ্জা পেল। সে বুঝেছে যে তার ভুল। কিন্তু এ গাড়িগুলোকে বাংলায় কি বলবে সে ভেবেই পায় না। ঘোড়ার গাড়ি বললে অন্যরকম গাড়ি বোঝায়। এটা কিন্তু ঠিক গরুর গাড়ি যেমন হয়, সেই রকমই তো, শুধু গরুর বদলে ঘোড়ায় টানছে।

গাড়িটা আস্তে-আস্তে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। রাণা সব সময় টর্চ জ্বেলে রেখেছে। গাড়িটা ঝকঝকে নতুন, কোনও মালপত্র নেই, একজন শুধু গাড়োয়ান ওপরে বসে আছে। গাড়োয়ানটি মাথায় এমনভাবে কম্বল মুড়ি দিয়ে আছে যে, ঠিক মনে হয় ঘোমটা। সে ওদের তিনজনের দিকে একবারও তাকালো না। লোকটা অসম্ভব লম্বা। ঘোড়াটা শুধু ওদের দিকে একবার মুখ ফেরাতেই টর্চের আলোয় চোখ দুটো সেইরকম জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল।

গাড়িটা একটু দূরে চলে গেছে। রাণা টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে। বাড়ি যাবার জন্য এক-পা বাড়িয়েই সে বলল, চল, ওই ঠেকাটায় পিছনে উঠে পড়বি? তাহলে আর হাঁটতে হবে না।

সুজয় এই সময় একটা কথা মনে পড়ায় দারুণ চমকে উঠল। রাণার হাত চেপে ধরে বলল, এই, তুই একটা জিনিস লক্ষ্য করিসনি?

—কি?

—ওই ঘোড়াটার দুটো শিং ছিল। ঘোড়ার কখনও শিং হয়?

—কি পাগলের মতন কথা বলছিস!

—সত্যি, আমি নিজের চোখে দেখলাম। তোরা দেখিসনি?

গাড়িটা তখনও খুব বেশি দূরে যায়নি। চাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে একটু-একটু। পেছন দিকের আলোটা দুলছে। এখনও দৌড়ে গেলে গাড়িটাকে ধরা যায়।

সুজয় খুব উত্তেজিত বোধ করছে। শিংওয়ালা ঘোড়া সে কখনও দেখেনি। এই জন্যই গাড়িটাকে দেখে তার ঘোড়ায় টানা গরুর গাড়ি মনে হয়েছিল। গরুর গাড়ির মতন দেখতে গাড়িটা, সেটা টানছে গরুর বদলে ঘোড়া—সেই ঘোড়ার আবার শিং রয়েছে। এর মানে কি?

রাণা বলল, ঘোড়ার আবার শিং কি? তুই নিশ্চয়ই কান দুটো দেখেছিস।

সুজয় বলল, মোটেই না। আমার অত দেখতে ভুল হয় না।

খোকন ভালো বাংলা জানে না। সে জিগ্যেস করল, দাদা, শিং কি? হোয়াট ইজ শিং?

সুজয় বলল, হর্ন? এ পেয়ার অব হর্নস।

খোকন বলল, হর্সের হর্ন? এহে-হে-হে-হে। জয়দাদা কি ফানি কথা বলে!

সুজয় বলল, আমি স্পষ্ট দেখেছি! চল, দৌড়ে চল, আমি তোদের দেখিয়ে দিচ্ছি।

তিনজনেই চোঁ করে ছুট দিল। খোকন বয়েসে ছোট হলেও সে-ই সবচেয়ে জোরে ছুটতে পারে। স্কুলের স্পোর্টসে হাড্রেড মিটার রেস-এ সে ফার্স্ট হয়। রাণা আর সুজয় প্রায় সমান-সমান। রাণার হাতে টর্চ, সুজয়ের হাতে এয়ার গান।

কিন্তু ওরা এত জোরে ছুটলেও গাড়িটাকে ধরতে পারছে না। গাড়িটা যেন ঠিক সমান দূরেই থেকে যাচ্ছে। গরুর গাড়ি কি এত জোরে যেতে পারে? না, না, গরুর গাড়ি তো নয়, ঘোড়ায় টানা গাড়ি!

রাণা চেঁচিয়ে উঠল, এ ঠেকাওয়ালা, রোক্‌কে, রোক্‌কে।

গাড়িটা তাতেও থামল না। তখন রাণা ওই কথাটাই মারাঠী ভাষায় বলল। তবু গাড়িটা সমান জোরে যাচ্ছে।

খোকন বলল, আমি ঠিক ধরব!

সঙ্গে-সঙ্গেই খোকন তীরের মতন বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই গাড়িটাকে ধরে ফেলে ঝপাং করে লাফিয়ে উঠে বসলো পেছন দিকটায়। এবার গাড়িটা থামল। সুজয় আর রাণাও পৌঁছে গেল একটু বাদেই।

সুজয় দেখল, লম্বা গাড়োয়ানটির পাশে আরও একজন বসে আছে। একে তো সে আগে দেখেনি। এই লোকটি আবার এল কোথা থেকে। গাড়িটা তো ফাঁকাই ছিল। এই লোকটিও সারা গা-মাথা কম্বলে মুড়ি দিয়ে এমন ভাবে বসে আছে যে, অন্ধকারে প্রায় মিয়ে যাবার মতন। হয়তো সেই জন্যই আগের বার নজরে পড়েনি।

রাণা গাড়োয়ানের উদ্দেশে বলল, আপনাকে থামতে বলেছিলাম, থামছিলেন না কেন?

সুজয় ব্যস্ত হয়ে বলল. এই রাণা, ঘোড়া দুটোর ওপর টর্চ ফ্যাল!

খোকন বলল. হর্সের হর্ন হর্সের হর্ন, হে-হে-হে-হে।

লম্বা গাড়োয়ানটি কৌতূহলের সঙ্গে ঝুঁকে খোকনের দিকে তাকালো। কি বুঝল কে জানে। সঙ্গে-সঙ্গে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

রাণা টর্চ ফেলল, ওরা তিনজনেই দেখল, ঘোড়া দুটো শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। শিং-টিং কিচ্ছু নেই। এদিককার ঘোড়াগুলো ছোট, টাট্টু ঘোড়া যাকে বলে।

রাণা জিগ্যেস করল, কই রে, শিং কোথায়?

সুজয় এতই অবাক হয়ে গেছে যে কথা বলতে পারছে না। তা হলে কি সে সত্যিই ভুল দেখল? ভাগলপুরী গরুর মতন বড়-বড় বাঁকানো শিং দেখেছিল। কিন্তু এখন তো নেই!

কলকাতার ছেলেরা তো খুব চালাক হয়। তাই তাদের বোকা বানাতে পারলে বাইরের ছেলেরা খুব আনন্দ পায়। রাণা তাই ঠাট্টা করে বলল, কি রে জয়, তোদের কলকাতার ঘোড়ার বুঝি শিং থাকে। আমরা বাবা কখনও ঘোড়ার শিং দেখিনি!

খোকন হাসতে-হাসতে বলল, কি গাড়োয়ানজি, ঘোড়া কা শিং হোতা হ্যায়?

গাড়োয়ান দুজন কেউ একটাও কথা বলল না।

খোকন বলল, সিংহেরও শিং থাকে না।

রাণা বলল, 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ!'

খোকন বলল, ঘোড়ারও শিং থাকে না ডিমও হয় না! মা বলেন, ঘোড়ার ডিম! কিন্তু ওই কথাটা ইংলিশে ট্রানস্লেশন করতে পারবে?

এইরকম ভাবে ওরা সুজয়কে রাগাচ্ছে। সুজয় কি আর বলবে, চুপ করে রইল।

রাণা একটা ঘোড়ার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, শুধু তো কান দেখছি, শিং-এর ভাঙা দাগও তো নেই!

সুজয় বলল, ঠিক আছে বাবা, আমার ভুল হয়েছে!

রাণা লম্বা গাড়োয়ানটির উদ্দেশে বলল, আপনার গাড়িতে আমাদের একটু নিয়ে যাবেন? আপনি স্টেশনের দিকে যাচ্ছেন?

লম্বা গাড়োয়ানটির মতন এমন লম্বা আর ফর্সা গাড়োয়ান সুজয় আগে কখনও দেখেনি। পাশের লোকটিও লম্বা, তবে অতটা নয়—এরও রং খুব ফর্সা. শুধু মুখটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

লম্বা গাড়োয়ানটি রাণার কথা শুনে দু-দিকে ঘাড় নেড়ে জানালো, না। তারপর আর কিছু না বলে আবার জোরে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

বাকি রাস্তাটা সুজয় আর একটাও কথা বলল না। রাণা আর খোকন আবার শেয়াল মারার কথা বলতে লাগল।

মামাবাবুর বাড়ির সামনের গোল বারান্দায় বড়োরা সবাই মিলে গল্প করছিলেন। সুজয়ের মামাবাবু, মামিমা, বাবা, মা, ছোড়দি, আরও দুজন অন্য বাড়ির লোক। কি একটা কথায় ওঁরা খুব হাসছিলেন বলেই বোঝা গেল, সুজয়দের দেরি করে ফেরার জন্য কেউ রাগ করেননি।

মামিমা বললেন. কি রে, তোরা কোথায় গিয়েছিলি?

রাণা হাসতে-হাসতে সুজয়ের মাকে বলল, জানো সেজোমাসি, জয় আজকে আমাদের ঘোড়ার শিং দেখাচ্ছিল!

সুজয়ের মা বললেন, সে আবার কি?

রাণা বলল, হ্যাঁ, ঘোড়ার মাথায় গরুর শিং!

খোকন বলল, ইউনিকর্ন কিন্তু নয়। দুটো করে—জয়দাদা বলেছে, এ পেয়ার অব হর্নস!

সুজয় মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যরা বেশ মজা পেয়েছে। সুজয়ের ছোড়দি ঝর্ণা বলল, কি হয়েছে বল না!

রাণা বলল, একটা ঠেকা গাড়ি যাচ্ছিল, জয় বলল কিনা ঘোড়া দুটোর শিং আছে। আমরা তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি শিং ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু ঘোড়ার কান লটপট করছে।

আরও কিছুক্ষণ এই নিয়ে ঠাট্টা করলো ওরা। সুজয় ব্যাপারটাকে চাপা দেবার জন্য বলল, খিদে পেয়েছে, এবার খেতে দাও!

রাণা বলল, আমরা আরও তাড়াতাড়ি আসতে পারতাম। ওই গাড়িটা ফাঁকা ছিল—একজন মোটা গাড়োয়ান, আমরা বললাম আমাদের নিয়ে আসতে—

সুজয় বলল, একজন না দুজন গাড়োয়ান!

এবার রাণা রীতিমতো অবাক হয়ে বলল, দুজন কোথায়? একজনই তো মোটে ছিল।

সুজয় জোর দিয়ে বলল, মোটেই একজন নয়। দুজন।

রাণা বলল, খোকন, ক'জন গাড়োয়ান ছিল রে?

খোকন বলল, ওনলি ওয়ান।

সুজয় বলল, তোরা লক্ষ্য করিসনি। আর একজন পাশে বসেছিল।

রাণা বলল, আমরা দুজনে কেউ দেখলাম না, আর তুই একা দেখলি? কি মিথ্যে কথা বলতে পারিস! একবার বলছিস ঘোড়ার শিং, আবার বলছিস একজনের জায়গায় দুজন গাড়োয়ান—

সুজয় এবার রেগে গিয়ে চ্যাঁচামেচি লাগিয়ে দিল। ঘোড়ার শিং তার চোখের ভুল হতে পারে, কিন্তু দুজন গাড়োয়ানকে ওরা একজন বলছে কেন?

সুজয় সহজে মিথ্যে কথা বলে না। এই বছরে মাত্র দুটো মিথ্যে কথা বলেছে। যে যখন সত্যি কথা বলে, তখনও কেউ অবিশ্বাস করলে তার কান্না এসে যায়। কান্না আর রাগ মিশিয়ে সে এমন চ্যাঁচামেচি করতে লাগল যে, বড়োরা জোর করে থামিয়ে দিলেন ওদের।

ছোড়দি বললেন, জয়টা আজকাল বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। ট্রেনে আসবার সময়, মনে নেই, জানলা দিয়ে একটা বই ফেলে দিয়েছিল?

মা বললেন, থাক থাক। ও-সব কথা থাক এখন। চল, খেতে চল।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বাদেই শোবার পালা। রাণা আর খোকন হোস্টেলে থাকে তো, ওদের তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া স্বভাব। বিছানায় শুয়েই ঘুমোল। রাণা যে

বলেছিল, রাত্তিরে আবার বেরুবে, সেকথা তার মনেই পড়লো না। অবশ্য আজ সুজয় মোটেই ওর সঙ্গে আর যেত না।

শুয়ে-শুয়ে সুজয় ভাবতে লাগল, রাণা আর খোকন দুজন গাড়োয়ান দেখেও একজন বলল কেন? শুধু তাকে রাগাবার জন্য কি? আর সে-ই বা ঘোড়ার শিং দুটো ভুল দেখলো কি করে?

সেই রাত্রে সুজয় স্বপ্ন দেখলো, সে একটা দারুণ মন্তর শিখে গেছে। সেই মন্তর দিয়ে সে একটা বেড়ালকে পায়রা করে দিতে পারে, গাধাকে কুকুর করে দিতে পারে। শিং ছাড়া গরু আর শিংওয়ালা ঘোড়া বানাতে পারে। এমনকি রাণা আর খোকনকেও সে পাথরের পুতুল করে দিতে পারে। সে ম্যানড্রেকের চেয়েও ভালো ম্যাজিক দেখাতে পারে এখন।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সুজয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। স্বপ্ন তো আর সত্যি হয় না। সে কোনও মন্ত্র কিংবা ম্যাজিকই শেখেনি।

পরীক্ষা করবার জন্য সে টেবিলের ওপরে রাখা গোল ঘড়িটার দিকে যাদুকরের মতন হাত নেড়ে বলল, এই ঘড়িটা এক্ষুনি একটা টিয়া পাখি হয়ে যাক! টিয়া পাখি হয়ে থাক!

কিছুই হল না। ঘড়িটা টিক-টিক করতে লাগল। আর সেই সময়েই দেওয়ালের ওপর থেকে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল, ঠিক-ঠিক!

এই সময়েই টিকটিকিটার ডাকবার কি কোনও মানে আছে! সুজয়ের খুব রাগ হল টিকটিকিটার ওপর। সে ওটাকে তাড়া করে গেল। টিকটিকিটা সুরুৎ করে ঢুকে গেল ঘুলঘুলির মধ্যে।

রাণা আর খোকন তখনও ঘুমোচ্ছে। সুজয় ওদের ডাকল না। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাগানে। বাড়ির আর কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি।

ঘাসের ওপর শিশির পড়ে আছে। ফুলগাছের ফুল আর পাতাও ভিজে-ভিজে। গুলমোহর গাছ দুটোর নিচে অজস্র পাপড়ি ঝরে পড়েছে। ফুরফর করছে ঠান্ডা হাওয়া। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

সুজয় একা একা বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল বাগানে। আর মনে-মনে ভাবতে লাগল, সত্যিই কি তার চোখ খারাপ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ! নইলে সে কাল রাত্তিরে ওরকম ভুল দেখল কেন?

আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখা যাক তো, সত্যিই তার চোখ খারাপ কি না। বাগানের এক কোণে পাশাপাশি তিনটে গোলাপ ফুলের গাছ। সাদা রঙের গোলাপ। ওই তিনটে গাছে সবসুদ্ধ ক'টা গোলাপ ফুটে আছে? সুজয় দূর থেকে গুনল—সাতটা।

তারপর এক ছুটে কাছে গিয়ে দেখলো, ঠিক সাতটাই ফুল। দূরের ইউক্যালিপটাস গাছটার ক'টা ডাল। চারটে! সুজয় ঠিক দেখতে পাচ্ছে। সুজয় মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো। মেঘ-টেঘ নেই, আকাশ তকতকে নীল। ঝিকমিক করছে রোদ্দুর, তাতে তাপ

নেই। এখন সূর্যের দিকেও তাকানো যায়। কত লক্ষ কোটি-কোটি মাইল দূরে সূর্য, তাও তো মানুষ দেখতে পায়।

সুজয় আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, এমনসময় এক ঝাঁক টিয়া পাখি উড়ে গেল তার মাথার ওপর দিয়ে। সুজয় গুনতে লাগল এক, দুই, তিন, মোটমাট আটটা। এর মধ্যে সাতটা টিয়া এক সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে যাচ্ছে আর একটা টিয়া একটু পেছনে পড়ে টি-টি-টি করে ডাকছে।

সুজয়ের বেশ মজা লাগলো। এ ক'দিন সে তো একটাও টিয়া পাখি দেখেনি এখানে। আজ সকালেই সে কিনা ঘড়িটাকে টিয়া পাখি করে দিতে চাইছিল, অমনি কোথা থেকে এল এক ঝাঁক টিয়া। এরকম অনেক মজার-মজার ব্যাপার হয়। তুমি মনে-মনে যা ভাবছ, হঠাৎ সেটা চোখের সামনে দেখা যায়। তুমি মনে-মনে একটা গানের লাইন ভাবছ, হঠাৎ সেই গানটাই তখন রেডিওতে শোনো যায়। হয় না এরকম?

সুজয়ের মনে হল, আচ্ছা, পেছনে যে টিয়াটা একলা যাচ্ছে সেইটাই তাদের ঘড়িটা নয় তো। ম্যাজিকটা একটু দেরিতে বোধহয় কাজ হয়েছে। এই কথা ভেবেই সুজয় এমন উত্তেজিত হয়ে গেল যে, সে ছুটে দেখতে গেল টেবিলের ওপর তাদের ঘড়িটা এখনও আছে কিনা। বাগানের দিকের জানলা দিয়েই উঁকি মারলো ঘরে।

সুজয় কি দেখল?

কি আবার দেখবে, ঘড়িটা ঠিক টেবিলের ওপর টিকটিক করছে। ঘড়ি আবার টিয়া পাখি হয় নাকি? সুজয়েরই শুধু এরকম অদ্ভুত কথা মনে হয়। ওইসব কথা ভেবে ভেবে সে মনে-মনে খেলা করতে ভালোবাসে।

সুজয় মাঝে-মাঝেই চোখে নানা রকম ভুল দেখে। কিন্তু চোখে ভুল দেখা তো দোষের কিছু নয়। সবাই চোখে ভুল দেখে। আমরা যখন কাচের গেলাসে এক গেলাস বেশ পরিষ্কার জল খেয়ে ফেলি, তখন কি আমরা বুঝতে পারি যে ওই জলের মধ্যে কত অসংখ্য বীজাণু কিলবিল করছে? স্বাস্থ্য বইতে কিন্তু লেখা আছে, সত্যি ওইরকম থাকে।

জানলা দিয়ে এক ফালি রোদ্দুর এসে পড়লে আমরা দেখতে পাই, সেই রোদ্দুরের মধ্যে কত কি ছোট-ছোট জিনিস উড়ছে। ঘরের অন্য কোনও জায়গায় সেরকম নেই। আসলে কিন্তু সব জায়গার হাওয়াতেই ওইরকম রয়েছে—আমরা দেখতে পাই না. রাস্তায় অনেকখানি রোদ্দুর থাকলেও তার মধ্যে দেখতে পাই না।

এই সব কথা ভাবতে-ভাবতে সুজয় বাগানে ঘুরছিল, হঠাৎ দেখল, বাগানের গেটের কাছে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। গেট তালাবন্ধ।

নিশ্চয়ই মামাবাবুকে ওরা ডাকতে এসেছে—এই ভেবে সুজয় গেটের দিকে এগিয়ে গেল। লোক দুটির কাছে এসে সুজয় এমন চমকে গেল যে, তার বুকের মধ্যে দুপদুপ শব্দ হতে লাগলো। চমকাবে না? গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে কাল রাত্তিরের সেই ঠেকাগাড়ির লোক দুটো। সেই লম্বা গাড়োয়ান আর তার সঙ্গী। গাড়িটা কিন্তু নেই। এত সকালে ওরা এখানে কি করছে?

সুজয় কিন্তু ভয় পায়নি। দিনের আলোয় দুজন লোককে দেখে ভয় পাবে কেন?

শুধু চমকে গেছে। তা ছাড়া, লোক দুটিকে দেখলে একটুও ভয় করে না। ভারী সুন্দর তাদের মুখ এবং দু-জনেই হাসি-হাসি মুখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

লম্বা লোকটি জিগ্যেস করলো, বাংলা না হিন্দি?

সুজয় বলল, হাম বাঙালি। কলকাতায় থাকতা হ্যায়।

লম্বা লোকটি এবার স্পষ্ট বাংলায় বলল, আপনার নাম কি?

সুজয়কে কেউ কখনও আপনি বলে না। সুজয় তো দারুণ খুশি। সে বলল, আমার নাম সুজয় মুখোপাধ্যায়। ডাকনাম জয়। ডাকনামটাই আমার বেশি ভালো লাগে।

—জয়বাবু, আপনারা এখানে বেড়াতে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

লোক দুটিকে দেখে এখন মোটেই গাড়োয়ান মনে হয় না। বোধহয় কাল রাত্তিরে শখ করে গাড়ি চালাচ্ছিল। মারাঠীদের মতন মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা, গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি আর দু-জনের গায়েই সাদা চাদর জড়ানো। খুব ফর্সা রং, স্বাস্থ্য খুব ভালো। তবে ওদের দাড়িগোঁফ নেই, হাতে পায়ে লোম নেই, দু-জনের মাথাতেই পাগড়ি! দাড়িগোঁফ না থাকলেও ওদের চীনেম্যানের মতন মনে হয় না—টিকোলো নাক, টানাটানা চোখ।

সুজয় বলল, কাল সন্ধ্যেবেলা আপনাদের দেখেছিলাম। আপনারা বাংলা জানেন?

—আমরা কলকাতায় গিয়েছিলাম।

সুজয়ের ইচ্ছে হল, তক্ষুনি রাণা আর খোকনকে ডেকে এনে দেখায়, কাল সত্যিই দু'জন লোক ছিল কিনা। সে অত ভুল দেখে না । কাল রাণা তাকে মিথ্যেবাদী বলেছিল বলে তার এত রাগ হয়েছিল!

কিন্তু এদের দাঁড় করিয়ে রেখে তো রাণাদের ডাকতে যাওয়া যায় না। তাই সে বলল, আপনারা ভেতরে আসবেন না?

লম্বা লোকটি বলল, না।

তার পাশের লোকটি এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার সে বলল, আচ্ছা জয়বাবু, ঘোড়ার শিং হয় না কখনও, তাই না?

সুজয় লজ্জা পেয়ে দুদিকে মাথা নেড়ে বলল না।

লোকটি তখন জিগ্যেস করল, তাহলে ঘড়ি কি টিয়া পাখি হয়?

এবার সুজয় শুধু চমকে উঠল না, ভয় পেয়ে গেল। সে যে ঘড়িটাকে টিয়া পাখি করতে চেয়েছিল, সেকথা এরা জানবে কি করে? আর কেউ তো জানে না! এরা কি তখন জানলার পাশে দাঁড়িয়ে শুনেছে?

কিংবা, এই লোক দুটোই বোধহয় ম্যাজিক জানে। সে বইতে পড়েছে, ভালো ভালো ম্যাজিসিয়ানরা কারুর চোখের দিকে তাকিয়েই তার মনে কথা বুঝতে পারে।

সুজয় শুকনো গলায় জিগ্যেস করল, আপনারা কি ম্যাজিক জানেন?

লোক দুটি ঠিক সুজয়ের মতনই দুদিকে মাথা নেড়ে হাসিমুখে বলল, না।

লোক দুটি এত ভোরবেলা কেন এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সুজয় সেটাও বুঝতে পারছে না। ভেতরেও আসতে চাইছে না ওরা।

সুজয় জিগ্যেস করল, আপনারা মামাবাবুকে ডাকতে এসেছেন?

লম্বা লোকটি বলল, না।

পাশের লোকটি বলল, আপনাকেই দেখতে এসেছি।

এবার সুজয়ের গা-ছমছম করতে লাগল। এদের কথাবার্তা যেন কেমন-কেমন! এরা মনের কথা জানতে পারে কী করে? কেনই বা সুজয়কে দেখতে এসেছে! সুজয় কি কোন দোষ করেছে?

অথচ সকালবেলাতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। রাত্তিরে অন্ধকারের মধ্যে সবাই একটু-আধটু ভয় পেতে পারে। কিন্তু অর্জুন আর কৃষ্ণ, টার্জন আর অরণ্যদেবের গল্প যে পড়েছে—তার কি দিনের বেলা ভয় পাওয়া মানায়?

সুজয় মনে-মনে সাহস এনে বলল, আপনারা কে?

লম্বা লোকটি বলল, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি।

সুজয় বলল, তাহলে কাল রাত্তিরে ওই ঠেকাগাড়ি চালাচ্ছিলেন কেন?

এবার ওরা কোনও উত্তর দেবার আগেই রাস্তার দুটো কুকুর ছুটে এল গেটের কাছে। লোক দু-জনের গায়ের গন্ধ শুঁকে অসম্ভব জোরে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে লাগল। এমনভাবে লাফাচ্ছে, যেন এক্ষুনি কামড়ে দেবে। রাস্তার কুকুররা অচেনা মানুষ দেখলে অনেক সময় এইরকম করে।

সুজয় কুকুরের কাছাকাছি থাকা একদম পছন্দ করে না। কিন্তু তার কোনও বিপদ নেই এখন, সে গেটের এপাশে রয়েছে।

লোক দুটি কুকুর দেখে ভয় পেলে না। লম্বা লোকটি তাকালো বেঁটে লোকটির চোখের দিকে। বেঁটে লোকটি দু-হাতের আঙ্গুল নেড়ে ইশারায় কি যেন বলল। লম্বা লোকটিও আঙুল নেড়ে ইশারা করল।

বেঁটে লোকটি সুজয়কে জিগ্যেস করল, এই কুকুর কি মানুষকে কামড়ায় নাকি?

সুজয় বলল, হ্যাঁ। অনেক সময় কামড়ে দেয়।

—তাহলে লোকেরা সব কুকুরগুলোকে মেরে ফেলে না কেন?

লম্বা লোকটি তাড়াতাড়ি বলল, সব কুকুর কামড়ায় না। পোষা কুকুর কামড়ায় না।

বলতে-না-বলতেই একটা কুকুর ঘ্যাঁক করে লম্বা লোকটিকেই কামড়ে দিল। পায়ে এত জোর কামড়ে দিয়েছে, যেন মনে হয় মাংস ছিঁড়ে নেবে।

লম্বা লোকটি এক ঝটিকায় পা-টা ছাড়িয়ে নিল। তারপর কুকুরটাকে এক লাথি মারতেই কুকুরটা একেবারে হাওয়া দিয়ে উড়ে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। বাবাঃ লোকটার পায়ে কি অসম্ভব জোর! এ যদি ফুটবলের সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলে তাহলে প্রত্যেক মিনিটে একটা করে গোল দেবে।

বেঁটে লোকটা অন্য কুকুরটাকে মারবার জন্য পা তুলেছে, কিন্তু প্রথম কুকুরটার দশা দেখে দ্বিতীয় কুকুরটা ভয় পেয়ে ল্যাজ গুটিয়ে এমনভাবে দৌড়ল যে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুজয় লম্বা লোকটিকে বলল, ইস্, আপনাকে দারুন জোরে কামড়ে দিয়েছে, না!

লম্বা লোকটার মুখে ব্যাথার চিহ্নমাত্র নেই। তখনও মুখখানা হাসিমাখা। বলল, হুঁ বড্ড জোরে—

—কই, আপনার রক্ত বেরোয়নি তো?

লম্বা লোকটি বলল, রক্ত বেরোয়নি বুঝি? কই দেখি!

সে ঝুঁকে পায়ের সেই জায়গাটায় হাত দিতেই গল-গল করে রক্ত বেরুতে লাগল। অনেক রক্ত। তারপর সে বলল, এই তো রক্ত। জয়বাবু, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।

জয় সত্যিই আগে রক্ত দেখতে পায়নি। এখন এত রক্ত দেখে বলল, আমি গেটের চাবি নিয়ে আসছি এক্ষুনি। আপনারা ভেতরে আসুন। আমার বাবার কাছে অনেক রকম ওষুধ আছে।

লম্বা লোকটি বলল, থাক, ওষুধের দরকার নেই।

জয় বলল, না না, ওরকম করবেন না। কুকুরে কামড়ালে কি হয় জানেন? জলাতঙ্ক অসুখ হয়।

ওরা সে কথার কোনও মূল্যই না দিয়ে বলল, আচ্ছা জয়বাবু, চলি!

বলেই ওরা পেছন ফিরে হাঁটতে লাগল। যতক্ষণ না ওরা রাস্তার মোড়ে বেঁকে গেল, ততক্ষণ সুজয় তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। ঠিক মোড় ঘুরবার সময় ওরা সুজয়ের দিকে তাকিয়ে আর একবার হাসল। ওদের কি গায়ে ব্যথা লাগে না? কুকুরে কামড়াবার পরও হাসতে পারে কি করে?

প্রথম দিকে একটু ভয় ভয় করলেও লোক দুটিকে সুজয়ের ভালোই লাগছিল। তার ইচ্ছে করছিল, ওদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলতে। হঠাৎ যে কোথা থেকে কুকুর দুটো এল! লম্বা লোকটিকে কুকুরে কামড়ে দেবার জন্য সুজয়ের মনে একটা দুঃখ -দুঃখ ভাব হল।

গেট থেকে ফিরে আসতে-আসতে সুজয় ভাবল, এই লোক দুটোর কথা সে বাড়ির কাউকে বলবে না। লোক দুটো বেশ ভালো হলেও কীরকম যেন অদ্ভুত! এদের কথা বললে রাণা আর খোকন যদি অবিশ্বাস করে! একটা লোককে কুকুরে কামড়ালে সে ব্যাথা পায় না—একথা কি ওরা মানতে চাইবে? তার চেয়ে বাবা কিছু বলার দরকার নেই।

সুজয় ঘরে ফিরে এসে দেখল, তার ছোড়দি ঘুম থেকে উঠেই একটা বই নিয়ে বসেছে। ছোড়দি গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। রাত্রিরে যদি কোনও বই নিয়ে শোয়— তাহলে সকালবেলা উঠেই আবার সেই বইটা পড়তে শুরু করবে। শেষ না করা পর্যন্ত মুখও ধোবে না।

ছোড়দি চুল আঁচড়ায়নি এখনও। শাড়িও বদলায়নি। গভীর মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে। বাড়ির আর কেউ এখনও ওঠেনি।

সুজয়কে দেখে ছোড়দি মুখ তুলে বলল, এত ভোরে তুই কোথায় গিয়েছিলি?

সুজয় বলল, এমনি বেড়াচ্ছিলাম।

—অত কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছিল কেন?

—রাস্তার কুকুর।

ছোড়দিও কুকুর দেখলে ভয় পায়। সেইজন্যই আবার জিগ্যেস করল, গেট বন্ধ আছে তো?

সুজয় 'হ্যাঁ' বলতেই ছোড়দি আবার নিশ্চিত হয়ে বইতে মনোযোগ দিল। যাক্, ছোড়দি লোক দুটোকে দেখতে পায়নি। সুজয়কেও কোনও মিথ্যে কথা বলতে হল না। সুজয় নিজের ঘরে ফিরে দেখল, তখনও রাণা আর খোকন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ঘড়িতে ক'টা বাজে দেখতে গিয়ে দেখল, ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। একটু আগেও তো চলছিল। ঘড়িটা তুলে নিয়ে দু-একবার ঝাঁকুনি দিতেই সেটা আবার চলতে লাগল।

সুজয় তখন ভাবল, ঘড়িটা টিয়াপাখি হয়ে উড়ে গিয়েছিল তো—আবার ফিরে এসে চলতে ভুলে গিয়েছিল। এই কথা ভেবে সুজয় মনে-মনেই হাসল। এরকম কখনও হয় না। হলে কিন্তু বেশ হত।

আচ্ছা, ওই লোকটা তার মনের কথা কি করে জানল? নিশ্চয়ই ম্যাজিক জানে ওই লোকটা। ইস, তাকে যদি ওই ম্যাজিকটা শিখিয়ে দিত।

সুজয় রাণা আর খোকনকে ধাক্কা দিয়ে বললে, এই, ওঠ্ ওঠ্।

সেদিন বিকেলবেলা ওরা বাড়িসুদ্ধ সবাই একসঙ্গে বেড়াতে বেরুল। জলগাঁও-এর সবচেয়ে ভালো জায়গার নাম বলিরাম পেট। এখানকার নামগুলো কী অদ্ভুত। পেট আবার জায়গার নাম হয নাকি ? বলিরাম পেট-এ মামাবাবুর এক বন্ধু থাকেন, তিনি সবাইকে চা-জলখাবারের নেমতন্ন করেছেন।

হেঁটেই যাওয়া হবে। বিকেলবেলা ফুরফুরে হাওয়া দিয়েছে, এর মধ্যে হাঁটতে বেশ ভালোই লাগে। বড়রা পেছনে আস্তে-আস্তে আসছেন, আর সুজয়রা সামনে এগিয়ে। রানা এখানকার সব রাস্তাই চেনে।

রাস্তার উলটোদিকে তিন চারটে কুকুর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে আর জোরে জোরে ডাকছে। এর মধ্যে সকালের সেই কুকুর দুটোও আছে কিনা কে জানে।

সুজয় ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে বলল, ওরে বাবা, কুকুর!

রাণা হেসে বলল, এঃ মা, এত ভয় পাচ্ছিস কেন! এরা কিছু বলে না। দেখবি!

রাণা শিস দিয়ে ডাকল, এই কাল্লু, কাম হিয়ার, কাম হিয়ার ! চু-চু-চু-চু।

সুজয় বলল, ডাকিস না, ডাকিস না। এই কুকুরগুলো ভীষণ কামড়ায়।

রাণা বলল, কক্ষনো না। এরা ওই মিষ্টির দোকানওয়ালার পোষা কুকুর।

খোকন বলল, এ বার্কিং ডগ নেভার বাইটস্।

সুজয় বলল, নেভার নয়। সেলডম। সেলডম! সেলডম মানে জানিস? একবার দুবার কামড়াতে পারে।

রাণা বলল, এরা কোনওদিন কারুকে কামড়ায়নি। তুই দোকানটায় জিগ্যেস কর।

সুজয় আর একটা কিছু বলতে গিয়েও বলল না। চুপ করে গেল।

হঠাৎ জলগাঁও থেকে অজন্তা-ইলোরায় বেড়াতে যাবার কথা ঠিক হয়ে গেল। মামাবাবুর বন্ধু একটা স্টেশন-ওয়াগন দিয়ে দিলেন ওদের। তিনি বললেন, কলকাতা থেকে এতদূর এসেছেন আর অজন্তা দেখবেন না, তাও কি হয়?

ওদের অবশ্য অজন্তায় বেড়াতে যাবার ইচ্ছে আগে থেকেই ছিল। এমনভাবে হঠাৎ একটা গাড়ি পেয়ে যাওয়ায় খুব সুবিধে হল। মামাবাবুর বন্ধুর অনেক লরি আর ট্যাক্সি আছে। ওদের জন্য একটা নতুন স্টেশন-ওয়াগন এসে গেল পরের দিন সকালেই।

সুজয়, রাণা আর খোকন খুব ভোরে উঠে স্নান-টান করে, জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে আছে। তিনজনেই ঠিক করে রেখেছে, জানালার কাছে বসবে। ড্রাইভারের পাশের সিটে কে বসবে—তা অবশ্য ঠিক হয়নি এখনও। মামাবাবু ছুটি পাবেন না বলে যেতে পারবেন না। তাই মামীমাও যাচ্ছেন না। সুজয়ের ছোড়দি ঝর্ণা তার বাবার ক্যামেরাটা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। ঝর্ণা খুব ভালো ছবি তোলে। ঝর্ণা সাইকেল চড়তে পারে, সাঁতারেও কলেজের স্পোর্টস প্রথম হয়ে কাপ পেয়েছে।

জিনিসপত্র সব তুলে গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হল। ঠিক হয়েছে, প্রথম দিন ওরা অজন্তা দেখে নিয়ে সেখান থেকে ঔরঙ্গাবাদ চলে যাবে। ঔরঙ্গাবাদে থাকবে হোটেলে। পরদিন ইলোরা এবং আরও যদি কাছাকাছি কিছু দেখার থাকে। ঔরঙ্গাবাদের কাছেই একটা দুর্গ আছে—সুজয়রা তো সেটা দেখবেই। সব মিলিয়ে চার-পাঁচ দিনের বেড়ানো।

কী চমৎকার রাস্তা। মাঝে-মাঝেই পাহাড় আর ঘন বন। অনেক জায়গা দেখেই মনে হয়, কি সুন্দর পিকনিক করা যায়। এক একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে একটু খেলে নিতে ইচ্ছে করে। একটা নদী প্রায় শুকিয়ে গেছে, বালির ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে নদী পার হচ্ছে একদল লোক। সুজয় সেখানে একবার গাড়ি থামাতে বলল। ড্রাইভারের পাশে বাবা বসে আছেন। বাবা বললেন, না। এখন সময় নষ্ট করা চলবে না। অজন্তার সব ক'টা গুহা ঘুরে-ঘুরে দেখতে সময় লাগবে।

অজন্তা জায়গাটা যে কীরকম, সুজয় তা ঠিক জানে না। সে শুনেছে, অজন্তার দেওয়ালে অনেক ছবি আঁকা আছে। আবার গুহার কথা শুনে ভাবে, গুহার মধ্যে তো বাঘ-ভাল্লুক থাকে—সেখানে ছবি থাকবে কি করে?

সেখানে পৌঁছোবার পর তার একেবারে চোখ জুড়িয়ে গেল। এমন অপূর্ব সুন্দর জায়গা সে জীবনে কখনও দেখেনি। চারপাশে খাড়া-খাড়া পাহাড়। পাহাড়গুলোকে কীরকম গম্ভীর গম্ভীর মনে হয়। ওদের গাড়িটা ঘুরতে-ঘুরতে নেমে এল অনেক নিচে, দুটো পাহাড়ের মাঝখানে। সেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী। নদীটা ছোট হলেও খুব স্রোত আর জলের রং গেরুয়া।

রাণার এরই মধ্যে খিদে পেয়ে গেছে। আর খোকন যদি কোল্ড ড্রিংকস্-এর দোকান দেখে, তাহলে কিছুতেই সেখান থেকে নড়বে না। সুজয়েরও একটু-একটু খিদে পেয়েছে—কিন্তু ছোড়দির ভয়ে কিছু বলছে না। বেড়াতে বেরিয়ে কোনওরকম আবদার করলেই ছোড়দি বড্ড বকে। নিজে যে বারবার চা খায়, তার বেলা কিছু নয়।

মা-ই বললেন, পাহাড়ে উঠতে হবে তো আগে ছোটদের কিছু খাইয়ে নাও।

ছোড়দি বলল, শুধু-শুধু সময় নষ্ট! এইজন্যই বাচ্চাগুলোকে রেখে আসতে বলেছিলাম।

ছোড়দি সুজয়ের চেয়ে মাত্র ছ'বছরের বড়। তবু সব সময় আজকাল ওকে বাচ্চা বাচ্চা বলে।

একটা লাল রঙের দোতলা বাড়ির একতলায় খাবার-টাবার সব পাওয়া যায়। ওরা সবাই সেখানে গিয়ে খেতে বসল। আর বাবা ইতিমধ্যে গিয়ে গাইড আর আলো ঠিক করে এলেন। আলো ছাড়া অজন্তার কোনও ছবিই দেখা যায় না।

মস্ত বড় একটা পাহাড় কেটে-কেটে গুহা বানানো হয়েছে। গুহা মানে কি, এক-একটা বিরাট হলঘরের মতন। ছোড়দি বলল, প্রায় দু-হাজার বছর আগে বৌদ্ধ শিল্পীরা এইসব গুহা বানিয়ে তার মধ্যে ছবি এঁকেছে। কত বছর যে লেগেছে কে জানে!

গুহাগুলো ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যে আগেকার দিনে ছবি আঁকত কি করে? আলো জ্বেলে-জ্বেলে সব দেওয়াল ভর্তি করে ছবি এঁকেছে? সুজয় বুঝতে পারে না, কেন বৌদ্ধরা এত কষ্ট করে ছবি আঁকত।

গাইড ওদের নিয়ে এক একটা গুহায় ঢুকছে আর আলো জ্বেলে জ্বেলে দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে ছবি বুঝিয়ে দিচ্ছে। অনেক লোক এমনি এসেছে, যারা আলোও আনেনি, গাইডও আনেনি। তারাও ওদের কাছে এসে ভিড় করে শুনছে।

পাঁচ-ছ'টা গুহা ঘুরেই সুজয়রা একটু ক্লান্ত হয়ে গেল। মা-ও আর হাঁটতে পারছেন না। মাঝে মাঝেই গুহার বাইরে বেরিয়ে বলছেন, দাঁড়াও বাপু, একটু জিরিয়ে নিই।

গুহাগুলোর সামনে দিয়ে টানা বারান্দার মতন রাস্তা। এক এক জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বা নামতে হয়। রাস্তাগুলোর পাশের দিকে নিচু দেয়াল। সেই দেয়াল দিয়ে ঝুঁকলে দেখা যায় অনেক নিচে সেই নদীটা, তার দু-পাশটা কি সুন্দর বাগানের মতন।

ছোড়দি একটুও বিশ্রাম করতে দেবে না। মা জিরোতে বসলেই সে তাড়া দিয়ে বলে, চলো, চলো! এখনও চল্লিশটার বেশি গুহা আছে। সব দেখতে হবে।

একেবারে শেষের দিকের একটা গুহার দেয়ালে বুদ্ধদেবের শুয়ে থাকা একটা বিরাট মূর্তি আছে, সেটা না দেখে ছোড়দি কিছুতেই যাবে না।

ওরা যখন এগারো নম্বর গুহাটা দেখছে—সেখানে অনেক লোকের ভিড়, গাইডবাবুও মস্তবড় বক্তৃতা দিচ্ছে—হঠাৎ সুজয় একটা অদ্ভুত জিনিস দেখল। ভিড়ের ঠিক পেছনে একজন লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে, লোকটার গা থেকে যেন আলো বেরুচ্ছে মনে হয়। জোনাকির গা থেকে যে-রকম আলো বেরোয়, সেই রকম হালকা নীল রঙের আলো। অন্ধকারের মধ্যে লোকটির চেহারা জ্বলজ্বল করছে।

একটু বাদেই কিন্তু সুজয় সেই লোকটিকে আর দেখতে পেল না। ভালো করে চোখ কচলে নিয়ে আবার তাকাল না। না, কিছুই নেই তো। এসব কি দেখছে সুজয়? সত্যিই দেখল, না স্বপ্ন? সুজয়ের কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? লোকের গা থেকে আবার আলো বেরোয় নাকি!

ভয়ে-ভয়ে সে রাণার দিকে চাইল। রাণা তার পাশে দাঁড়িয়ে একই দিকে তাকিয়ে আছে। রাণা ওই রকম কিছু দেখতে পেলে নিশ্চয়ই বলতো। কিন্তু রাণা কিছু দেখেনি। সুজয়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেন সে চোখে এত ভুল দেখছে? সুজয় ঠিক করল, সে আর অন্য কোনও দিকে তাকাবে না, সে ছোড়দির পাশে-পাশে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে সব ছবি দেখবে। এরপর চার-পাঁচটা গুহা ঘুরে ঘুরে ছবি দেখতে ভালো লাগল তারা। এখন সে বুদ্ধ আর অবলোকিতেশ্বরের তফাত পর্যন্ত বুঝে গেছে।

কুড়িখানা গুহা দেখার পর মা বললেন, আমি আর যেতে পারছি না বাপু। আমি এবার এখানে বসলুম। এবার ফিরে চল।

ঝর্ণা বলল, এর মধ্যেই? এখনো তো অর্ধেকও হয়নি।

তখন ঠিক হল বাবা আর ছোড়দি গাইডবাবুর সঙ্গে গিয়ে বাকিটা দেখে আসবে। সুজয়রা মায়ের সঙ্গে সেখানেই অপেক্ষা করবে। সুজয় অবশ্য ছোড়দির সঙ্গে যেতে চায়। কিন্তু তা হলে রাণা আর খোকনও যাবে। মাকে তো আর এখানে একা বসিয়ে রাখা যায় না।

ওরা তিনজনে মাকে নিয়ে সেখানে বসে রইল। ছোড়দি আর বাবা যখন চলে যাচ্ছেন, তখন তাঁদের পেছনের মানুষের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে সুজয় বলে উঠল, আরেঃ!

রাণা জিগ্যেস করলো, কি?

সুজয় বলল, সেই লোকটা!

—কোন্ লোকটা?

—সেই ঠেকাগাড়ির লম্বা লোকটা।

রাণা হো-হো করে হেসে উঠল।

সুজয় বলল, হাসছিস কেন? ওই তো লোকটা, দেখতে পাচ্ছিস না?

রাণা বলল, তোর কি মাথা খারাপ? সেই লোকটা এখানে আসবে কি করে?

সুজয় বলল, চল আমার সঙ্গে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

ওরা দুজনে দৌড়ে খানিকটা এগিয়ে গেল। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সেই লোকটাকে আর খুঁজে পেল না। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস হল, সে ঠিক সেই লম্বা লোকটাকেই দেখেছে। তার চোখের ভুল নয়। আর ওই লোকটাই একটু আগে গুহার মধ্যে লোকজনের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, ওর গা থেকে আলো বেরোচ্ছে।

একটু বাদে দূরে কীরকম যেন হুড়োহুড়ির শব্দ শোনা গেল। ওরা ব্যস্ত হয়ে তাকাল সেদিকে। কতকগুলো লোক এদিকে ছুটে আসছে। রাণা একজন লোককে ডেকে জিগ্যেস করলে, কেয়া হুয়া?

লোকটি বলল, একঠো জেনানা গির গিয়া!

লোকটি আবার বলল, একজন মেয়ে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকেছিল, হঠাৎ সে নিচে পড়ে গেছে।

কী সাংঘাতিক কথা! কোনও বিপদের কথা শুনলে সবাই প্রথমে নিজের লোকের কথা ভাবে। মা ভাবলেন, ঝর্ণা পড়ে যায়নি তো? ওর যা সাহস দেখাবার ঝোঁক! মা চোখ বড়-বড় করে বললেন, কি হবে?

মা এতক্ষণ হাঁটতে পারছিলেন না। দুর্ঘটনার কথা শুনে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, প্রায় ছুটতে শুরু করলেন। সুজয়ের হাত ধরে কান্না-কান্না মুখে বললেন, শিগগির চল—কি সর্বনাশের কথা, কে পড়ে গেল!

মা প্রায় ধরেই নিয়েছেন যে, ঝর্ণাই পড়ে গেছে।

খোকন সবচেয়ে আগে বাঁই করে ছুটে বেরিয়ে গেছে। রাণাও অনেকটা এগিয়ে

গেছে। সুজয় মাকে নিয়ে বেশি জোরে ছুটতে সাহস পাচ্ছে না। গত বছর মা খুব অসুখে ভুগেছিলেন, তারপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে একটুতেই হাঁপিয়ে যান। সেই অসুখের পর থেকেই মা সব ব্যাপারে বেশি-বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বেশ দূর থেকেই সুজয় ঝর্ণাকে দেখতে পেয়ে বলল, ওই তো ছোড়দি! ওই তো বাবা!

মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, আছে? ঠিক দেখেছিস তো? তাহলে আমি আর দৌড়োতে পারছি না।

মা সেখানেই বসে পড়লেন।

এখান থেকে মায়ের হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই বুঝেই সুজয় একা দৌড়ে গেল এবার।

সবাই পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে দেখছে। জায়গাটায় অসম্ভব ভিড় আর চেঁচামেচি। কিছু-কিছু লোক এদিক-সেদিক দৌড়োদৌড়ি করছে। সুজয় ঝর্ণার কাছে কোনওক্রমে ঠেলেঠুলে উপস্থিত হয়ে বলল, কি হয়েছে ছোড়দি?

ছোড়দি বলল, একটা পাঞ্জাবি মেয়ে পাঁচিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে কায়দা করে ব্যালান্স দেখাচ্ছিল, হঠাৎ নিচে পড়ে গেছে!

—কোথায়, কোথায়?

—দেখা যাচ্ছে না। এই, বেশি ঝুঁকিস না!

বাবা সুজয়কে দেখে বললেন, জয়, তোর মা কোথায়?

সুজয় আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, মা ওইখানে বসে আছে।

বাবা বললেন, আমি তোদের মায়ের কাছে যাচ্ছি। তোরা চলে আয়। খোকন, রাণা, জয়—তোরা সব হাত ধরাধরি করে থাক—

কিন্তু এত ভিড়ের মধ্যে হাত ধরাধরি করে থাকা সহজ নয়। তাছাড়া জয় হাত ধরবে কি, সে আবার এখন একটা জিনিস দেখল, যাতে তার প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম।

জয় দেখল, খানিকটা দূরে ফাঁকা জায়গায় সেই লম্বা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তার আড়ালে বোধহয় সেই বেঁটে লোকটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, এক-মুহূর্ত পরে তাকে দেখা গেল। বেঁটে লোকটা লাফিয়ে উঠল পাঁচিলের ওপর। লম্বা লোকটা তাকে আঙুল তুলে কি ইশারা করল, অমনি বেঁটে লোকটা লাফ দিলো নিচের দিকে। বড় বড় সাঁতারুরা যে রকম উঁচু থেকে ডাইভ দেয়, সেইরকম ভাবে মাথার দুপাশে দুটো হাত তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা। সঙ্গে-সঙ্গে কিন্তু নিচে পড়ে গেল না। পাখির মতন একটু ভেসে রইল হাওয়ায়, আর তার গা থেকে নীল রঙের জ্বলজ্বলে আলো বেরুতে লাগল। তারপর লোকটা শোঁ-শোঁ করে নামতে লাগল নিচের দিকে, 'চিলের মতন ঘুরে-ঘুরে'।

কিন্তু এই রকম একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল, অথচ আর কেউ দেখল না? একটা লোককে ইচ্ছে করে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখলে অনেকেরই তো ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠবার কথা! কেউ এ বিষয়ে কোনও সাড়া শব্দ করল না। সবাই এখনও নিচের দিকে তাকিয়ে আছে আর পাঞ্জাবি মেয়েটির কথাই বলছে।

সুজয় আর থাকতে পারল না। সে এক দৌড়ে চলে গেল লম্বা লোকটির কাছে। দারুণ উত্তেজিতভাবে বলল, এই যে শুনুন, আপনার বন্ধু...আপনার বন্ধু—

লোকটি সুজয়কে দেখে মিষ্টি হেসে বলল, এই যে জয়বাবু, কি খবর?

সুজয় আবার বলল, আপনার বন্ধু লাফিয়ে পড়লেন? এত উঁচু থেকে?

—তাই নাকি? আপনি দেখেছেন?

—হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে দেখেছি। আপনি দেখেননি?

—আপনি তো অনেক কিছু দেখতে পান!

—বাঃ, আপনার পাশেই তো দাঁড়িয়েছিলেন—আপনি হাত নেড়ে নেড়ে কি সব যেন বললেন। এত উঁচু থেকে লাফালে কি কেউ বাঁচে?

লোকটি সে কথার উত্তর দিল না। সুজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে বলল, আপনি তো অনেক কিছু দেখতে পান দেখছি। আমাব চোখের দিকে তাকান তো—

লোকটি এত লম্বা যে, সুজয়ের মাথা ওর কোমরের কাছে মোটে পৌঁছোয়। সুজয়কে তাকাতে হয় চোখ উঁচুর দিকে তুলে।

লোকটি নিচু হয়ে সুজয়ের মুখের কাছে মুখ এনে বলল, এবার ভালো করে তাকান আমার চোখের দিকে।

সুজয় তাকাতেই তার চোখ ঝলসে গেল। যেন দুটো বড় টর্চ লাইটের আলো কেউ তার চোখের ওপর ফেলেছে।

সুজয় চোখ বুজে ফেলতেই লোকটি বলল, কি হল! তাকান আবার! আর একটু দেখি—

সুজয় চোখ পিটপিট করছে, আর কিছুতেই ভালো করে তাকাতে পারছে না। তখন লোকটি খুব জোরে একবার ফুঁ দিতেই সুজয়ের চোখ খুলে গেল।

লোকটির ফুঁ লাগতেই সুজয়ের গা-টা ছ্যাঁক করে উঠল। লোকটার নিঃশ্বাস কি গরম! ঠিক যেন একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর। ওর চোখ দুটো যেন দুটে পাঁচশো পাওয়ারের বাল্‌ব—সুজয় কিছুতেই সেদিকে চোখ রাখতে পারছে না।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে সুজয় বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আর পারছি না।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সুজয়ের কাছ থেকে সরে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

সুজয়ের সারা শরীরটা কাঁপছে। ঠিক ভয়ে নয়। যদিও লোক দুটির ধরনধারণ এতই অদ্ভুত যে, এখন সে ভয় পেলে কেউ তাকে দোষ দেবে না। কিন্তু ওদের গলার আওয়াজ এত মিষ্টি আর বয়েসে এত বড় হয়েও সুজয়কে আপনি করে কথা বলে—সেইজন্য সুজয় ঠিক ভয় পেতেও পারছে না। এখন যে তার শরীর কাঁপছে, তার কারণ হঠাৎ যেন তার খুব জ্বর হয়ে গেছে—তার কান, চোখ, নাক জ্বালা করছে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, এক্ষুনি মাটিতে শুয়ে পড়বে।

সুজয় বলল, আমার কি হল? আমার জ্বর হয়েছে, আমার ভীষণ জ্বর হয়েছে।

লোকটি বলল, ও কিছু নয়। একটু বাদেই ঠিক হয়ে যাবে।

সুজয় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, পাঁচিলটাতে হেলান দিল। মাথা ঝিমঝিম

করছে তার। চোখ দুটোতে ঝাপসা দেখছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, ছোড়দি এখনও সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—রাণা আর খোকন চলে গেছে তার বাবা-মায়ের. কাছে।

যদিও এখানটায় একটু শীত-শীত ভাব—তবু কুলকুল করে ঘাম বইতে লাগল সুজয়ের গা দিয়ে। আস্তে-আস্তে তার জ্বরের ভাবটা কমে গেল।

লোকটি জিগ্যেস করল, জয়বাবু, এখন ভালো লাগছে তো?

সুজয় ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

লোকটি বলল, আপনার চোখ দুটো একটু পরীক্ষা করে দেখলাম।—ইল ইম্ব টেলাস অকষি টুমপে সিনা সিনা যোজং মরডি ঘ্রা মরডি ঘ্রা।

সুজয় ঘাবড়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, কি বললেন? এর মানে কি?

লোকটি যেন একটু লজ্জা পেয়েই বলল, না, না, ওটা কিছু নয়। আমি বলছিলাম কি, আপনার চোখে একটা শিরা বেশি আছে। কোটি কোটি লোকের মধ্যে একজন দু -জনের এরকম থাকে। এরকম থাকলে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি দেখা যায়। আপনার শিরাটায় একটা পর্দা পড়েছিল, এবার থেকে আরও বেশি দেখতে পাবেন।

—আপনার চোখ দিয়ে অত জোর আলো বেরুচ্ছিল কেন?

—আমার চোখ থেকে তো আলো বেরোয়নি।

—আমি যে দেখলাম?

—ওটা অন্য জিনিস। পৃথিবীতে তো এত আলো আছে—খানিকটা আলো যদি এক জায়গায় এনে খুব ঘন করে ধরা যায়—

সুজয় ওই কথাটার ঠিক মানে বুঝতে পারল না। বুঝবার সময়ও পেল না। কারণ, সে দেখল, পাঁচিলের ওপাশ থেকে বেঁটে লোকটা মুখ বাড়িয়েছে। এক লাফে সে এদিকে চলে এল। তার হাতে একটা ছোট ফুলগাছ— একটা মাত্র সাদা ফুল ফুটে আছে। গাছটার তলায় শেকড়ের কাছে ভিজে মাটি দিয়ে গোল করা।

বেঁটে লোকটা লম্বা লোকটার চেয়েও বেশি হাসিখুশি। সে সুজয়কে দেখে একগাল হেসে বলল, আরে, জয়বাবু যে! আবার দেখা হয়ে গেল!

এসব আলাপ করার সময় নেই সুজয়ের। সে উৎকণ্ঠিত ভাবে বলল, আপনি এখান থেকে লাফ দিয়েছিলেন? আবার পাহাড় বেয়ে উঠলেন?

বেঁটে লোকটি বলল, হ্যাঁ। এই গাছটা আনতে গিয়েছিলাম। কি সুন্দর ফুল।

—আপনি এত উঁচু থেকে লাফাতে পারেন? আপনি কি পাখির মতন উড়তে পারেন?

—এটা খুব শক্ত বুঝি?

—শক্ত নয়? আর কেউ পারে কি! আচ্ছা, নিচে যে একটা মেয়ে পড়ে গেছে, আপনি তাকে দেখতে পেলেন না?

বেঁটে লোকটি সুজয়কে এ কথার উত্তর না দিয়ে লম্বা লোকটির দিকে তাকাল। তারপর হাত তুলে আঙুলে-আঙুলে ছুঁইয়ে নানারকম ভঙ্গি করতে লাগল।

সুজয় বুঝতে পারল, ওরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে চায়, তখন মুখে কিছু বলে না, শুধু আঙুল দিয়ে ইশারা করে।

এই সময় মাইকে একটা ঘোষণা শোনা গেল। প্রথমে কিছু বোঝা যায়নি, কারণ সবাই খুব গোলমাল করছিল। তারপর একটু শান্ত হতেই সুজয় মন দিয়ে শুনল যে মাইকে বলছে, এক্ষুনি সবাইকে নিচে নেমে যেতে হবে। আজ অজন্তার গুহায় কোনও লোককে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না। সবাইকে নিচে নেমে আসতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রীতমকুমারী নামে একটি পাঞ্জাবি মেয়ে ওপর থেকে পড়ে গেছে—তার মৃতদেহ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সুজয় বেঁটে লোকটিকে আবার জিগ্যেস করল, আপনি তো নিচে গিয়েছিলেন, আপনি মেয়েটিকে দেখেননি?

এবারও লোকটি এই কথার উত্তর দিতে চাইল না। হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল, আমাদের এক্ষুনি যেতে হবে। আচ্ছা চলি জয়বাবু!

তখন ঝর্ণা এসে সুজয়ের পিঠে হাত দিয়ে বলল, এই জয়, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস? বাবা তখন থেকে ডাকছেন তোকে—শুনতে পাচ্ছিস না?

জয় খুব উৎসাহের সঙ্গে লোক দুটির দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে, এই আমার ছোড়দি।

লোক দুটি দু-পায়ের গোড়ালি ঠুকে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে অদ্ভুতভাবে নমস্কার করল ঝর্ণাকে। তারপর খুব বিনীত ভাবে বলল, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব প্রীত হলাম।

অচেনা লোকদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে ঝর্ণার কোনও লজ্জা-টজ্জা নেই। সে বেঁটে লোকটির হাতের ফুলগাছটা দেখে বলল, বাঃ, ভারি সুন্দর ফুলটা তো। কী ফুল এটা?

সাধারণত এই ভাবে কেউ বললে সবাই ফুলটা ভালো করে দেখবার জন্য এগিয়ে দেয়। লোকটি কিন্তু একটু পিছিয়ে গেল। ফুলগাছটা খুব সাবধানে ধরে বলল, দেখুন না!

ঝর্ণা একটু অবাক হলেও আবার বলল, কি ফুল এটা, এতগুলো পাপড়িওয়ালা সাদা ফুল তো দেখিনি। ফুলটার গন্ধ আছে? নিশ্চয়ই আছে। সব সাদা ফুলেরই গন্ধ থাকে। একটু দিন তো দেখি।

লোকটি তবু দিল না। বলল, হ্যাঁ, গন্ধ আছে। কিন্তু এ ফুলের গন্ধ শুঁকতে নেই।

—কেন, শুঁকলে কি হয়?

—গন্ধ শুঁকলেই ফুলটা মরে যায়।

—তা আবার হয় নাকি?

মাইকে তখনও ঘোষণা চলছে। সুজয়ের বাবা জোরে জোরে ওদের ডাকছেন। ঝর্ণা আর দেরি করল না, সুজয়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। লোক দুটি দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই।

ভিড়ের মধ্যে যাতে কেউ হারিয়ে না যায়, এইজন্য সবাই মিলে হাত ধরাধরি করে নামতে লাগল নিচে। নিচেও দারুণ ভিড়। অনেকে মিলে এক জায়গায় ঠেলাঠেলি করছে। একগাড়ি পুলিশ এসেছে। ভ্রমণ-বিভাগের কর্মীরাও খুব ব্যস্ত।

নিচে এসে নানারকম গল্প শোনা যেতে লাগল। অনেকেই বলছে যে, তারা দেখেছে একটা লোক মেয়েটিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেছে। সেই লোকটাও পাঞ্জাবি।

কিন্তু তা হলে প্রীতমকুমারীর দেহটা গেল কোথায়? দেহটা তো অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না?

বাবা বললেন, ওসব কিছুই হয়নি। সব গুজব। এক একটা লোকের গুজব রটানোর অভ্যাস থাকে। একজন কেউ রটিয়ে দিলেই অন্যরা তা বিশ্বাস করে।

রাণা অনেক ডিটেকটিভ বই পড়ে। সে বলল, আমি বলতে পারি মেয়েটার কি হয়েছে। ওর দেহটা ওপর থেকে পড়েছে নদীর জলে—তারপর ভাসতে-ভাসতে চলে গেছে।

ছোড়দি বলল, নদীটা তো একটু দূরে। মেয়েটা কি উড়তে-উড়তে গিয়ে নদীতে পড়বে?

রাণা বলল, না, আগে নিচে পড়ে তারপর গড়াতে-গড়াতে—

—মানুষ কি পাথর যে অতখানি গড়াবে?

—তাহলে কি হয়েছে জানো, অত উঁচু থেকে পড়েছে তো। একেবারে ছাতু হয়ে গেছে। তারপর টুকরোগুলো সাঁই-সাঁই করে ছিটকে—

—ধ্যাৎ! চুপ কর তো!

বাবা বললেন, চলো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ কি? ঔরঙ্গাবাদের দিকেই চলে যাওয়া যাক।

মা বললেন, যা করবার বাপু তাড়াতাড়ি করো। আমি আর এই রোদ্দুরের মধ্যেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

খোকন বলল, আমি কোল্ড ড্রিংকস্ খাব!

ঝর্ণা কিন্তু এক্ষুনি এখান থেকে যেতে চায় না! অজন্তার সব ক'টা গুহা না দেখে সে যাবে না। তাছাড়া বুদ্ধদেবের সেই বিখ্যাত শুয়ে-থাকা মূর্তিই দেখা হল না।

ঝর্ণা বাবাকে বলল, আজ রাত্রে আমরা এখানকার ট্যুরিস্ট লজে থাকব!

রাণা আর সুজয় বলল, হ্যাঁ, আমরা আজ এখানেই থাকব।

খোকন বলল, গ্র্যান্ড হবে।

বাবা ওদের আবদার ফেলতে পারলেন না। গেলেন ট্যুরিস্ট লজে খোঁজ নিতে। ফিরে এলেন কিন্তু নিরাশ হয়ে। একটাও ঘর খালি নেই। আগে থেকে খবর না দিয়ে এলে এখানে জায়গাই পাওয়া যায় না!

এই সময় আবার একটা গোলমাল শোনা গেল। পাহাড়ের ওপর থেকে পুলিশ একটা লোককে ধরে আনছে। আর লোকটা হাউ-হাউ করে কাঁদছে। লোকটার বিরাট চেহারা, একমুখ দাড়ি, কিন্তু কাঁদছে একেবারে ছোট ছেলেদের মতন।

কি ব্যাপার হয়েছে জানার জন্য সুজয়দের দারুণ কৌতূহল। কিন্তু বাবা আর ওদের যেতে দেবেন না ওদিকে। ওদিকে যা ভিড়! শেষ পর্যন্ত বাবা নিজেই গেলেন খোঁজ আনতে।

বাবা ফিরে আসার আগেই ওরা অন্য লোকের মুখে সব কিছু শুনে ফেলল। সবাই তো এই কথাই বলাবলি করছে।

ওই শিখ ছেলেটি অজন্তার একটা গুহার মধ্যে লুকিয়ে ছিল। পুলিশ ওকে খুঁজে বার করেছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর ও স্বীকার করেছে যে,সত্যিই ও প্রীতমকুমারীকে ঠেলে ফেলেছে।

কেন ঠেলে ফেলে দিয়েছে?

তার কারণ, প্রীতমকুমারী ওকে বিয়ে করতে চায়নি। সেইজন্য খুব রাগ হয়েছিল। কিন্তু এখন খুব অনুতাপ হচ্ছে। হায়, হায় কেন ও প্রীতমকুমারীকে মেরে ফেলল!

তাহলে প্রীতমকুমারী নামের একটি মেয়ের সত্যিই দুর্ঘটনা হয়েছে। তবে তার মৃতদেহটা গেল কোথায়?

বাবা ফিরে এসে বললেন, আর দেরি করে লাভ নেই। এখানে তো থাকার জায়গা পাওয়া যাবে না।

ঝর্ণা অভিমান করে বলল, তাহলে আমাদের আর অজন্তা দেখা হবে না।

বাবা বললেন, আমরা ইলোরা-টিলোরা দেখে আবার তো এই পথেই ফিরব— তখন আবার দেখে যাবো!

ঝর্ণা বলল, ঠিক তো?

বাবার কাছ থেকে একেবারে কথা আদায় করে তারপর ঝর্ণা বাসে উঠল।

ঔরঙ্গাবাদে পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। ঔরঙ্গাবাদে অনেক হোটেল, অনেক থাকার জায়গা আছে। শহরটাও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওরা কয়েকটা হোটেল ঘুরে ঘুরে গ্রিন পার্ক নামে একটা হোটেল পছন্দ করল। দোতলায় পাশাপাশি দু-খানা ঘর ওদের জন্য। বিরাট লম্বা বারান্দা। ওদের ছুটোছুটি করার পক্ষে ভারি সুবিধে। আর হু-হু করে হাওয়া বইছে।

ঝর্ণা স্নান-টান সেরে বারান্দায় এসে ছোটদের সঙ্গে দাঁড়াল। তারপর সুজয়কে বলল, তোর ওই বন্ধু দুজন ভারি অসভ্য। ফুলগাছটা দেখতে চাইলুম, কিছুতেই দেখতে দিল না। আমি কি ছিঁড়ে ফেলতুম?

সুজয় কোনও উত্তর দিতে পারল না।

ঝর্ণা সুজয়কে আবার জিগ্যেস করল, হ্যাঁ রে, লোক দুটোর নাম কি রে?

সুজয় ভাবল, তাই তো, ওদের নাম তো কখনও জিগ্যেস করা হয়নি। ওরাও কখনও বলেনি। আবার দেখা হলে জেনে নিতে হবে।

সুজয় বলল, জানি না।

ঝর্ণা বলল, বলল, নামও জানিস না! তাহলে ওরা তোর বন্ধু হল কি করে?

রাণা এসে বলল, সুজয়ের বন্ধু? কে সুজয়ের বন্ধু?

—ওই যে একটা লম্বা লোক আর বেঁটে লোক একটা!

রাণা বলল, আমি তো তাদের দেখিনি!

খোকন বলল, হ্যাঁ, আমি দেখেছি। ফিল্মে। লরেল আর হার্ডি তো?

ঝর্ণা বলল, না, না, আজকেই যে অজন্তা পাহাড়ে দেখলাম!

রাণা আর খোকন একসঙ্গে বলল, তারা এরকম কোনও লোক দেখেনি।

সুজয় বেশ বিরক্ত হল ওদের ওপরে। ওরা নিশ্চয়ই দেখেছে সেই প্রথম দিন। ওদের যদি মনে না থাকে তো সুজয় কি করতে পারে!

সুজয়ের একবার ইচ্ছে হল, সে ছোড়দিকে সব কথা খুলে বলে। ক'দিন ধরে সে এমন সব অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য জিনিস দেখছে যে, নিজের মনের মধ্যে আর চেপে রাখতে পারছে না। যা সে দেখছে, তা সব সত্যিই কিনা তাই-ই বা কে জানে।

কিন্তু ছোড়দির সঙ্গে তো তার আগেকার মতন ভাব নেই। ছোড়দি আর তার সঙ্গে আগের মতন গল্পও করে না, ক্যারামও খেলে না। ছোড়দির এখন যত ভাব শুধু কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে। ছোড়দি তার কথা শুনে যদি হাসে?

খোকন আর রাণাকে তো বলাই যাবে না। সুজয়ের সব কথাই অবিশ্বাস করতে চায়। সুজয় কলকাতায় থাকে বলে মনে-মনে ওদের হিংসে আসে কিনা।

একজন কাউকে না বললে সুজয়ের মন কিছুতেই হালকা হবে না। ঠিক আছে, সুজয় আজ থেকে ডাইরি লিখবে। ডাইরির কাছে সবরকম গোপন কথা বলা যায়।

এরপর ওই লোক দু-জনের সঙ্গে দেখা হলে ওদের নাম জিগ্যেস করবে, আর ওদের সব অদ্ভুত ব্যবহারেরও কারণ জানতে চাইবে।

তবে ওদের সঙ্গে আর তার দেখা হবে কি? এই ক'বার তো হঠাৎ হঠাৎই দেখা হয়েছে।

এর পরের তিনদিন সুজয়রা খুব ঘুরে বেড়াল। ওই লোক দুটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

এর মধ্যে কিন্তু খবরের কাগজে দুটো খুব রহস্যময় খবর বেরিয়েছিল। যাদের খবরের কাগজ নিয়মিত পড়ার অভ্যেস আছে, তাদের হয়তো মনে থাকতে পারে।

একটা খবর হল, চম্বল উপত্যকার এগারোজন ডাকাত হঠাৎ পাগল হয়ে যায়। তারা যেরকম নিষ্ঠুর আর দুর্দান্ত স্বভাবের ডাকাত—তাদের পাগল হবার কোনও কারণই নেই। আর এগারোজন ডাকাত একসঙ্গেই বা পাগল হবে কেন, তা কেউ জানে না।

চম্বল উপত্যকায় অনেক ঝোপজঙ্গল আর টিলার মধ্যে ডাকাতরা লুকিয়ে থাকে। পুলিশ বহু বছর চেষ্টা করেও সব ডাকাতকে ধরতে পারেনি। একদিন এই এগারোজন ডাকাত একসঙ্গে ছুটতে-ছুটতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে, দিনের বেলা। তাদের দেখে গ্রামের লোক ভয় পেয়ে গিয়েছিল —সকলেরই হাতে বন্দুক। কিন্তু ডাকাতগুলো মাটিতে আছড়ে পড়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগল।

গ্রামের লোক ভয় পেয়ে পুলিশকে খবর পাঠাল। তখন অনেক পুলিশ এসে ডাকাতদের ঘিরে ফেলে উঠে দাঁড়াতে হুকুম করে। ডাকাতগুলো তখনও গোঁ-গোঁ শব্দ করছে—আর তাদের চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ছে।

পুলিশ তখন সবার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। ডাকাতগুলো তাও কোনও কথা বলে না। পরীক্ষা করে দেখা গেল, সবাই পাগল হয়ে গেছে। ওদের গায়ে এখানে সেখানে

কিছু পোড়া পোড়া দাগ। যেন হঠাৎ কোনও আগুনের ঝলকানিতে শরীর ঝলসে গেছে। কি করে ওরকম হল—তাও ওরা বলতে পারে না।

ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলেছেন যে, হঠাৎ কোনও কারণে ভয় পেয়ে ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু এ কথাও শুনে ঠিক বিশ্বাস হয় না। ওইরকম দুর্ধর্ষ ডাকাত কী দেখে ভয় পাবে? বাঘ-ভাল্লুক-পুলিশ—কোনও কিছুতেই ওরা ভয় পায় না। ওদের চোখের দৃষ্টিও খারাপ হয়ে গেছে—তাও বোধহয় ওই আগুনের ঝলকের মতন কোনও কিছুর খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকার জন্য।

পুলিশ জঙ্গলের মধ্যে খোঁজ করে দেখতে পেয়েছে, একটা জায়গায় একটা বিরাট গর্ত। তার পাশেই যে ওই ডাকাতগুলো বসে বসে খাবার খাচ্ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু কি ভাবে অত বড় গর্ত হল, সেখানে কি ছিল—তা কিছুই জানা যায়নি।

আর একটা খবর খুব ছোট। সেটার সঙ্গেই সুজয়রা জড়িত। খবরটা বেরিয়েছিল এইরকম ভাবে ঃ অজন্তা গুহার পাহাড় থেকে একটি মেয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিল। সবাই ভেবেছিল মেয়েটি মরেই যাবে। কিন্তু পাহাড়ের গায়ে একটা গাছের ডালে তার সালোয়ার কামিজ আটকে যায়—সেই অবস্থায় সে পুরো একদিন ঝুলে থেকেও বেঁচে যায়। খবরটার শিরোনাম ছিল—রাখে হরি মারে কে?

আসল ব্যাপারটা কিন্তু একবারে অন্যরকম। ঔরঙ্গাবাদ শহরে সেই ব্যাপার নিয়ে হইহই পড়ে গিয়েছিল।

সেই যে প্রীতমকুমারী নামের মেয়েটি ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিল—তিনদিনের মধ্যে তার দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। গাছের ডালে আটকে থাকা একেবারে অসম্ভব—পাহাড়ের নিচে দাঁড়ালে ওপর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়—আর পাহাড়ের গায়ে সেরকম কোনও বড় গাছও নেই।

তখন পুলিশ ভেবেছিল, মেয়েটির পড়ে যাওয়ার খবরটাই গুজব। একটা জলজ্যান্ত মেয়ে তো আর অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু মুশকিল এই যে, আর একজন শিখ যুবক, যে ধরা পড়ে স্বীকার করেছে, সে ইচ্ছে করে প্রীতমকুমারীকে নিজের হাতে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। কয়েকজন লোক সেই দৃশ্য দেখেছে বলেও সাক্ষী দিয়েছে। তাহলে প্রীতমকুমারী কোথায় গেল?

তিনদিন বাদে প্রীতমকুমারীকে পাওয়া গেল সেই অজন্তা পাহাড়ের নিচে, নদীটার থেকে একটুখানি দূরে। সে অজ্ঞান হয়ে ছিল। প্রথমে ভ্রমণ-বিভাগের একজন লোক তাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠতেই প্রীতমকুমারী চোখ মেলে তাকায়। ঠিক যেন ঘুম ভেঙে উঠল।

প্রীতমকুমারীকে নিয়ে আসা হয়েছে ঔরঙ্গাবাদে, রাখা হয়েছে হাসপাতালে। কিন্তু তার চিকিৎসা করার কিছুই নেই, সে সম্পূর্ণ সুস্থ। সে বিশেষ কিছুই বলতে পারছে না। তার শুধু এইটুকু মনে আছে যে, অজন্তা পাহাড়ের ওপরের পাঁচিল থেকে কে যেন তাকে ঠেলে ফেলে দেয়। তখন প্রীতমকুমারী ভয় পেযে ভেবেছিল এক্ষুনি মরে যাবে। ভয়ের চোটে সে পড়তে-পড়তেই অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর আর তার কিছুই মনে নেই।

এমন হতে পারে, নেহাত সৌভাগ্যের জোরে পাহাড়ের অত উঁচু থেকে পড়েও

প্রীতমকুমারীর হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যায়নি। সেটা যদিও বিশ্বাস করা যায় না, তবু ধরে নেওয়া হল। কিন্তু এই তিনদিন সে কোথায় ছিল? এই তিনদিন তো তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি?

সমস্ত ঔরঙ্গাবাদ এই আলোচনায় মত্ত। সুজয়রা সবাই এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল বলে তারাও দল বেঁধে হাসপাতালে গেল প্রীতমকুমারীকে দেখতে। সে দিব্যি হাসিখুশি রয়েছে।

বাবা, মা, ছোড়দি সবাই বলাবলি করতে লাগল, এ কি করে সম্ভব? এ কি করে সম্ভব?

সুজয়ের শুধু মনে হতে লাগল, সেই লম্বা আর বেঁটে লোক দুটো নিশ্চয়ই এর কারণ জানে। ওরা নিজেদের মধ্যে আঙুল নেড়ে-নেড়ে এ বিষয়েই কথা বলছিল। সুজয়কে কিছু বলতে চায়নি। কিন্তু কোথায় সুজয় তাদের খুঁজে পাবে?

অজন্তার মতনই ঔরঙ্গাবাদ শহরের খুব কাছেই একটা পাহাড়ে কয়েকটা গুহাতেও অনেক মূর্তি ও ছবি আছে। অজন্তার তুলনায় অনেক কম হলে ও এখানকার শিল্পকলা ভারি চমৎকার। পাহাড়ের অনেকখানি উঁচু পর্যন্ত গাড়ি উঠে যায়, তারপর সামান্য কিছু সিঁড়ি।

অনেকে এই গুহাগুলোর কথা জানে না, না দেখেই চলে যায়। তারা খুব ঠকে। এই গুহাগুলোও খুব অন্ধকার। কোনওদিন আলো ঢোকে না! এত অন্ধকার গুহায় এমন সুন্দর-সুন্দর মূর্তি বানিয়েছিল কেন, কে জানে! একটা গুহাতে আয়না দিয়ে দেখতে হয়। আয়নার আলো ফেলে দেখা যায়, নাচের ভঙ্গিমায় কয়েকটি মূর্তি, প্রত্যেকের মুখের ভাব আলাদা। কত যত্ন করে যে এইসব মূর্তি তৈরি করতে হয়েছে!

সেই ঔরঙ্গাবাদ গুহা দেখতে গিয়ে সুজয়ের বাবার সঙ্গে আলাপ হল একজন মিলিটারি কর্নেলের। ঔরঙ্গাবাদে মিলিটারি ক্যানটনমেন্ট আছে, তিনি সেখানেই থাকেন। কর্নেলের নাম চেতন সিং। জাতে রাজপুত। লম্বা চেহারা, টকটকে ফরসা গায়ের রং, চোখের পল্লবগুলো খুব ঘন আর বড়-বড় এবং মস্ত বড় গোঁফ আছে। ছবিতে রাণা প্রতাপের যে-রকম ছবি দেখা যায়, এর সঙ্গে সেই ছবির খুব মিল আছে।

সুজয়ের বাবা কর্নেল চেতন সিং-এর সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলছিলেন, কিন্তু কর্নেল হেসে বললেন, হামি বাংলা ভালো জানে। হামি কলকাত্তার নজিগে ব্যারাকপুর যো আছে না, সেখানে সাড়ে চার বছর থাকছিলাম তো। ফলওয়ালা দুধওয়ালা ভি হামার বাংলা বাত বোঝে!

কর্নেলের এত ভালো বাংলা শুনে রাণা, খোকন আর সুজয় মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল। ঝর্ণা তাদের ধমক দিয়ে বলল, এই, লোকের কথা শুনে অসভ্যের মতন হাসতে নেই।

কর্নেল চেতন সিং বললেন, আপলোগকে পেয়ে ভালোই হল, হামার বাংলা প্র্যাক্‌টিস করে নেব।

কথায় কথায় বাবা বললেন, আপনি সেই পাঞ্জাবি মেয়েটির কথা শুনেছেন?

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ শুনেছি। ভেরি স্ট্রেঞ্জ। কী করে যে সম্ভব! একে মিরাকল্ ছাড়া কি বলা যায়!

বাবা বললেন, জানেন তো, সেই ঘটনার সময় আমরা অজন্তাতেই ছিলাম। বলতে গেলে আমাদের চোখের সামনে—

কর্নেল বললেন, তাই নাকি? ঠিক-ঠিক কি হয়েছিল শোনান তো!

বাবা উৎসাহ পেয়ে সব ঘটনাটা আবার বলে গেলেন। ছোড়দিও মাঝে-মাঝে দু-একটা কথা জুড়ে দিচ্ছে। সুজয় পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সে আরও অনেক কিছু জানে কিন্তু কিছুই বলল না। বলে কি হবে, এরা তো কেউ বিশ্বাস করে না তার কথায়।

সব শুনে কর্নেল বললেন, আউর একঠো খবর শুনেছেন তো! বোম্বাই থেকে দুইজন ডাক্তার আসছেন প্রীতমকুমারীর জন্য। আর্মির ডাক্তারও পরীক্ষা করছেন।

ওরা একথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বলল, কিন্তু প্রীতমকুমারীর তো কোনও জায়গায় কেটে-টেটে যায়নি, হাড়ও ভাঙেনি। তার তো কোনও অসুখ নেই।

কর্নেল বললেন, বেমারি তো কিছু নেই। লেকিন সে মাঝে-মাঝে বড় অদ্ভুত কথা বলে। সে তার ঘরে যেতে চায় না, পাঞ্জাবে ফিরে যেতে চায় না, সে বলে, ওই পাহাড়ের নীচে ঝর্ণার কাছে থাকবে।

বাবা বললেন, ওই জায়গাটা ওর খুব ভালো লেগে গেছে বুঝি?

ছোড়দি বলল, জায়গাটা খুব সুন্দর। সবারই থাকতে ইচ্ছে করে।

কর্নেল বললেন, এর থেকে আরও এক আশ্চর্যের কথা আছে। মাঝে-মাঝেই সে চোখে কিছু দেখতে পায় না। চোখ চেয়ে আছে, হাসপাতালের ঘর—লেকিন ও কি বলে জানেন? ও বলে, শুধু আঁখে দেখছে পাহাড় আর সেই ঝর্ণা। আর বলে, আমি পেড়, আমি পেড়—পেড়কে কি বলে বাংলাতে?

রাণা বলল, গাছ। পেড় মানে গাছ।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই লেড়কি বলে, ও যখন-তখন গাছ হয়ে যায়। তখন ওর দুই পায়ের নিচে খুব ফাইন সুতাকা মাফিক...

বাবা বললেন, মেয়েটি তাহলে পাগল হয়ে গেছে?

কর্নেল বললেন, পাগলের থেকে আরও অনেক বেশি।

স্ট্রেঞ্জ ফেনোমেনান্—

ছোড়দি বলল, বাবা, চলো না আমরা প্রীতমকুমারীকে দেখে আসি।

কর্নেল বললেন, তাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। আপলোগ তো যেতে পারবেন না।

ছোড়দি জিগ্যেস করল, আপনি ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন না?

কর্নেল একটু চিন্তা করে বললেন, আচ্ছা, হামি খোঁজখবর নিয়ে দেখবে। জরুর খবর পাঠাব আপনার হোটেল মে!

কর্নেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা উঠল নিজেদের গাড়িতে। গাড়ি ছাড়ার

পর বাবা বললেন, লোকটা বেশ ভালো। ছোড়দি বলল, কি হ্যান্ডসাম দেখতে। সুজয়, রাণা, খোকন বলল, দারুণ, দারুণ!

সেদিন বিকেলবেলাই কর্নেল জিপগাড়ি নিয়ে এলেন হোটেলে। ওরা সবাই দুদ্দাড় করে গাড়িতে উঠতে গেল কিন্তু কর্নেল হেসে বললেন, সরি, ভেরি সরি, ছোটরা যাবে না, ডাক্তারসাহেব অ্যালাউ করবেন না।

ছোটরা নিরাশ হয়ে গেল। সুজয়ের বাবা আর ঝর্ণা চলে গেল কর্নেল সাহেবের সঙ্গে। সুজয়রা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

ওরা ফিরল সন্ধের অনেক পরে। বাবা বললেন, মেয়েটি বোধহয় আর বাঁচবে না।

মা বললেন, সে কি? কেন? বেশ তো ভালো দেখে এলাম সেদিন।

বাবা বললেন, হঠাৎ আবার কি রকম বদলে গেছে। চোখের দৃষ্টিটা একেবারে অন্যরকম। মানুষের চোখ ওরকম হয় না!

ঝর্ণা বলল, বাবা, ওর গায়ের রংটা দেখেছ?

সুজয়রা দেখেছিল প্রীতমকুমারীর গায়ের রং দুধে-আলতার মতন ফরসা, কিন্তু ঝর্ণা বলল, প্রীতমকুমারীর গায়ের রং কীরকম কালচে সবুজ হয়ে গেছে। সকালবেলাও সে কথা বলছিল মাঝে-মাঝে—কিন্তু এখন আর একটা কথাও বলতে পারছে না। চার-পাঁচজন ডাক্তার ওকে পরীক্ষা করছেন—কিন্তু কেউ কিছুই বুঝতে পারছেন না।

প্রীতমকুমারী ওদের কেউ হয় না। তবু প্রীতমকুমারীর জন্য ওদের সকলেরই খুব মন খারাপ হয়ে গেল। রাত্তিরে খেতে বসে ওরা শুধু ওই মেয়েটির কথাই আলোচনা করতে লাগল। এরকম রহস্যময় ব্যাপারের কথা ওরা আগে কখনও শোনেনি।

রাত্তিরে শুয়ে-শুয়েও সুজয় প্রীতমকুমারীর কথাই ভাবতে লাগল। কিছুতেই ঘুম আসছে না। তার ওপর আবার একটা মশা কানের কাছে পিন-পিন করছে। অন্ধকারে মশাটাকে দেখা যাচ্ছে না বলে মারাও যাচ্ছে না।

সুজয়ের বার-বার মনে হচ্ছে, প্রীতমকুমারীর এইরকম অবস্থার সঙ্গে সেই অদ্ভুত লোক দু-জনের কিছু একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু লোক দুটিকে তো তার খুব ভালোই মনে হয়েছিল---তারা কি প্রীতমকুমারীর কোনও ক্ষতি করবে? লোক দুটিকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে—তাও সুজয় জানে না।

মশাটাকে না মারলে আর সুজয়ের ঘুম আসবে না। সুজয় খাট থেকে নেমে আলো জ্বালল। তখন আর দেখা যায় না মশাটাকে। রাণা, খোকন খুব ঘুমুচ্ছে। হোটেলের সবাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়। বারান্দার দরজা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। সুজয় একটা শাল জড়িয়ে বারান্দার দিকে তাকাল।

বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাতেই সুজয়ের চোখ দুটো একবার যেন একটু জ্বালা করে উঠলো। তারপরই সে টের পেল—সে অন্ধকারের মধ্যেও সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। এমন কি অন্ধকারের মধ্যে যে রাস্তার ওপরের দোকানটার সাইনবোর্ডও পড়তে পারছে অনায়াসে।

সুজয় এখন অবাকও হল না, ভয়ও পেল না। সে বুঝে গেছে, অন্যদের চেয়ে

সে অনেক কিছু বেশি দেখতে পায়। লম্বা লোকটিও তাকে বলেছে, কয়েক কোটি লোকের মধ্যে এক-একজনের এরকম হয়ে থাকে। তার চোখ খারাপ নয়, বেশি ভালো।

সুজয় আরও একমনে দূরের জিনিস দেখার চেষ্টা করল। দূরের ল্যাম্প পোস্টটার নিচে একটা ভাঙা পাথর সুজয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আরও দূরে, এমন কি হাসপাতাল এবং ঔরঙ্গাবাদ গুহাও তার চোখে ভেসে উঠছে। মনে-মনে দেখা নয়, চোখে দেখা।

তারপর সুজয় দেখল যে, অনেক দূরে, পাহাড়ের নিচে নিরালা জায়গায় দুটো নীল আলো ঘুরছে। একদৃষ্টে তাকাতে বোঝা গেল, ওখানে সেই দুটো লোক, তাদের গা থেকে সেই ঠান্ডা মতন নীল আলো বেরুচ্ছে। তারা এক জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসল। সেখানে একটি ছোট্ট ফুলগাছ। বেঁটে লোকটি গাছটার সামনে হাত রাখতেই গাছটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুজয় এত উত্তেজিত বোধ করল যে, সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেই পারছে না। ওই লোক দুটোর কাছে তাকে যেতেই হবে। সুজয় কারুকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে। ছুটতে লাগল অন্ধকার রাস্তা ধরে।

সমস্ত ঔরঙ্গাবাদ শহর ঘুমিয়ে আছে, আর অন্ধকাব রাস্তা দিয়ে ছুটছে সুজয়। সুজয়ের কিন্তু একটুও ভয় করছে না। রাস্তা চিনতেও তার অসুবিধে নেই, সে দেখতে পাচ্ছে সব কিছুই। তবে সেই লোক দুটোকে এখন আর দেখা যায় না। হোটেলের দোতলার বারান্দা থেকে দেখা যায় অনেক দূর পর্যন্ত, কিন্তু রাস্তায় নেমে অন্য বাড়ির আড়াল পড়ে গেছে। তবু কোন দিকে ওরা আছে, তা সুজয় জানে।

বেশ খানিকক্ষণ ছুটতে-ছুটতে সুজয় যখন একটু একটু হাঁপিয়ে গেছে, তখন সে হঠাৎ একবার হোঁচট খেয়ে পড়ল। বিশেষ কোথাও কাটেনি। দু-পায়ের হাঁটুর কাছে নুনছাল উঠে গিয়ে একটু জ্বালা-জ্বালা করছে। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার পরই সে দেখল চারিদিকে দারুণ ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। এতক্ষণ সে সবকিছুই দেখতে পাচ্ছিল, এখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

সুজয়ের হয় এরকম। এক-এক সময় সে অন্যদের থেকে অনেক বেশি কিছু দেখতে পায়, কিন্তু সব সময় পায় না। যেন তার একটা আলাদা চোখ আছে, যেটা শুধু মাঝে মাঝে খোলে।

সুজয় খুব করে চোখ আর কপাল রগড়াল, কিন্তু আর কিছুই হল না। অন্ধকারে এখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে তার একটু ভয়-ভয় করছে। এই অন্ধকারের মধ্যে সে কি আর রাস্তা চিনে হোটেলে ফিরে যেতে পারবে? সুজয় ঠিক করল, যা হয় হোক, সে ওই লোক দুটিকেই খুঁজতে যাবে।

এমন সময় ঠক-ঠক করে জুতোর আওয়াজ হল একটু দূরে। কারা যেন আসছে। যারাই আসুক, এত রাত্তিরে সুজয়ের মতন কম বয়েসি ছেলেকে একা-একা রাস্তায় দেখলে তারা নিশ্চয়ই অবাক হবে। আর যদি চোর-ডাকাত হয়? চোর-ডাকাতরাই তো এত রাত্রে বাইরে বেরোয়। কিন্তু তারা কি জুতোয় এত জোর শব্দ করে?

সুজয় একটা দোকানঘরের দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁষে লুকিয়ে দাঁড়াল। তারপর

দেখল, চোর-ডাকাত নয়, দুজন পুলিশ। হাতে দুটো লম্বা-লম্বা লাঠি নিয়ে তারা খুব আস্তে-আস্তে হাঁটছে। সুজয়ের খুব কাছাকাছি এসে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হয় যেন ওদের দু-জনেরই খুব ঘুম পেয়েছে, আর হাঁটতে পারছে না।

ওদের যে-কোনও একজন একটু ঘাড় ফেরালেই সুজয়কে দেখতে পাবে। সুজয়ের বুকের মধ্যে টিপ-টিপ করছে।

কিন্তু পুলিশ দু-জনের কোনোদিকে তাকাবার মতন মনই নেই। নিজেদের মধ্যে কি যেন গল্প করছে। তারপর একজন খৈনি বার করে সাজতে লাগল, আর একজন জুড়ে দিল গান। সেটা এমনই মজার গান যে, সুজয়ের আর একটু হলেই হাসি পেয়ে গিয়েছিল। মাঝরাত্তিরে এরকম গান কেউ গায় নাকি?

পুলিশটা গাইছিল ঃ

পাঁচ রুপাইয়া বারা আনা—
মারে গা ভাইয়া নারে নানা—

এই দুটো লাইনই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছে বরাবর। আর একজনও মাঝে-মাঝে গলা মেলাচ্ছে। তারপর খৈনি মুখে দিয়ে চুপ করল।

একটু পরেই দূরে একটা লরির আওয়াজ শোনা গেল। লরিটা কাছে আসতেই পুলিশ দুজন হাত দেখিয়ে সেটাকে সেটাকে থামাল, একজন টর্চ ফেলল সেটার ওপর। লরিটা একেবারে মালপত্তরে ঠাসা, অনেকখানি উঁচু হয়ে আছে।

পুলিশ দুজন লরির ড্রাইভারকে কি যেন বলতে লাগল। তখন ড্রাইভার কতগুলো খুচরো পয়সা ফেলে দিল। রাস্তার ওপর। তারপরে পুলিশ দুজন সরে দাঁড়াতেই লরিটা চলে গেল। পুলিশরা পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আবার সেই গানটা গাইতে-গাইতে হাঁটতে শুরু করল।

ওরা বেশ খানিকটা দূরে চলে গেলে সুজয় নেমে এল রাস্তায়। রাস্তাটা শহর ছাড়িয়ে যে-দিকে গেছে, সুজয় সেই দিকটা ধরল। একবার তার মনে হল, রাণা কিংবা খোকন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যদি তাকে না দেখতে পায়, তাহলে নিশ্চয়ই বাবা-মাকে ডাকবে। বাবা-মা ভীষণ চিন্তা করবেন তখন। ওঁরা কি সুজয়কে খুঁজতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বেন?

আবার সুজয় ভাবল, রাণা আর খোকনের এমন গাঢ় ঘুম যে, রাত্তিরে একবারও ওঠে না। তা হলে কেউ কিছুই জানতে পারবে না।

অন্ধকারে রাস্তা দেখতে না পেলেও সুজয় যেন চুম্বকের টানে একটা বিশেষ দিকে যাচ্ছে। খানিকটা বাদে যে রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। মাঝে-মাঝে হোঁচট খাচ্ছে। সে আশা করছিল, এই রকম হোঁচট খেয়ে যদি তার সেই দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে আসে তো খুব ভালো হয়। কিন্তু সে-রকম কিছুই হল না।

তবে, একটু বাদেই সে দেখতে পেল মাঠের মধ্যে দুটো নীল রঙের আলো। তখনই সে বুঝতে পারল, সেই লোক দুটোকে খুঁজে পেয়েছে। সুজয় দৌড়োতে লাগল।

কাজেই একটা ছোট পাহাড়। তার নিচে এবড়োখেবড়ো মাঠ, দু-চারটে ছোট ছোট গাছও রয়েছে। সেই একটি গাছের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সেই লম্বা আর বেঁটে লোক দুটি! তাদের গা থেকে আলো বেরিয়েই জায়গাটা বেশ আলো হয়ে আছে।

ওরা খুব মনোযোগ দিয়ে গাছটাকে দেখছিল। সুজয়ের পায়ের শব্দ বোধহয় শুনতে পায়নি। সুজয় এই লোক দু'টিকে প্রায় বন্ধুর মতন মনে করে, তাই ওদের দেখে এখন তার একটুও ভয় হয় না।

কাছে এগিয়ে এসে সুজয় উত্তেজিতভাবে ডাকল, এই যে!

সঙ্গে সঙ্গে ওদের গা থেকে আলো নিভে গেল, ওরা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

সুজয় একেবারে হকচকিয়ে থ। কি হল! কোথায় গেল ওরা? এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ আবার আলো জ্বলে উঠল, লোক দুটিকে দেখা গেল। তবে, এখন কিন্তু লোক দুটির গা থেকে নীল আলো বেরুচ্ছে না। একজনের হাতে লণ্ঠন, সেটা থেকেই আলো বেরুচ্ছে। কিন্তু সুজয় বাজি ফেলে বলতে পারে, একটু আগে ওদের কাছে লণ্ঠন ছিল না।

সুজয় দৌড়ে এসে লম্বা লোকটির হাত ধরতে যায়। লম্বা লোকটি তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বলল, জয়বাবু, আমাকে ছোঁবেন না, ছোঁবেন না!

সুজয় থমকে গিয়ে বলল কেন?

—আমাদের ছুঁতে নেই!

—কেন?

—এমনিই। আপনি এত রাত্তিরে হঠাৎ এখানে এসেছেন কেন?

সুজয় সে কথার উত্তর না দিয়ে জিগ্যেস করল, অপনার এখানে কি করছেন?

—একটা কাজ করছি।

বেঁটে লোকটি একটাও কথা বলেনি, সুজয়ের দিকে তাকায়নি পর্যন্ত। সে গাছটার সামনে এমনভাবে বসে আছে, যেন ঠিক ওটাকে পুজো করছে। অথচ খুবই সাধারণ গাছ, যে কোন মাঠেই দেখা যায়।

বেঁটে লোকটি এমনিতে খুবই হাসিখুশি। কিন্তু এখন তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সুজয়ের হঠাৎ এসে পড়াটা সে পছন্দ করেনি।

সুজয় লম্বা লোকটিকে জিগ্যেস করল, আমি কি এখানে একটু থাকতে পারি ?

লম্বা লোকটি বলল, চুপটি করে ওইখানটায় বসুন।

সুজয় বলল, আমাকে সব সময় আপনি বলেন কেন? আমি তো আপনার থেকে অনেক ছোট।

বেঁটে লোকটি দু-হাতের দুটো আঙুল তুলে কি একটা ইশারা করতেই লম্বা লোকটিও আঙুল নেড়ে উত্তর দিল।

বেঁটে লোকটি সেই গাছটার দু-পাশে দুটো হাত রাখল। তারপর এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সেদিকে। তখন একটা সাংঘাতিক আশ্চর্য ব্যাপার হল। লোকটির হাতের মধ্যে সেই চারাগাছটা আস্তে আস্তে পাতলা ছায়ার মতন হয়ে গিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারে।

সুজয় মুখ দিয়ে অবাক হওয়ার শব্দ করতেই লম্বা লোকটি তার দিকে ফিরে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলল। সুজয় নিজেকে সামলে নিল।

বেঁটে লোকটি সেই অদৃশ্য গাছটার কাছে তখনও দু-হাত মেলে আছে।

আস্তে আস্তে আবার সেখানে গাছটার পাতলা ছায়া দেখা দিল, তারপর পুরো গাছটাই ফিরে এল।

সুজয় শুনেছে, যারা ম্যাজিক দেখায় তারা এসব খুব সহজেই পারে। এই লোক দুটো কি রাতদুপুরে এখানে বসে বসে ম্যাজিক প্র্যাকটিস করছে?

লম্বা লোকটি মাথা নেড়ে বলল, উঁহু! ঠিক হয়নি। তাপর যেন সুজয়ের মনের কথা বুঝতে পেরেই তাকে বলল এটা ম্যাজিক নয়।

বেঁটে লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন বেশ রেগে গেছে। সে এবার একটা পাথর তুলে নিয়ে লম্বা লোকটির হাতে তুলে দিল। লম্বা লোকটি সেটি ভালো করে পরীক্ষা করে ফিরিয়ে দিল বেঁটে লোকটিকে। বেঁটে লোকটি চোখের নিমেষে পাথরটা অদৃশ্য করে ফেলল। তারপরের মুহূর্তেই সেটাকে আবার ফিরিয়ে আনল হাওয়া থেকে।

লম্বা লোকটি পাথরটা পরীক্ষা করে বলল, এটা ঠিক হয়েছে। গাছটা ঠিক হচ্ছে না কেন?

সুজয় আর থাকতে পারল না। সে মিনতি করে বলল, দেখুন, আপনারা তো অনেক কিছুই পারেন। প্রীতমকুমারীর খুব অসুখ। আপনারা ওকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন না?

লম্বা লোকটি বলল, আমরা এখানে সেই চেষ্টাই তো করছি। একটা জিনিস কিছুতেই মিলছে না যে!

সুজয় রীতিমতন অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, আপনারা প্রীতমকুমারীকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন? এইখানে বসে?

লম্বা লোকটি খুব সাধারণভাবে বলল, হ্যাঁ। আচ্ছা জয়বাবু, আপনি আমাদের একটু সাহায্য করুন। এই যে গাছটা রয়েছে, গুনে দেখুন, এর ক'টা ডাল আর প্রত্যেক ডালে ক'টা পাতা। গুনে মনে রাখতে পারবেন?

গাছের পাতা গোনার কথা কেউ কখনও ভাবে না। অবশ্য এই গাছটা বেশ ছোট। তিনটে মোটে ডাল। অজন্তা পাহাড়ে বেঁটে লোকটির হাতে এইরকমই একটা চারাগাছ দেখেছিল সুজয়। কিন্তু সেই গাছটা আর এটা এক নয়। সেটার পাতাগুলো অন্যরকম, এবং একটা ফুল ছিল।

সুজয় গাছটার পাতাগুলো গুনে ফেলল। লম্বা লোকটি আঙুলের ইশারা করলো বেঁটে লোকটিকে। বেঁটে লোকটি হাত ছুঁইয়ে গাছটাকে অদৃশ্য করে দিল আবার। একটু বাদেই গাছটাকে ফের সেই জায়গায় দেখা গেল।

লম্বা লোকটি বলল, সুজয় বাবু, আপনি এবার গাছের পাতাগুলো গুনুন তো।

সুজয় গুনে দেখল, পাতাগুলো উলটোপালটা হয়ে গেছে। যে ডালে আগে সতেরোটা পাতা ছিল, এখন সেখানে উনিশটা। অন্য ডালে আবার পাতা কমে গেছে।

বেঁটে লোকটি ভীষণ রেগে ভুরু কুঁচকে রয়েছে। লম্বা লোকটি বলল, কিছুতেই হচ্ছে না।

সুজয় বলল, আমাকে এই ম্যাজিকটা শিখিয়ে দেবেন?

লম্বা লোকটি বলল, বললাম না যে এটা ম্যাজিক নয়! ম্যাজিকে কোনও কিছুই অদৃশ্য হয় না। শুধু চোখের ভুল। এটা অন্য ব্যাপার।

—আপনারা কি বৈজ্ঞানিক?

—এটা এমন কিছু বৈজ্ঞানিকদের মাথা ঘামাবার মতন ব্যাপার নয়, খুবই সাধারণ।

—আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন?

লম্বা লোকটি সুজয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কারণ আমাদের সময় খুব কম। এই যে গাছপালা, পাহাড়, জল, লোহা—এগুলোর নাম কি? এগুলোকে বলে ম্যাটার।

সুজয় বিজ্ঞান বইতে এসব পড়েছে বলেই উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ, এ সবকিছুই ম্যাটার, তার মানে পদার্থ। পদার্থ তিনরকম—কঠিন, তরল আর বায়বীয়।

লম্বা লোকটি বলল, বাঃ! এখন এই যে তিনরকম পদার্থ বা ম্যাটার—এদের আকৃতি বদলানো যায়। বুঝতে পারলেন?

—না।

—একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বরফ একটা কঠিন পদার্থ। সেটা গলে গেলেই জল, মানে তরল পদার্থ। সেই জল খুব গরম করলে বাষ্প, তার মানে কি যেন বললেন, বায়বীয়, সেই বায়বীয় হয়ে যায়। আবার বাষ্পকে ধরে রেখে ঠান্ডা করলে জল হয়, জল জমিয়ে বরফ। বুঝতে পারছেন?

—হ্যাঁ।

—সেইরকম সোনা কিংবা লোহাকেও গলিয়ে তরল করা যায়। তরল থেকে বাষ্প। যে-কোনও জিনিসকেই ভাঙতে ভাঙতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছোনো যায়, যার নাম অ্যাটম। সেই অ্যাটমকেও ভাঙলে তখন আর তা বস্তু কিংবা পদার্থ থাকে না, হয়ে যায় শক্তি। পদার্থ থেকে যেমন শক্তি হয়, তেমনি শক্তি থেকেও পদার্থ হয়। এসব এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

সুজয় কিন্তু এখন আর বিশেষ কিছু বুঝতে পারছে না। শুধু ঘাড় নেড়ে যাচ্ছে। এইসব কথার সঙ্গে গাছটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কি সম্পর্ক?

সুজয় যখন যা ভাবে, এই লোক দুটি তখনই ঠিক সেই কথা বলে। লম্বা লোকটি আবার বলল, এইসব কথার সঙ্গে গাছটা অদৃশ্য করার সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, গাছটা একটা পদার্থ—সেটাকে শক্তি করে ফেলা খুব সহজ—কিন্তু শক্তি থেকে সেটাকে গাছে ফিরিয়ে আনতে গেলে একটু অদলবদল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই গাছটা আর থাকছে না। আমার বন্ধু এই কাজ খুবই ভালো পারে, কিন্তু এসব গাছ তো ওর চেনা নয়!

বেঁটে লোকটি এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর একজন কোনও মানুষের ওপর এটা পরীক্ষা করে দেখলে হতো!

লম্বা লোকটি বলল, সেরকম মানুষ কোথায় পাওয়া যায়?

—কেন, এই তো সুজয়বাবুই রয়েছেন। কি সুজয়বাবু, আপনি রাজি?

সুজয় জিগ্যেস করল, আমাকে কি করতে হবে?

—আপনাকে একবার অদৃশ্য করে আবার ফিরিয়ে এনে দেখতে চাই। ঠিকঠাক হয় কিনা।

সুজয় ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত নেড়ে বলল, না, না, আমাকে নয়। আমাকে নয়।

লম্বা লোকটি বলল, একি জয়বাবু, আপনি এই সামান্য ব্যাপারেই ভয় পেয়ে গেলেন?

বেঁটে লোকটি এমন একদৃষ্টে সুজয়ের দিকে তাকিয়ে আছে যে, তার বুক ঢিপ-ঢিপ করছে। নিজের চোখ আড়াল করে সে প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, আমি মা-বাবাকে বলে আসিনি, আমি মরে গেলে মা-বাবা ভীষণ কাঁদবেন।

লম্বা লোকটি বলল, সে কি সুজয়বাবু! আমরা থাকতে আপনি মরবেন কেন? তা কখনো হয়?

—কিন্তু আমি যদি বদলে যাই? মা-বাবা যদি আমাকে চিনতে না পারেন? আমার তো আর ভাই নেই।

—আমরা অনেকবার পরীক্ষা করে দেখব। একবার না একবার ঠিক হবেই।

সুজয়ের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেলে। বলল, 'আপনারা নিজেদের ওপর পরীক্ষা করে দেখুন না! একজন আর একজনকে করুন।

লম্বা লোকটি মাথা নেড়ে জানালো, আমাদের ওপর এ-পরীক্ষা করলে হবে না।

—কেন, আপনারা যখন একজন মানুষ খুঁজছেন!

—আমরা তো মানুষ নই।

সুজয়ের চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেল। সে ফিসফিস করে বলল, আপনারা মানুষ নন? তা হলে আপনারা কি?

বেঁটে লোকটি ঠাট্টার সুরে বলল, আমরা মানুষ নই। আমাদের বলতে পারেন অ-মানুষ! অ-মানুষ!

তারপর সে হো হো করে হাসতে লাগল। লম্বা লোকটিও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসছে। এই রাতদুপুরে এইরকম হাসিঠাট্টার কি মানে হয় রে বাবা!

সুজয়ের মনে হল, এবার তার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। অনেকখানি এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হবে। তবে এখন তার দৃষ্টিশক্তি আবার বেড়ে গেছে, সেইজন্য ভয় করছে না।

সে বলল, আচ্ছা, আপনারা ওই অদৃশ্য করার বিদ্যেটা আমাকে একটু শিখিয়ে দেবেন!

লম্বা লোকটি এবার একটু ধমক দিয়েই বলল, দিয়েছিলাম তো আপনাদের শিখিয়ে। সব ভুলে গেছেন।

—কাকে শিখিয়েছিলেন?

—এদেশের লোকদের। গৌতমকে শেখানো হয়েছিল, তারপর—

—গৌতম কে?

—গৌতম ঋষির নাম শোনেননি? তিনি অহল্যা নামের একটি মেয়েকে পাথর

করে দিয়েছিলেন। তারপর রাম এসে সেই পাথর থেকে আবার মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলেন। এইসবই তো পদার্থ থেকে শক্তি, আবার শক্তি থেকে পদার্থ।

সুজয় বলল, এ তো গল্প!

—মোটেই গল্প নয়। আগেকার দিনে কেউ বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে গল্প লিখতো **না। এখানকার লেখকরাই বানিয়ে বানিয়ে লেখে।**

—এসব তা হলে সত্যি? এসব করতে গেলে কোন যন্ত্রপাতি লাগে না?

—মনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী যন্ত্র আর কিছু আছে? আপনারা নিজের মনকেই তো চেনেন না। একটা কথা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম, 'আত্মানং বিদ্ধি'—সেটাও ভুলে গেছেন।

সুজয় বলল, আমি এসব কিছু বুঝতে পারছি না। আমি এবার বাড়ি যাই। প্রীতমকুমারী কি তা হলে সারবে না!

লম্বা লোকটি বলল, ওই মেয়েটির বাঁচার কোনও আশাই ছিল না। যখন ও নিচে পড়ে যায়, তখন ওর শরীর প্রায় গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল—প্রাণটা তখনও বেরোয়নি বলে আমরা ওকে একটা গাছ বানিয়ে রাখি। গাছ নিজের শরীর মানুষের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি সারিয়ে নিতে পারে। সেরেও গিয়ে ছিল। কিন্তু গাছ থেকে আবার মেয়েতে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। ও আবার গাছ হতে চাইছে।

বেঁটে লোকটি বলল, প্রীতমকুমারীকে বাঁচাবার জন্য আর একবার চেষ্টা করে দেখি না! শেষ চেষ্টা।

লম্বা লোকটি বলল, চলো, যাওয়া যাক।

সুজয় বলল, আপনারা সেখানে কি করে যাবেন? সেখানে এখন খুব কড়া পাহারা। আমাদের যেতে দেয়নি। বাবা আর ছোড়দি শুধু গিয়েছিল কর্নেল সাহেবের সঙ্গে।

ওরা দুজন নিজেদের মধ্যে আঙুলের ইশারায় কি কথা বলে নিল। তারপর সুজয়ের দিকে ফিরে লম্বা লোকটি বলল, জয়বাবু, আপনি তাহলে এখন বাড়ি যান! রাস্তা চিনে যেতে পারবেন তো?

—আপনারা এখন কোথায় যাবেন?

—ওই মেয়েটির কাছে যাব।

—কিন্তু বললুম যে, খুব কড়া পাহারা।

—কড়া পাহারা দিয়ে কি মৃত্যুকে আটকে রাখা যায়? ওই মেয়েটি তো একটু বাদেই মরে যাবে। আমরা গেলে তবু বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারি।

সুজয় বলল, আমিও আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি?

লম্বা লোকটি বলল, আপনি গেলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে যে!

বেঁটে লোকটি ঠাট্টা করে বলল, তাছাড়া জয়বাবু, আপনি যে বড্ড ভীতু!

এই কথাটা সুজয়ের মনে লাগল। ভীতু বললে কার না খারাপ লাগে?

সুজয় অভিমানের সঙ্গে বলল, আমি মোটেই ভীতু নই! আমি অন্ধকার রাস্তা দিয়ে এতখানি দৌড়ে এসেছি, আর কোনও ছেলে পারবে?

—কিন্তু আপনাকে যখন বললুম , আপনাকে অদৃশ্য করে দিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখব, তখন আপনি ভয় পেলেন কেন?

—বাঃ, আপনারা কেন নিজেদের ওপর পরীক্ষা করছেন না? তার মানে আপনারাও ভয় পাচ্ছেন। সেবেলা বুঝি কিছু হয় না?

বেঁটে লোকটা হাসতে হাসতে বলল, আমরা নিজেদের ওপর পরীক্ষা করব? আচ্ছা, এই দেখুন!

বেঁটে লোকটি লম্বা লোকটির দিকে দু-হাত তুলে তাকাতেই লম্বা লোকটি চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত বাদে লোকটি নিজের জায়গায় ফিরে এল। এবার সে বেঁটে লোকটির দিকে দু-হাত তুলে তাকাতেই বেঁটে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার সে ফিরে এল নিজের জায়গায়। তখন সে আবার লম্বা লোকটির দিকে হাত তুলে—

এই রকম তিন-চার বার চলল। একজন আর একজনকে অদৃশ্য করে দিচ্ছে! সুজয় বড় বড় চোখ মেলে দেখছে। কিছুতেই যেন বিশ্বাস করা যায় না। অথচ চোখের সামনেই তো হচ্ছে এসব। সুজয়ের গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। ঘাম বেরুচ্ছে এই শীতের মধ্যেও। অথচ ঠিক ভয় পাচ্ছে না সে।

লম্বা লোকটি বলল, দেখলেন তো? কিন্তু আমাদের ওপর এই পরীক্ষা করে লাভ নেই। কারণ সাধারণ মানুষের চেয়ে আমরা একটু আলাদা। আমাদের গায়ে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। আর আমরা আলো শুষে নিতে পারি বলে আমাদের শরীরের ছায়া পড়ে না। এই দেখুন না, চাঁদের আলোয় আপনার একটা ছায়া পড়েছে। কিন্তু আমাদের কি ছায়া আছে?

সুজয় দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, আপনাদের ছায়া পড়ে না? তা হলে আপনারা কি দেবতা? আমি বইতে পড়েছি, দেবতাদের গা থেকে রক্তও পড়ে না, ওঁদের কখনও ছায়াও পড়ে না।

বেঁটে লোকটি জিগ্যেস করল, দেবতা কি?

সুজয় বলল, বাঃ, আপনারা কি দেবতার কথা জানেন না? ব্রহ্মা,বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র। বাবা বলেছেন, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ—এরাও দেবতা!

লম্বা লোকটি বলল, না, আমরা দেবতা নই। আমরা অন্য গ্রহ থেকে এসেছি— অনেক দূর থেকে।

—সত্যি?

—হ্যাঁ, সত্যি। আমরা যেখান থেকে এসেছি, সেখানে মিথ্যে বলে কিছু নেই। পৃথিবীর মানুষই শুধু মিথ্যে কথা বলে।

—কিন্তু বাবা যে বলেছেন, পৃথিবী ছাড়া আর অন্য কোনও গ্রহে মানুষ কিংবা প্রাণী নেই! বাবা মিথ্যে কথা বলেছেন?

—না, আপনার বাবা হয়তো জানেন না। আমরা এসেছি অনেক দূর থেকে — আপনাদের আকাশে যে-রকম সূর্য আছে, এরকম অনেকগুলি সূর্য পার হয়ে,

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সুজয় জিগ্যেস করল, কিন্তু সেদিন যে কুকুরটা আপনার পায়ে কামড়ে দেবার পর আপনারা পা দিয়ে খুব রক্ত পড়েছিল!

—সে তো আপনি রক্তের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি রক্ত তৈরি করে ফেললাম।

—এরকম যা খুশি তৈরি করতে পারেন?

—কিছুই শক্ত নয়। দেখবেন, আমার পায়ে কুকুর কামড়েছিল বটে, কিন্তু সেখানে একটুও দাগ নেই?

লোকটি একটা পা মেলে দিল সুজয়ের সামনে। কাপড়টা সরাতেই দেখা গেল মসৃণ সুন্দর চামড়া। অত জোরে কুকুর কামড়ে দিলে ঘা হবেই যে-কোনও লোকের। এর কিছুই হয়নি। এর পায়ে একটুও লোম নেই—ঠিক যেন আয়নার মতন ঝকঝকে গা।

বেঁটে লোকটি বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু! এক্ষুনি না গেলে মেয়েটিকে বাঁচানো যাবে না।

লম্বা লোকটি বলল, আচ্ছা, এসব কথা পরে হবে। এখন যাওয়া যাক।

বেঁটে লোকটি চোখের দিকে তাকালেই সুজয়ের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে। তবু দাঁতে দাঁত চেপে সাহস এনে সে বলল, তা হলে প্রীতমকুমারীকে বাঁচাতে পারবেন?

—চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

—আচ্ছা, তা হলে করুন।

বেঁটে লোকটি একদৃষ্টিতে সুজয়ের দিকে তাকিয়ে দুটো হাত তুলতেই সুজয়ের দেহটা হালকা ছায়ার মতন হয়ে গেল। তারপর একেবারে অদৃশ্য।

অদৃশ্য অবস্থায় কি কি হয়েছিল তা সুজয়ের মনে নেই। তখন তার চোখ ছিল না বলে কিছুই দেখতে পায়নি। তার মাথা ছিল না বলে কিছু মনেও রাখতে পারবার উপায় নেই!

শুধু নির্জন মাঠে জ্যোৎস্নার মধ্যে যেখানে সুজয় লোক দুটির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, এখন সেখানে সে নেই। এখন সেখানে চাঁদের আলো পড়ে আছে. ছায়াটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। আকাশে হালকা সাদা সাদা মেঘ। এক এক টুকরো মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদকে।

বেঁটে লোকটি একরকম ভাবে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তার। এত জ্বলজ্বলে চোখ কোনও মানুষের হয় না। মনে হয় যেন চাঁদের খানিকটা আলোও সে চোখ দিয়ে শুষে নিয়ে আবার বার করে দিচ্ছে।

লম্বা লোকটিও এক পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। কয়েক মুহূর্ত বাদে সে একটা টুস্‌কি দিল। বেঁটে লোকটা আবার হাত দুটো ওঠা-নামা করাতেই ফিরে আসতে লাগল সুজয়।

প্রথমে ধোঁয়া ধোঁয়া, তারপর হালকা কাচের মতন, তারপর পুরোপুরি তার আগেকার চেহারা।

সুজয় চোখ বুজে আছে। চোখ খুলতেই তার কিরকম যেন মাথা ঘুরে গেল। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

লোক দুটি দৌড়ে এল তার খুব কাছে, ঝুঁকে পড়ল, কিন্তু সুজয়ের গা-ছুঁলো না। দু-জনেই ব্যস্তভাবে ডাকল, সুজয়বাবু, সুজয়বাবু!

সুজয় আবার চোখ বুজে আছে।

লম্বা লোকটি হাততালি দিয়ে খটখট করে শব্দ করতে লাগল।

সুজয় চোখ মেলে বলল, আমি কোথায়?

লম্বা লোকটি বলল, এই যে আপনি এখানে। আমাদের সামনে। এখানেই তো ছিলেন।

—আমি কে?

—আপনারা নাম তো সুজয়! জয়বাবু, আপনার কিছু মনে পড়ছে না?

সুজয় দুদিকে ঘাড় নেড়ে জানাল—না।

—ভালো করে মনে করার চেষ্টা করুন।

—পারছি না। কিছুই মনে পড়ছে না।

বেঁটে লোকটি বলল, হাত পা মুখ সবই তো ঠিক আছে।

লম্বা লোকটি বলল, মাথাটা একটু ছোট মনে হচ্ছে না?

বেঁটে লোকটি বলল, না। ঠিকই তো আছে। শরীরটা ঠিকই আছে। কিন্তু ওদের গায়ের ভেতরে যে রক্ত থাকে—সেই রক্ত একটু অদলবদল হলেই মুশকিল—

লম্বা লোকটি বলল, জয়বাবু, আপনি মনে করার চেষ্টা করুন, আপনি আপনার বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছেন। আপনার দিদি আছেন সঙ্গে—আপনি হোটেল থেকে রাত্তির বেলা—

সুজয় বলল, না, না, আমার নাম আবদুল মালেক, আমার খুব অসুখ হয়েছিল—

—সে কি?

—আমাকে ইঞ্জেকশান দিচ্ছিল ডাক্তারবাবু।

বেঁটে লোকটির মুখ চিন্তায় কুঁকড়ে গেল। খুব নিচু গলায় বলল, একটা কিছু ভুল হয়েছে—

সে আবার হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে বেশ জোরে বলল, জয়বাবু, আমার দিকে তাকান! আবার তাকান!

সুজয় হাত দিয়ে নিজের চোখ আড়াল করে বলল, পারছি না। আমার চোখে লাগছে। এত আলো কেন?

বেঁটে লোকটি বলল, হাত সরিয়ে নিন, চোখে লাগবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে!

বেঁটে লোকটি খুবই উত্তেজিত। এখন তার গা থেকে নীল আলো বেরুতে শুরু করেছে। সুজয় চোখ থেকে হাত সরাতেই সে সুজয়কে আবার চোখের নিমেষে অদৃশ্য করে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে কিন্তু এবার আর সে সুজয়কে ফিরিয়ে আনল না! প্রায় পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল ওই একভাবে। এখন তাকে দেবতা বা অলৌকিক কিছু মনে হয়।

আবার সুজয় ফিরে এল সেই জায়গায়। এবার কিন্তু সে চোখ মেলেই ধড়ফড় করে উঠতে গেল। সুজয়ের মতন গলায় নয়, অন্যরকম, বয়স্ক লোকদের মতন গম্ভীর গলায় বলল, এসব কি ব্যাপার?

লম্বা লোকটি বলল, সুজয়বাবু, এবার সব ঠিক আছে?

সুজয় ভুরু কুঁচকে বলল, সুজয় আবার কে?

—আপনার নাম সুজয়। আপনার ডাকনাম জয়।

—কি বাজে কথা বলছেন? আমার নাম পরিতোষ। আপনারা সুজয়ের কথা কি বলছেন? তার কি হয়েছে?

মাটিতে যে শুয়ে আছে, সে সুজয়ের মতনই ঠিক দেখতে। সেই জামাপ্যান্ট পরা, কিন্তু গলার আওয়াজ বড়দের মতন—অন্য একজন লোক কথা বলছে তার ভেতর থেকে।

লম্বা লোকটি আর বেঁটে লোকটি চোখাচোখি করল। আঙুলের ইশারা করে আবার কি বলাবলি শুরু করে দিল নিজেদের মধ্যে।

সুজয় জিগ্যেস করল, আপনারা কে? আমি এখানে কি করে এসেছি? সুজয়ের কথা আপনারা কি বলছিলেন?

লম্বা লোকটি বলল, সেসব কথা পরে হবে। আপনি সুজয়কে চেনেন?

—কেন চিনবো না। সুজয় তো আমার দিদির ছেলের নাম! আমার ভাগ্নে হয়। কি হয়েছে তার?

বেঁটে লোকটির চোখ-মুখে হঠাৎ হাসি ছড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণে মনে হল, সে যেন খুব খুশি হয়ে উঠেছে। সে বলল, যাক, আর ভয় নেই।

লম্বা লোকটি বলল, কি?

—অনেকটা মিলে এসেছে। একই পরিবারের রক্ত হয়ে এসেছে যখন, তখন আর দেরি হবে না। এই রক্তই যত গোলমাল করে।

মাটিতে শুয়ে থাকা সুজয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, পরিতোষবাবু, একবার আমার চোখের দিকে তাকান তো! তারপর হাত উঁচু করেই সে ওই শরীরটা অদৃশ্য করে ফেলল।

এবার সুজয়ের চেহারাটা যখন ফিরে এল, তখন তার চোখ খোলা। সে লম্বা লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, সব ঠিক আছে?

লম্বা লোকটি খুব নরম গলায় জিগ্যেস করল, আপনার নাম কি সুজয়? আপনি কি আমাদের জয়বাবু?

সুজয় বলল, বাঃ, আমার নাম আবার বদলে যাবে নাকি এর মধ্যে? আমাকে কি আপনারা সত্যি অদৃশ্য করে দিয়েছিলেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি? খালি মনে হচ্ছে, আমি যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলাম!

লম্বা ও বেঁটে লোক দুটি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বড়-বড় নিঃশ্বাস ফেলল।

বেঁটে লোকটি বলল, উঃ, যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন! তাও তো আপনাকে গাছ বা অন্য কিছু করিনি!

সুজয় বলল, আপনাদের পরীক্ষা ঠিক হয়েছে তো? আমি কি ভয় পেয়েছি একটুও, বলুন?

—না, আপনি একটুও ভয় পাননি।

লম্বা লোকটি বলল, চলুন এবার দেখা যাক মেয়েটিকে বাঁচানো যায় কিনা!

এত রাত্রেও হাসপাতালের সামনের গেটে বেশ কিছু লোকজন, গাড়ি ও আলো।

ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে কয়েকজন লোককেও ছুটোছুটি করতে দেখা গেল। প্রীতমকুমারীর জন্য সবাই দারুণ ব্যস্ত, তার অবস্থা খুবই খারাপ। মহারাষ্ট্রের গভর্নর নিজে তিনবার টেলিফোন করেছেন খবর জানবার জন্য। দিল্লি থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রীতমকুমারীকে যে-কোনও প্রকারে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হোক। সমস্ত দেশের বড় বড় ডাক্তারদের একটা দলকে দু-একদিনের মধ্যেই পাঠানো হচ্ছে এখানে। প্রীতমকুমারীর একটা পা শুকিয়ে অবিকল গাছের ডালের মতন হয়ে গেছে!

লোক দুটির সঙ্গে সুজয় হন হন করে দোতলায় উঠে এল। প্রীতমকুমারীকে কোন্ ঘরে রাখা হয়েছে, সে জানে। লোক দু'টিও মনে হল জানে, কেননা তারা সুজয়কে একবারও জিজ্ঞেস না করেই এগুতে লাগল ডানদিকের কোণের ঘবটার দিকে।

এই সময় কর্নেল চেতন সিং বেরিয়ে এলেন ওই ঘরটা থেকে। খুব ব্যস্তভাবে হেঁটে যাচ্ছিলেন সিঁড়ির দিকে। সুজয়কে দেখতে পাননি।

সুজয় দৌড়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কর্নেলসাহেব, কর্নেলসাহেব, শুনুন—

কর্নেল প্রথমে সুজয়কে চিনতে পারলেন না। তারপর ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললেন, ও সেই বাঙালিবাবু! এত রাতমে এখানে কি করছো?

সুজয় উত্তেজিতভাবে বলল, এই যে এঁরা দুজন, এঁরা প্রীতমকুমারীকে সারিয়ে দেবেন।

কর্নেলসাহেব বললেন, ননসেন্স! এখন বিরক্ত করো না! খুব সাংঘাতিক ব্যাপার—

—আপনি ভালো করে শুনুন। এঁরা দুজন—

কর্নেলসাহেব সুজয়ের কথা পুরোটা না শুনেই বললেন, খোকাবাবু, এখন বাড়ি যাও—

লোক দুটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। লম্বা লোকটি এবার এগিয়ে এসে খুব বিনীতভাবে বলল, আমাদের একবার ভেতরে যেতে দিন।

লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে কর্নেল যেন একটু চমকে গেলেন। দু-তিনবার তাকালেন। তারপর রুক্ষভাবে ইংরেজিতে বললেন, আপনারা কি? হেকিম না কবিরাজ, না সাধু? মন্তর দিয়ে সারাবেন? ওখানে সাতজন বড়-বড় ডাক্তার রয়েছেন—

লোকটি কর্নেলের চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে আবার সেই কথা বলল, আমাদের একবার ভেতরে যেতে দিন!

—এখন বিরক্ত করবেন না। আপনারা চলে যান এখান থেকে।

—আমাদের একবার ভেতরে যেতে দিন।

কর্নেলসাহেব এমনিতে বেশ হাসিখুশি ভালো মানুষ। কিন্তু আজকের নানানরকম ঘটনায় তাঁর মেজাজ ঠিক নেই। হঠাৎ রেগে উঠে বললেন, গেট আউট! যত সব হাতুড়ে! আপনারা যাবেন, না তাড়িয়ে দিতে হবে?

তিনি গলা চড়িয়ে ডাকলেন, অডার্লি—অডার্লি!

লোক দুটি শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ আসছে না দেখে, রাগের চোটে কর্নেলসাহেব নিজেই ওদের ঘাড়ধাক্কা দিতে এলেন। কর্নেল 'যাও' বলে সেই লম্বা লোকটির

ঘাড়ে হাত দিয়ে ঠেলতে গেলেন, অমনি সে দু-হাত উঁচু করলো। সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল কর্নেল।

বেঁটে লোকটি বলল, চলো এবার ভেতরে যাওয়া যাক।

দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সুজয়ের মনে হল, প্রীতমকুমারী আর বেঁচে নেই। কেন যে তার মনে হল, সে জানে না। তখনও সে প্রীতমকুমারীকে দেখতে পায়নি। তবু তার মনে হল তারা ঠিক এক মুহূর্ত দেরি করে এসেছে।

সত্যিই তাই। তারা দরজা খোলার ঠিক আগের মুহূর্তেই প্রীতমকুমারীর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেছে।

ঘর-ভর্তি ডাক্তার আর নার্স। প্রীতমকুমারীর নাকে অক্সিজেনের নল। আরও কত রকম যন্ত্রপাতি। তিনজন ডাক্তার প্রীতমকুমারীর কাছে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ছিলেন। এবার মুখ তুলে ইংরেজিতে বললেন, সব শেষ। অবিশ্বাস্য! অলৌকিক! ক্যামেরাম্যানদের ডাকুন!

প্রীতমকুমারীর হাত-পাগুলো ঠিক গাছের ডালের মতন রং ধরে শুকিয়ে গেছে। মুখখানা সবুজ।

সুজয় এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, সেই লোক দুটি দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বেঁটে লোকটির মুখ দু-হাতে ঢাকা। মনে হয় যেন কাঁদছে।

সুজয় বুঝতে পারল, ঘরের অন্য সব ডাক্তাররা যাতে ওদের মনে করে প্রীতমকুমারীর আত্মীয়, দুঃখ পেয়ে কাঁদছে—তাই বেঁটে লোকটি ওইরকম ভান করছে। দারুণ চালাক তো!

লম্বা লোকটি নিচু গলায় বলল, আমরা এখানে থেকে আর কি করব! চলো—

সুজয়ও ওদের সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় কেউ কোনও কথা বলল না। বাইরে বেরিয়ে আসার পরল সুজয় দেখল, বেঁটে লোকটি সত্যিই কাঁদছে তখনও। তার দু-চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। লম্বা লোকটির চোখেও ছলছল ভাব।

সুজয় বেশ অবাক হয় গেল। একটু আগে সে ওদের দেবতা ভেবেছিল। দেবতাদের ছায়া পড়ে না। গা থেকে রক্ত পড়ে না। কিন্তু চোখ দিয়ে কি জল পড়ে? দেবতাদের কান্নার কথা কি সে কোথাও পড়েছে? এই লোকটির কান্না কিন্তু একটুও মিথ্যে নয়।

সুজয় জিগ্যেস করল, আপনি কাঁদছেন কেন?

বেঁটে লোকটি ধরা গলায় বলল, আমি মেয়েটিকে বাঁচাতে পারলাম না!

প্রীতমকুমারী তো ওদের আত্মীয় নয়, কেউ নয়। প্রীতমকুমারী যে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিল, তাতেও ওদের কোনও দোষ নেই। তবু ওই মেয়েটির জন্য ওরা কাঁদছে —এটা সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। সুজয়েরও মনে খুব কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু চোখ দিয়ে তো জল পড়ছে না।

সুজয় কিন্তু সে কথা বলল না। সে বরং জিগ্যেস করল, আপনারা তো ওকে বাঁচাবার কোনও রকম চেষ্টাই করলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বেঁটে লোকটি চোখ মুছে বলল, একবার প্রাণ বেরিয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। প্রাণ থাকলে অদলবদল করা যায়, কিন্তু প্রাণই যদি না থাকে—

লম্বা লোকটি বলল, এখানে এরা তো এখনও ঠিকমতন বাঁচাতে জানে না। তাই এত লোক মরে।

বেঁটে লোকটি সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বুঝিয়ে দেবার মতন সুরে বলল, আগে আমরা প্রাণ তৈরি করতে পারতাম। খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না কিন্তু ক'বছর আগে থেকে আমাদের ওখানে প্রাণ তৈরি করা নিষেধ হয়ে গেছে। ওটা আবার আমরা প্রকৃতির ওপর ছেড়ে দিয়েছি।

সুজয় জিগ্যেস করল, ক'বছর আগে থেকে।

লম্বা লোকটি উত্তর দিল, আপনাদের হিসেবে এই ধরুন সাড়ে তিন হাজার বছর আগে থেকে।

সুজয় আর সেই লোক দুজন কিছুক্ষণ হাঁটতে লাগল চুপচাপ। সুজয়ের মনের মধ্যে একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন ঘুরছে। কোনটা আগে জিজ্ঞেস করবে, সেটাই ঠিক করতে পারছে না। বার বার তার মনে হচ্ছে, কি যেন একটা জরুরি কথা এক্ষুনি বলা দরকার। যদিও প্রীতমকুমারীর মুখখানাই তার চোখের সামনে ভাসছে—তবুও এর থেকেও বেশি জরুরি আর একটা কি যেন ব্যাপার আছে। অথচ ঠিক মনে পড়ছে না।

রাত আর বেশি নেই। কোথা থেকে ডেকে উঠল একটা কুকুর। একটা গাছে কয়েকটা পাখির ঝটপটানি শোনা গেল। তিন রাস্তার মোড়ে এসে লম্বা লোকটি বলল, জয়বাবু, আপনি এবার যেতে পারবেন তো? আমাদের এবার অন্যদিকে যেতে হবে।

সুজয় জিগ্যেস করল, আপনারা কোথায় যবেন?

লম্বা লোকটি বলল, আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে।

মা-বাবা হঠাৎ জেগে উঠলে সুজয়কে খোঁজাখুঁজি করবেন। চিন্তা করবেন খুব। তবু সুজয়ের এক্ষুনি বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। এই লোক দুটির সঙ্গে যদি আর কখনও দেখা না হয়, তাহলে সে অনেক কথাই জানতে পারবে না।

সুজয় বলল, আপনারা যদি প্রীতমকুমারীকে বাঁচিয়ে দিতে পারতেন, তাহলে সবাইকে আমি বলতাম যে, আমার জন্যই সে বেঁচে গেছে। আমি আপনাদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম তো!

বেঁটে লোকটির মুখ দেখে মনে হল, আবার কেঁদে ফেলবে। প্রীতমকুমারীর জন্য ওর সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে। ধরা গলায় বলল, চেষ্টা তো কম করিনি। পাহাড় থেকে পড়ে যাবার পরই সে মরে যেত। তবু তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছি। ওকে আরও অনেকদিন গাছ করে রেখে দিলে হয়তো কাজ হতো। কিন্তু তাতে ওর স্মৃতিশক্তি অন্য রকম হয়ে যেতে পারতো। ও আর মানুষ চিনতে পারতো না।

—সেও তো ভালো ছিল।

—না, তার ফল ভালো হয় না। সেরকম বেঁচে থেকে লাভ নেই।

—আপনারা আগে মরা মানুষ বাঁচাতে পারতেন তো। ইচ্ছে করে সেটা ভুলে গেলেন?

—শুধু মরা মানুষ বাঁচানো নয়। প্রাণও তৈরি করতে পারতাম। যেমন ধরুন, ইচ্ছে করলেই আপনার মতন একটি ছেলেকে এই মুহূর্তে তৈরি করতে পারতাম। কিন্তু নিয়ম করে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে সময়ের হিসেব থাকে না।

—তার মানে?

—সেটা আপনি ঠিক বুঝবেন না। সকলেই যে এক সময় জন্মায় ও মরে। তাই দিয়েই সময়ের হিসেব হয়।

সুজয় লম্বা লোকটির দিকে ফিরে বলল, আপনি যে বললেন, আপনাদের অনেক কাজ বাকি আছে? আপনারা তো বাইরে থেকে এসেছেন? এখানে আপনাদের কি কাজ?

লম্বা লোকটি হেসে বলল, অনেক কাজ। যেমন ধরুন, কাল বিকেলবেলা একটা ঝড় তুলতে হবে এখানে। আপনাকে আগে থেকেই বলে দিলাম, কাল বিকেল ঠিক সাড়ে চারটের সময় ধারুণ ঝড় আর বৃষ্টি শুরু হবে এখানে। এরকম ঝড় এখানে বহুদিন হয়নি।

—আপনারা ঝড় তৈরি করবেন?

—হ্যাঁ। এই সময় তো সাধারণত ঝড়-বৃষ্টি হয় না। আমরা তৈরি না করলে আর কি করে হবে বলুন!

—কেন, ঝড়বৃষ্টির দরকার কি?

—প্রীতমকুমারীর জন্য। প্রীতমকুমারী যেভাবে মারা গেছে, এর আগে আপনাদের এখানে আর কেউ মারা যায়নি। মরার পর কেউ তো গাছ হয়ে যায় না। এই নিয়ে খুব হই-চই হবে। সেটাকে চাপা দেবার জন্যই ঝড়বৃষ্টি চাই। ঝড়বৃষ্টিতে লোকে নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়বে যে, অন্য কথা নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না।

বেঁটে লোকটি বলল, আপনাদের এখানে এই তো নিয়ম দেখছি। নতুন একটা কিছু ঘটলেই লোকে পুরোনো কথাটা ভুলে যায়।

—আপনারা এরকম ঝড় ইচ্ছে করলেই তৈরি করতে পারেন?

—মাঝে-মাঝে করতে হয়। কাল বিকেলে আমাদের একটা রকেট এখানে নামবে। ঝড়বৃষ্টিতে কেউ দেখতে পাবে না।

সুজয় জিগ্যেস করল, সেই রকেটে কি আপনারা চলে যাবেন?

লম্বা লোকটি বলল, ঠিক নেই। যেতেও পারি।

—আপনাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না?

—আপনি দেখা করতে চান বুঝি? আমাদের আপনি পছন্দ করেছেন?

সুজয় কীভাবে বুঝিয়ে বলবে জানে না। এই লোক দুটির সঙ্গে আর দেখা হবে না, তা কি হয়? সে আবদারের সুরে বলল, না, আপনারা কালকে কিছুতেই যেতে পারবেন না।

বেঁটে লোকটি বলল, আমরা তো প্রায়ই আসি। যখনই দেখবেন পৃথিবীর কোনও জায়গায় খুব বেশি ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, সে সময়ই বুঝবেন, আমাদের রকেট নেমেছে। এমনি অন্য সময় যদি রকেট নামে—তা হলে তার কাছাকাছি মানযজন থাকলে তাদের চোখ ঝলসে যায়। কিছুদিন আগেই এইরকম একটা ব্যাপার হয়েছিল। দশ-এগারো জন লোকের চোখ ঝলসে গেছে—

লম্বা লোকটি বলল, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করিনি, কারণ খবর নিয়ে জানলুম তারা ডাকাত।

বেঁটে লোকটি বলল, মানুষের মধ্যে আমরা ঘোরাফেরা করলেও কেউ আমাদের চিনতে পারে না। আপনি চিনতে পেরেছেন, কারণ আপনার চোখটা অন্যরকম।

লম্বা লোকটি বলল, আরও দু'একজন চিনতে পেরেছে। ফরাসি দেশে একজন লোকের চোখ আপনার মতন। কিন্তু তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি—লোকে তাকে পাগল ভেবেছে।

বেঁটে লোকটি বলল, আপনিও যেন আমাদের কথা কারুকে বলবেন না। তাহলে সবাই পাগল বলবে কিন্তু।

হঠাৎ উত্তেজনায় সুজয়ের চোখ-মুখ লাল হয়ে এল। সেই জরুরি কথাটা মনে পড়ে গেছে। সে চিৎকার করে বলল, সেই কর্নেল? সেই কর্নেলের কি হল?

বেঁটে লোকটি বলল, কর্নেল? সে আবার কে?

—হাসপাতালে যাকে আপনারা অদৃশ্য করে দিলেন?

লম্বা লোকটি খুব গম্ভীরভাবে বলল, সেই লোকটি খুব খারাপ কাজ করেছিল, সে আমার গায়ে হাত দিতে এসেছিল।

বেঁটে লোকটি বলল, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন তো, আমরা এখানে কোনও মানুষের গা-ছুঁই না।

সুজয় বলল, কর্নেলকে মেরে ফেলবেন না। ওকে বাঁচিয়ে দিন।

লম্বা লোকটি বলল, না, না, মারবো কেন? আমার গা-ছুঁয়ে ফেললেই বরং তাকে বাঁচানো যেত না। সুজয়বাবু, আপনি চোখ বুজুন। এবার হাসপাতালটার কথা ভাবুন! —কি দেখছেন?

সুজয় দেখল, হাসপাতালের দোতলার সিঁড়ির কাছে কর্নেল সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ বোজা। ঠিক যেন জেগে জেগে ঘুমোচ্ছেন। দু-তিনজন লোক অবাক হয়ে চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

সুজয় চোখ খুলতেই বেঁটে লোকটি বলল, সব ঠিক আছে তো?

সুজয় বলল, হ্যাঁ!

লম্বা লোকটি বলল, এবার আমরা চলি!

সঙ্গে সঙ্গে তারা হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। সুজয় তাদের আর কিছু জিগ্যেস করার সুযোগ পেল না।

সুজয় হোটেলে ফিরে দেখল তখনও কারুর ঘুম ভাঙেনি। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সিঁড়ি দিয়ে সে পা টিপে-টিপে ওপরে উঠল। আস্তে-আস্তে নিজের ঘরের দরজা ফাঁক করে দেখল, রাণা আর খোকন তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সুজয় খাটে ওঠার সময় একটা ক্যাঁচ করে শব্দ হল, তাতেও ওরা জাগল না। চাদরটা গায়ে টেনে শুয়ে পড়ল সুজয়।

সেই যে ঘুমিয়ে পড়ল, কিছুতেই আর তার ঘুম ভাঙে না। রাণা আর খোকন বার বার তাকে ডাকাডাকি করল, সুজয় চোখই খোলে না। মা এসে বললেন, এই জয়, ওঠ ওঠ। খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সুজয় ঘুমের ঘোরে বলল, আমি খাব না।

ঝর্ণা এসে বলল, খাবি না, খাবি না! উঠে চোখ-মুখ ধুয়ে নে। সকালে একটু বেড়াতে বেরুব। আজ বিকেলেই আমাদের জলগাঁও ফিরতে হবে।

সুজয় চোখ বুজেই বলল, আজ আমাদের ফেরা হবে না।

আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সবাই অবাক। সুজয় তো কোনওদিন এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় না। সে বরং ভোরে ওঠে সকলের আগে।

মা বললেন, আচ্ছা আর একটু ঘুমোক। ন'টার সময় ডাকলেই হবে।

ঝর্ণা কিন্তু খুব কড়া। সে বলল, কেন ঘুমোবে, এতক্ষণ ঘুমন খুব খারাপ অভ্যেস!

ঝর্ণা খানিকটা জল এনে ছিটিয়ে দিল সুজয়ের মুখে। খোকন ওর পায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

সুজয় তবু জাগলো না, আঃ বলে পাশ ফিরে শুলো।

তখন রাণা আর খোকন দুদিক থেকে দু-হাত ধরে ওকে টানতে-টানতে তুলল বিছানা থেকে। হাঁটিয়ে নিয়ে এল বারান্দায়। সুজয় ওদের সঙ্গে হাঁটছে বটে, কিন্তু চোখ খুলছে না।

ঝর্ণা এবার বকুনি দিয়ে বলল, এই, কি হচ্ছে কি? বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?

সুজয় বলল, আমার চোখ জ্বালা করছে, চোখ খুলতে পারছি না।

মা অমনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, কেন, চোখে কি হয়েছে? দেখি তো!

চোখ খোলার পর দেখা গেল, সুজয়ের চোখ দুটো সত্যিই খুব লাল। অনেক জলের ঝাপটা দিয়ে খানিকটা ঠিক হল। ঝর্ণা বলল, এবার কলকাতায় ফিরে মা তুমি সুজয়কে কোনও চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেও। ও বরাবরই চোখে একটু কম দেখে।

এই কথা শুনে সুজয় মনে-মনে হাসল। সে চোখে মোটেই কম দেখে না, অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি দেখে। কোনো ডাক্তারই সেটা বুঝতে পারবে না।

কাল রাত্তিরে যে সুজয় বাইরে বেরিয়েছিল সে-কথা কারুকে বলল না। বাবা, মা ছোড়দি তা হলে ভীষণ বকবেন। কিন্তু দুপুরবেলাতেই সব জানাজানি হয়ে গেল।

বাবা ঠিক করেছেন, সেদিন বিকেলেই জলগাঁও ফিরবেন। সেই জন্য সকালের দিকে সবাই আর একবার ইলোরার দিকে বেড়াতে যেতে চায়। তাছাড়া সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমাধিটাও এখনও দেখা হয়নি। রাণা, খোকন একেবারে জুতো মোজা পড়ে রেডি। সুজয়ের তখনও জলখাবার খাওয়াই শেষ হয়নি। সে বললে, আমার আজ বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে না। তোমরা ঘুরে এসো; আমি এখানে থাকি।

তাই ঠিক হল, সবাই বেরিয়ে যেতে সুজয় আবার গিয়ে গুটি-গুটি শুয়ে পড়ল বিছানায়। কেন যে তার এত ঘুম পাচ্ছে কে জানে!

দুপুরবেলা ওরা সবাই ফিরে এসে সুজয়কে আবার ডেকে তুলল। সুজয়ের ঘুমকাতুরেপনা নিয়ে খুব হাসাহাসি করল রাণা আর খোকন। সুজয় তাড়াতাড়ি চলে গেল চান করতে।

ওরা দুপুরের খাওয়া সবে মাত্র শেষ করেছে, এসেই সময় বাইরে একটা জিপ গাড়ি থামল। আর দুজন মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে নামলেন কর্নেল চেতন সিং।

কর্নেল চেতন সিং-এর চেহারা দেখে সুজয় হাসবে কি কাঁদবে—ঠিক করতে পারল

না। এক রাত্তিরেই কর্নেলের চেহারাটা কিরকম বদলে গেছে। অত সুন্দর চেহারা ছিল কর্নেলের, এখন তার চোখ দুটো বেশ ট্যারা, চুলের রং-ও কীরকম খয়েরি হয়ে গেছে! কর্নেল বোধহয় সকাল থেকে আয়ানায় নিজের মুখ দেখেন নি।

ঝর্ণা বলল, কর্নেলের চেহারাটা কীরকম বদলে গেছে মনে হচ্ছে!

সুজয় চুপ করে রইল। কাল সেই অদ্ভুত লোক দুটো কর্নেল সাহেবকে একবার অদৃশ্য করে দিয়েছিল। ফিরিয়ে আনার সময় হুবহু চেহারাটা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। সেই কথা মনে পড়ায় সুজয়েরও বুক টিপটিপ করতে লাগল। সুজয়কেও তো একবার অদৃশ্য করা হয়েছিল—তার কিছু বদলে যায়নি তো? না, বদলায়নি বোধহয়। তাহলে মা কিংবা ছোড়দি নিশ্চয়ই লক্ষ করতেন। তবু সুজয় এক ছুটে চলে গেল আয়নায় মুখ দেখতে।

কর্নেল সাহেবের মুখখানা খুব গম্ভীর। তিনি বাবাকে বললেন, মিঃ মুখার্জি, আপনার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে।

কর্নেল আর দুজন অফিসার বাবার ঘরে দরজা বন্ধ করে কি সব কথা বলতে লাগলেন।

একটু বাদেই বাবা দরজা ফাঁক করে ডাকলেন, জয়? জয় কোথায় গেল?

সুজয় জানতো যে তার ডাক পড়বেই। সে গুটি গুটি এগিয়ে গেল। ঝর্ণাও আসছিল সুজয়ের সঙ্গে। বাবা তাকে বললেন, তুই বাইরে থাক। ওঁরা জয়ের সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চান।

সুজয় ভেতরে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াল।

বাবা রীতিমত অবাক ভাবে বললেন, এ সব কী শুনছি? কাল রাত্তিরে তুই কোথায় গিয়েছিলি?

সুজয় এই ভয়টাই পাচ্ছিল। বাবার সামনে সে কিছুতেই মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। অথচ কি করে সব কথা বলবে? সেই লোক দুজন যে এ-সব কথা বলতে বারণ করেছে!

কর্নেল নিজেই উত্তেজিতভাবে ইংরেজিতে বললেন, মিঃ মুখার্জি আপনি কিছুই জানেন না? কাল মাঝরাত্তিরে আপনার ছেলে দুজন লোক নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল। আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। সেই লোক দুটো কে?

বাবা সুজয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কাল রাত্তিরে বাইরে বেরিয়েছিলি?

সুজয় আস্তে আস্তে বলল, হ্যাঁ। আমার দুজন বন্ধু আমাকে ডেকেছিল —

বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, তোর দুজন বন্ধু? এখানে তোর বন্ধু এল কি করে? মাঝরাত্তিরেই বা তারা ডাকবে কেন?

দুজন মিলিটারি অফিসারের মধ্যে একজন খসখস করে কি লিখে যাচ্ছিলেন। আর একজন হাত তুলে বাবাকে থামিয়ে দিয়ে সুজয়কে খুব মিষ্টিভাবে জিগ্যেস করলেন, সেই লোক দুজন কে?

সুজয় বলল, এমনিই দুজন লোক—

—তারা কোথায় থাকে?

—তা তো জানি না।

কর্নেলসাহেব টেবিলে থাপ্পড় মেরে চেঁচিয়ে বললেন, জানতেই হবে! সেই লোক দুটোকে খুঁজে বের করতেই হবে। তারা কে? প্রীতমকুমারীর সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক? তোমার সঙ্গে তাদের কি করে দেখা হল?

সুজয় বলল, হঠাৎ দেখা হয়েছিল।

কর্নেল বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে চলো। তাদের আজই খুঁজে বার করা চাই। পুলিশকে বলা আছে।

সুজয় মাথা নেড়ে বলল, আপনারা তাদের খুঁজে পাবেন না। তা ছাড়া এক্ষুনি খুব জোরে বৃষ্টি নামবে।

সবাই দারুণ অবাক হয়ে সুজয়ের দিকে তাকাল।

সুজয় বুঝতে পারল, বৃষ্টির কথাটা তার বলে ফেলা ঠিক হয়নি। বাইরে খটখট করছে রোদ, ঝকঝক করছে নীল আকাশ। কোথাও একছিটে মেঘও নেই। শীতকালে এসব জায়গায় কোনওদিন বৃষ্টি হয় না।

সুজয়ের বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'একটু বাদে বৃষ্টি হবে? তার মানে কি? তুই কি করে জানলি?

সুজয় কোনও উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলল, সকালবেলা আমি একটু মেঘ দেখেছিলাম।

—সকালবেলায় মেঘ দেখেই বলা যায় বিকেলে বৃষ্টি হবে?

সুজয় আর বাহাদুরির লোভ সামলাতে পারল না। সে বলল, আমি বলছি, দেখো ঠিক বৃষ্টি হবে। এখন ক'টা বাজে। ঠিক সাড়ে চারটে বাজলেই ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে।

বাবা তার ছেলের দিকে গোল গোল চোখ করে তাকালেন। ঘরের সবাই প্রায় এক মিনিট চুপ করে চেয়ে রইল। তারপর বাবা বললেন, তুই এসব কি বলছিস? তুই কি করে জানলি?

কর্নেলসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার কি মনে হচ্ছে না—আপনার ছেলে বেশ অদ্ভুত ব্যবহার করছে? ওর নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। রাত্তিরবেলা আপনাদের কিছু না বলে ও বেরিয়ে গিয়েছিল, দুজন অদ্ভুত লোকের সঙ্গে ও ঘুরেছে। এসব কি ব্যাপার?

অন্য যে মিলিটারি অফিসারটি সব কথা লিখে নিচ্ছিলেন, তিনি বললেন, সময় নষ্ট করে লাভ কি? চলুন, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া দরকার। লোক দুটিকে তো খুঁজে বার করা দরকার।

তিনি বাবার দিকে ফিরে বললেন, আপনার ছেলেকে যদি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাই আপনার কোনও আপত্তি আছে?

বাবা ভাবছিলেন, এরা চলে গেলে তিনি সুজয়কে নিয়ে জেরা করতে বসবেন। তাঁর ছেলে তো এরকম অদ্ভুত কাজ কখনও করেনি। সবাই তাঁর ছেলের প্রশংসা করে।

তিনি কোনও উত্তর দেবার আগেই সুজয় বলল, আমি তো জানি না সেই দুজন লোক কোথায় থাকে?

—ওদের সঙ্গে কি করে তোমার বন্ধুত্ব হল?

—মানে, এমনি হঠাৎ দেখা হয়েছিল, মানে, ওরা আমার ঠিক বন্ধু না।

—ওদের নাম কি?

—জানি না তো?

—নাম জানো না, কোথায় থাকে তাও জানো না, অথচ তুমি রাতদুপুরে তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে?

সেই মিলিটারি অফিসারটি সুজয়ের পিঠে হাত দিয়ে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা তাদের ঠিকই খুঁজে বার করব। এ আমাদের সঙ্গে চলুক। এ ছাড়া তো আমরা কেউ সেই দু-জনকে চিনতে পারব না। কর্নেলসাহেবও তো মাত্র একটুখানি দেখেছেন।

সুজয় বাবার পাশ ঘেঁষে সরে এসে বলল, আমি যাব না।

—যাবে না কেন? তুমি ভয় পাচ্ছ?

—ওদের দু-জনকে খুঁজে পাওয় যাবে না।

কর্নেলসাহেব দারুণ রেগে উঠলেন। চোখ দুটো আরও বেশি ট্যারা করে বললেন, পাওয়া যাবে না মানে? সমস্ত ইন্ডিয়া তন্নতন্ন করে খুঁজতে হলেও আমি তাদের ঠিক খুঁজে বার করব। ওরা আমার কাছে ম্যাজিকের খেলা দেখাতে এসেছে!

বাবা বললেন, কর্নেলসাহেব, আপনার চেহারাটা অন্যরকম দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ?

কর্নেলসাহেবের রাগ দপ করে নিভে গেল। ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখখানা। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, তা হলে কি সত্যি? তাহলে কি সত্যি? আমার চেহারা সত্যিই বদলে গেছে?

অন্য দুজন মিলিটারির লোক মুখ টিপে একটু হাসলেন। বাবা বললেন, একটু যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে!

কর্নেলসাহেব ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, আমি আয়নায় দেখে ভাবলাম—আমার চোখের ভুল। কিংবা আয়নাটা খারাপ হয়ে গেছে। সত্যি কি এরকম হতে পারে? আমার চোখ রাণা প্রতাপের মতন সুন্দর ছিল। সেই চোখ—

বাবা বললেন, আপনার চুলের রংও তো—

কর্নেল কান্না-কান্না গলায় বললেন, আমার চুল ছিল কুচকুচে কালো। সবাই দেখেছে—

কর্নেল আবার উঠে এসে সুজয়ের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, তোমার বন্ধুরা আমায় এরকম করেছে?

সুজয় বলল, জানি না তো?

—চলো; এক্ষুনি চলো। তাদের ধরে আমি গুলি করে মারব।

ওই লোক দু'টিকে সুজয়ের খারাপ লাগেনি একটুও। প্রীতমকুমারীকে বাঁচাবার কত চেষ্টা করেছিল। সুজয়ের সঙ্গে সব সময় কি সুন্দরভাবে কথা বলেছে। যদিও সুজয় জানে, ওদের ধরার সাধ্য কারুর নেই। ওরা তো ইচ্ছে করলেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে —সুজয় নিজের চোখে দেখেছে। তবু মিলিটারির লোক যদি আচমকা ওদের দু-জনকেই

পেছন থেকে ধরে চোখ বেঁধে দেয়? তখন ওরা ভাববে, সুজয়ই ওদের ধরিয়ে দিতে নিয়ে এসেছে।

সুজয় বলল, আমি যাব না।

কর্নেল সাহেব তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললেন, তোমাকে যেতেই হবে।

বাবা বললেন, তুই যেতে চাইছিস না কেন? চল আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

সুজয় কিছুতেই যেতে চায় না। ওঁরা অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। সুজয় ঘরের কোণে সরে দাঁড়িয়ে শুধু বলতে লাগল, আমি যাব না, আমি যাব না।

বাবা তখন বললেন, সেই লোক দুটোকে তুই ছাড়া আর কেউ দেখেনি? রাণা কিংবা খোকন?

সুজয় বলল, ছোড়দি দেখেছে!

বাবা তক্ষুণি দরজা খুলে ডাকলেন, ঝর্ণা, ঝর্ণা!

ঝর্ণা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে ঘরে আসতেই কর্নেল সাহেব বললেন, মিস মুখার্জি, আপনার ছোট ভাইয়ের দুজন বন্ধু—একজন লম্বা আর একজন বেঁটে—আপনি তাদের দেখেছেন?

ঝর্ণা সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, কারা রে? সেই যে—

সুজয় বলল, হ্যাঁ, সেই যে, অজন্তা পাহাড়ে দেখেছিলে না?

ঝর্ণা বলল, ও, সেই লোক দুটো? কেন, কি করেছে তারা?

কর্নেল জিগ্যেস করলেন, আপনি তাদের দেখলে আবার চিনতে পারবেন?

ঝর্ণা একটু অহংকারের সঙ্গে বলল, একবার কারুর সঙ্গে আলাপ হলে আমি তাদের কক্ষণ ভুলি না।

—তা হলে আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। আপনার বাবাও যাচ্ছেন।

—আপনার চোখে কি হয়েছে?

কর্নেলসাহেব হাত দিয়ে নিজের মুখটা চাপা দিয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, সে পরে শুনবেন। বেরিয়ে পড়া যাক। আপনার কি তৈরি হতে সময় লাগবে?

ঝর্ণা বলল, না, আমি তো তৈরিই আছি। আমি এক্ষুনি বেরুতে পারি।

—চলুন তাহলে।

সুজয় বলল, ছোড়দি যেও না। একটু বাদেই দারুণ ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে কিন্তু বলে দিচ্ছি!

কর্ণেল সাহেব এবার সুজয়কে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললেন, শাট আপ! তুমি আমাদের অনেক বিরক্ত করেছ। অনেক বাজে কথা বলেছ। এখন চুপ করে বসে থাকো।

সুজয় আর কিছু বলল না। ওরা সবাই মিলে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই সত্যি সত্যিই সোঁ-সোঁ করে ঝড় উঠল। কোথা থেকে কালো-কালো মেঘ এসে ছেয়ে ফেলল আকাশ। চারিদিক অন্ধকার করে বইতে লাগল ধুলোর ঝড়। সেইসঙ্গে বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি।

মা জানলা বন্ধ করতে এসে দেখলেন, সুজয় জানলা দিয়ে বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বৃষ্টির দাপটে মনে হচ্ছে আকাশ ভেঙে পড়ছে। দারুণ হাওয়ায় চারিদিক ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেছে। এখানে সেখানে দরজা-জানলায় আওয়াজ হচ্ছে ঠকাস-ঠকাস করে। কোথায় যেন একটা টিনের চাল উড়ে গেল। মনে হচ্ছে, গাছপালা ভেঙে পড়বে, ঘরবাড়ি সব ভেসে যাবে।

মা এসে সুজয়কে বললেন, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? সরে আয়, জানলা বন্ধ করে দিই।

সুজয় বলল, বাবা আর ছোড়দি এই বৃষ্টির মধ্যে বেরুল! কি হবে বল তো?

মা বললেন, এ বৃষ্টি আর কতক্ষণ হবে। অসময়ের বৃষ্টি, একটু বাদেই থেমে যাবে।

সুজয় বলল, না মা। এ বৃষ্টি সহজে থামবে না। আমি কত করে বললাম, এক্ষুণি খুব বৃষ্টি হবে, বেরিও না!

—তুই কি করে জানলি যে বৃষ্টি হবে?

—আমি জানতাম। তোমরা তো আমার কথা বিশ্বাস করো না!

মা সুজয়ের কথা শুনে কি বুঝলেন কে জানে। তিনি একদৃষ্টে তাকিয় রইলেন ছেলের দিকে। তারপর ওর মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, তোর বাবা তোর ওপর খুব রেগে গেছেন। তুই নাকি কাল রাত্তিরে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলি?

সুজয় বলল হ্যাঁ।

—এ কি সাংঘাতিক কথা! তোকে কেউ ডেকেছিল? কক্ষনো রাত্তিরে কেউ ডাকলে বেরুতে নেই। নিশি ডাকলে কি হয় জানিস?

সুজয়ের সারা শরীরটা একবার কেঁপে উঠল। কাল রাত্তিরে সে একবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তারপর যদি ওরা তাকে আবার ফিরিয়ে না আনত? তাহলে মা-বাবা এতক্ষণ কি করতেন? মা সুজয়ের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন। সব মায়ের গায়েই একটা মা-মা গন্ধ আছে। তাতে মনটা কি রকম নরম হয়ে যায়। যে কথা সুজয় কাউকে বলেনি, এখন সেটা মাকে বলে ফেলল।

মাকে জড়িয়ে ধরে সুজয় বলল, মা তোমাকে একটা কথা বলব? তুমি আর কাউকে বলবে না বলো?

মা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, কি রে?

—আমার সঙ্গে না দুজন দেবতার দেখা হয়েছিল!

—সে কি রে?

—হ্যাঁ মা সত্যি। ওঁদের ছায়া পড়ে না, গা দিয়ে রক্ত পড়ে না। ওঁরা মানুষকে অদৃশ্য করে দিতে পারে।

মায়ের মুখটা শুকিয়ে গেল। মায়েদের মন সব সময় বিপদের আশঙ্কা করে। সুজয় কোনও দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়েনি তো? আজকাল তো পথেঘাটে চোর জোচ্চার গিসগিস করছে।

মা বললেন, কি করে তাঁদের সঙ্গে দেখা হল? তারা কারা?

—তারা দেবতা। তারা এই পৃথিবীর কেউ না, আকাশ থেকে এসেছে। আচ্ছা মা, দেবতারা কি কাঁদে? আমি ওদের কাঁদতে দেখেছি!

মা বললেন, এসব কি বলছিস তুই? দেবতাদের কি এমনি এমনি দেখা পাওয়া যায়?

—কেন পাওয়া যাবে না? তুমি সেই যে একটা গল্প বলতে, একটা ছেলে রোজ দীনবন্ধু দাদাকে ডাকত। তারপর একদিন দীনবন্ধু দাদা সত্যিই এসে দেখা দিলেন।

মা একটু থতমত খেয়ে গেলেন। কী যে বলবেন, বঝুতে পারলেন না। তিনি ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু ঠাকুর-দেবতার দেখা পাওয়াটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি বললেন, সে তো আগেকার দিনে দেখা পাওয়া যেত। এখন পৃথিবী পাপে ভর্তি হয়ে গেছে, এখন কি আর দেবতারা আসেন!

সুজয় জোর দিয়ে বলল, না মা, তুমি জানো না। দেবতারা এখনো এসে আমাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। লোকে তাঁদের চিনতে পারে না।

—তা হলে তুই চিনলি কি করে?

—আমার চোখ যে অন্য রকম। তোমরা তো বিশ্বাস করো না। দেবতারাও বলেছেন, আমার চোখ অন্য রকম। আমি যে ওঁদের অলৌকিক রূপ দেখতে পেলাম।

মা তবুও খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, সেই দেবতারা তোকে বলে দিয়েছেন যে আজ বৃষ্টি হবে?

—হ্যাঁ, ওঁরাই তো বলেছেন। তুমি জানো না মা, যেদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হয়, সেদিন দেবতারাই সেটা ইচ্ছে করে তৈরি করেন। এখন বুঝতে পারলে তো, খবরের কাগজে আবহাওয়ার খবর কেন মেলে না? যেদিন লেখে খুব বৃষ্টি হবে, সেদিন খটখটে রোদ থাকে। তারা তো দেবতাদের খবর রাখে না। দেবতাদের যখন রকেট নামে—সেই সময় ঝড়বৃষ্টি হয়।

মা বললেন, তোর চোখমুখ বড্ড শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। তোর কি শরীর খারাপ হয়েছে?

—না তো।

মা সুজয়ের কপালে হাত ছুঁইয়ে বললেন, গা-টা গরম-গরম লাগছে। জ্বর আসছে নাকি! এই ঠান্ডার মধ্যে জানলার পাশে দাঁড়াসনি, সরে আয়। সুজয় বলল, মা, আমি একটা জিনিস দেখবার চেষ্টা করছি, কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না।

—এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কি দেখবি?

—দেখতে চেষ্টা করছি, ছোড়দি আর বাবা এখন কি করছে। ওদের কিছু হল কিনা।

—ওরা তো অনেক দূরে চলে গেছে, তুই দেখবি কি করে?

—আমি এক এক সময় দেখতে পাই।

বলতে-বলতেই সুজয় মাকে জড়িয়ে ধরল। খুব ভয়-পাওয়া গলায় চেঁচিয়ে বলল, মা, মা, সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হয়েছে। বাবাদের গাড়ি উলটে গেছে। শিগগিরই যেতে হবে আমাকে।

মায়ের বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। সুজয় এসব কি বলছে? এতদিন পরে তিনি নিজের ছেলের কথাও বুঝতে পারছেন না!

সুজয়কে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, তুই বলছিস কি? তুই দেখতে পাচ্ছিস?

সুজয় বলল, হ্যাঁ মা, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বাবাদের গাড়ি উলটে গেছে। ওদের খুব বিপদ। আমাদের এক্ষুনি যেতে হবে।

মা প্রায় কেঁদেই ফেললেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, কি সর্বনাশের ব্যাপার! কি হবে তা হলে?

ততক্ষণে চেঁচামেচি শুনে রাণা আর খোকন এসে গেছে। সুজয় ওদের বললে, বাবাদের গাড়ি উল্টে গেছে। আমাদের সাহায্য করতে যেতে হবে।

খোকন তক্ষুনি রাজি। সে বলল, রাণা এখানে থাক। তুই আর আমি যাই।

রাণা থাকতে রাজি নয়। সে বলল, আমিও যাব!

মা তাড়াতাড়ি ওদের বাধা দিয়ে বললেন দাঁড়া-দাঁড়া! তোরা কোথায় যাবি এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে?

সুজয় বলল, ঝড়বৃষ্টিতে আমাদের কিছু হবে না!

সুজয়ের বাবা এবং ঝর্ণার বিপদের কথা শুনে মা খুব ভয় পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এইরকম সময়ে ছেলেদেরই বা বাইরে পাঠাবেন কি করে? মা একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলেন।

খোকন বলল, আগে এক কাজ করলে হয় না? হোটেল থেকে থানায় একটা ফোন করব? অ্যাকসিডেন্ট হলে ওরা নিশ্চয়ই জানবে।

মা বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই তো ভালো। চল তো!

সবাই দৌড়োলো ম্যানেজারের ঘরের দিকে।

হোটেলে একটিই মাত্র টেলিফোন, সেটা থাকে ম্যানেজারের ঘরে। তিনি আবার সেটাকে তালাবন্ধ করে রাখেন। ওরা এসে দেখল টেলিফোন তালা বন্ধ। তিনি ঘরে নেই।

সুজয় আর খোকন চেঁচামেচি করে ডাকতে লাগল ম্যানেজারকে। একজন বেয়ারা এসে বলল, ম্যানেজারবাবু ঘুমোচ্ছেন। মা তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, কেন ঘুমোচ্ছেন? এটা কি ঘুমোবার সময়? শিগগির ডেকে নিয়ে এসো তাকে।

ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, কি হয়েছে? কি ব্যাপার?

মা তাঁকে বললেন, এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, আর আপনি এখন ঘুমোচ্ছেন?

—কি কান্ড হয়েছে?

—এ রকম ঝড়বৃষ্টি!

—ঝড়বৃষ্টি কি টেলিফোন করে থামাবেন?

—আঃ, সে কথা হচ্ছে না। একটা দারুণ অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

—কোথায়? আপনারা কি করে জানলেন?

খোকন বলল, আমরা পয়সা দিয়ে টেলিফোন করব, আপনি শুধু-শুধু দেরি করিয়ে দিচ্ছেন কেন?

থানায় টেলিফোন করতেই তারা বলল, আমরা এইমাত্র মিলিটারি থেকে ওয়ারলেসে খবর পেলাম, একটা গাড়ি উলটে গেছে। তাতে দুজন কর্নেল আর একজন অফিসার ছিলেন।

মা জিগ্যেস করলেন, তাতে মিঃ মুখার্জি বলে এক ভদ্রলোক আর একটি মেয়ে ছিল না?

—তা ঠিক বলতে পারছি না।

—অ্যাকসিডেন্টটা 'কোথায় হয়েছে? কোন জায়গায়?

সুজয় একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে আপনমনে বলল, সেই জায়গাটায় রাস্তার পাশে একটা খাদ আছে। তার পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট নদী যাচ্ছে। একটা মস্ত বড় গাছ কাত হয়ে আছে।

খোকন জিগ্যেস করল, তুই কি করে জানলি রে!

সুজয় গম্ভীরভাবে বলল, আমি জানি।

মা টেলিফোনে আবার বললেন, আমরা এক্ষুনি সেখানে যেতে চাই! কর্নেলরা আমাদের এখানেই এসেছিলেন। আমার স্বামী আর মেয়েকে নিয়ে গেছেন। আপনারা গাড়ি পাঠান।

—আপনারা এখন কি করে যাবেন! অপেক্ষা করুন; আমরা একটু বাদে আবার খবর পাঠাব।

মা টেলিফোনটা রেখে দিয়ে ম্যানেজারকে বললেন, আপনি খবরদার টেলিফোনে এখন তালা লাগাবেন না। ঘুমোতেও যেতে পারবেন না। আমরা এখন এখানেই বসে থাকব।

খোকন বলল, যাব না আমরা? সুজয় তো জায়গাটা চেনে?

মা বললেন, না, এখানে থাকো সবাই। এক্ষুনি আবার খবর আসবে।

সুজয় আবার মনে মনে ভাবতে লাগল, সেই লোক দুজন, তারা দেবতা হোক বা না হোক, তারা ভালো লোক। তারা তো কারুর ক্ষতি করতে চায় না। বাবা, ছোড়দি, কর্নেলরা বিপদে পড়লেন, ওরা কি সাহায্য করবে না?

ওরা এই বৃষ্টি তৈরি করেছে, বৃষ্টির জন্যই তো এরকম বিপদ হল। এখন বৃষ্টি থামিয়ে দেওয়া উচিত।

সুজয় আবার জানলার কাছে গিয়ে দেখবার চেষ্টা করল, সেই লোক দু'জন এখন কোথায় আছে। এখন একবার তাদের দেখা পাওয়া গেলে খুব ভালো হতো।

ওরা বলেছিল, মানুষের মনের শক্তি অসাধারণ। মনে-মনে খুব করে ওদের কথা ভাবলে কি ওদের দেখা পাওয়া যাবে না?

সুজয় অনেক করে ভাবল ওদের কথা। মনে-মনে খুব ডাকতে লাগল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। কাল রাত্রে সুজয় কত দূরে মাঠের মধ্যে অন্ধকারে ওদের দেখতে পেয়েছিল। তখন সুজয়ের মনে পড়ল, এই সময়ে ওদের দেখতে পাওয়া যাবে না বলেই তো ওরা ঝড়বৃষ্টি তৈরি করেছে। তাই তো!

বৃষ্টি কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগল। একটু বাদেই ঝড়-বৃষ্টি একসঙ্গে থেমে গেল। আকাশ একেবারে পরিষ্কার।

মা আবার থানায় টেলিফোন করলেন। থানা থেকে বলল, এখনো নতুন কোনও খবর পাওয়া যায়নি। আমাদের দুটো গাড়ি গেছে ওদিকে।

সুজয় খোকনের হাত ধরে টেনে বলল, চল তো! মা, তুমি থাকো, আমরা চললাম।

মা আর বাধা দেবার সুযোগ পেলেন না। তার আগেই সুজয় আর খোকন বাঁই বাঁই করে বেরিয়ে গেল। রাণা একটুখানি এদিক-ওদিক করে বলল, দেখে আসি তো ওরা কোথায় গেল!

রাণাও বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। ওরা দুজনে তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। রাণা খুব জোরে ছুটে ওদের ধরে ফেলল।

সুজয় ছুটছে তো ছুটছেই। খোকন একসময় বলল, আর কত দূর?

সুজয় বলল, তা জানি না।

কুকুর যেমন গন্ধ শুঁকে-শুঁকে একদিকে দৌড়োয়, সুজয়ও অনেকটা সেইভাবে দৌড়োচ্ছে।

তারপর এক সময় দেখা গেল, এক জায়গায় কয়েকখানা গাড়ি আর কিছু পুলিশের ভিড়। সেখানে ঠিক রাস্তার পাশে একটা খাদ, তার পাশে নদী, হেলেপড়া গাছ—সেই গাছের সঙ্গে আটকে আছে কর্নেল সাহেবের গাড়ি।

সুজয়রা যখন এসে পৌঁছল, তখন ওই গাড়ির সকলকে একটা অ্যামবুলেন্স-এ তোলা হয়েছে। আর একটা গাড়িও সঙ্গে-সঙ্গে যাবে। সুজয়রা সেই গাড়িটাতে উঠে বসল। বাবা ও ছোড়দিকে দেখতে পেল না।

খুব জোরে গাড়ি দুটো এসে থামল হাসপাতালের সামনে। এই সেই হাসপাতাল, যেখানে কালকে রাত্তিরেই প্রীতমকুমারী মারা গেছে। সুজয়ের বুক ছম ছম করতে লাগল।

কর্নেলসাহেব, তাঁর সঙ্গে অন্য দুজন মিলিটারি অফিসার, সুজয়েব বাবা এবং ঝর্ণা পাশাপাশি শুয়ে আছে হাসপাতালের খাটে। দু-জনেই অজ্ঞান। কারুর গায়ে কোনও আঘাত লাগেনি, কোনও জায়গা থেকে রক্ত বেরোয়নি, কিন্তু জ্ঞান ফিরছে না।

প্রীতমকুমারীকে দেখবার জন্য যেসব ডাক্তার এসেছিলেন, তাঁদের কয়েকজন এখনও রয়ে গেছেন। তাঁরাই ছুটে এলেন আবার। ঝড়বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। আকাশ পরিষ্কার।

সুজয়, খোকন আর রাণাকে একবার মাত্র ঘরে ঢুকে দেখতে দেওয়া হয়েছিল, তারপর তাদের বাইরে থাকতে বলা হয়েছে। সুজয়ের মাকে খবর পাঠানো হয়েছে, তিনি একটু বাদেই এসে পড়বেন এখানে।

সুজয় হাসপাতালের বারান্দায় এসে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। সেই লোক দু'টি বলেছিল, ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই তাদের রকেট উড়ে যাবে। এতক্ষড়ে নিশ্চয়ই অনেক দূরে চলে গেছে। তবু সুজয় চেষ্টা করছে, যদি একটুও দেখা যায়। ওরা কি আর ফিরে আসবে না?

খোকন জিগ্যেস করল, হ্যাঁ রে জয়, তুই কী করে তখন বললি যে, পিসেমশাইদের গাড়িতে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে!

সুজয় গম্ভীরভাবে বলল, আমি দূর থেকে অনেক জিনিস দেখতে পাই।

—তুই কি জ্যোতিষী হয়েছিস নাকি?

—জ্যোতিষীদের থেকেও আমি বেশি দেখতে পাই।

—আচ্ছা, তুই কত দূর অবধি দেখতে পাস? তুই বলতে পারিস, জলগাঁওতে বাবা আর মা এখন কি করছে?

—হ্যাঁ পারি।

—বল তো!

সুজয় হাত দুটো দু'দিকে ছড়িয়ে চোখ বুজল। ম্যাজিসিয়ানদের মতন ভঙ্গি করে এগিয়ে গেল কয়েক পা। তারপর চোখ খুলেই বলল, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোদের বাড়ির আলমারির চাবি হারিয়ে গেছে, মামাবাবু আর মামিমা সেটা খুঁজছেন। পাবেন না কিন্তু। কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি, চাবিটা পড়ে আছে বাথরুমের এক কোণে।

রাণা অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, সত্যি?

সুজয় বলল, কেন ক'টা বাজে দেখে রাখ। জলগাঁওতে গিয়ে মিলিয়ে দেখিস।

খোকন বলল, জয়টা যা গুল ঝাড়তে শিখেছে না!

সুজয় বলল, বললুম তো মিলিয়ে দেখিস। এখন ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা বাজে।

সুজয় এমন ভাবে বলল যে ওরা আর মুখের ওপর অবিশ্বাস করতে পারলো না। সুজয় অবশ্য এই কথাটা বানিয়েই বলেছে। জলগাঁও-এর দৃশ্য ও কিছুটা দেখতে পায়নি। সব সময় তো সে দূরের জিনিস দেখতে পায় না। এক-এক সময় হঠাৎ হঠাৎ শুধু মনের মধ্যে একটা ছবি ফুটে ওঠে। এখন সে অনেক চেষ্টা করেও কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ হাসপাতালের মধ্যে অনেক লোকের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল। ওরা দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে দেখল, পাঁচজনেরই একসঙ্গে জ্ঞান ফিরে এসেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, পাঁচজন ঠিক একসঙ্গে চোখ খুলে তাকিয়ে বলে উঠেছে—কি হয়েছে আমাদের?

কর্নেল চেতন সিং খাট থেকে তড়াক করে নেমে পড়লেন নিচে। চেঁচিয়ে বললেন, আমাদের তো কিছু হয়নি! আমাদের হাসপাতালে আনা হয়েছে কেন?

একজন ডাক্তার মৃদু গলায় জানালেন, আপনাদের গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।

—সে তো সামান্য অ্যাকসিডেন্ট! তার জন্য হাসপাতালে আনবার দরকার কি?

ঝর্ণা চোখ কচলাতে-কচলাতে উঠে বসে বলল, আমরা মরে যাইনি?

সুজয় এগিয়ে এসে বলল, কেন ছোড়দি? তোমাদের কি হয়েছিল?

ঝর্ণা বলল, আমি তো দেখলাম, আমাদের গাড়িটা ঝড়ে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে গেল রাস্তা থেকে। গাড়িটা হাওয়ায় ভাসছিল, তারপর যখন নিচে আছড়ে পড়তে লাগল, তখন আমি ভয়ে চোখ বুজলাম।

অন্য মিলিটারি অফিসারটি বললেন, আমিও তাই দেখছিলাম। কিন্তু গাড়িটা ওপর থেকে একেবারে নিচে পড়ে গেল, তবু আমাদের কারুর হাত-পা কিছুই ভাঙল না!

সুজয়ের বাবা বললেন, ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেছি।

কর্নেল চেতন সিং বললেন, আমরা একটা জরুরি কাজে যাচ্ছিলাম। এরকমভাবে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।

কর্নেল সাহেবের চোখ দুটো এখন আরও বেশি ট্যারা হয়ে গেছে। সেইজন্যই মুখখানা খুব রাগী-রাগী দেখাচ্ছে।

ডাক্তার বললেন, এখন আপনাদের কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। এখন আপনাদের বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

কর্নেল বললেন, ননসেন্স। আমাদের সকলেরই শরীর ঠিক আছে। সেই রহস্যময় লোক দুটোকে খুঁজে বার করতেই হবে। দেরি করলে তারা পালিয়ে যেতে পারে।

কর্নেল তারপরই সুজয়ের দিকে ফিরে বললেন, এই যে শোনো, তুমি কি করে আগে থেকে বললে যে, একটু পরেই বৃষ্টি হবে? কোনও বছরই এই সময় ঝড়বৃষ্টি হয় না?

সুজয় উত্তর না দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। সুজয়কে বাঁচিয়ে দিল সুজয়ের মা। তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রায় দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। তারপর যখন দেখলেন যে, তাঁর স্বামী এবং মেয়ে দু-জনেই ভালো আছে, গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি, তখন তিনি হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে পারলেন না। এর আগেই তিনি কালীঘাটে পুজো দেবার জন্য মানত করে ফেলেছিলেন। সবাই তাঁকে ঘিরে ধরল।

সুজয়ের মা বললেন, তোমরা এক্ষুনি হোটেলে ফিরে চলো। হাসপাতাল দেখলেই আমার ভয় করে।

কর্নেল বললেন, কিন্তু আমাদের যে এক্ষুনি কাজে বেরুতে হবে!

মা এক ধমক দিয়ে বললেন, আপনার কাজ আপনি করুন গে। ওরা কোথাও যাবে না এখন। যত অলক্ষুণে ব্যাপার!

পুলিশের গাড়ি ওদের সবাইকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল।

মা বললেন, আর এখানে আমার একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না বাপু। কাল ভোরবেলাতেই ফিরে চলো।

বাবা বললেন, সেই ভালো। আজ আর কারুর বেরিয়ে দরকার নেই।

মা জয়ের দিকে ফিরে বিশেষ করে বললেন, জয়, তুই একদম বেরুবি না কিন্তু। তা হলে কিন্তু মার খাবি আমার কাছে।

সুজয় বেরুল না বটে, কিন্তু অন্যদের সঙ্গেও থাকতে চাইল না। সে একা এসে দাঁড়াল বারান্দায়। একটু পরেই যেন দুটো পাখির ডানা-ঝাপটানোর মতন শব্দ হল। তারপরই সুজয় দেখল, তার কাছেই সেই লোক দুটি এসে দাঁড়িয়েছে।

সুজয় অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই তারা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, আস্তে। জয়বাবু, আপনার বাবা আর দিদি ভালো আছেন তো?

সুজয় বলল, হ্যাঁ, খুব ভালো আছে। আপনারা চলে যাননি?

লম্বা লোকটা বলল, না, যাওয়া হয়নি। আমাদের রকেটে একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে। রাত্তিরের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।

বেঁটে লোকটা বলল, সেই ফাঁকে আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে এলাম। আমাদের কথা কাউকে বলেননি তো?

—না, কিন্তু আপনারা চলে যাচ্ছেন—আর আসবেন না?

—অন্য কেউ আসবে। আমাদের আবার আসতে অনেক দেরি হবে। অনেক দূরে যেতে হবে তো!

—কত দূরে?

লম্বা লোকটি বলল, সে একটা শক্ত অঙ্কের মতন ব্যাপার। আপনি কি বুঝতে পারবেন? এক আলো-বছর কাকে বলে জানেন? এক বছরে আলো যতই দূরে যায়—তার মানে ১৮৬০০০×৬০×৬০×২৪×৩৬৫ মাইল। এরকম এক কোটি পনেরো লক্ষ আলো-বছর দূরে আমরা থাকি। এবার তাহলে হিসেব করুন!

এক বিরাট অঙ্ক শুনে সুজয়ের মাথা ঘুরে গেল। হিসেব করার কোনও চেষ্টাই করল না সে। তার আগেই সে চমকে উঠল। আবার তাদের হোটেলের দিকে দু-খানা মিলিটারি গাড়ি আসছে।

সুজয় বলল, সর্বনাশ, কর্নেলসাহেব আসছেন!

লম্বা লোকটি বলল, কর্নেলসাহেব আসছেন, তাতে সর্বনাশ হবে কেন?

সুজয় বলল, কর্নেলসাহেব আপনাদের দারুণভাবে খুঁজছেন। উনি আপনাদের ওপর খুব রেগে গেছেন।

—কেন?

—বাঃ, কর্নেলসাহেবের চোখ ট্যারা করে দিয়েছেন যে আপনারা!

বেঁটে লোকটি এই কথা শুনে খুব হাসতে লাগল। হাসতে-হাসতে বলল, তাই নাকি? চোখ ট্যারা হয়ে গেছে? কীরকম দেখাচ্ছে এখন?

—খুব বিচ্ছিরি!

—ইস, তাহলে তো খুব দুঃখের কথা! আমি আবার ঠিক করে দিতে পারি।

লম্বা লোকটি হাত তুলে বলল, না, তার সময় নেই। আমাদের আজ রাত্তিরেই চলে যেতে হবে।

—এখনও তো রাত্তিরের অনেক দেরি। দিন না ঠিক করে!

—তার উপায় নেই যে জয়বাবু! এখন কিছু করতে হলে সবাইকে জানিয়ে করতে হবে। সেটা ঠিক নয়। আপনি জেনে ফেলেছেন বটে, কিন্তু অন্য সকলকে আমাদের কথা এখন জানানো ঠিক নয়।

—কেন, কি হবে জানলে?

—পৃথিবীতে অনেক গোলমাল শুরু হয়ে যাবে। মানুষের অনেক কিছু শেখার আছে, কিন্তু সেগুলো শিখতে হবে আস্তে আস্তে। আগের অনেক কিছু না জেনে পরের একটা কিছু হঠাৎ জেনে ফেললে, মাথার গোলমাল হয়ে যেতে পারে। আমরা যেমন চোখের নিমেষে যে-কোনও জিনিসকে বদলে দিতে পারি—সেটা এখনও-এখানে সকলকে জানাবার সময় আসেনি। এখন এটা জানলে লোকেরা এই নিয়ে ছেলেখেলা করবে। যেমন, অণু-পরমাণু ভাঙতে শিখে হঠাৎ বোমা বানিয়ে ছেলেখেলা করছে।

—আপনাদের অ্যাটম বোমা আছে?

লম্বা লোকটি হেসে বলল, না।

সুজয় অবাক হয়ে বলল, আপনাদের রকেট আছে, আর অ্যাটম বোমাই নেই?

—শুধু অ্যাটম বোমা কেন, আমাদের কোনও অস্ত্রই নেই। আট হাজার বছর আগে শেষ বোমা ফেটেছিল। এখন ছেলেরা বাজি ফাটায় শুধু।

—আপনাদের বন্দুক-পিস্তলও নেই?

—যাদুঘরে আছে।

কর্নেলসাহেবের গাড়ি একটু আগেই থেমেছিল। কর্নেলসাহেব হোটেলের দরজা দিয়ে ঢুকেও আবার বাইয়ে বেরিয়ে এলেন। ওপরে বারান্দার দিকে তাকালেন, সুজয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হল। তিনি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে।

সুজয় বলল, এই রে, কর্নেলসাহেব আপনাদের দেখে ফেললেন কিন্তু!

বেঁটে লোকটি বলল, এখন আর দেখতে পাচ্ছেন না।

—হ্যাঁ, পাচ্ছেন। এদিকেই তো তাকিয়ে আছেন!

—তাও পাচ্ছেন না।

সুজয়ের এটা কিছুতেই মাথায় ঢুকল না। সে নিজের চোখে লোক দু-জনকে দেখতে পাচ্ছে, কর্নেলসাহেবকেও দেখতে পাচ্ছে। তাহলে কর্নেলসাহেব ওদের দেখতে পাবেন না কেন?

কর্নেলসাহেবও যেন কীরকম করছেন। একবার দু-হাত দিয়ে চোখ রগড়ালেন। মাথা ঝুঁকিয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন। খুব যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। তারপর হনহন করে আবার ভেতরে ঢুকে গেলেন।

সুজয় বলল, উনি নিশ্চয়ই আমাদের কাছেই আসছেন। যদি সোজা এখানে চলে আসেন!

এই কথাটা বলেই সুজয়ের মনে হল, এরকমভাবে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।

তাড়াতাড়ি আবার বলল, আসুক না, আপনাদের তো ভয় নেই। আপনাদের তো কেউ কিছু করতে পারবে না।

লম্বা লোকটি বলল, একজন আরেকজনকে দেখে ভয় পাবে কেন? ভয় জিনিসটা ভালো নয়।

এই সময় হঠাৎ আকাশে একবার মাত্র বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সুজয় বলল, একি, আবার বৃষ্টি হবে নাকি?

বেঁটে লোকটি বলল, না। এবার আমাদের চলে যেতে হবে। ওটা সেই চিহ্ন।

লম্বা লোকটি বলল, জয় বাবু, আমরা তাহলে চললাম। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম একটা কথা বলার জন্য। দুপুরে ঝড়বৃষ্টির সময় আমরা এখানকার আকাশ নিয়ে একটা পরীক্ষা করছিলাম। সে সময় আমরা চেয়েছিলাম, কেউ যেন বাইরে না বেরোয়। আপনার বাবা আর দিদি তখন গাড়িতে যাচ্ছিলেন—

তাই গাড়িটা থামিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু আমরা সাবধানে করেছি সেটা, যাতে কারুর গায়ে কোনও আঘাত না লাগে।

সুজয় বলল, কারুর লাগেনি। কিন্তু একটা কথা শুনুন। আপনাবা আর ফিরে আসবেন না?

—সেটা ঠিক নেই। আপনার সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হবে না।

সুজয়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল। যে-কোনও কারণেই হোক, এই লোক দুটিকে ভালো লেগে গিয়েছিল তার। দেবতাদের তো কখনও দেখেনি সে। মনে হয়, এরা দেবতাদের থেকেও ভাল।

এই কথাটা মুখেই বলে ফেলল সে। বলল, আপনারা চলে গেলে আপনাদের জন্য আমার মন কেমন করবে!

লম্বা লোকটি বলল, সত্যি? জয়বাবু, আপনি খুব ভালো।

বেঁটে লোকটি বলল, জয়বাবু, আপনার জন্য আমাদেরও মন কেমন করবে। কারুর সঙ্গে একবার ভাব হয়ে গেলে তাকে ছেড়ে যেতে আমাদেরও কষ্ট হয়।

বেঁটে লোকটি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুজয়ের দিকে। মন হল ওর চোখে জল এসে যাচ্ছে। হাতের তালু দিয়ে চোখ মুছল। সুজয়ের মনে পড়ল, দেবতারা কাঁদে কিনা —এই কথাটা এখনও জানা হয়নি।

বেঁটে লোকটি বলল, জয়বাবু, আমাদের গ্রহ থেকে কেউ-কেউ এই পৃথিবীতে মাঝে মাঝে আসি। প্রত্যেকবারই ভাবি, আগের বারের চেয়ে সবকিছুই ভালো দেখব। কিন্তু প্রত্যেকবারই দেখি, মানুষ আরও বেশি রাগী হয়ে যাচ্ছে। এখনও তারা ঝগড়া মারামারি করে। দেখে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। জয়বাবু, আপনি বড় হয়ে চেষ্টা করবেন যাতে সব মানুষ ভালো হয়ে ওঠে। চেষ্টা করবেন তো?

জয় কিছু বলার আগেই তার ছোড়দি ঘরের মধ্যে থেকে বলল, এই জয়, ওখানে কে কথা বলছে রে?

তারপরই ঝর্ণা বারান্দায় উঁকি মেরে বলল, একি, এই তো সেই দুজন লোক!

লম্বা ও বেঁটে লোক দুটি ঝর্ণাকে দেখে খুব বিনীতভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে বললে, নমস্কার। ভালো আছেন তো?

ঝর্ণা বলল, আপনারা এখানে কি করে এলেন?

লম্বা লোকটি বলল, আপনাদের পাশের ঘরের একজনের সঙ্গে আমাদের চেনা আছে। তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আচ্ছা চলি—

আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ওরা দুজন বারান্দা দিয়ে হেঁটে হোটেলের অন্য একটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

এই সময় সুজয়ের বাবা ডাকলেন ঝর্ণাকে। কর্নেলসাহেব সেখানে বসে আছেন। তিনি বললেন, আমার মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, না চোখ খারাপ হয়ে গেছে? আমি একবার দেখলাম, আপনার ছেলের পাশে সেই অদ্ভুত লোক দুটো দাঁড়িয়ে আছে। পরের মুহূর্তেই দেখলাম নেই।

ঝর্ণা বলল, ভুল দেখবেন কেন? ওরা তো সত্যিই এসেছে।

কর্নেলসাহেব লাফিয়ে উঠে বললেন কোথায়?

—আমাদের পাশের ঘরে।

—শিগগিরি চলুন।

সবাই ছুটে গেল সেই ঘরটার দিকে। আগে খেয়াল হয়নি, এখন দেখা গেল, সেটা দরজার বাইরে থেকে তালা বন্ধ। সেখানে কোনও লোক নেই। তখন বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢোকা হল। সেখানেও কেউ নেই।

কর্নেলসাহেব তখন সুজয়ের দিকে ঘুরে জিগ্যেস করলেন, লোক দুটো তোমার কাছে এসেছিল কেন?

সুজয় বলল, আমার সঙ্গে দেখা করতে।

—ওরা কারা? তোমাকে বলতেই হবে।

—ওরা খারাপ লোক নয়। ওরা ভালো—

কর্নেল বললেন, এত তাড়াতাড়ি লোক দুটো বেশি দূর যেতে পারবে না। ওদের ধরতেই হবে।

ঝর্ণা বলল, আমি তো এই এক মিনিট আগেই দেখলাম। এতক্ষণে বড়জোর গেটটুকু পেরিয়েছে।

সবাই হুড়োহুড়ি করে নেমে এল নিচে। গেটে দারোয়ান বলল, হ্যাঁ, একজন লম্বা আর একজন বেঁটে লোককে সে একটু আগেই বেরিয়ে যেতে দেখেছে।

কর্নেল তড়াক করে গাড়িতে চেপে বললেন, আপনারা আসতে চানত আসুন।

সকলেই উঠে বসল গাড়িতে। ড্রাইভারের পাশে কর্নেল আর বাবা। ঝর্ণা আর সুজয় পেছনে। সুজয় ফিসফিস করে ঝর্ণাকে বলল, ছোড়দি, ওদের কেউ ধরতে পারবে না। আমি তোমাকে বলছি, বিশ্বাস করো। ওরা খুব ভালো—

ঝর্ণা বলল, ওই তো ওরা যাচ্ছে—

সোজা রাস্তায় খানিকটা দূরে সত্যি দেখা গেল লোক দুটিকে, যেন খুব নিশ্চিন্তে গল্প করতে-করতে যাচ্ছে। সুজয় বুঝতে পারল, ওরা নিশ্চয়ই মজা করছে। না হলে ওরা তো ইচ্ছে করলেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

লোক দুটো পিছন ফিরে গাড়িটাকে দেখে দৌড়োতে শুরু করল। কর্নেলসাহেব চেঁচিয়ে বললেন, জোরসে চালাও। ওদের ধরতেই হবে।

কিন্তু লোক দুটো এমন জোরে দৌড়োচ্ছে যে গাড়ি ফুল স্পিডে চালিয়েও ওদের কাছাকাছি পৌঁছোতে পারছে না। ঠিক সমান দূরত্ব থেকে যাচ্ছে। কর্নেলসাহেব চেঁচাতে লাগলেন, জোরে, আরও জোরে—

বেশ কিছুক্ষণ এইরকম চলল। সুজয় জানে যে, ওদের কিছুতেই ধরা যাবে না, তবুও সে উত্তেজনা বোধ করছে। শেষ পর্যন্ত কি হবে?

একটু পরেই লোক দুটো পাকা রাস্তা থেকে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। সেখান দিয়ে গাড়ি চলে না। কর্নেলসাহেবও গাড়ি থেকে নেমে শুরু করলেন দৌড়তে। অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখা যায় না। লোক দুটিকেও আর দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ আকাশে আর একবার বিদ্যুতের ঝিলিক। একসঙ্গে একশোটা বজ্রপাতের মতন প্রচণ্ড শব্দ। সেই শব্দে ওরা একসঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

অন্যরা মাটিতে মুখ চেপে রেখেছিল, সুজয় শুধু ওপরের দিকে তাকাল। সে দেখল, অন্ধকার আকাশের বুক চিরে একটা রকেট চলে যাচ্ছে। ওরা এবার সত্যিই চলে গেল।

সুজয় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেই উজ্জ্বল রকেটটাব দিকে। সেই রকেটটা কিন্তু খবরের কাগজের ছবিতে দেখা আমেরিকা বা রাশিয়ার ছুঁচলো রকেটের মতন নয়। বরং মহাভারত বইয়ের ছবিতে দেখা রথের মতন অনেকটা।
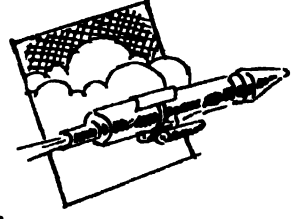
আকাশ দস্যু

দূরে একটুকরো গাঢ় নীল রঙের মেঘ দেখে নী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। হাততালি দিয়ে বলতে লাগল, 'ওই দ্যাখো, ওই দ্যাখো, সত্যিকারের মেঘ! আমি কিন্তু আগে দেখেছি! ওই মেঘটা আমার!'

রা বসে আছে কক্‌পিটে। মেঘটা সেও দেখেছে। রা সেদিকেই তাকিয়ে ছিল। গত চার-পাঁচ দিন কোনও মেঘের চিহ্নই দেখা যায়নি। এই নীল বঙের মেঘটা কোথা থেকে এল কে জানে।

নী জিগ্যেস করল, 'রা-দি, আমি কি এই মেঘটায় স্নান করতে পারি? বড্ড ইচ্ছে করছে!'

রা বলল, 'আচ্ছা করো। কিন্তু সেদিনকার মতন আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে পারবে না। আমরা পাঁচ পরা-মুহূর্তের বেশি খরচ করতে পারব না।'

রা রকেটের মুখ ঘোরাল।

রা-এর পুরো নাম রাভী। সবাই রা বলে ডাকে। যেমন নী-এর নাম নীলাঞ্জনা। তার কলেজের বন্ধুরা বলে নীলা, বাড়িতে ডাকনাম শুধু নী। নী-এর বয়েস চোদ্দ, এখন স্কুল শেষ হয়ে যায় দশ বছর বয়েসে, কলেজেও নী-র আর মাত্র একবছর বাকি।

নী সাঁতারের পোশাক পরে তৈরি হয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল। রা বলল, 'দাঁড়াও, আগে ভালো করে দেখে নিই।'

রা রকেটটা নিয়ে মেঘটার চারপাশ একবার ঘুরে এল। সে দেখে নিতে চায়, এটা সত্যিই মেঘ না অভ্রলিকা। মহাশূন্যে দিনের পর দিন কোথাও এক ছিটে মেঘ দেখা যায় না। কিন্তু মানুষের চোখ আকাশে মেঘ খোঁজে। তাই এক-এক সময় চোখের ভুল হয়। ঠিক মরুভূমিতে মরীচিকা দেখার মতন আকাশেও নকল মেঘ দেখা যায়। এরই নাম দেওয়া হয়েছে অভ্রলিকা।

রা দেখে নিশ্চিন্ত হল। গাঢ় নীল রঙের বেশ ঘন মেঘ। এই রকম মেঘে স্নান করার খুব সুবিধে। রা-রও খুব স্নান করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু দু জনের মধ্যে একজনকে থাকতেই হবে। নিয়ম হচ্ছে, যে আগে মেঘটা দেখবে, সেটা তার হবে। রা যদিও আগে দেখেছিল, কিন্তু সে-নিজের জন্য মেঘটা দাবি করলো না। নী-টা ছেলেমানুষ, ও-ই করুক।

নী বলল, 'যদি ঝিলমদা জেগে থাকত, খুব হিংসে করত আমায়।'

রা বলল, 'নে, বেশি দেরি করিস না কিন্তু। ট্যাবলেট খেয়েছিস তো?'

নী বলল, 'হ্যাঁ।'

রা দরজা খুলে দিতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নী। দু-হাত ছড়িয়ে পাখির মতন উড়তে-উড়তে ঢুকে গেল মেঘের মধ্যে। তারপর তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

এই মেঘের মধ্যে স্নান ভারী মজার। হালকা তুলো-তুলো মেঘগুলো গায়ে লাগলেই জলকণা হয়ে যায়। সাঁতার কাটলে সুড়ঙ্গ হয়ে যায় মেঘের মধ্যে, একটু পরেই বুজে যায় আবার।

রকেটের তলার দিকের ঘরে ঘুমোচ্ছে রাভীর স্বামী ঝিলম। ওদের দুজনেরই বয়েস তেইশ বছর। মাত্র সাত মাস আগে বিয়ে হয়েছে ওদের, অর্থাৎ পৃথিবীর হিসেবে সাত মাস। এখানকার হিসেবে অন্যরকম। বিয়ের পরই ওরা এই রকেট নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছে। অবশ্য শুধু বেড়ানো নয়, একটা জিনিস আবিষ্কার করতে পারলে বিরাট পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা আছে। পৃথিবী থেকে অনেকেই এখন মহাশূন্যে রকেট নিয়ে খোঁজাখুঁজি করছে।

অনেক বৈজ্ঞানিক একসঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, সূর্য-মণ্ডলের বাইরে কোথাও ঠিক পৃথিবীর মতন একটা গ্রহ আছে নিশ্চয়ই। সেখানে মানুষ আছে, আর তারা পৃথিবীর মানুষের মতনই হুবহু। সেই গ্রহটা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। যে প্রথম সেই গ্রহের সন্ধান পাবে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাকে বিরাট পুরস্কার দেবে। এখন পরমাণু রকেট বেরিয়ে যাবার ফলে সূর্যমন্ডলের বাইরে ঘোরাঘুরি জলভাতের মতন সহজ।

রাভীর স্বামী ঝিলমের পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে ওদের এক বন্ধু ইউনুস। এই ইউনুস আগেও অনেক অভিযানে ঝিলমের সঙ্গে এসেছে। আর নীলাঞ্জনার এখন কলেজ ছুটি বলে ওকেও আনা হয়েছে সঙ্গে। ও খুব বেড়াতে ভালোবাসে। নীলাঞ্জনার আর একটা বড় পরিচয়, ও কবি।

মাঝখানে কবি খুব কমে গিয়েছিল। আজ থেকে সতেরো বছর আগে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর আধুনিক শহর নাইরোবিতে বৈজ্ঞানিকরা এক সম্মেলনে বলেছিলেন, পৃথিবীতে যে হঠাৎ পাগলের সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে তার কারণ এখন আর কেউ কবিতা লিখছে না। কোনও পত্রপত্রিকাতে আজ কাল কবিতা ছাপা হয় না, দশ-বারো বছরের মধ্যে সারা পৃথিবীতে কোথাও একটাও কবিতার বই বেরোয়নি, এটা খুব খারাপ লক্ষণ। এক্ষুনি অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের কবিতা লেখার জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত। কবিতা লিখতে-লিখতে অনেকে আধ-পাগল হয়ে থাকবে, পুরো পাগল হবে না, সে বরং ভালো।

এখন আবার দু-চারজন কবিতা লিখতে শুরু করেছে। নীলাঞ্জনার একটা কবিতা রা-র খুব ভালো লাগে। সেটা হচ্ছে এই :

চাঁদের ও-পিঠে রাঙা-মাসিমার
মস্ত বাগান-বাড়ি,
লাল খরগোশ ঘাস ভেবে খায়,
মেসোমশাইয়ের দাড়ি!

কবিতাটি মনে পড়লেই হাসি পায় রা-র। নীলাঞ্জনার মাসি আর মেসো সত্যিই চাঁদে এই কিছুদিন আগে বেশ বড় বাগানওয়ালা একটা বাড়ি বানিয়েছেন। নীলাঞ্জনার মেসোমশাই নতুন-নতুন জন্তু-জানোয়ার বানান। আসার পথে রা দেখে এসেছে তাঁর

বাগানে বেগুনি রঙের হরিণ, সবুজ ছাগল আর ঠিক বেড়ালের মতন ছোট-ছোট সাদা ধপধপে হাতি। সেগুলো সত্যিকারের, জ্যান্ত।

আজ নীলাঞ্জনা মেঘে সাঁতার কাটতে গেছে। আজ নিশ্চয়ই ফিরে এসে মেঘ নিয়ে কোনও কবিতা লিখবে।

রকেটের ইঞ্জিনটা বন্ধ করে রা মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে ফেলল। গুচ্ছ-গুচ্ছ চুল ছড়িয়ে পড়ল পিঠে। একটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল। কতদিন রা স্নান করেনি। নী যদি একটু রকেট চালানো জানত, তা হলে নী ফিরে এলে ওকে কন্ট্রোল রুমে বসিয়ে রা এর পর সাঁতার কেটে আসত। ঝিলম আর ইউনুস ঘুমোচ্ছে, ওদের জাগাবার কোনও উপায় নেই। আফ্রিকার সিয়েরা লিয়ন এখন মহাকাশচর্চার সবচেয়ে বড় জায়গা। সেখান থেকে রা রকেটবিজ্ঞান শিখে এসেছে বলেই ওর হাতে রকেটের ভার দিয়ে ঝিলম আর ইউনুস নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে।

দূরের আকাশে একটা কালো বিন্দু দেখে রা সেইদিকে চোখ রাখল। কোনও উল্কা হলে একটু ভয়ের কথা আছে। এদিককার মহাকাশের যে মানচিত্র আছে তাতে কিছুদিন আগে দু-একটা ভুল ধরা পড়েছে। সন্ধান মিলেছে অনেকগুলো উল্কা আর ভাঙা তারকার। রা একটা জুম টেলিস্কোপ তুলে নিয়ে দেখল। না উল্কা নয়, আর-একটা রকেট। খুব সম্ভবত আমেরিকান রকেট। ওরা কি এই মেঘটাকে দেখতে পেয়েই আসছে? পরের মুহূর্তেই রা বুঝতে পারল, না তা তো হতে পারে না। ওদের রকেটগুলো বড্ড পুরোনো ধরনের, মহাশূন্যের মাঝখানে কোথাও স্থির হয়ে থেমে থাকার ক্ষমতা ওদের নেই।

রা মনে-মনে বলল, 'আহা বেচারিরা!'

রা ইতিহাসে পড়েছে যে, অনেকদিন আগে আমেরিকান আর রাশিয়ানরা মহাকাশ দৌড়ে খুব উন্নতি করেছিল। তারপর তাদের ছাড়িয়ে যায় চিন, তারপর ভারত। এখন তো আফ্রিকানদের জয়-জয়কার। ওই কালো লোকদের যা বুদ্ধি, ওদের সঙ্গে কেউ পারে না। টাকাও ওদের বেশি। ঝিলমের গায়ের রং কুচকুচে কালো, ঠিক আফ্রিকানদের মতন. সেইজন্য পৃথিবীর কত মেয়ে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল!

আমেরিকান রকেটটা শাঁ করে উড়ে বেরিয়ে গেল। নিশ্চয়ই ওই রকেটের লোকরা মেঘের পাশে থেমে-থাকা রা-এর রকেট দেখে খুব হিংসে করছে!

কিছুই করবার নেই বলে রা একটা বই খুলে বসল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নামে কোনও এক লেখকের লেখা একটা উপন্যাস। এই লেখকের নাম এখনকার কেউ জানে না, এসব বইও আজকাল কেউ পড়তে চায় না। পাওয়া ও যায় না এ-ধরনের বই। এখনকার লেখকদের বই পাওয়া যায় ছোট্ট-ছোট্ট ক্যাসেটে, পড়তেও হয় না। যখন ইচ্ছে রেকর্ডার চালিয়ে দিলেই শুনে নেওয়া যায়।

রা ইতিহাস পড়তে ভালোবাসে বলেই এরকম দু-চারখানা বই যোগাড় করেছে এক পুরনো জিনিসপত্রের দোকানে। বেশ মজা লাগে তার আগেকার যুগের এই সব গল্প পড়তে! মাত্র একশো বছর আগেকার কথা, তখন নাকি হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-ইহুদি এই সব নানান ধর্ম আর জাত ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও করত। এদেশে-ওদেশে যুদ্ধ লাগতো! সত্যি, মজার ব্যাপার, না? এ যুগের অনেক ছেলেমেয়ে এসব শুনলে বিশ্বাসই করতে পারবে না?

এখন কারুর নামে কোনও পদবি নেই, তাই কোনও জাতও নেই। সবাই মানুষ, এই শুধু পরিচয়। স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীদের শিখতে হয় মাত্র দুটো ভাষা। নিজের মাতৃভাষা আর এসপারান্টো। পৃথিবীর যে-কোনও লোক অন্য দেশে গিয়ে এসপারান্টো ভাষায় কথা বলতে পারে, সবাই বুঝবে। এই ভাষা শেখাও খুব সহজ। অবশ্য এই ভাষায় ইংরেজি শব্দ একটু বেশি, কিন্তু পৃথিবীর সব ভাষার শব্দই এর মধ্যে আছে। যেমন, আমি কবিতা লিখি, এর এসপারান্টো হচ্ছে, জ্য রাইট কবিতা!

যে-বইটা রা পড়ছে, তাতে এক জায়গায় আছে যে, একটা গরিবের ছেলের ওপর একজন বড়লোক খুব অত্যাচার করছে। পড়তে-পড়তে রা খুক-খুক করে হাসতে লাগল। কী অদ্ভুত ছিল আগের যুগের মানুষগুলো! ওদের কি মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু ছিল না? শুধু ঝগড়া, মারামারি আর অত্যাচার আর দুঃখ! গরিব-বড়লোক আবার কী জিনিস? এখন তো ওসব কিছুই নেই। সব মানুষ সমান, যার যেমন গুণ, সে সেইরকম কাজ করে। কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়।

ডান দিকে এক জায়গায় দুবার লাল আলো জ্বলে উঠতেই রা বইটা নামিয়ে একটা রিসিভার তুলে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা গলা ভেসে এল, 'রকেট সংখ্যা আলফা বিটা সাত দুই নয় শূন্য?'

রা বলল, 'হ্যাঁ।'

ওদিক থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, 'জীবন কী রকম?'

রা বলল, 'চমৎকার!'

'স্পেস স্টেশন সাতাশ থেকে বলছি...দশ নম্বর স্টেশন থেকে আপনাকে চাইছে... ধরে থাকুন, লাইন জুড়ে দিচ্ছি।'

একটুক্ষণ ধরে থাকার পর আবার একজন জিগ্যেস করল, 'আলফা বিটা সাত দুই নয় শূন্য?'

'হ্যাঁ বলছি।'

'জীবন কী রকম?'

'অপূর্ব সুন্দর। এখন বলুন তো, কী ব্যাপার?'

'পৃথিবী থেকে কেউ একজন কথা বলবে আপনার সঙ্গে। ধরে থাকুন সাবমেরিন স্টেশনের সঙ্গে লাইন জুড়ে দিচ্ছি। আপনার প্রত্যেকদিন আনন্দে কাটুক!'

'ধন্যবাদ! আপনারও প্রতিটি দিন আনন্দময় হোক।'

সাবমেরিন স্টেশন শুনেই রা বুঝতে পেরেছে কার টেলিফোন। এই কিছুদিন হল তার মায়ের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। তাঁর একটু হাঁপানির অসুখ আছে বলে পৃথিবীর জল-হাওয়া সহ্য হয় না। অথচ অন্য কোনও গ্রহেও তিনি যাবেন না। সেই জন্য গত বছরে ভারত মহাসাগরে দু-মাইল জলের তলার কলোনিতে যে সস্তায় জমি বিক্রি হচ্ছিল, সেখানে রা-র বাবা জমি কিনে একটা ছোট বাড়ি করেছেন। রা অবশ্য বাড়িটা এখনও দেখেনি, তবে শুনেছে বেশ ভালো জায়গা। ওখানে মাছ খুব সস্তা।

'হ্যালো, হ্যালো, কে ঝিলম? শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?'

'না, মা। আমি রা বলছি। হ্যাঁ, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি তোমার কথা!'

'ও, রা? বাপরে বাপ! আজকাল যা হয়েছে টেলিফোনের অবস্থা, কিছুতেই লাইন

পাওয়া যায় না। সেই কখন থেকে তোকে ধরার চেষ্টা করছি। শোন, তোকে একটা ভালো খবর দিচ্ছি। শুনতে পাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ, মা খুব পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। বলো—।'

'তবে কি আমারই কানের দোষ হল? তোর গলাটা যেন চিনতে পারছি না। শোন রা, আমাদের বাগানে যে কাঁচালঙ্কা-গাছ পুঁতেছিলাম, তাতে কাল ফুল ধরেছে, এবার লঙ্কা হবে! বুঝলি?'

'উঃ মা! তোমাকে নিয়ে আর পারি না! এই তোমার ভালো খবর? এর জন্য টেলিফোন করলে? কত খরচ জানো?'

'ও-মা, ভালো খবর নয়? আমাদের এই অতল নগরী চারশো দুই-তে আর কারও বাড়িতে কাঁচালঙ্কা গাছ আছে? এখানে লঙ্কাই পাওয়া যায় না। তুই তো জানিস, আমি একটু ঝাল ছাড়া একদম খেতে পারি না। এত ভালো-ভালো চিংড়ি মাছ পাওয়া যায় এখানে, ইচ্ছে করে যে জিরে-পাঁচফোড়ন দিয়ে পাতলা ঝোল রাঁধব, কিন্তু তুই বল, কাঁচালঙ্কা ছাড়া জিরে-পাঁচফোড়নের ঝোল হয়?'

'বুঝেছি, বুঝেছি, খুব ভালো খবর। আমরা ফিরলে তোমার গাছের কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝোল রেঁধে খাইয়ো। তোমরা সব কেমন আছ?'

'ভালো আছি। তোরা ভালো আছিস তো? খুব বেশি দূরে যাসনি যেন! জামাই কোথায়? তাকে একটু দে না, কথা বলি!'

'সে তো ঘুমোচ্ছে। কথা বলার উপায় নেই তো।'

'ও, ঘুমোচ্ছে? বুঝেছি। তা কতদিন হল ঘুমোচ্ছে?'

'আটদিন।'

'আর কতদিন ঘুমোবে?'

'দাঁড়াও, হিসেব করে বলছি, হ্যাঁ আরও কুড়িদিন।'

'জাগলে আমায় একদিন টেলিফোন করতে বলিস। তোর বাবা হাঙর শিকার করতে গেছে। এখানে এসে খুব শিকারের শখ হয়েছে!'

'আচ্ছা মা, তোমরা সাবধানে থেকো, ভালো থেকো। এখন ছেড়ে দিই?'

'তোরা কবে আসবি?'

এ-কথার আর উত্তর দেওয়া হল না, লাইন কেটে গেল।

রিসিভারটা ঠিক জায়গায় রেখে ঘড়ি দেখল রা। এখনও নী ফিরল না কেন? এবার তো তার চলে আসা উচিত।

রা সামনে তাকিয়ে চমকে উঠে দেখল নীল মেঘটা চলতে শুরু করেছে। খুব জোরে, প্রায় রকেটের মতন গতিতে সেটা চলে যাচ্ছে দূরে।

২

নী মনের সুখে সাঁতার কাটছিল মেঘের মধ্যে। একবার নামলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। নদী বা পুকুরে সাঁতার কাটার চেয়েও মেঘের মধ্যে সাঁতার অনেক আরামের, কারণ এতে হাত-পায়ের জোর খাটাতে হয় না। শুধু ভেসে গেলেই হয়।

মেঘের মধ্যে নিঃশ্বাস নেবারও কোনও অসুবিধে নেই। একটা ট্যাবলেট খেলে বুকের মধ্যে দু-ঘন্টার মতন অক্সিজেন জমা থাকে, সেই দু'ঘন্টা হাওয়াহীন জায়গাতেও ভেসে বেড়ানো যায়। নী হাতে একটা ঘড়ির মতন যন্ত্র পরে আছে, ওই যন্ত্রটা তাকে রকেটটার সঙ্গে অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রাখবে, দু-হাজার গজের বাইরে যেতে দেবে না। হঠাৎ কোনও দরকার হলে ওই যন্ত্রটাতেই রা তাকে খবর পাঠাবে।

নীল মেঘের মধ্যে নী একটা জলপরীর মতন চিতসাঁতার দিয়ে ভাসতে লাগল। বিন্দু-বিন্দু জলকণায় শরীরটা যেন একেবারে জুড়িয়ে যায়। নী এর আগেও কয়েকবার পৃথিবীর বাইরে বেড়াতে এসেছে। চাঁদে তার রাঙামাসিমার বাড়ি, সেখানে এসেছে দুবার। আর একবার গরমের ছুটিতে বাবা সবাইকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন বুধ-গ্রহে, তখন অবশ্য নী খুব ছোট, তবু তার একটু-একটু মনে আছে। বুধ-গ্রহটা খুব মজার, বিশেষ এক ধরনের জুতো পায়ে না-দিলে সেখানে হাঁটাই যায় না, যখন-তখন মাথাটা নিচে আর পা দুটো ওপরের দিকে উঠে যায়!

নী বাবার কাছে শুনেছে যে, আগে পৃথিবী থেকে অন্য গ্রহে বেড়াতে আসার অনেক ঝামেলা ছিল। জোব্বা-জাব্বা পরে, মুখে মুখোশ লাগিয়ে, পিঠে অম্লজানের কলসি নিয়ে ঘুরতে হতো। নী দেখেছে তখনকার বি-গ্রহ যাত্রীদের ছবি। তারপর অম্লজান-বড়ি আবিষ্কার হবার পর সব কিছুই খুব সহজ হয়ে গেছে।

নী-র রাঙামাসিমা তো বলছেন, কলেজের পড়া শেষ হলে তাকে চাঁদে এসে থাকতে। চাঁদে কাজ পাওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। আজকাল তো পৃথিবীতে মানুষ থাকতেই চায় না প্রায়। কলকাতা লন্ডন নিউইয়র্ক এই সব আগেকার দিনের পুরনো শহরগুলো খাঁ-খাঁ করছে। নী একবার বোম্বাই গিয়ে দেখেছিল, সেখানে হাজার-হাজার বাড়ি খালি পড়ে আছে, ঠিক যেন একটা ভূতুড়ে শহর। ভারত সরকার এখন ঐতিহাসিক ও পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইনে ওই বাড়িগুলো একই অবস্থায় রেখে দিতে চাইছেন। আসামের মতন সুন্দর জায়গায় এখন তো মানুষ নেই বললেই চলে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সেখানকার টেলিফোন টেলিগ্রাফ পরমাণু-কেন্দ্র এসব চালাবারও লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সরকার তাই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে, যে-কোনও লোক, এমনকী বিদেশিরাও যদি আসামে এসে থাকতে চায়, তা হলে তাদের আগামী পাঁচ বছর খাবার-দাবারের কোনও খরচ লাগবে না। তারা একটি বাড়িও পাবে বিনা পয়সায়।

নী অবশ্য সূর্যমন্ডলের বাইরে আগে কখনো আসেনি। সূর্যের গ্রহগুলো তো সব জানা হয়ে গেছে, কোনওটাতেই মানুষের মতন প্রাণী কিংবা অন্য কোনও জীবজন্তুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। সূর্যমণ্ডলের বাইরেই এখন বেশি মজা। এখনও কতরকম অজানা জিনিস যে দেখা যায়। এই যে মাঝে-মাঝে টুকরো-টুকরো জলভরা মেঘ, এর কথাই বা কে জানত।

নী কতক্ষণ সাঁতার কেটেছে তার খেয়ালই নেই। এক সময় টের পেল, সে শুধু একই জায়গায় থেমে আছে আর তার চারপাশ দিয়ে মেঘ উড়ে চলেছে। সে তখন দিক পালটাবার জন্য মাথা ফেরাল, কিন্তু সাঁতার কাটতে পারল না, তার হাত-পা চলছে না, মেঘই তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এ কী ব্যাপার? অনেক চেষ্টা করল নী, তবু কিছুই হল না। ক্রমশই মেঘটার গতিবেগ বাড়ছে।

ভয় পেয়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'রা-দি! রা-দি!'

এখানে বাতাস নেই বলে গলার আওয়াজ কেউ শুনতে পাবে না। চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই। তার কব্জিতে বাঁধা ট্রান্সমিটারে কোনও শব্দ আসছে না। সে যে দূরে সরে যাচ্ছে তা কি রা-দি টের পায় নি? যন্ত্রটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল? ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল নী'র। কোনওক্রমে মাথা তুলে সে দেখল, বহু দূর থেকে একটা সূক্ষ্ম আলোর রেখা এসে পড়েছে মেঘটার ওপর। সুতো দিয়ে যেমন ঘুড়ি টানে, সেই রকমভাবে কেউ যেন ওই আলো দিয়ে মেঘটাকে টানছে। নী এইটুকু বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই ওটা কোনও চুম্বক আলো।

আর কিছু ভাবার সময় পেল না সে। মেঘের প্রচন্ড গতিবেগ সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

এদিকে রা যখন দেখল, মেঘটা উড়ে যাচ্ছে, তখনই সে রকেটটা আবার চালু করে দিয়েছে। এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটার মধ্যে একটা বিপদের গন্ধ পেয়েছে সে। কিন্তু রা সহজে ঘাবড়াবার মেয়ে নয়। মহাকাশে অন্তত কয়েক কোটি মাইল রকেট চালিয়েছে সে এই বয়সেই, অনেক রকম বিপদের জন্য সে তৈরি থাকে।

ঝিলম আর ইউনুসকে ডাকবার কোনও উপায় নেই। ওরা বয়েস কমাবার ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমোচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ের আগে কিছুতেই ঘুম ভাঙবে না। সূর্যমণ্ডলের বাইরে ঘুরতে গেলে পৃথিবীর হিসেবে বয়েস অনেক বেড়ে যায়। প্রথম-প্রথম যেসব অভিযাত্রী এদিকে এসেছিল, তারা কেউ-কেউ ফিরেছে পঁচিশ কিংবা তিরিশ বছর পরে, ততদিনে তারা বুড়ো হয়ে গেছে। এখন সেই সমস্যা নেই, এখন এই ট্যাবলেট খেয়ে নিয়ে ঘুমোলে বয়েসটা থেমে থাকে, তারপর এক মাস, দু-মাস বা এক বছর বাদে ঘুম ভাঙলেও সেই সময়টায় বয়স বাড়ে না। মহাকাশের সব অভিযাত্রীই পালা করে এই ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমোয়।

রা তার রকেটের গতি বাড়িয়ে দিয়ে মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটল। তারপর মেঘটার পাশাপাশি এসে রকেটের লেজের দিক থেকে অতি-বেগুনি রশ্মি ছড়াতে লাগল মেঘটার ওপর। এমন সুন্দর মেঘটাকে নষ্ট করে দিতে হল তাকে, কিন্তু আর উপায় তো নেই! ঠিক যেমন দেশলাই কাঠি জ্বললে তুলোর বান্ডিল পুড়ে যায়, সেই রকম অতি-বেগুনি রশ্মিতে গলে যেতে লাগল মেঘটা।

প্রায় চোখের পলকেই অদৃশ্য হয়ে গেল পুরো মেঘটা, শুধু দেখা গেল নী-কে। ঠিক যেন অগাধ সমুদ্রে ভাসছে একটা ক্ষীরের পুতুল। নী-র হাত-পা ছড়ানোর ভাব দেখেই ছ্যাঁত করে উঠল রা-র বুকের মধ্যে। নী এখনো বেঁচে আছে তো?

এরপর রা দেখল, মেঘটা গলে গেলেও নী-র শরীরটা থামছে না, সেটা তখনও ছুটে চলেছে সমান গতিতে। তার রকেটের পাশাপাশি চলছে বলেই প্রথমটা সে বুঝতে পারেনি। ঠিক যেমন দুটো ট্রেন বা দুটো বিমান পাশাপাশি সমান গতিতে ছুটলে মনে হয়, দুটোই থেমে আছে। তখনই রা প্রথম লক্ষ করল, নী-কে টানছে একটা সূক্ষ্ম আলোর রেখা। তার ভুরু কুঁচকে গেল। ওটা কীসের আলো?

বেশি চিন্তা করারও সময় নেই। রা আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে লেসার বিম

দিয়ে কেটে দিল আলোর রেখাটাকে। তারপর ঠিক সুতো কাটা ঘুড়িরই মতন আস্তে-আস্তে দুলতে লাগল নী-র দেহ।

এর পরের কাজটাই শক্ত। রকেটটার গতি কমাতে-কমাতেই সেটা নী-কে ছাড়িয়ে চলে যাবে বহু দূরে। তারপর ফিরে এসে এই বিরাট মহাকাশের মধ্যে ওইটুকু একটা মানুষকে খুঁজে বার করাই দারুণ কঠিন। রা রকেটের মুখটা ঘুরিয়ে গোল করে ফিরে আসতে আসতেই নীকে ছাড়িয়ে সে চলে গেল। বহু হাজার মাইল দূরে। তারপর রকেটের গতি একটু-একটু কমিয়ে গোলটাকে ছোট আনতে লাগল। রকেট চালাতে-চালাতেই সে নানানরকম বোতাম টিপে অঙ্ক কষে যাচ্ছে।

এত রকম ব্যস্ততা ও উত্তেজনার মধ্যেও এই সময় রা-র হঠাৎ খুব একা লাগল। ইস, এখন ঝিলম কিংবা ইউনুস যদি পাশে থাকত। তারপরই সে চমকে উঠল। আরে! লেসার বিমের রেখাটা সে বন্ধ করতে ভুলে গেছে! সর্বনাশ! ওটা যদি নী'র গায়ে লাগত!

ঠিক হিসেব মতন ঘুরতে-ঘুরতে গোলটাকে ছোট করে এনে নী-কে দেখতে পেল রা। এখনও নী সেইরকম ভাবে দুলছে। নী-র ছোট্ট সুন্দর শরীরটা যেন একটা গোলাপ ফুলের পাপড়ি। আস্তে-আস্তে কাছে এসে একটা মস্তবড় চায়ের ছাঁকনির মতন জিনিস বার করে সে লুফে নিল নী-কে। রকেটের ভিতরে এনেই নী-কে কোলে তুলে নিয়ে সে ছুটে গেল স্বয়ংক্রিয় হাসপাতালে। এটা রকেটের মধ্যে একটা ছোট্ট ঘর, এখানে সব রকম রোগের চিকিৎসা করে কমপিউটার। রা-র আবার ডাক্তারি-জ্ঞান একটুও নেই। এই ব্যাপারে ইউনুসের খুব অভিজ্ঞতা আছে।

স্বয়ংক্রিয় হাসপাতালে নী-কে খাটে শুইয়ে দেওয়ামাত্র চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। কমপিউটার থেকে দুটো হাত বেরিয়ে এসে ব্যবস্থা করতে লাগল সব কিছুর। হাত দুটো ইস্পাতের নয়, নরম রবারের, ঠিক মনে হয় কোনও মেয়ের হাত। রা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, দেওয়ালের একটা চৌকো জায়গায় নানান আলোতে নী-র হৃদস্পন্দন, নাড়ির গতি, রক্তের চাপ— এইসবের হিসেব ফুটে উঠছে। ইউনুস থাকলে এই সব দেখলেই বলতে পারত, এর থেকে কোনও বিপদের ভয় আছে না।

তারপরই রা-র মনে পড়ল, ও হরি, ইউনুস থাকলেও তো কোনও লাভ ছিল না! ইউনুস তো এক বছরের জন্য নিঃশব্দ-বড়ি খেয়ে নিয়েছে। এই এক বছর ইউনুসের কথা বলার ক্ষমতা থাকবে না। এরা প্রায়ই এক বছর দু'বছরের জন্য কথা বলা কিংবা কানে শোনা এমন কী চোখে দেখা বন্ধ করে আয়ু বাড়িয়ে নেয়। শরীরের এক-একটা অঙ্গকে মাঝে-মাঝে এরকম বিশ্রাম দিলে তারা আরও জোরালো হয়।

রা-র বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপ করছে। নী-র যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে ওর বাবা-মাকে সে কী বলে সান্ত্বনা দেবে! কেন সে মেয়েটাকে মেঘে সাঁতার কাটার জন্য নামতে দিল! অথচ, আগেও তো সে এরকম তিন-চারবার মেঘে সাঁতার কেটেছে, কখনও তো কোনও বিপদ হয়নি? ওই আলোর রেখাটা কোথা থেকে এল? ঝিলম জেগে থাকলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারত, ওটা কী! আবার খুব একা লাগল রা-র।

এই সময় খুব শান্ত মিষ্টি গলায় একজন বলল, 'বেশি ভাবনা করো না রা, মেয়েটি ভালো হয়ে যাবে।'

রা মুখ তুলে বলল, 'সত্যিই জিউস? ওঃ তোমায় কী বলে যে ধন্যবাদ দেব!'

'ওরকম মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে না থেকে আমায় জিগ্যেস করলেই তো পারতে।'

'আমি ভাবলাম, তুমি ব্যস্ত। তাই তোমায় বিরক্ত করিনি।'

'তোমার যখন একা-একা লাগে, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না কেন?'

'ঠিক বলেছ, জিউস! এবার থেকে মাঝে-মাঝে এসে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব। তোমার কাজের অসুবিধে হবে না তো?'

'যতই কাজ থাকুক, আমারও তো মাঝে-মাঝে একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে হয়! জীবন কী-রকম, রা?'

'অপূর্ব সুন্দর!'

'তোমার জীবন আরও মধুময় হোক, রা!'

কমপিউটারটির থেকে আরও দুটো হাত বেরিয়ে এল, পুরুষের মতন হাত। রা সেই হাত দুটি চেপে ধরে বলল, 'তুমি খুব ভালো জিউস, তোমার মতন আর দুটি দেখিনি কোথাও! আচ্ছা, জিউস, তুমি বলতে পারো, ওই যে আলোর রেখাটা মেঘটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ওটা কী?

'ও-রকম আগে কখনো দেখিনি।'

'ওটা কি প্রাকৃতিক? না কেউ ইচ্ছে করে অমনি ভাবে টানছিল?'

'সেটাও বুঝতে পারলুম না!'

'সে কী, তুমি এত জ্ঞানী, তুমিও জানো না?'

'হা-হা-হা-হা! তুমি এত মজার কথা বলো, রা! জীবনে এখনও কত কিছু অজানা রয়ে গেছে, কত রহস্যের মীমাংসা হয়নি, দিন-দিন রহস্য বাড়ছে বলেই তো জীবনটা এত মজার। সব-কিছু জানা হয়ে গেলে তোমাদের কি আর বাঁচতে ভালো লাগবে?'

'তা ঠিক বলেছ। তবু আমার মনটা খুঁতখুঁত করছে। নী-কে আর একটু হলেই আমরা হারাতাম। লেসার বিমে এ আলোর রেখাটা খুব সহজেই কেটে গেল অবশ্য—'

'তুমি জুপিটারকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। আমি একটু পরে জুপিটারের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করে দেবার চেষ্টা করব। জুপিটার সব সময় এত ব্যস্ত থাকে যে, বেচারির নিঃশ্বাস ফেলারও সময় নেই।'

জুপিটার আর-একটি অতিকায় কমপিউটার, সেটি বসানো আছে মহাশূন্যে স্টেশন নং একুশে। এর চেয়ে বড় কমপিউটার মানুষ কখনও তৈরি করতে পারেনি। এটার খরচ দিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, তাই পৃথিবীর যে-কোনও দেশের মানুষ যে-কোনও সমস্যা নিয়ে জুপিটারকে প্রশ্ন করতে পারে।

'শোনো, রা, ঝিলমকে বলো, আলোর চুম্বকশক্তি নিয়ে তোমাদের আরও গবেষণা করা দরকার। এই ব্যাপারে আফ্রিকানরা তোমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে।'

'ঠিক বলেছ, জিউস!'

'ওই দ্যাখো, মেয়েটি চোখ মেলেছে!'

রা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল নী-র দিকে। নী তার টলটলে চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে

আছে ওপরের দিকে। রা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, নী, এখন কেমন লাগছে? ওঃ, যা চিন্তায় ফেলেছিলি!'

নী কোনও উত্তর দিল না।

রা তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'এই নী, নী আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না? এই দ্যাখ, আমি রা-দি, তোর আর কোনও ভয় নেই—'

নী যে সত্যিকারের কবি তার প্রমাণ পাওয়া গেল এবার। জ্ঞান ফেরার পর সে প্রথম কথা বলল কবিতায়। সে বলল ঃ

'কালো মেঘ পাহাড়ের
বুকে গিয়ে কাঁদে,
লাল মেঘ ঝড় তোলে
মঙ্গলে চাঁদে,
নীল মেঘ ঘুম দেয়,
আলো দিয়ে বাঁধে,
সাদা মেঘ, সাদা মেঘ,
সাদা মেঘ, এসো!...'

৩

গোলাপি-রঙা রোদের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছে রকেটটা।

এদিকে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, যার আলোর রঙই গোলাপি। কিন্তু এমন সুন্দর রঙ হলেও এই আলো খুব গরম। একবার ঝিলম এই গোলাপি রোদের মধ্যে রকেটের বাইরে বেরিয়েছিল, তাতে তার পিঠ এমন ঝলসে গেছে যে, গোলাপি-গোলাপি ছাপ পড়ে গেছে। এই আলোর এলাকা থেকে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে চায় রা।

নী খাবার তৈরি করে এনেছে, ওরা দুজন পাশাপাশি বসে খাচ্ছে, খাওয়া মানে একটা করে স্যান্ডউইচ আর এক কাপ সুপ। দীর্ঘ যাত্রার সময় একসঙ্গে বেশি খাবার খাওয়া যায় না, খেলেই গা গুলোয়।

রা বলল, 'নী, এবার তোকে রকেট চালানো শিখিয়ে দেব। তুই অ্যাসট্রোফিজিক্স পরীক্ষায় কীরকম নম্বর পেয়েছিলি রে?'

নী লজ্জায় মুখ নিচু করে বলল, 'বলব না!'

'ও মা, বলবি না কেন?'

'না, আমার ওসব কথা বলতে ভালো লাগে না!'

রা 'ওঃ হো-হো' বলে হেসে উঠল। তার মনে পড়ে গেছে। হাসতে-হাসতেই সে বলল, 'ও, তুই তো সব পরীক্ষাতেই ফার্স্ট হোস, সেইজন্য বলতে লজ্জা পাচ্ছিস! তুই কী করে প্রত্যেকবার ফার্স্ট হোস রে? বেশি তো পড়াশুনো করতে দেখি না তোকে?'

নী বলল, 'আমি কী করব, আমি একবার যা চোখে দেখি, তা সব আমার মনে থেকে যায়।'

'তোদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হয়নি মহাকাশে?'

'সে তো পৃথিবী থেকে মাত্র পাঁচ হাজার মাইল ওপরে। সে আর এমন কী!'

ঠিক আছে, আজ থেকে তোর রকেট চালানোর হাতে খড়ি হবে। আমার পাশে বসে আসন-বন্ধনীটা কোমরে বেঁধে ফ্যাল।'

ঠিক এই সময় একটা লাল আলো জ্বলে উঠল এবং হিস-হিস শব্দ হতে লাগল মাথার ওপরে। রা একটা রিসিভার তুলে নিতেই শোনা গেল, 'এস ও এস, এস ও এস, সবাইকে ডাকছি, প্রক্সিমিটি লালগোলাপ, কেউ কি শুনতে পাচ্ছ...।'

কিছুক্ষণ শোনার পর রা রিসিভারটা আবার রেখে দিল।

নী জিজ্ঞেস করল, 'কী হল? কে কথা বলল?'

রা নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'লালগোলাপ নামে এদিকে একটা উপগ্রহ আছে, সেখানে একটা রাশিয়ান রকেট ক্রাশল্যান্ড করেছে। তাই সাহায্য চাইছে।'

'আমরা সেদিকে যাব না?'

'আমাদের তো কোনও দরকার নেই যাবার। ওরা চতুর্দিকে খবর পাঠাচ্ছে। এদিকে কাছেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটা স্পেস-স্টেশন আছে, সেখান থেকে দমকল যাবে—'

'রা-দি, যদি কোনও কারণে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্পেস-স্টেশন ওদের খবর শুনতে না পায়? ওরা বিপদে পড়েছে, আমাদের যাওয়া উচিত না?'

'আমরা শুধু-শুধু সময় নষ্ট করব কেন? এমনিতেই কতটা সময় খরচ হয়ে গেল! এই রাশিয়ান আর আমেরিকানদের ওপর আমার বড্ড রাগ হয়। ওদের দেশের অনেক লোক এখন খেতে পায় না, ওদের আবার রকেট ভাসাবার বিলাসিতা করবার কী দরকার? গত বছরের হিসেবে দেখেছি ওই দুটো দেশের একুশ কোটি শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে! আফ্রিকা আর আমাদের দেশের সাহায্য না পেলে তো ওরা চালাতেই পারে না, তবু মহাকাশ গবেষণায় এত টাকা নষ্ট করা চাই! এই দ্যাখ না, এতটুকু দেশ বাংলাদেশ, কিন্তু কী দারুণ উন্নতি করেছে, সেই তুলনায় ওই বড়-বড় দেশগুলো—'

'রা-দি, তুমি যাই বলো, মানুষ বিপদে পড়লে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।'

'তুই যে একেবারে দয়ার অবতার হলি! দাঁড়া, আগে দেখি রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্পেস-স্টেশন খবরটা পেয়েছে কি না!'

রা অনেকগুলো বোতাম টিপে রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্টেশনকে ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনও সাড়া পেল না। তার ভুরু কুঁচকে গেল। আপন মনে সে বিড়বিড় করে বলল, 'কোনও কারণে সারকিট জ্যাম হয়ে গেছে। ওরা বোধহয় কিছু শুনতে পায়নি।'

'রা-দি তা হলে?'

'যেতেই হয় দেখছি। আবার অনেকখানি সময় খরচ! তুই পাঁচ নম্বর মানচিত্রটা বার করে এনে আমার সামনের এই ফ্রেমটাতে বসিয়ে দে।'

ককপিটের পাশেই মানচিত্র-লাইব্রেরি। নী চট করে সেখান থেকে পাঁচ নম্বর মানচিত্রটা খুঁজে এনে ফ্রেমে লাগিয়ে দিল। মানচিত্রটি ত্রিস্তর। ফ্রেমে বসাতেই যেন মহাকাশের একটা অংশ ওদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল। খালি চোখে তাকালে এই মহাকাশকে শুধু মহাশূন্য বলে বোধ হয়, কিন্তু এই ম্যাপে কত রকম ফুটকি রয়েছে। আবার কিছু অদ্ভুত চেহারার, ঠিক খেলনার মতন ছবি।

একটা ফুট্‌কির দিকে আঙুল দেখিয়ে রা বলল, 'এটা হল লালগোলাপ, একটা ছোট উপগ্রহ, বেশ দূরে আছে। খুব লাল রঙের পাতলা-পাতলা মেঘ এই উপগ্রহটা ঘিরে আছে, সেইজন্য দূর থেকে এটাকে লাল গোলাপের মতন দেখায়।'

অঙ্ক কষে নির্দিষ্ট গতি পথ বার করে রা রকেটের মুখ ঘোরাল সেই দিকে। তারপর সে চেষ্টা করল বেতার-টেলিফোনে লালগোলাপের বিপন্ন রকেটটির সঙ্গে যোগাযোগ করবার। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাদের আর ধরা গেল না। রা বেশ অবাক হল। সে নী-কে বলল, 'তুই ধরেছিস যখন, যেতেই হবে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদের রকেটে আর একজনের বেশি লোককে জায়গা দেওয়া যাবে না। ওদের রকেটটা যদি একেবারে নষ্ট হয়ে যায় আর তিন-চারজন মানুষ থাকে, তা হলে কী করব?'

নী বলল, 'আমরা ওদের চিকিৎসা কিংবা খাবার দিয়ে সাহায্য করতে পারি অন্তত।'

'তুই কখনো ধ্যান-ট্যাবলেট খেয়েছিস, নী?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ, রা-দি আমার এখনও পনেরো বছর বয়েস হয়নি। তার আগে ওই ট্যাবলেট খাওয়া নিষেধ না?'

'মুশকিল হচ্ছে, আমি রকেট চালাচ্ছি তো, এখন আমার পক্ষে ওই ট্যাবলেট খাওয়া ঠিক হবে না। অনেকক্ষণ ঘোর থাকে। তোর চোদ্দ বছর তো হয়ে গেছে, এখন খেলে দোষ নেই। তোর সাহায্য আমার দরকার এখন।'

হাতব্যাগ থেকে দুটি ট্যাবলেট বার করে নী-কে দিয়ে বলল, 'এই দুটো তোর জিভের তলায় রেখে দে। তারপর চোখ বুঁজে শুধু লালগোলাপ গ্রহটার কথা চিন্তা কর। অন্য কোনও চিন্তা যেন মনে না আসে।'

নী ট্যাবলেট দুটো মুখে দিয়ে চোখ বুঁজে বসল। রা হাতঘড়িটা দেখে আবার মন দিল রকেট চালনায়।

ঠিক দশ মিনিট বাদে নী চেঁচিয়ে বলল, 'দেখতে পাচ্ছি, রা-দি, দেখতে পাচ্ছি, অপূর্ব সুন্দর!'

রা বলল, 'চোখ খুলিস না। চ্যাঁচাসনি! আস্তে-আস্তে বল, আরও ভালো করে দ্যাখ।'

'ঠিক ফুলের পাপড়ির মতন লাল-লাল মেঘ, সত্যি লালগোলাপের মতনই দেখতে গ্রহটাকে—'

'গ্রহ নয়, উপগ্রহ। যাই হোক, মেঘের ভেতর দিয়ে দ্যাখবার চেষ্টা কর। ওখানে ছোট-ছোট পাহাড় আছে।'

'দেখতে পাচ্ছি একটা পাহাড়। তার মাথার দিকে চাঁদের মতন কী যেন জ্বলছে।'

'চাঁদ নয়, ওটাই ওর গ্রহ। পাহাড়ের নিচের দিকে কিছু দেখতে পাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ, ওই যে একটা রকেট, কাত হয়ে পড়ে আছে, খুব জোর আঘাত লেগেছে মনে হচ্ছে।'

'কোনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না?'

'তাও দেখা যাচ্ছে, একজন শুয়ে আছে মাটিতে, আর দু'জন বসে আছে পাশে।'

'সবাই পুরুষ, না মেয়ে আছে?'

'তা বোঝা যাচ্ছে না। সবার মাথায় স্পেস হেলমেট।'

'লালগোলাপে এমনিতে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বোধহয় ওদের অম্লজানবড়ি ফুরিয়ে গেছে।'

'রা-দি, ওদের সঙ্গে কথা বলা যায় না? এত কাছে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন ডাকলেই শুনতে পাবে।'

'না, কথা বলা যায় না। তুই কাছে ভাবছিস, আসলে ওরা সাতচল্লিশ হাজার কিলোমিটার দূরে। এবার চোখ খোল, আর কষ্ট করার দরকার নেই।'

নী চোখ খোলার পরও মুখখানা হাসি-হাসি করেই রইল। আপন মনে বলল, 'আমি এখনও লালগোলাপ-উপগ্রহটা দেখতে পাচ্ছি...মেঘগুলো দুলছে—'

রা বলল, 'এই তো তোদের নিয়ে মুশকিল! এইজন্যই অল্পবয়সীদের ধ্যান-বড়ি খাওয়াতে নিষেধ করে। ঘোর কাটতে চায় না। দাঁড়া আমি ব্যবস্থা করছি।'

রা একটা বোতাম টিপে দিতেই ডান পাশের দেয়ালের খানিকটা অংশ সরে গেল, সেখানে দেখা গেল একটা চৌকো সাদা পর্দা। আর একটা বোতাম টিপতেই সেই পর্দার ওপর শুরু হয়ে গেল সিনেমা। বৃহস্পতিগ্রহের লছামি পাহাড়ের চূড়ায় চারটি ছেলে-মেয়ের অভিযান। ফিল্মটা কুড়ি-পঁচিশ বছরের পুরনো, কিন্তু গানগুলো এত ভালো যে, এখনও ভালো লাগে। দু-খানা গান গেয়েছে হংকংয়ের একটা ডলফিন। এই ডলফিনটা এসপারান্টো ভাষায় দারুণ গান গায়। নী-র মেসোমশাই ওঁদের চাঁদের বাড়িতে একটা কোকিলকে চমৎকার পল্লীগীতি গাইতে শিখিয়েছেন। তার মধ্যে একটা গান সকলের খুব ভালো লাগে, সেই গানটা হল 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।' এই পল্লীগীতিটা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে আগেকার দিনের একজন সাধু।

সিনেমা দেখতে-দেখতে এই দুটি মেয়ে মহাশূন্য দিয়ে উড়ে চলল অন্য একটা বিপদে-পড়া রকেটের মানুষদের উদ্ধার করতে।

সিনেমাটা শেষ হবার আগেই হঠাৎ রা এক সময় সুইচ বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'নী, শিগগির বাইরে দ্যাখ, এরকম দৃশ্য সহজে দেখতে পাবি না!'

নী সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী দেখব? কই কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো?'

'ভালো করে তাকিয়ে থাক্!'

'ধোঁয়ার মতন কী যেন ভাসছে। আকাশে এত ধোঁয়া এল কী করে?'

'আমি একটু বাঁ পাশে সরে যাচ্ছি, তখন ভালো করে দেখতে পাবি।'

সেই ধোঁয়া থেকে রকেটটা খানিকটা বাঁ পাশে সরে যেতেই নী চমকে উঠল। মনে হল, একটা প্রকাণ্ড বিড়াল যেন আকাশ জুড়ে গুমড়ি খেয়ে আছে, সারা শরীরটা টান-টান, পেছনের পা দুটো গুটিয়ে আছে শরীরের সঙ্গে, তার লেজটা শরীরের চেয়েও বড়। বেড়ালের মতন দেখতে বটে, কিন্তু সেটা যে কত হাজার কিলোমিটার লম্বা তার ঠিক নেই।

'ওটা কী, রা-দি?

'কী বল তো। আন্দাজ কর!'

'এরকম জিনিস কখনও দেখিনি।'

'ওটা একটা ধূমকেতু। তুই আগে ধূমকেতু দেখিসনি কখনও?'

'ছবিতে দেখেছি। কিন্তু ধূমকেতু যে এমন হয় জানতুম না তো!'

'আমাদের যাওয়া-আসার পথে তো অনেক ধূমকেতু পড়ে। কিন্তু এটার বিশেষত্ব হচ্ছে, এটা দেখতে ঠিক একটা জীবন্ত প্রাণীর মতন। এটাকে আমি আগে একবার মাত্র দেখেছি।'

'মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা বেড়াল লাফ দিয়েছে। আচ্ছা রা-দি, ওই ধূমকেতুটার মধ্যে ঢোকা যায় না?'

'বেড়ালের পেটে ঢুকে যাবি, তারপর যদি আর বেরুতে না পারিস? তা ছাড়া আমরা একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি, এখন খেলা করবার সময় নয়।'

ধূমকেতুটার অনেকগুলো ছবি তুলে ফেলল নী। ওদের রকেট সেটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চলল।

খানিক বাদেই দেখা গেল লালগোলাপ উপগ্রহটিকে।

সেটির কাছাকাছি আসতেই নী উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠিক একরকম! ধ্যান-বড়ি খেয়ে ঠিক এইরকম দেখেছিলাম।'

রা ব্যস্ত হয়ে পড়ল নানারকম বোতাম টেপায়। পাতলা-পাতলা লাল রঙের মেঘ উড়ছে উপগ্রহটিকে ঘিরে। রা দুটি চশমা বার করে একটা পরে নিল নিজে, আর-একটা এগিয়ে দিল নী-র দিকে। এই চশমা না পরলে লালগোলাপ-উপগ্রহে নেমে কিছুই চোখে দেখা যায় না। নানারকম ট্যাবলেট বার করে রা নিজেও খেয়ে নিল, নী-কেও খাওয়াল। রকেটটা এক্ষুণি মাটি ছোঁবে।

শেষ ঝাঁকুনিটা সহ্য করার জন্য দু-জনেই আসন-বন্ধনী কোমরে বেঁধে, মাথার নিচে হাত রেখে চোখ বুজে রইল। রা গুনতে লাগল, এক-দুই-তিন-চার। ঠিক দশ গোনার সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁকুনি লাগল বেশ জোরে।

রা চোখ খুলে বলল, 'এসে গেছি!'

রকেট থেকে নামবার আগে রা একবার দেখে এল ঝাঁকুনির জন্য ঝিলম আর ইউনুসের কোনও অসুবিধে হয়েছে কি না। কিছুই হয়নি, দুটি কাচের বাক্সের মধ্যে ওরা দু'জনে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দেখলে মনে হয় যেন দুটি পুতুল।

বাক্স দুটির ভেতর লাগানো আছে দুটি ঘড়ি। সময় হয়ে গেলেই খুব জোরে বেল বাজিয়ে ওদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে। ঘড়ি দেখে রা বুঝল, ওদের ঘুম ভাঙতে আর খুব বেশি দেরি নেই।

সিঁড়ি আগেই নেমে গেছে, এবার দরজা খুলে ওরা নেমে এল নিচে। দু-জনেই ওভারকোট গায়ে দিয়ে নেমেছে। লালগোলাপ-উপগ্রহটিকে ওপর থেকে যত সুন্দর দেখায় আসলে জায়গাটা অবশ্য তেমন সুন্দর নয়। মাটির রঙ বারুদ রঙের, এবড়োখেবড়ো, কোনওরকম প্রাণীর চিহ্ন নেই এখানে। লাল রঙের মেঘগুলোতে অম্লজান নেই বলে কখনো বৃষ্টি হয় না, শুধু শোভা হয়েই ভেসে বেড়ায়।

রা বলল, 'সাবধানে হাঁটবি, ঠিক ভাবে পা ফেলে ফেলে, একটু তাড়াহুড়ো করলেই হোঁচট খেয়ে পড়বি।'

নী বলল, 'রা-দি, ওই যে ধূমকেতুটা দেখলাম, ওইটা নিয়ে একটা কবিতা আমার মাথায় এসেছে।'

'পরে শুনব, এখন কবিতা শোনার মেজাজ নেই। ভাঙা রকেটটা দেখতে পাচ্ছিস?'

'কই, না তো!'

'চশমাটা ঠিক করে পরিসনি নিশ্চয়ই। দু'হাতে চেপে ঠিক করে বসিয়ে নে।'

অন্য একটা রকেট একটা টিলার পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। রা সেটার কাছে এসে ভুরু কুঁচকে তাকাল। রকেটটার রং কালো, গায়ে কোনও দেশের চিহ্ন আঁকা নেই, গড়নটাও অচেনা ধরনের। দরজাটা খোলা। কিন্তু সিঁড়ি নেই।

টিলার গায়ের সঙ্গে রকেটটা লেগে আছে বলে রা সেই টিলার ওপরে খানিকটা উঠে গিয়ে বলল, 'তুই নিচে থাক, নী, আমি ভেতরটা দেখে আসছি।'

রা ভেতরে দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ভেতরে কেউ আছে?'

কোনও উত্তর এল না।

দু-তিনবার ডেকেও কোনও সাড়া না পেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতরটা অন্ধকার। রা ওভারকোটের পকেট থেকে একটা পেন্সিল টর্চ বার করল, সেটাতে অসম্ভব জোর আলো হয়। সেই আলোতে রা রকেটটার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখল। ভেতরে কোনও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। শুধু তাই নয়, রকেটটা দেখে রা-র মনে হল, এটা অনেকদিন চালু নেই, যন্ত্রপাতি অধিকাংশই অকেজো। খবর পাঠাবার যন্ত্রটি রা বেশ ভালো ভাবে নেড়েচেড়ে দেখল। যন্ত্রটা একেবারেই খারাপ, এই যন্ত্র দিয়ে খবর পাঠাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

রা নিচে নেমে এসে বলল, 'আশ্চর্য।'

নী মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে কী যেন দেখছিল, মাথা তুলে বলল, 'রা-দি, এখানে মনে হচ্ছে রক্তের দাগ।'

রা দেখল বারুদ-রঙা মাটির ওপরে খানিকটা কালো-কালো ছোপ। রক্ত হলেও হতে পারে। সে বলল, 'ওটা যদি রক্তের দাগ হয়ও, তা হলেও বেশ পুরোনো, দু-এক দিনের নয়। কিন্তু এই রকেটের লোকজন গেল কোথায়? খবরই বা কে পাঠাল?

'ভেতরে কেউ নেই?'

'না।'

'বোধহয় আমাদের দেরি দেখে তারা অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়েছে।'

'না, আমরা ভুল জায়গায় এসেছি। অন্য কোনও রকেটের যাত্রীরা আমাদের সাহায্য চেয়েছে। এটা এখানে পড়ে আছে আনেক আগে থেকেই।'

'তা হলে? আমরা কি পায়ে হেঁটে খুঁজব, না আবার আমাদের রকেটে চেপে—'

নী-র কথা শেষ হল না। টিলার অন্য পাশ দিয়ে একসঙ্গে সমান তালে পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে এল পাঁচজন মানুষ। তারা প্রত্যেকেই স্পেস-হেলমেট পরে আছে বলে তাদের মুখ দেখা যায় না ভালো করে। একজনের হাতে ঝোলানো একটা চকচকে ইস্পাত-রঙের বাক্স।

ওদের পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে নী বলল, 'রা-দি, ওই লোকগুলোকে আমার মোটেই ভালো বলে মনে হচ্ছে না। ওরা আসবার আগেই চলো আমরা রকেটে উঠে পালিয়ে যাই।'

রা বলল, 'ছেলেমানুষি করিস না, চুপ করে দাঁড়া।'

লোকগুলো এসে ওদের চার পাশ ঘিরে দাঁড়াল।

৪

রা কোনও কথা বলল না।

অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই বলতে হয়, জীবন কীরকম, অথবা আপনার জীবন সুন্দর হোক, এই ধরনের কিছু। ছেলেরা আর মেয়েরা থাকলে প্রথমে ছেলেরাই বলে, সেটাই ভদ্রতা।

এরা সেরকম কিছুই বলল না। চৌকো বাক্সওয়ালা লোকটি একটু কাছে এগিয়ে এসে রা-র মুখের দিকে তাকিয়ে এসপারান্টো ভাষায় বলল, 'বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই, আপনারা আমাদের বন্দি? আপনারা দু'জনেই চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলুন।'

রা জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কে?'

লোকটি বলল, 'প্রশ্ন করলেই উত্তর পাবার অধিকার থাকে না। বিশেষত বন্দিদের থাকে না।'

লোকটির গলার আওয়াজ খুব কর্কশ। কিংবা ইচ্ছে করেই ওদের ভয় দেখাবার জন্যই বোধহয় হেঁড়ে গলায় কথা বলছে।

এবার রা কোটের পকেট থেকে ডান হাতটা বার করল। সেই হাতে খুব ছোট্ট একটা রিভলভার। সেটা দিয়ে সে লোকগুলোকে গুলি করবার কিংবা ভয় দেখাবার কোনও চেষ্টাই করল না সামনের মাটিতে একখণ্ড পাথরের দিকে ট্রিগার টিপল। কোনও শব্দ হল না, কিন্তু দেখা গেল কোনও অদৃশ্য শক্তিতে সেটা মুড়মুড় করে ভেঙে যেতে-যেতে একেবারে ধুলোর মতন গুঁড়িয়ে গেল।

রা মুখ তুলে বলল, 'এই পিস্তলটা দিয়ে ইচ্ছে করলে মানুষ কিংবা তার চেয়েও বড় কোনও প্রাণীর দেহ গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।'

চৌকো বাক্সওয়ালা লোকটি বলল, 'এবার এদিকে দেখুন!'

লোকটি তার হাতের বাক্সটায় একটা বোতাম টিপতেই একটা আলোর রেখা গিয়ে পড়ল আর-একটা পাথরের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে পাথরটা এক লাফে উঠে গেল শূন্যে।

লোকটি বলল, 'মানুষেব চেয়েও কোনও বড় প্রাণীকে এই ভাবে আমি চোখের নিমেষে কাছে টেনে আনতে পারি কিংবা দূরে সরিয়ে দিতে পারি।'

রা জিগ্যেস করল, 'আমার এই অস্ত্রটা আপনার বাক্সটাকে তার আগেই গুঁড়ো করে ফেলতে পারবে না বলতে চান?'

'চেষ্টা করে দেখুন।'

'তার দরকার নেই, আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট!'

'এবার আপনারা দু'জনে চশমা খুলে ফেলুন!'

'না, আমরা চশমা খুলব না।'

'বুঝতেই পারছেন প্রতিবাদ করে কোনও লাভ নেই।'

ইনফ্রা রেড চশমা না পরে থাকলে এই লালগোলাপ গ্রহটিতে খালি চোখে কিছু দেখা যায় না তো বটেই, কয়েক ঘণ্টা সেরকমভাবে থাকলে অন্ধ হয়ে যাবারও সম্ভাবনা। রা তা জানে।

নী রা-এর বাঁ-হাঁত চেপে ধরে বলল, 'রা-দি, এই লোকগুলো নিশ্চয়ই মেঘ-চোর।

রা কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। সে কোটের পকেট থেকে দুটো ট্যাবলেট বার করে একটা নী-কে দিয়ে বলল, 'চট করে খেয়ে নে। একটু দূরে সরে দাঁড়া। খবরদার আমাকে আর ছুঁবি না।'

অন্য লোকগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মতন। তাদের হাতে কিন্তু কোনও অস্ত্র নেই। বাক্সওয়ালা লোকটিই আবার বলল, 'শুধু-শুধু সময় নষ্ট করবেন না। আপনারা চলুন, আপনাদের তাঁবুতে রাখা হবে, সেখানে খাবার দাবারের কোনও কষ্ট নেই। আপনাদের চশমা দুটোও আমরা একটু পরে ফেরত দেব। আপনাদের রকেটটা আমাদের চাই।'

রা লোকটিকে ধমক দিয়ে বলল, 'আপনারা বিপদে-পড়ার ভান করে সাহায্য চেয়ে খুব অন্যায় করেছেন। ভবিষ্যতে আবার কেউ যদি বিপদে পড়ে সাহায্য চায়, আমরা কি তাকে বিশ্বাস করব? ভাবব, আবার কোনও বদমাস লোক মিথ্যে সাহায্য চাইছে?'

লোকটি বলল, 'সেরকম সুযোগই আর আপনাদের আসবে না।'

'আপনারা আমাদের রকেটটা নিতে চাইছেন। কিন্তু ওই রকেটে আমাদের দু'জন সঙ্গী আছে। তারা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।'

'আপনাদের পুরুষরা বুঝি মেয়েদের রকেট চালাতে দিয়ে নিজেরা ঘুমোয়? বাঃ চমৎকার তো!'

'কতটা চমৎকার, তা বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই মনে হয়। যাই হোক, যা বলছিলাম, ওরা ঘুমিয়ে আছে। ওদের জাগানোও যাবে না, নামানোও যাবে না। সুতরাং তাদের সুদ্ধু আপনারা রকেটটা নেবেন কী করে?'

'সে আমরা ব্যবস্থা করব! তাতে আমাদের কোনও অসুবিধে নেই।'

'তার মানে রকেট চালিয়ে দিয়ে এক সময় ওদের আপনারা কলা কিংবা কমলালেবুর খোসা ছোঁড়ার মতন বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, তাই না। আপনারা জানেন না, মহাশূন্যে কোনওরকম আবর্জনা ফেলা নিষেধ?'

'ভদ্রমহোদয়া, আপনি দেখছি খুব সুন্দর কথা বলতে পারেন। আমি দুঃখিত যে, আপনার সুন্দর-সুন্দর কথা শুনে সময় নষ্ট করতে পারছি না এখন। আমাদের সঙ্গে চলুন। আশা করি আমাদের জোর করতে বাধ্য করবেন না।

'আপনারা কেন আমাদের বন্দি করছেন?'

'আমরা কে, কেন আপনাদের বন্দি করছি, এই সব ছেলেমানুষি প্রশ্ন কেন করছেন? কোনওটারই উত্তর দেব না।'

'উত্তর দিতে হবে না, আমি বলছি শুনুন। আপনারা পৃথিবীর লোক নন। প্রথম সাহায্য চাইবার সময় আপনারা রাশিয়ান ভাষা বলেছিলেন, কিন্তু আপনারা যে রাশিয়ান নন, সেটা তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল। আপনারা যে এসপারান্টো বলছেন, তাও অন্যরকম। রকেটকে আপনি বলছেন রকাইট, কান্নুংগাকে আপনারা বলছেন কানুনজা, সুন্দরকে বলছেন, ছুইস্তার! আপনারা শুক্রগ্রহের মানুষ, তাই না?'

শুক্রগ্রহের লোক অবশ্য পৃথিবীর মানুষই। আজ থেকে বাষট্টি বছর আগে মানুষ জয় করেছিল শুক্রগ্রহ, সেটা একুশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। শুক্রগ্রহে আলো-হাওয়া খুব খারাপ বলে প্রথমে কয়েকজন ফাঁসির আসামিকে পাঠানো হয়েছিল সেখানে। তারা বেঁচে যেতে, তারপর থেকে বেশ কয়েক বছর শুধু চোর-গুন্ডা-বদমাসদের নির্বাসন দেওয়া হত শুক্রগ্রহে। ক্রমশ সেই লোকগুলোই শুক্রগ্রহে চাষবাস করে, শহর বানিয়ে খুব উন্নতি করেছে। কিছুদিন হল তারা বিজ্ঞানেও খুব উন্নতি করেছে বলে শুনেছে রা। সে অবশ্য শুক্রগ্রহে একবারও যায়নি। লোকগুলো তা হলে এতদূর এগিয়েছে যে, সূর্যমন্ডলের বাইরেও যেতে শিখেছে? এ-খবর পৃথিবীর লোক বোধহয় এখনও জানে না।

বাক্সওয়ালা লোকটি বলল, 'আপনার বুদ্ধি আছে, তা স্বীকার করতেই হবে। এখন চলুন তো। চশমা যদি না খোলেন, তা হলে জোর করে খুলে নিতেই হবে।'

রা ওভারকোটের হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখল। ছোট রিভলভারটা সে আগেই পকেটে ভরে ফেলেছে। একেবারে খালি হাতে সে বাক্সওয়ালা লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'ছিঃ, ওরকম কথা বলে না। কোনও মেয়ের চোখ থেকে জোর করে চশমা খুলে নিতে নেই।'

রা আরও এক পা এগুতেই লোকটি বাক্সের বোতাম টিপল। তাতে রা পাথরের টুকরোটার মতন আকাশেও উড়ে গেল না. লোকটির কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়েও পড়ল না। সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল! রা হাসিমুখে লোকটির দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল, 'আপনি আমায় ধরুন তো!'

স্পেস হেলমেট পরে থাকায় লোকটি যে কত অবাক হয়েছে তা তার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। তবে তার চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে গেছে। রা-কে সে ছুঁতে সাহস করল না।

রা বলল, 'আপনি আমায় ধরবেন না? কিন্তু আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তা হলে আমি আপনাকে জড়িয়ে ধরি?'

রা লোকটির কাঁধে হাত রাখতেই লোকটি বাক্স সমেত ছিটকে গিয়ে দূরে পড়ল। অন্য লোকগুলোর মধ্যে দু-তিনজন ঠিক এই সময় দৌড়ে ধরতে গেল নী-কে, তাদেরও ঠিক একই অবস্থা হল। নী-র গায়ে হাত দেওয়া মাত্রই তারাও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

রা আর নী একটু আগে যে ট্যাবলেট খেয়েছে, তার ফলে তাদের শরীরে দারুণ শক্তিশালী বিরুদ্ধ-চুম্বকশক্তি জন্মে গেছে। কোনও জীবিত প্রাণী তাদের ছুঁতে পারবে না। এটা হচ্ছে সবচেয়ে নতুন আত্মরক্ষার অস্ত্র। এতে কেউ মরে যায় না, কিন্তু উচিৎ শাস্তি পায়।

যে একটা মাত্র লোক রা কিংবা নী-কে ছোঁয়নি, সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দু-একবার এদিক-ওদিক তাকাল, তারপর দৌড়ে গেল রা-দের রকেটটার দিকে।

বাক্সওয়ালা লোকটা মাটিতে পড়ে গিয়েও চেঁচিয়ে বলল, 'এস্ এস্, শিগগির রকেটটা দখল করো।'

লোকটা রকেটের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল তরতরিয়ে।

রা কিন্তু সেই লোকটাকে বাধা দেবার কোনও চেষ্টাই করল না। সে হাসি মুখে তাকিয়ে রইল নিজেদের রকেটটার দিকে। শুক্রগ্রহের লোকটি ভেতরে ঢোকার একটু পরেই আঁ-আঁ করে দারুণ ভয়ার্ত চিৎকার শুরু করল। তারপর চিৎকারটা এমন ভাবে থেমে গেল যে, বোঝা যায়, লোকটি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

রা বাক্সওয়ালার দিকে চেয়ে বলল, 'তোমাদের ওই বন্ধুটি আর ফিরবে না। মূর্খ, শেষ অস্ত্রটির কথা আগে কক্ষনও জানাতে নেই।'

তারপর সে নী-কে ডেকে বলল, 'চল রে, নী, আমরা রকেটে ফিরে যাই।'

মাটিতে শুয়ে থাকা বাক্সওয়ালাকে রা বলল, 'কী আর একবার ছুঁয়ে দেব নাকি?'

লোকটি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'না, না, না, না!'

'আমরা এখন চলে যাচ্ছি বটে, তবে চিন্তা করবেন না, আমরা আবার অবশ্যই রাষ্ট্রসঙ্ঘের পুলিশ নিয়ে ফিরে আসব। ততক্ষণ পর্যন্ত গুড্‌লাক। আপনারা কি পৃথিবীর হিসেব জানেন? পৃথিবীর সময়ের হিসেব অনুযায়ী আর ঠিক ষোলো মিনিট পরে আপনারা উঠে দাঁড়াতে পারবেন। আচ্ছা ডাকাতবাবু, চলি এখন।'

নী একেবারে হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে অত বড়-বড় চেহারার লোক যখন তাকে ধরবার জন্য ছুটে এসেছিল, তখন আর একটু হলেই সে ভয়ে দৌড় মারত। লোকগুলো কীভাবে ছিটকে পড়ল তা সে বুঝতেই পারছে না। নী ছেলেমানুষ, সে এই অস্ত্রটার কথা কিছুই জানে না। সামান্য একটি ট্যাবলেট যে অস্ত্র হতে পারে, সে বুঝবে কী করে?

রা নী-র কাছে এসে বলল, 'শোন্, তুই আগে-আগে চল। ভেতরে ঢুকেই দেখবি ওই লোকটা অজ্ঞান হয়ে আছে। ভয় পাবি না, আর খবর্দার, কোনও কারণেই আমাকে ছুঁয়ে ফেলবি না কিন্তু। ভেতরে গিয়েই তুই স্নানের ঘরে ঢুকে পড়বি। সেখানে দেখেছিস তো জলের শাওয়ারের কলের পাশেই আর-একটা কল আছে? সেটা তুঁতে-আলোর শাওয়ার। সেই আলোতে স্নান করে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে!

নী প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে রকেটে উঠল, তারপর উঠল রা। ককপিটের কাছেই মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সেই লোকটা। সেদিকে বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে রা রকেটের সিঁড়ি তুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তরপর বলল, 'ধন্যবাদ জিউস! জীবন সুন্দর তো?'

কমপিউটার জিউস খুব নরম বকুনির সুরে বলল, 'রা, নিচে নামার আগে তোমার উচিত ছিল আমাকে একবার জিজ্ঞেস করা! হ্যাঁ জীবন সুন্দর।'

রা বলল, 'ভুল হয়ে গেছে। এই নী মেয়েটা এমন তাড়াহুড়ো করল! ছেলেমানুষ তো, বড্ড আবেগপ্রবণ। তবু আমি জানতাম, আমি ভুল করলেও তোমার সাহায্য পাবই!'

'রকেট তাড়াতাড়ি চালু করে দাও, রা। ওরা একরকম গোলা ছোঁড়বার চেষ্টা করছে।'

'অদ্ভুত তো লোকগুলো! গোলা ছুঁড়ে আমাদের রকেটটা নষ্ট করে ওদের কী লাভ?'

'তুমি এন ফ্রিকোয়েন্সি মাইক্রোওয়েভ পাঠিয়ে দাও, তাতেই ওরা ঠান্ডা হয়ে যাবে।'

'না, না আমি ওদের মারতে চাই না। আমি কোনও মানুষকেই মারতে চাই না। এই লোকগুলো বোধহয় পাগল, নইলে এমন করবে কেন?'

জিউস হা-হা করে হেসে উঠল। জিউস এমনিতে খুব কম হাসে।

রা ততক্ষণে রকেট চালু করে দিয়েছে। ওভারকোটটা খুলে ফেলে সে হালকা হয়ে নিল। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল, লালগোলাপের মেঘ ভেদ করে কতকগুলো আগুনের গোলা ছুটে আসছে। সেজন্য সে একটুও চিন্তিত হল না। ওই গোলার একটাও তার রকেট ছুঁতে পারবে না।

রকেট চালু হবার পর আসন-বন্ধনী খুলে উঠে এসে মাটিতে পড়ে-থাকা লোকটির পাশে দাঁড়াল। রকেট ছাড়ার সময় প্রথম ঝাঁকুনিতে লোকটি দেয়ালেব গায়ে একটা ধাক্কা খেয়েছে।

রা বলল, 'ইস ওর কথা খেয়াল করিনি তো!'

লোকটার একটা হাত পিঠের নিচে পড়েছে বলে নী সেটা ঠিক করে দিতে যাচ্ছিল, রা তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'এই কী করছিস? তুই লোকটাকে মারবি নাকি? এখনও আমাদের শরীর চুম্বক-বিরোধী হয়ে আছে না? যা, শিগগির স্নান করে আয়!'

দুজনে দুটো বাথরুমে ঢুকে ঝটপট স্নান করে পোশাক বদলে বেরিয়ে এল। কড়া ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় ওদের চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে।

লোকটির কাছে এসে রা নী-কে বলল, 'তুই ওর পা দুটো ধর তো, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। দেরি হয়ে গেল!'

দুজনে ধরাধরি করে ওকে নিয়ে এল স্বয়ংক্রিয় হাসপাতালে। লোকটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে রা বলল, 'জিউস, একে একটু চটপট দেখবে?'

জিউস বলল, 'তুমি ওর মাথা থেকে স্পেস-হেলমেটটা খুলে নাও।'

রা স্পেস-হেলমেটটা খুলে নিয়ে দেখল, লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, গালে অল্প-অল্প দাড়ি, বাঁ চোখের ঠিক ওপরেই একটা কাটা দাগ। লোকটির চুল ও দাড়ির রং হলদে-হলদে, তা দেখে রা অবাক হল না। শুক্রগ্রহে মানুষের চুল-দাড়ির রং এরকম বদলে গেছে, সে আগেই শুনেছে।

দুটি রবারের হাত বেরিয়ে এসে পরীক্ষা করতে লাগল লোকটাকে।

রা আবার জিগ্যেস করল, 'লোকটা বাঁচবে তো জিউস?'

জিউস বলল, 'তুমি যখন কোনও মানুষকে মারতে চাও না, তখন ওকে বাঁচাতেই হবে।'

রবারের হাত দুটিই লোকটিকে পটাপট ইঞ্জেকশান দিতে লাগল।

একটু পরে জিউস বলল, 'শোনো রা, এই লোকটি কতখানি হিংস্র আমরা জানি

না। জ্ঞান ফিরে পাবার পর যদি ও তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? ওর গায়ে যেরকম শক্তি, তোমরা দুজনে তো ওর সঙ্গে পারবে না!'

'তুমিই তো রয়েছো জিউস। তুমি আমাদের রক্ষা করবে।'

'তাতে একটু অসুবিধে আছে।'

'কিন্তু লোকটা রকেটে ওঠা মাত্রই তো তুমি ওকে ঠান্ডা করে দিলে।'

'হ্যাঁ তখন অতিকম্পন দিয়ে আমি ওকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম। কম্পন আর একটু বাড়ালে ওর হাত-পাগুলো টুকরো-টুকরো হয়ে যেত। কিন্তু তোমরা কাছাকাছি থাকলে তো তা পারব না। সেইজন্যই আমি বলি কী, ওকে এখন ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে রাখা হোক।'

'কিন্তু আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই যে! ওরা কেন আমাদের বন্দি করে রকেটটা নিয়ে নিতে চাইছিল, তা আমি জানতে চাই।'

'তুমি জেরা করে ওর পেট থেকে কথা বার করবে ভাবছ? তা তুমি পারবে না। বরং ইউনুস জেগে উঠুক—'

'তুমি যন্ত্র হয়েও মেয়ে আর ছেলেতে কেন তফাত করো বলো তো? ইউনুস ছেলে বলেই পারবে, আর আমি মেয়ে বলে পারব না?'

'আমি সেভাবে বলিনি। তুমি রাগ করছ কেন, রা? মনের শান্তি কত দুর্লভ, তা কি যখন-তখন নষ্ট করতে আছে? শান্তি, শান্তি, শান্তি, তোমার মন শান্ত হোক!'

জিউসের গলায় দুঃখের সুর পেয়ে রা তক্ষুণি বলল, 'আমি অন্যায় ভাবে রাগ করেছি জিউস। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

জিউস বলল, 'তোমায় ক্ষমা চাইতে হবে না। সত্যিই তো আমি যন্ত্র; আমার রাগ নেই, দুঃখ নেই, হিংসা নেই, মায়া-মমতা নেই। তোমরা তো এগুলো আমায় দাওনি। মেয়ে-পুরুষের তফাতও আমি বুঝি না। আমি বলছিলাম কী, মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে দু-চোখের দৃষ্টি এক করে তার মনের কথা পড়ে ফেলার ব্যাপারে ইউনুস এক বছর ট্রেনিং নিয়েছে। তুমি তো সে ট্রেনিং নাওনি!'

'ও, ঠিকই তো, আমি ভুলে গিয়েছিলাম! তা হলে—'

রা-র কথা শেষ হল না। শুক্রগ্রহের লোকটি লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমেই নী-কে ধরে কাঁধে তুলে নিল।

তারপর রা-কে হুকুম করল, 'এক্ষুণি রকেটের মুখ ঘোরাও। আমরা লালগোলাপে ফিরে যাব।'

ব্যাপারটা একেবারে চোখের নিমেষে ঘটে গেল। জিউসের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে রা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। লোকটার জ্ঞান নিশ্চয়ই আগেই ফিরে এসেছে, এতক্ষণ ওদের কথা শুনেছে।

নী ছটফট করছে, কিন্তু লোকটার গায়ে দারুণ শক্তি। শক্ত করে চেপে ধরে আছে নী-কে।

জিউস বলল, 'আমি এই ভয়ই পাচ্ছিলাম।'

লোকটি বলল, 'আমার কোনও ক্ষতি করবার চেষ্টা করলেই এই মেয়েটিকে আমি আগে মেরে ফেলব! এক্ষুণি ককপিটে চলো, রকেট ঘোরাতে হবে।'

রা গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি জানি আপনার নাম এস। জীবন কী-রকম শ্রীযুক্ত এস?'

লোকটি বলল, 'ওসব তোমাদের পৃথিবীর ন্যাকামি-কথা ছাড়ো! চলো ককপিটে।'

রা হাত তুলে লোকটিকে আদেশ দিল, 'আপনি ওই মেয়েটিকে নামিয়ে দিন। আর ভদ্রভাবে কথা বলুন, শ্রীযুক্ত এস!'

এর উত্তরে লোকটি ঘরের দেয়ালে ঠকাস করে নী-র মাথাটা ঠুকে দিয়ে বলল, 'এই দেখলে? আর-এক ঠোকায় এর মাথাটা ছাতু করে দিতে পারি। যদি এই মেয়েটিকে বাঁচাতে চাও, তবে আমার হুকুম মানতে তোমরা বাধ্য।'

নী চেঁচিয়ে বলল, রা-দি, ও আমায় মেরে ফেলুক তবু তুমি ওর কথা শুনো না!'

লোকটি দড়াম করে লাথি দিয়ে হাসপাতালের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে।

জিউস বলল, 'রা, দ্যাখো, তোমরা বিজ্ঞানে কত উন্নতি করছ, তবু শেষ পর্যন্ত মানুষের গায়ের জোরই জিতে যাচ্ছে।'

রা বলল, 'তুমি নজর রাখো, জিউস। ও কোনও-না-কোনও ভুল করবেই। গায়ের জোর নয়, শেষ পর্যন্ত জেতা যায় মনের জোরে।'

রা-ও হাসপাতাল-ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নী-কে কাঁধে চেপে ধরে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ককপিটের সামনে। রা-কে দেখে সে বলল, 'অতিকম্পন দিয়ে আমাদের দু-জনকেই মাটিতে ফেলে অজ্ঞান করার চেষ্টা যদি করো, তাহলে প্রথম ঝাঁকুনি লাগার সঙ্গে-সঙ্গে আমি মেয়েটাকে মেরে ফেলব। তারপর আমার যা হয় হোক।'

নী লোকটির একটা কান কামড়ে ধরল।

লোকটি যন্ত্রণায় দুবার আ-আ চিৎকার করেই রাগে গর্জন করে রা-কে বলল, 'শিগগির ওকে বারণ করো। নইলে আমি এক্ষুনি ওকে শেষ করে দেব!'

রা বলল, 'নী, ওরকম করে না! ছেড়ে দে। ও যতই অসভ্যতা করুক, তা বলে আমরা করব কেন!'

নী ওর কান ছেড়ে দিতেই লোকটি তাকে নামিয়ে নিজের সামনে রেখে কাঁধ দুটো শক্ত করে চেপে ধরে রইল। লোকটির পিঠ দেয়ালের দিকে।

ককপিটের ওপরের দিকে বিপ-বিপ শব্দ হতে লাগল। বাইরে থেকে কোনও খবর এসেছে।

লোকটি বলল, 'ফোন ধোরো না! রকেটের মুখ ঘোরাও।'

রা বলল, 'অত চেঁচিয়ে কথা বলার দরকার নেই। আমরা লালগোলাপেই ফিরে যাচ্ছি।'

রা নিজের আসনে বসে কয়েকটা বোতাম টিপল।

লোকটি বলল, 'আমার সঙ্গে চালাকি কোরো না। অন্য কোনও দিকে গেলে আমি ঠিক বুঝতে পারব। তুমি স্ক্যানার দেখাও, কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যাচ্ছ, আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।'

রা বলল, 'মূর্খ, আমি লালগোলাপে যাবার নাম করে যদি তোমাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্পেস-স্টেশন নং একুশে নিয়ে যাই, তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। এই রকেটের স্ক্যানার দেখে বুঝতে পারে, এমন লোক মাত্র তিনজনই আছে। কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলি না। তোমরা পৃথিবী থেকে অনেকদিন আগে শুক্রগ্রহে চলে গেছ বলে, আগেকার পৃথিবীর মানুষদের খারাপ দোষগুলো এখনও ভুলতে পারনি। ওই দ্যাখো লালগোলাপ!'

ককপিটের সামনের কাচে লালগোলাপ উপগ্রহের এক হাজার গুণ বড় করা ছবি ফুটে উঠল। সেটা ক্রমশ আরও বড় হচ্ছে।

লোকটির মুখে এবার হাসি ফুটে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণের মধ্যে পৌঁছোব?'

রা ঘড়ি দেখে বলল, 'ধরো, আর পনেরো মিনিট।'

নী ব্যাকুলভাবে বলল, 'রা-দি তুমি কী করছ? ওরা আমাদের রকেটটা কেড়ে নিয়ে লালগোলাপে আমাদের ফেলে রেখে পালাবে। তাতে তো আমরা এমনিই মরব! তারচেয়ে বরং আমি একলা মরি। তারপর তুমি এই লোকটাকে শাস্তি দিও।'

রা বলল, 'মরা কি অত সহজ নাকি? সুন্দর এই জীবন, সময় ফুরোবার আগে কেন এই জীবন নষ্ট হবে?'

আর তখনই রকেটের আর একটা চেম্বারে ঝিনঝিন-ঝিনঝিন করে বেজে উঠল একটা ঘড়ির অ্যালার্ম। আওয়াজটা খুব জোর নয়। কিন্তু রা শুনতে পেয়েছে ঠিকই।

৫

পৃথিবীর হিসেবে আঠাশ দিন, আর মহাকাশের হিসেবে একদিন পর ঘুম ভাঙল ঝিলমের। ঘড়ির অ্যালার্ম বাজে তার ঘুম ভাঙাবার জন্য নয়, অন্যদের জানাবার জন্য। ট্যাবলেট খাওয়া ঘুম কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সময়ে ভাঙে।

চোখ মেলে ঝিলম এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটু অবাক হল। রা পাশে নেই কেন? হাত দিয়ে কাচের ডালাটা ঠেলে তুলল সে।

মহাশূন্যে অনেকদিন ঘুরে বেড়ালেও মানুষের শরীর এখনও পৃথিবীর নিয়মে চলে! এতক্ষণ পরে ঘুম ভাঙলেই খিদে পায় খুব, শরীর দুর্বল লাগে। সেইজন্যই গ্লুকোজ মেশানো কমলালেবুর রস নিয়ে একজন কারুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ম। উঠে বসতেই ঝিলমের মাথাটা যেন ঝিমঝিম করে উঠল, আর তখনই কে যেন তার কানের পাশে ফিসফিস করে বলল, 'সুপ্রভাত, ঝিলম!'

ঝিলম বলল, 'সুপ্রভাত, জিউস। জীবন সুন্দর তো?'

জিউস বলল, 'ততটা সুন্দর বলতে পারছি না। এই রকেটে অন্য একজন লোক আছে...সে তোমাদের সকলকে বন্দি করবার জন্য লালগোলাপ উপগ্রহে নিয়ে যাচ্ছে।

'অ্যাঁ?'

'উত্তেজিত হয়ো না। উঠে দাঁড়িও না। এক্ষুনি উঠলেই তুমি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। আমি দুঃখিত। আমার হাত অত বেশি লম্বা নয় বলে তোমাকে ফলের রস পৌঁছে দিতে পারছি না। একটু বিশ্রাম নাও!'

সেই কাচের বাক্সের মধ্যেই বসে থেকে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝিলম জিগ্যেস করল, 'রা আর নী কোথায়?'

'সেই লোকটা ওদের আটকে রেখেছে।'

'তুমি কী করছ? তোমাকে তো আটকে রাখেনি। তুমি ওই একটা মাত্র লোককে—'

'এ ক্ষেত্রে আমি অসহায়।'

সঙ্গে-সঙ্গে ঝিলম উঠে দাঁড়াল।

জিউস বলল, 'আর একটু থাকো, আর একটু বিশ্রাম নাও, সময় হলে আমি বলে দেব—'

'আমি ঠিক আছি।'

কাচের বাক্সটার বাইরে বেরিয়ে এসে ঝিলম প্রায় টলতে-টলতে চলে এল পাশের রান্নাঘরে। ঘুম থেকে উঠে ঝিলম ফলের রস, তারপর টোস্ট, সসেজ, সমুদ্র-শ্যাওলার সালাড আর তিমিমাছের কেক খেতে ভালোবাসে। এখন সে খুব তাড়াতাড়ি এক ঢোঁক ফলের রস, কয়েকখানা বিস্কিট আর গোটা ছয়েক নিউট্রিশন ট্যাবলেট খেয়ে নিল। রকেটের সব জায়গাতেই কথা বলার টিউব আছে, জিউস এখানেও ফিসফিস করে তাকে সব ঘটনাটা শুনিয়ে যাচ্ছে।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে, ঘুম-ঘরে আবার ঢুকে ঝিলম একটা পোশাকের ওরার্ডরোব খুলল। সেখানে কিছু পোশাক আর জুতো সাজানো। জুতোগুলোর মধ্যে ব্যস্তভাবে খুঁজতে লাগল ঝিলম, কিছুতেই যেন পছন্দমতন জুতো জোড়া খুঁজে পাচ্ছে না।

জিউস বলল, 'জুতোর জন্য তুমি সময় নষ্ট করছ, ঝিলম? এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান!'

ঝিলম তাকে এক ধমক দিয়ে বলল, 'বিপদে পড়লে দেখছি তোমারও মাথা খারাপ হয়ে যায়, জিউস! সব দিক চিন্তা করতে ভুলে যাও! মনে হচ্ছে তোমার একবার ওভারহলিং দরকার!'

এই রকেটে একমাত্র ঝিলমই জিউসকে ধমকে কথা বলতে পারে। ঠিক জুতো-জোড়া খুঁজে পেয়ে পরে নিতে-নিতে ঝিলম এবার ইউনুসের দিকে তাকাল। ইউনুসের ঘুম ভাঙতে আরও কয়েকদিন দেরি আছে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে ককপিট দেখা যায়। ককপিটের সামনে অনেকখানি লম্বা জায়গা। ঝিলম দেয়াল ধরে-ধরে একটু-একটু করে এগোতে লাগল, যেন পা ফেলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

ঝিলমের বয়েস তেইশ, গায়ের রং কুচকুচে কালো, সে খুবই সুপুরুষ। সাদা ট্রাউজার্স আর হাতকাটা সাদা গেঞ্জি পরে আছে সে, তার সঙ্গে খুবই বেমানান টুকটুকে লাল রঙের জুতো। খুবই জোর করে পা টেনে-টেনে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল ওপরে।

রা এদিকেই তাকিয়ে ছিল। ঝিলমকে দেখেও একটা কথা বলল না।

নী উত্তেজনা দমন করতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠল, 'ঝিলমদা, চলে যাও, শিগগিরই চলে যাও!'

দেয়ালে ভর দিয়ে হাঁপাতে লাগল ঝিলম।

এস নামের লোকটি ঝিলমকে দেখে নী-কে আরও শক্ত করে চেপে ধরে বলল, 'কোনওরকম ছেলেমানুষির চেষ্টা করে লাভ নেই। আমরা এক্ষুণি লালগোলাপে নামছি।'

ঝিলম লোকটির কথা একেবারেই গ্রাহ্য না করে রা-র দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, 'রা, আমি এই রকেটের কমান্ডার হিসেবে বলছি, এক্ষুণি এই রকেটের ট্রাজেকটরি বদলাও। আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্পেস স্টেশন নং ২৭-এ যাব। গড স্পিড।'

এস রা-কে বলল, 'রকেটের গতি পালটালে এই মেয়েটার কী দশা হবে তা তুমি ভাল করেই জানো!'

রা একবার ঝিলমের দিকে আর একবার এস-এর দিকে তাকাল।

ঝিলম বলল, 'রা, আমার হুকুম শুনতে পাওনি?'

রা ঝিলমকে বলল, 'কমান্ডারের হুকুম আমি মানতে বাধ্য।'

এস ঝিলমের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'এই খোকাটি দেখছি ভালো-মন্দ কিছুই বোঝে না। এখানে রক্তপাত হোক, ও চায়?'

রকেটের মুখটা তক্ষুনি যে বেঁকে গেল, তা বুঝতে কারুরই অসুবিধে হল না। সামনের স্ক্রিন থেকে লালগোলাপের ছবি সরে গেল।

এস নী কে উঁচুতে তুলে দাঁত চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'এই মেয়েটাকে আছড়ে আমি ওই মেয়েটাকে মারব। আমি ঠিক পাঁচ গুনব, তার মধ্যে রকেট যদি লালগোলাপের দিকে না ফেরে—'

ঝিলম বলল, 'গুনবার দরকার নেই, তুমি ওই মেয়ে দুটিকে মারো, আমি সেই দৃশ্যটা দেখতে চাই।'

ঝিলম দেয়াল থেকে হাত তুলে নিতেই স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে চোখের পলক ফেলার আগেই এস নামে লোকটির ওপরে গিয়ে পড়ল। ধস্তাধস্তি বিশেষ হল না, তার আগেই ঝিলম নী-কে ছাড়িয়ে নিয়েছে। তারপর এস-এর চিবুকে পরপর ঘুঁষি মেরে চলল সে।

রা উঠে এসে বলল, 'ঝিলম, এবার ছেড়ে দাও। হাজার হোক, মানুষ তো? মরে যাবে যে লোকটা!'

লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। হাত-পা ছড়িয়ে চোখ বুঁজে পড়ে আছে।

জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নিতে-নিতে ঝিলম বলল, 'এই বদমাসটা নী-কে কষ্ট দিয়েছে বলেই আমার অত রাগ হয়ে গিয়েছিল। আর একটু হলে বোধহয় ওকে আমি একেবারে শেষ করেই ফেলতাম!'

পা থেকে লাল জুতোজোড়া খুলে ফেলে ঝিলম নী-র দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার বেশি লাগেনি তো, নী?'

নী বলল, 'না ঝিলমদা! উঃ তোমার গায়ে কী জোর! অতবড় চেহারার লোকটাকে তুমি ঘুঁষি মেরে ঠান্ডা করে দিলে? অত জোরে তুমি লাফ দিলেই বা কী করে?'

ঝিলম বলল, 'ওসব কথা পরে হবে। আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমার জন্য খাবার তৈরি করে আনবে?'

রা বলল, 'আমি তোমার জন্য খাবার এনে দিচ্ছি, ঝিলম। ততক্ষণ তুমি কন্ট্রোলে বসো।'

ঝিলম উঠে দাঁড়াতেই কমপিউটার জিউস জানাল, 'এই লোকটি কিন্তু অজ্ঞান হয়নি। চোখ বুজে অজ্ঞানের ভান করে আছে।'

ঝিলম বলল, 'ওর হাত দুটো বেঁধে রাখা দরকার, যাতে হঠাৎ কোনও পেজোমি করতে না পারে আবার। রা, দড়ি-টড়ি কিছু আছে?'

রা হাসিমুখে বলল, 'দড়ি কোথায় পাব? রকেটে কখনও দড়ি লাগবে ভেবেছি নাকি?'

নী বলল, 'আসবার সময় মা আমাকে যে কেকের বাক্সটা দিয়েছিলেন, সেটা একটা সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল না?'

ঝিলম বলল, 'সেটা ফেলে দাওনি তো? দ্যাখো তো সেটা অ্যালয় সুতো কি না!'

নী সুতোটা খুঁজে নিয়ে এল। খুব সরু-সুতো, অনেকটা ঘুড়ি ওড়াবার সুতোর মতন, কিন্তু তাতে চার-পাঁচ রকমের রিঙ। ঝিলম সুতোটা হাতে নিয়ে বলল, 'বাঃ এতেই কাজ চলবে। এই অ্যালয় সুতো কোনও গোরিলাও ছিঁড়তে পারে না।'

ঝিলম সুতোটা নিয়ে কাছে যেতেই লোকটা ধড়মড় করে উঠে বসল।

ঝিলম বলল, 'আশা করি তুমি আবার আমায় ঘুঁষি মারতে বাধ্য করবে না! হাত দুটো উঁচু করো, আমি এই সুতোটা বেঁধে দেব!'

লোকটি বলল, 'বাঁধবার দরকার নেই, আমি আর কিছু করব না।'

ঝিলম বলল, 'তোমায় আমি বিশ্বাস করি না। যে একটা ছোট মেয়েকে তুলে আছাড় মারতে যেতে পারে, সে মানুষ নয়, অমানুষ।'

লোকটির হাত দুটো পিঠের দিকে নিয়ে সেই সরু সুতোটা দিয়ে বেঁধে ফেলল ঝিলম। তারপর তার কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা গোল বল বার করে আনল।

ঝিলম বলটা নেড়ে-চেড়ে দেখে বলল, 'বিচ্ছিরি জিনিস! এরকম একটা জিনিস কেউ পকেটে রাখে?'

ওই গোল বলটা একটা গ্রীনেড। সামান্য একটা টেনিস বলের মতন হলেও ওই একটা গ্রীনেড দিয়েই এই রকেটটা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

জিউস বলল, 'ওটা হাতে রেখো না, ঝিলম। এক্ষুণি ওটা জলে ডুবিয়ে দাও!'

ঝিলম বলল, 'জানি!'

বাথরুমে ঢুকে ঝিলম সেই বলটাকে সিঙ্কে ডুবিয়ে রেখে এল। তারপর কন্ট্রোল বোর্ডের সামনে চেয়ার নিয়ে বসতেই রা একটা প্লেটে সাজিয়ে খাবার এনে দিল তাকে।

ঝিলম বলল, 'চমৎকার! এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতন গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো তো!'

রা চমকে উঠে বলল, 'সে কী! এখন আমি ঘুমোব?'

ঝিলম বলল, 'নিশ্চয়ই? তোমার সময় হয়ে গেছে।'

রা মিনতি করে বলল, 'না, এখন আমার একটুও ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না! এই লোকটাকে জেরা করতে হবে।'

'সে আমি করব। তোমার এখন জেগে থাকা চলবে না।'

'আমার বদলে নী ঘুমোতে যাক বরং!'

'ইউনুস জেগে উঠলে নী ঘুমোতে যাবে। ইউনুসের আর বেশি দেরি নেই।'

'একটা দিন না-ঘুমোলে কী হয়?'

'তোমার আঠাশ দিন বয়েস বেড়ে যাবে। আমরা আর যাই পারি, হারানো সময়কে কিছুতেই ফিরে পেতে পারি না। লক্ষ্মীটি, যাও!'

রা আর তর্ক করল না। ঘুমের ঘরে গিয়ে কাচের বাক্সটা খুলে একটা ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়ল।

নিজের খাবার শেষ করতে-করতে ঝিলম বলল, 'নী, আমার পাশে এসে বসো। আমি যতক্ষণ খাই, ততক্ষণ তুমি একটা কবিতা শোনাও তো।'

নী বলল, 'বেড়ালের মতন চেহারার একটা ধূমকেতু দেখে আমি একটা কবিতা বানিয়েছিলুম, তারপর এমন সব কান্ড হল যে, সেটা আমি ভুলে গেলুম!'

'যাঃ! কবিতাটা হারিয়ে গেল? খুব দুঃখের কথা।'

'লালগোলাপে লোকগুলো যখন আমাদের ঘিরে ধরেছিল, তখন সত্যিই আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। রা-দি কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। তুমি তো জানো না ঝিলমদা, এর আগেও কী একটা দারুণ কান্ড হয়েছিল। আমি একটা মেঘে সাঁতার কাটতে নেমেছিলুম—'

নী তখন মেঘ চুরির ঘটনাটা শোনাল।

ঝিলম খাবার শেষ করে কন্ট্রোল বোর্ডের অনেকগুলো বোতাম টিপতে লাগল টপাটপ করে। তারপর গলা চড়িয়ে জিগ্যেস করল, 'মহাশূন্য স্টেশন নং চোদ্দোতে পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগবে, জিউস?'

'তিন ঘণ্টা এগারো মিনিট সাত সেকেন্ড!'

'চমৎকার!'

চেয়ারটা হাত-বাঁধা লোকটির দিকে ঘুরিয়ে জিগ্যেস করল, 'এবার তোমার গানটা শোনাও।'

লোকটি বলল, 'গান? আমি তো গান জানি না!'

ঝিলম বলল, 'যা জানো তাতেই হবে। শুরু করো, শুরু করো!'

'সত্যিই আমি গান জানি না!'

'তোমার গলায় যে সুর নেই, তা তো বুঝতেই পারছি। তোমার কাছ থেকে কি আমি ওস্তাদি গান শুনতে চাইছি? তোমার মাথার হলদে চুলই বলে দিচ্ছে তুমি শুক্রগ্রহের মানুষ। তোমরা তো বেশ উন্নতি করেছ শুনেছি। সূর্যমণ্ডলের বাইরে এসে তোমরা রকেট চুরি করতে শুরু করলে কেন?'

'বললাম তো, আমি কোনও গান জানি না!'

'আমার কাছে এমন যন্ত্র আছে, যা একবার তোমার গায়ে ছোঁয়ালে শুধু গান কেন তুমি তিড়িং-তিড়িং করে নাচতেও শুরু করবে। কিন্তু সেটা আমি ব্যবহার করতে চাই না।'

'আমাকে মেরে ফেললেও আমার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরুবে না।'

'এর মধ্যে মেরে ফেলার কথা উঠছে কেন? তোমায় মারব কেন? তোমরা বুঝি এখনও কথায়-কথায় মানুষ মারো?'

লোকটি ঝিলমের দিকে কটমট করে চেয়ে রইল। আর কোনও কথা বলল না।

ঝিলম হেসে উঠল হো-হো করে।

নী বলল, 'ঝিলমদা, লোকটার চোখ দুটো দ্যাখো! তাকালেই কীরকম গা-ছমছম করে।'

ঝিলম বলল, 'আজ থেকে সাত-আট দিন পরে দেখো, ওর সব কিছু বদলে যাবে। ওর চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে যাবে, লোকের সঙ্গে মিষ্টি ভাবে কথা বলবে, কারুকে খুন করার কথা স্বপ্নেও ভাববে না।'

'লোকটা হঠাৎ এরকম বদলে যাবে?'

'হ্যাঁ। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে অনেকগুলো এলাকা আছে জানো তো? তার মধ্যে ৪৭ নং এলাকাটা অপারেশান করে বদলে দিলেই ও একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যাবে।'

ঝিলম লোকটিকে আবার বলল, 'তুমি বুঝি ভাবছ, তুমি চুপ করে থাকলেই তোমার কথা আমরা জানতে পারব না? দাঁড়াও না, ইউনুস জেগে উঠুক, তখন দেখবে কী মজা হয়!'

ঝিলম টেলিফোনটা হাতে নিতেই নী বলল, 'রা-দি রাষ্ট্র সংঙ্ঘ স্পেস-স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিল। পারেনি। লাইন জ্যাম হয়ে ছিল।'

ঝিলম বলল, 'জিউস, দেখো তো এখন পাওয়া যায় কি না!'

জিউস উত্তর দিল, 'ট্রাজেকটরি বদলাবার পর তরঙ্গ পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

টেলিফোনে ওদিক থেকে গলার আওয়াজ ভেসে আসতেই ঝিলম বলল, 'হ্যালো কে, রাইন? আমি ঝিলম বলছি। জীবন কীরকম?'

'রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্পেস-স্টেশন চোদ্দো থেকে রাইন বলল, 'প্রত্যেকদিন জীবনটা যেন বেশি ভালো মনে হচ্ছে, ঝিলম! অনেকদিন পর তোমার গলা শুনলুম। সদ্য ঘুম থেকে উঠেছ বুঝি?'

'হ্যাঁ, রাইন। ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমাদের রকেটে একটা পাখি আটকা পড়েছে।'

'তাই নাকি? কোন দেশের পাখি?'

'যতদূর মনে হচ্ছে, শুক্রগ্রহের!'

'ওর ডানাদুটো ছেঁটে ওকে আবার আকাশে উড়িয়ে দাও।'

'ডানাদুটো ছাঁটার ভার তোমাদের নিতে হবে। আমার কাছে কাঁচি নেই।'

'শুক্রগ্রহের লোকদের ডানা ছাঁটতে আমার খুব ভালো লাগে। জানো তো, আমার এক কাকা শুক্রগ্রহে গিয়ে কীরকম অদ্ভুত ভাবে বদলে গেলেন। মাঝখানে একবার এখানে এসেছিলেন, আমায় দেখে চিনতেই পারলেন না।'

'ঠিক আছে, সে তুমি দেখো। শোনো, দুটো কাজ করতে হবে। আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওখানে গিয়ে পৌঁছচ্ছি। আমাদের জন্য দুটো ঘর বুক করে রাখো। আর ঝটিকা-বাহিনীর দফতরে খবর দাও, লালগোলাপ-উপগ্রহে কিছু অদ্ভুত ব্যাপার শুরু হয়েছে। ওরা যেন খবর নিতে শুরু করে।'

'লালগোলাপটা কোথায়?'

'তুমি আকাশ-মানচিত্রে খুবই কাঁচা, আমি জানি, রাইন। তুমি ঝটিকা দফতরে খবর দাও, ওরা ঠিক বুঝতে পারবে। ছেড়ে দিচ্ছি, আনন্দে থেকো, রাইন!'

'তোমার আনন্দ আরও বেশি হোক। একটু পরে দেখা তো হচ্ছেই, তখন একসঙ্গে দু'জনে আনন্দ করা যাবে।'

টি-রি-রি-রিং করে অ্যালার্ম বেজে উঠতেই ঝিলম বলল, 'এবার তোমার পালা, নী। ইউনুসের জন্য খাবার নিয়ে যাও। তারপর চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়ো।'

নী বলল, 'ইস, এই সময় কারুর ঘুমোতে ইচ্ছে করে?'

ঝিলম বলল, 'দেরি কোরো না, চটপট চলে যাও। আর শোনো, আগে ইউনুসকে কিছু বোলো না। ওকে চমকে দিতে হবে। তুমিও এই কথা শুনে রাখো জিউস।'

নী চলে যাবার পর লোকটা মুখ তুলে হিংস্র গলায় বলল, 'তোমরা আগুন নিয়ে খেলছ! আমার কোনও ক্ষতি করলে তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। ভালো চাও তো এখনও আমাকে লালগোলাপে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।'

আবার হেসে উঠল ঝিলম।

৬

ইউনুস যে নিঃশব্দ-বড়ি খেয়ে কথা বলা এবং কানে শোনার ক্ষমতাকেও ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে তা ঝিলমের মনে ছিল না। একটু বাদে গ্লুকোজ আর অন্যান্য খাবার খেয়ে ইউনুস যখন ককপিটে এল তখন ঝিলম তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

হাত বাঁধা একটা অচেনা লোককে মেঝেতে বসে থাকতে দেখে সে দারুণ অবাক হয়ে গেল। চোখ দুটি অনেক বড় করে ঝিলমের দিকে তাকাল সে।

ইউনুসও পরে আছে সাদা প্যান্ট ও গেঞ্জি। ঝিলমের গায়ের রং কুচকুচে কালো, ইউনুসের ফর্সা। সেইজন্য ঝিলমকে একটু-একটু হিংসে করে ইউনুস। প্রায়ই সে তেল মেখে রোদে শুয়ে থাকে রং কালো করবার জন্য। ইউনুসের মাথার চুল কোঁকড়া।

ঝিলম বলল, 'দ্যাখো তো ইউনুস, এই পাখিটাকে চিনতে পারো কি না?'

ইউনুস এ-কথা শুনতেও পেল না, কিছু বুঝতেও পারল না।

ঝিলম আবার বলল, 'এই পাখিটি বলছে ও গান জানে না। ওর মনের মধ্যে যে গানটা গুনগুন করছে, সেটা তুমি গেয়ে শুনিয়ে দাও তো!'

ইউনুস এবার এগিয়ে এসে ঝিলমের পিঠে খুব জোরে একটা কিল মারল।

ঝিলম বলল, 'আরে-আরে, আমায় মারছ কেন? মারতে হয় তো ওই লোকটাকে মারো। ওই লোকটা নী-কে কষ্ট দিয়েছে জানো?'

ইউনুস আবার কিল মারার জন্য হাত তুলল।

ঝিলম বলল, 'এ কী, এই কি ঠাট্টার সময়?'

ইউনুস হঠাৎ পেছন ফিরে দৌড়ে চলে গেল। ফিরে এল একটা স্লেট ও পেন্সিল নিয়ে। তাতে বড় বড় করে লিখল, 'কী ব্যাপার?'

ঝিলম বলল, 'ও তাই তো? তুমি এখন বোবা আর কালা। ভুলেই গিয়েছিলাম! যাঃ এখন কী হবে? তুমি আমায় মনে করিয়ে দিলে না কেন, জিউস?'

জিউস উত্তর দিল, 'তুমি ওর সঙ্গে মজা করতে চাইছিলে, তাই কিছু বলিনি!'

ইউনুসের হাত থেকে স্লেট-পেন্সিল নিয়ে ঝিলম খসখস করে লিখে যেতে লাগল। ইউনুস পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়তে-পড়তেই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল, তার নিঃশ্বাস পড়তে লাগল ঘন-ঘন।

লেখাটা শেষ হওয়া মাত্র সে ছুটে গিয়ে খুব জোরে একটা চড় কষাল হাত-বাঁধা লোকটির গালে।

ঝিলম তাড়াতাড়ি স্লেটের পিঠে উলটো লিখল, 'বন্দিকে মারতে নেই।' উঠে গিয়ে ইউনুসের চোখের সামনে সেই লেখাটা দেখাল। তারপর সব লেখা মুছে দিয়ে ইউনুসের হাতে স্লেট-পেনসিল তুলে দিয়ে ইঙ্গিত করল লোকটার সামনে বসে পড়তে।

ইউনুস লোকটির থেকে এক হাত দূরে বসে পড়ে লোকটির মুখের দিকে তাকাল। লোকটি অমনি চোখ বুজে ফেলে মাথা নিচু করে চিবুকটা বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখল। ঝিলম জোর করে ওর মুখটা আবার উঁচু করবার চেষ্টা করল, কিন্তু এভাবে তো চোখ খোলানো যায় না!

ইউনুস স্লেটে লিখল, 'শুক্রগ্রহের মাউন্ট অলিভের লোক...পেশায় ডাক্তার... লালগোলাপ...নাঃ, এভাবে পারছি না...আমার অসুবিধে হচ্ছে...ওষুধ খেয়ে আছি বলে আমার ওই ক্ষমতাটাও কাজ করছে না...।'

ঝিলম বলল, 'থাক, ছেড়ে দাও। এক্ষুনি তো আমরা রাষ্ট্র সঙ্ঘের স্পেস-স্টেশনে পৌঁছে যাব।'

ইউনুস তবু সেখানে বসে রইল। তার খুব আফসোস হচ্ছে। এই রকম সময়েও সে ঝিলমকে সাহায্য করতে পারছে না!

ঝিলম ফিরে গেল কন্ট্রোল বোর্ডের সামনে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই স্টেশনটির ডাকনাম আর্মস্ট্রং, সেটাকে এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হয় ঠিক একটা পুরনো কালের দুর্গের মতন, যদিও ইঁট-পাথর কিছুই নেই। সব কিছুই ফাইবার কাচ দিয়ে তৈরি। আগেরকার কালের ইংরেজিতে কোনও অসম্ভব জিনিসকে বলত 'বিল্ডিং কাসল ইন দ্য এয়ার'। সেটাই যেন এখন সম্ভব হয়েছে। মহাশূন্যে ভাসছে একটা দুর্গ।

আর্মস্ট্রংয়ের সঙ্গে সিগন্যাল-বিনিময় শুরু করে দিল ঝিলম। রাইন জানাচ্ছে যে, সব ঠিকঠাক আছে। ঝিলমকে ঢুকতে হবে তিন নম্বর দরজা দিয়ে।

ঝিলম নামতে-নামতেই দেখতে পেল ঝটিকা-বাহিনীর প্রায় তিরিশজন লোক দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। কয়েকজন লোক স্ট্রেচার নিয়ে তৈরি। দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে তারা ভেতরে উঠে এল।

ঘুমন্ত রা আর নী-র কাচের বাক্স দুটি স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে গেল কয়েকজন। ঝটিকা বাহিনীর লোকেরা প্রায় চ্যাং দোলা করে নামিয়ে নিল হাত-বাঁধা শুক্রগ্রহের লোকটিকে। চোখের নিমেষে তারা যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাইন এগিয়ে এসে ঝিলমকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'জীবনটা চমৎকার না, ঝিলম?'

ঝিলম বলল, 'বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে আরও চমৎকার হয়।'

রাইন এবার ইউনুসকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কী সুন্দর এই বেঁচে থাকা, ইউনুস!'

ঝিলম বলল, 'আমাদের এই বন্ধুটি এখন বোবা-কালা। ওর কাছ থেকে কিছু আশা কোরো না।'

রাইন বলল, 'বোবা-কালা হবার আর সময় পেল না? ভেবেছিলাম জমিয়ে আড্ডা দেব!'

ঝিলম বলল, 'আমাদের জন্য ঘর ঠিক করা আছে তো?'

রাইন বলল, 'হ্যাঁ, আছে; তোমরা গিয়ে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নাও। তারপর তুমি জেনারেল লি পো'র সঙ্গে দেখা করবে। তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

ঝিলম অবাক হয়ে বলল, 'জেনারেল লি পো? তিনি এখানে?'

রাইন বলল, 'তুমি যে-ব্যাপারে আমাদের খবর দিলে, ঠিক সেই ব্যাপারেই খোঁজ নিতে জেনারেল লি পো এখানে এসেছেন।'

জেনারেল লি পো জাপানের বিখ্যাত সেনাপতি। মাত্র এক বছর হল তিনি শান্তি-সেনাবাহিনীর প্রধান হয়েছেন। তাঁর হেড কোয়ার্টার মঙ্গলগ্রহে।

রাইনের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ঝিলম ইউনুসকে নিয়ে মনো-রেলে গিয়ে উঠল। ছোট্ট একটা ট্রেন সমস্ত জায়গাটা ঘুরে-ঘুরে যায়। এখানে এক জায়গায় হোটেলের মতন সারি-সারি ঘর আছে, মহাকাশযাত্রীরা মাঝে-মাঝে বিশ্রামের জন্য এখানে আসে। ঘরগুলো হালকা নীল রঙের কাচ দিয়ে তৈরি, অদৃশ্য জায়গা থেকে সব সময় খুব হালকাভাবে বাজনা বাজে। ইচ্ছেমতন প্রত্যেক ঘরে সেই বাজনা বদল করা যায়, আবার থামিয়েও দেওয়া যায়।

ঘরে ঢুকে বিরাট তুলোর বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে ঝিলম বলল, আঃ! ইউনুস অবশ্য সে-শব্দটুকুও উচ্চারণ করতে পারল না। নী আর রা-কে কাচের বাক্স থেকে বার করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে পাশের ঘরের বিছানায়। এখানকার আবহাওয়া খুব আরামের। একতলায় আছে বিরাট বড় কাফেটেরিয়া, সেখানে পৃথিবীর সব দেশের খাবার পাওয়া যায়।

ঠিক আধ ঘণ্টা বাদে ঝিলম অন্যদের হোটেলে রেখে একা গেল জেনারেল লি পো'র সঙ্গে দেখা করতে। গত শতাব্দীতে যিনি প্রথম চাঁদে দিয়েছিলেন, সেই নীল আর্মস্ট্রং-এর একটা মূর্তি বসানো আছে একটা বাড়ির সামনে। সেই বাড়িতেই এখানকার ঝটিকা-বাহিনীর অফিস।

জেনারেল লি পো'র চেহারাটি বিরাট। দারুণ চওড়া কাঁধ, উচ্চতাতেও প্রায় সাত ফুট। চিবুকে দাড়ি, নাকের নিচে মোটা গোঁফ, কিন্তু তাঁর মুখখানা খুব শান্ত ধরনের।

ঝিলম ঘরে ঢুকে দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আপনার জীবন মধুময় হোক জেনারেল।'

জেনারেল লি পো উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাড়িয়ে ঝিলমের কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, 'তোমার জীবন আরও সুন্দর হোক। তুমিই অভিযাত্রী ঝিলম?'

'হ্যাঁ।'

'তুমিই মৃত গ্রহ নীলিকায় প্রথম গাছ আবিষ্কার করেছিলে?'

'হঠাৎ আমার চোখে পড়ে গিয়েছিল। এমন-কিছু কৃতিত্ব নেই, আমার!'

'হু! হো-সানের কাছে তোমার নাম শুনেছি।'

'শ্রদ্ধেয় হো-সানের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল এর মধ্যে?'

'হ্যাঁ! আচ্ছা, সে-কথা যাক। লালগোলাপ উপগ্রহে তুমি ঠিক কী-কী দেখেছ বলো তো?'

'লালগোলাপে আমি নিজে যাই নি। আমার স্ত্রী গিয়েছিলেন—'

'তাহলে তোমার স্ত্রীকেই আমার বেশি দরকার এখন।'

'দুঃখের বিষয়, তিনি এখন ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছেন।'

'ওঃ হো! তোমরা যে লোকটাকে ধরে এনেছ, সে খুবই কড়া ধাতের মানুষ। ওর কাছ থেকে কিছুই বার করা যাচ্ছে না। এই দ্যাখো, আমরা ওর মনের কতকগুলো ছবি তুলেছি। কিন্তু ও একসঙ্গে চার-পাঁচরকম চিন্তা করার শক্তি রাখে। মস্তিষ্কটা খুবই শক্তিশালী।'

'ওই লোকটি একজন ডাক্তার, আমরা এইটুকু জেনেছি।'

'আশ্চর্য! ডাক্তার হয়েও ডাকাতি করে? এর মধ্যে আমরা শুক্রগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ওখানকার সরকার কোনও দায়িত্ব নিতে চাইছে না। তারা বলছে, শুক্রগ্রহ থেকে একদল লোক বাইরে চলে গিয়ে সূর্যমণ্ডলেরও বাইরে কোনও জায়গায় নতুন কলোনি করেছে। সেই জায়গাটা ঠিক কোথায়, তা কেউ জানে না। ওরা কি তবে লালগোলাপে আড্ডা গেড়েছে?'

'লালগোলাপ তো ঠিক মানুষের থাকার উপযোগী নয়। ওখানে জল নেই। আলোটাও খারাপ।'

'তোমার স্ত্রী লালগোলাপে নেমেও উদ্ধার পেলেন কী করে? ওদের অস্ত্র কী রকম?'

ঝিলম এবার হাসল।

জেনারেল লি পো'ও হাসলেন, 'বুঝেছি!'

ঝিলম বলল, 'আমার স্ত্রীকে বন্দি করার চেষ্টা করে ওই ডাকাতরা খুব ভুল করেছিল! বড় সাঙ্ঘাতিক মেয়ে!'

'এদিকে অন্তত এগারোটি রকেটের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

এই সময় জেনারেলের টেবিলে একটা ছোট রেডিওতে আওয়াজ শোনা গেল, 'আমরা রেডি, জেনারেল।'

লি পো উঠে দাঁড়িয়ে ঝিলমকে বললেন, 'দশখানা রকেট নিয়ে আমরা লালগোলাপে যাচ্ছি। দেখে আসি ব্যাপারটা। ফিরে এসে তোমার সঙ্গে আবার কথা বলব। তুমি বিশ্রাম নাও।'

ঝিলমও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিছু যদি না মনে করেন, একটা কথা বলব? আমি কি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি?'

'তুমি যেমন আছ, সেই অবস্থাতেই যেতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

জেনারেল লি পো নিজে যে রকেটটায় উঠলেন, সেটাতেই সঙ্গে নিলেন ঝিলমকে। যাওয়ার পথে দুজনে আরও অনেক কথাবার্তা হল। পৃথিবীতে চুরি বা ডাকাতি অনেক দিন বন্ধ হয়ে গেছে; গত পাঁচ বছরে পৃথিবীতে মানুষ খুন হয়েছে মাত্র দুটি, তাও প্রশান্ত

মহাসাগরের ওপরে একটি জাহাজে একজন নাবিক হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে তার দুজন সঙ্গীকে হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু শুক্রগ্রহের লোকগুলি এখনও এরকম কেন? শুক্রগ্রহের লোকগুলি তো পৃথিবীর মানুষেরই বংশধর।

ঝিলম জিজ্ঞেস করল, 'অনেকখানি সময় কেটে গেছে। ওরা কি লালগোলাপে এখনও থাকবে?'

লি পো বললেন, 'লালগোলাপে যদি ঘাঁটি গেড়ে থাকে, তবে সবসুদ্ধু পালাবে কোথায়?'

'একটা ব্যাপারে আমার খট্‌কা লাগছে। রা ওদের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এল, ওদের একজন লোককে ধরেও নিয়ে এল, তবু ওরা অন্য রকেট নিয়ে রা-কে তাড়া করে এল না কেন?'

'তার মানে ওদের রকেটের সে-রকম জোর নেই। সেইজন্যই ওরা আমাদের রকেট চুরি করতে চায়।'

'কিন্তু ওরা সূর্যমণ্ডলের এতটা বাইরে এসে ঘোরাঘুরি করছে, রকেটের সে-রকম উন্নতি করেনি?'

'চলো, গিয়ে দ্যাখা যাক, কী ব্যাপার!'

লালগোলাপের কাছাকাছি গিয়ে ঝটিকা-বাহিনীর দশখানি রকেট নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল। লালগোলাপ থেকে যদি হঠাৎ আক্রমণ করে তার জন্য তৈরি হয়ে আসা হয়েছে। আগে দেখা যাক্, ওরা কোনও গোলাগুলি ছোঁড়ে কিনা।

লালগোলাপের চারপাশে রকেটগুলো কয়েকবার ঘুরল। কিন্তু ওদের দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। এবার আরও একটু নিচে নেমে এসে জেনারেল লি পো হুকুম দিলেন,'ফায়ার!'

অমনি চারখানি রকেট থেকে বোমা ফেলা হতে লাগল। এই বোমাগুলিতে তেমন বেশি আওয়াজ হয় না। শুধু নিচে পড়ে ফটাস শব্দে ফেটে গিয়ে দারুণ ধোঁয়া ছড়ায়। এই বোমায় কেউ মরে না, আহতও হয় না, ধোঁয়া নাকে গেলেই সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। এই বোমা পড়ার পর কারুর পক্ষেই জেগে থাকা সম্ভব নয়। সত্তর বছর আগে চিনের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে এই বোমা ব্যবহার করেই দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষরা জিতে যায়। পৃথিবীতে তারপর আর কোনও যুদ্ধ হয়নি।

দশটি ঘুম-বোমা ফেলার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হল। লালগোলাপে কোনও লোক থাকলে এমনকী মাটির নিচে লুকিয়ে থাকলেও তারা এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য।

এর পরেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। রোবো দিয়ে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব কিছু না। রোবো তো আর ঘুমোবে না। তাছাড়া কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থাকতে পারে। সেই জন্য এবার অন্য চারখানি রকেট থেকে খুব গোপন ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ ছাড়া হতে লাগল। এই তরঙ্গে সমস্ত জানাশোনা যন্ত্র বিকল হয়ে যায়।

এরপরও ওদের কাছে অজানা কোনও যন্ত্র বা অস্ত্র থাকতে পারে। কিন্তু সেটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে।

জেনারেল লি পো এবার নামবার হুকুম দিলেন।

ধোঁয়া কেটে যাবার পর দেখা গেল লালগোলাপের এখানে সেখানে অনেকগুলো রকেট পড়ে আছে। কিন্তু কোথাও কোনও মানুষের চিহ্ন নেই। প্রত্যেকটি রকেট ঘুরে দেখা হল, দেখলেই বোঝা যায়, সেই রকেটগুলো বেশ কিছুদিন চালানো হয়নি।

ঝিলম বলল, 'আমি বলেছিলাম, এরা আগেই পালাবে?'

লি পো বললেন, 'কিন্তু রকেট চুরি যদি ওদের মতলব হয়, তাহলে এতগুলো রকেট ফেলে গেল কেন?'

'এখানে যে ওরা ঘাঁটি গাড়েনি, তা বোঝাই যাচ্ছে।'

চশমা পরার অভ্যেস নেই বলে জেনারেল লি পো তাঁর চোখ থেকে ইনফ্রা রেড চশমাটা খুলে ফেললেন অন্যমনস্কভাবে।

ঝিলম বলল,'চশমা খুলে রাখবেন না, জেনারেল, ওটা বিপজ্জনক।'

লি পো বললেন, 'রকেটগুলো সবই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, তা লক্ষ্য করেছ? একটাও শুক্রগ্রহের নয়। অর্থাৎ পৃথিবীর অভিযাত্রীদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে টেনে এনেছিল ওই ডাকাতগুলো। তোমার স্ত্রীর মতন যারা চালাক নয়, তাবা আর পালাতে পারেনি। তাহলে সেই লোকগুলো গেল কোথায়? ডাকাতরা তাদের ধরে নিয়ে গেল আর রকেটগুলো ফেলে গেল? এ তো বড় আশ্চর্য কথা। তুমি কী বলো ঝিলম?'

ঝিলম একটু চিন্তা করে বলল, 'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। শুক্রগ্রহের লোকেরা মানুষ চুরি করবে কেন? ওদের তো মানুষের অভাব নেই।'

এই সময় দূর থেকে কয়েকজন উত্তেজিতভাবে ডাকতে লাগল, 'জেনারেল জেনারেল, এদিকে আসুন!'

লি পো বললেন, 'ওরা কিছু দেখতে পেয়েছে। চলো, ওদিকে যাই।'

লালগোলাপ উপগ্রহটা পৃথিবীর চেয়ে তো বটেই, চাঁদের চেয়েও অনেক ছোট। এখানকার পাহাড়গুলোও বেঁটে-বেঁটে। একটা পাহাড়ের ওপর উঠলেই গোলাপের পাপড়ির মতন মেঘ গায়ের ওপর দিয়ে ভেসে চলে যায়। মেঘগুলো এত নিচু বলেই এখানে একটু দূরের জিনিস হলেই আর দেখা যায় না।

লি পো আর ঝিলম কিছুটা এগিয়ে এসে দেখল একটা ছোট পাহাড়ের সামনে ঝটিকা-বাহিনীর দশজন সৈনিক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজন ক্যাপ্টেন কয়েক পা এগিয়ে এসে স্যালুট করে বলল,'এই পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে কয়েকজন মানুষ রয়েছে, জেনারেল!'

জেনারেল জিগ্যেস করলেন, 'নিশ্চয়ই তারা ঘুমন্ত?'

ক্যাপ্টেন বলল, 'জেগে থাকার কোনও সম্ভাবনাই নেই। অবশ্য গুহার ভেতরটা খুব অন্ধকার। রকেট থেকে ফ্ল্যাশ-লাইট আনতে পাঠিয়েছি।'

দুজন সৈনিক তক্ষুনি দুটি ফ্ল্যাশ-লাইট নিয়ে উপস্থিত হল। জেনারেল লি পো ওভার-কোটের পকেটে হাত দিয়ে নিজেই প্রথমে ঢুকলেন গুহার মধ্যে।

গুহাটা বেশ চওড়া। গোল সুড়ঙ্গের মতন। ভেতরের দিকটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। খানিকটা এগোবার পরই মনে হল মাটিতে পাশাপাশি পঁচিশ-তিরিশ জন লোক শুয়ে আছে। তীব্র ফ্ল্যাশ-লাইটের আলো সেখানে পড়া মাত্রই একটা বীভৎস দৃশ্য দেখা গেল।

জেনারেল অস্ফুট স্বরে বললেন, 'এ কী?'

ঝিলম চট্ করে মুখটা ফিরিয়ে নিল। দৃশ্যটা সে সহ্য করতে পারেনি।

মাটিতে শুয়ে থাকা প্রত্যেকটি লোকের চোখ খুবলে তুলে নেওয়া হয়েছে।

জেনারেল লি পো ঝিলমের হাত ধরে টেনে আরও কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'যারা এই কাজ করেছে, তাদের প্রচণ্ড শাস্তি পেতে হবে। দ্যাখো ঝিলম, এরা শুক্রগ্রহের নয়। এরা পৃথিবীর মানুষ।'

ঝিলম তাকিয়ে দেখল, জেনারেল ঠিকই বলেছেন। কারুর চুল হলদে রঙের নয়। কালো।

শুধু চোখই খুবলে নেয়নি, প্রত্যেকটি লোকের দু-কানেও ক্ষত, কানগুলো কেটে ফেলা হয়েছে, সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে জমাট বেঁধে আছে।

ঝিলম বলল, 'ওঃ! এমনভাবে মানুষ খুন করল কেন? এদের খুন করে কার কী লাভ।'

ঝটিকা-বাহিনীর ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার বলল, 'এদের মারতে চাইলে তো শুধু একটা করে বুলেট খরচ করলেই হত। ওরা এত নিষ্ঠুর।'

জেনারেল লি পো বললেন, 'আমি এখানে আর থাকতে পারছি না। চলো, বাইরে চলো।'

ঝিলম হঠাৎ বলে উঠল, 'একটু দাঁড়ান, জেনারেল।'

তারপর শুয়ে-থাকা তৃতীয় মানুষটির কাছে গিয়ে পাশে বসে পড়ে সে করুণ গলায় বলল, 'চোখ না থাকলেও আমি একে চিনতে পেরেছি। এই যে কপালের ডান দিকে একটা ক্রসের মতন কাটা দাগ। এ আমার বন্ধু ভের্লেইন। জেনারেল, আপনি বিখ্যাত অভিযাত্রী ভের্লেইনের নাম শোনেননি?'

'কোন ভের্লেইন? যে বৃহস্পতির আগুনের বলয়ের মধ্য দিয়ে রকেট চালিয়ে রেকর্ড করেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ইস! ওইরকম একটা মানুষের এইরকম জঘন্য মৃত্যু?'

'জেনারেল, আমি ভের্লেইনের দেহটা নিয়ে যেতে চাই।'

ঝিলম সেই মৃত লোকটির গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠল। এ কী, ওর গা গরম কেন? তাড়াতাড়ি ভের্লেইনের বুকে হাত দিয়েই সে উত্তেজিত ভাবে আবার বলল, 'জেনারেল, জেনারেল ভের্লেইন এখনও বেঁচে আছে।' রক্ষী-বাহিনীর সৈনিকেরা সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকগুলির বুকে হাত রেখে পরীক্ষা শুরু করল। দেখা গেল, মোট সাতাশজন লোকের মধ্যে চব্বিশজনই তখনও বেঁচে আছে। অন্য তিনজনের বুকে কোনও স্পন্দন নেই।

জেনারেল বলল, 'আশ্চর্য! এদের মারতে চায়নি। শুধু চোখ আর কান খুবলে নিয়েছে। কিন্তু কেন?'

ঝিলম বলল, 'জেনারেল, এখনও এদের চটপট রকেটে তুলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা যায়। আর কিছুক্ষণ থাকলে এমনিই মরে যাবে।'

জেনারেল লি পো তক্ষুনি ঝটিকা-বাহিনীকে হুকুম দিলেন সব কটি লোককেই বিভিন্ন রকেটে তুলে নিতে।

গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে ঝিলম বলল, 'এবার আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি, জেনারেল।'

'কী বলো তো?'

'আমরা যাকে বন্দি করে নিয়ে গেছি, সে একজন ডাক্তার।'

'ওঃ হো! তুমি ঠিক ধরেছ তো! লোকগুলোকে ওরা মারতে চায়নি। ডাক্তার এনে ওরা লোকগুলোর চোখ আর কানের পর্দা তুলে নিয়েছে।'

'কত সাবধানে ওরা অপারেশন করেছে, তা ভাবুন। লোকগুলোকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের চোখ আর কানের পর্দা তুলে নেওয়া কি সোজা কথা?'

'কিন্তু এই কাজই বা ওরা করল কেন? শুক্রগ্রহে কি চক্ষু ব্যাঙ্ক আর কানের পর্দার ব্যাঙ্ক নেই?'

'সেটা খোঁজ নিতে হবে।'

'খোঁজ নেবার প্রশ্ন ওঠে না। নিশ্চয়ই আছে। শুক্রগ্রহের লোকদের তুমি এত অসভ্য ভেবো না। তা ছাড়া যেখানে এত ভালো ডাক্তার আছে, সেখানে ওই সব ব্যাঙ্ক থাকবে না?'

'এরা শুক্রগ্রহ থেকে বেরিয়ে আসা একটি দল। হয়তো এরা আর শুক্রগ্রহে ফিরতেই চায় না। এবার বোঝা যাচ্ছে, রকেট চুরি ওদের উদ্দেশ্য নয়! মানুষের চোখ আর কানের পর্দা চুরি করাই ওদের আসল উদ্দেশ্য। রা আর নী যদি ধরা পরত, তা হলে তাদেরও এই অবস্থা হত!'

'কিন্তু হঠাৎ এত চোখ আর কানের পর্দা দরকার হল কেন ওদের? সাতাশ জনের চোখ-কান নিয়েছে, আরও মানুষকে বন্দি করতে চাইছিল!'

'এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। শুক্রগ্রহের এই দলটি কোনও অচেনা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সেখানে হঠাৎ কোনও বিস্ফোরণে সেই দলের অনেকের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে আর কানের পর্দা ফেটে গেছে। তাই তারা এই সব চুরি করে নিজের দলের লোকদের চোখ আর কান আবার ঠিক করে দিতে চায়।'

'তোমার অনুমান সত্যি হতে পারে। এ তো আমরা শুধু লালগোলাপের ঘটনা দেখলাম। আর কোনও গ্রহে বা উপগ্রহেও তারা রকেট-অভিযাত্রীদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের চোখ আর কান উপড়ে নিচ্ছে হয়তো। এটা বন্ধ করতেই হবে! নির্বোধ, শয়তানের দল! এরকম ভাবে জ্যান্ত মানুষের চোখ আর কান নষ্ট না করে আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে চাইলে কি আমরা চোখ-কান দিতাম না?'

'হয়তো ওদের এমন কোনও গোপন ব্যাপার আছে, যা আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চায় না!'

রাগে, দুঃখে জেনারেল লি পো'র মুখখানা কুঁকড়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, 'ওদের গোপন কথা আমি বার করবই! দেখি ওই ডাক্তারটা কীভাবে গোপন কথা পেটে চেপে রাখতে পারে। এবার মার লাগাব, বুঝলে, স্রেফ মার! চলো, আর্মস্ট্রং-এ ফিরে চলো।'

দুজনে গিয়ে উঠে বসল রকেটে।

৭

নী আর রা ঘুমিয়ে আছে। ইউনুস একা-একা একটু ঘুরতে বেরিয়েছে।

আর্মস্ট্রং নামের এই মহাশূন্যের স্টেশনটাতে পার্ক, থিয়েটার হল, সাঁতার কাটার পুকুর, হাসপাতাল, এই সব কিছুই আছে। মহাকাশ-অভিযাত্রীরা এখানে প্রধানত বিশ্রামের জন্যই আসে। অবশ্য বিরাট একটি গবেষণাগারও আছে। আর ঝটিকা-বাহিনীর একটি প্রধান দফতরও বটে।

ইউনুস পার্কে গিয়ে বসল। এই পার্কে কিন্তু একটাও সত্যিকারের গাছ নেই। যদিও দেখলে মনে হবে ছোট-বড় অনেক গাছ আছে, ফুলও ফুটে আছে কয়েকটাতে। এ সবই আলো দিয়ে তৈরি। সূর্যমণ্ডলের বাইরে কোথাও এখনও গাছ বাঁচানো যায়নি। বরফ-ঢাকা একটা ছোট্ট গ্রহতে ঝিলম একটা গাছ আবিষ্কার করেছিল। সেটাও মোটেই গাছের মতন দেখতে নয়। খয়েরি রঙের একটা গুঁড়ি, ডাল বা পাতা কিছু নেই, সেই গুঁড়িটার গায়ে ব্যাঙের ছাতার মতন গোল-গোল জিনিস লেগে আছে। তাই নিয়ে পৃথিবীর খবরের কাগজগুলোতে কত হই-চই!

ইউনুস ইচ্ছে করেই লোকজনদের এড়িয়ে পার্কে এসে বসল। কারণ সে কারুর কথাই শুনতে পাবে না, মুখেও কিছু বলতে পারবে না। তার খুব আফশোস হচ্ছে, ঠিক এই সময়েই কেন সে নিঃশব্দ-বড়ি খেলো! এখন এত সব কাণ্ড হচ্ছে, অথচ সে যোগ দিতে পারছে না। অবশ্য আর বেশি দিন বাকি নেই। এই জায়গাটার আবহাওয়া পৃথিবীর মতনই বলে এখানে বয়েস বাড়ে না। কিন্তু একবার মহাশূন্যে রকেট নিয়ে বেরুলেই হু-হু করে দিন কেটে যায়।

ইউনুস একটা বেঞ্চিতে বসেছে, পাশেই একটা আলোর ফুলগাছের ঝোপ, তাতে যেন সত্যিকারের গাঁদা ফুল ফুটে আছে। একটু দূরে একটা ফোয়ারা, সেটাও জলের নয়, আলোর। মহাশূন্যে বেশি দিন থাকলে সত্যিকারের গাছ আর ফুল দেখার জন্য খুব মন কেমন করে।

একটি আফ্রিকান মেয়ে এসে বসল ইউনুসের পাশে।

ইউনুস মনে-মনে ভাবল, এই রে! এই কালো কুচকুচে মেয়েগুলোর খুব রূপের গর্ব হয়। আর এদের বুদ্ধিও খুব সাঙ্ঘাতিক। এর সঙ্গে কথা না বললেই তো চটে যাবে!

ইউনুস ইশারা করে নিজের মুখ আর কান দেখিয়ে দিল।

মেয়েটি অবাক ভাবে চেয়ে বলল, 'জীবন খুব সুন্দর, তাই না?'

ইউনুস আন্দাজেই কথাটা বুঝে ঘাড় হেলিয়ে বোঝাল যে, হ্যাঁ!

মেয়েটি আবাব বলল, 'আপনারা কোন রকেটে এসেছেন?'

ইউনুস আবার মুখ আর কানে হাত দিয়ে বোঝাল।

মেয়েটি তবু জিগ্যেস করল, 'লালগোলাপ-উপগ্রহটি সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?'

ইউনুস ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাত জোড় করল।

মেয়েটি এবার বলল, 'আপনাকে দেখতে খুব বিচ্ছিরি!'

ইউনুস কিছুই বুঝতে না পেরে মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

'সত্যি কথা বলতে কী, আপনাকে অবিকল একটা সাদা শুয়োরের মতন দেখতে!'

ইউনুস মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে আছে।

মেয়েটি হেসে উঠে বলল, 'সত্যিই তা হলে বোবা আর কালা? যাক্, তা হলে আর কোনও চিন্তা নেই।'

ইউনুস কিন্তু ভেতরে-ভেতরে দারুণ চমকে উঠেছে। কারণ সে মেয়েটির মনের কথা বুঝতে আরম্ভ করেছে। মেয়েটি ভাবছে, শুক্রগ্রহের 'এস' নামের লোকটি এখানে এসে পড়বে এক্ষুনি। কেউ তাকে চিনতে না পারে, কেউ যেন বুঝতে না পারে, কেউ টের না পায়! এই বোবা-কালা লোকটিকে এখান থেকে সরানো দরকার।

মেয়েটি নানান অঙ্গভঙ্গি করে ইউনুসকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে, তার একজন বন্ধু এখানে আসবে, ইউনুস অন্য কোনও জায়গায় গিয়ে বসুক।

ইউনুস কিছুই বুঝতে না পারার ভান করে মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে মেয়েটির মনের কথা আরও পড়তে পারছে। এই মেয়েটিও একজন ডাক্তার। শুক্রগ্রহের লোকটিকে যেখানে পরীক্ষা করা হচ্ছিল, সেখানে এই মেয়ে ডাক্তারটি ডিউটিতে ছিল। শুক্রগ্রহের লোকটি কোনওক্রমে একে হাত করেছে! তাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে পারলে সে অনেক কিছু দেবে বলেছে।

কী দেবে? সোনা! এই মেয়েটির দেহের ওজনের সমান সোনা। আফ্রিকার মেয়েরা এত বোকা হয়? সোনা নিয়ে ও কী করবে? ঠাকুমা-দিদিমার যুগের মেয়েরা সোনার গয়না পরত, এখন কেউ পরে না। তাছাড়া সোনার আর বিশেষ কোনও দাম নেই। ও হ্যাঁ, শুক্রগ্রহে সোনার এখনও খুব দাম আছে। এই মেয়েটি কি শুক্রগ্রহে চলে যেতে চায়? হ্যাঁ বোঝাই যাচ্ছে ওর মনে-মনে তাই ইচ্ছে।

মেয়েটি চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক চাইছে। একটু বাদে সে বেঞ্চ ছেড়ে গিয়ে ফোয়ারাটার কাছে দাঁড়াল, তখন দেখা গেল হাসাপাতালের দিক থেকে হেঁটে আসছে একজন মানুষ। এখানকার ডাক্তারের মতন সাদা পোশাক পরা, মাথায় একটা টুপি। সেই টুপিতে কপালের অনেকখানি ঢেকে আছে।

লোকটি এসে দাঁড়াল কালো মেয়েটির সামনে। তারপর ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল।

ইউনুস বুঝতে পারল এই সেই শুক্রগ্রহের 'এস'। মাথার হলদে চুল ঢেকে নিয়েছে টুপিতে, এখানকার কোনও ডাক্তারের ছদ্মবেশ ধরেছে। কোনও ডাক্তারকে আচমকা মেরে তার পোশাকটা খুলে নেওয়াও আশ্চর্য কিছু নয়। লোকটির গায়ে অসম্ভব জোর।

ইউনুস তক্ষুনি লোকটিকে ধরবার চেষ্টা করল না। ওই লোকটার কাছে কিংবা মেয়েটার কাছে কোনও অস্ত্র থাকা স্বাভাবিক। ইউনুসের কাছে কিছুই নেই। সে বেঞ্চে বসেই ওদের দিকে নজর রাখতে লাগল।

লোকটি একবার দেখল ইউনুসকে। মেয়েটি আবার তাকে কী যেন বলল, ইউনুসকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে লোকটি, তাই সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করল উলটো দিকে। মেয়েটিও চলল তার সঙ্গে।

ইউনুস কী করবে প্রথমে ঠিক করতে পারল না। সে চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করতে পারবে না। কারুকে যে কিছু ডেকে বলবে তার উপায় নেই। অথচ ওদের চোখে আড়ালেও যেতে দেওয়া যায় না। ইউনুস উঠে-পড়ে যেতে লাগল ওদের পিছু-পিছু।

পার্কের রেলিংয়ের কাছে গিয়ে লোকটি ফিরে দাঁড়াল। ইউনুস মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিল। খুব সম্ভবত লোকটির কাছে কোনও অস্ত্র নেই, কিন্তু মেয়েটির কাছে থাকা খুবই সম্ভব। সেই জন্য সে শুক্রগ্রহের লোকটিকে কিছু না বলে, তীরের মতন ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মেয়েটিকে। সেই কালো মেয়েটি তার হাতের ব্যাগ খোলার সময়ই পেল না।

শুক্রগ্রহের লোকটি টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করল ইউনুসকে। কিন্তু ইউনুস প্রাণপণ শক্তিতে জড়িয়ে ধরে আছে মেয়েটিকে। শুক্রগ্রহের লোকটি এবার দারুণ জোরে দুটি ঘুঁষি মারল ইউনুসের চোয়ালে। তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, তবু ইউনুস ছাড়ল না। লোকটি ইউনুসকে মেরেই চলল।

পার্কের পাশেই রাস্তা। কিছু লোক থমকে গেল এই দৃশ্য দেখে। একটা লোক একটা মেয়েকে চেপে ধরে আছে, আর একটা লোক তাকে মারছে, এই দৃশ্য দেখে লোকে তো অবাক হবেই। ঝটিকা-বাহিনীর দুজন সৈনিকও চলে এল সেখানে।

মেয়েটি এবার কেঁদে-কেঁদে বলল, 'দেখুন, আমি পার্কে আমার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ এই লোকটা আমায় আক্রমণ করেছে।'

শুক্রগ্রহের ছদ্মবেশী লোকটি বলল, 'এই লোকটি হয় কোনও পাগল অথবা গুন্ডা!'

ঝটিকা-বাহিনীর একজন সৈনিক ইউনুসের দিকে এল এম জি উঁচিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? এক্ষুনি মেয়েটিকে ছেড়ে দাও!'

ইউনুস মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছল।

সৈনিকটি জিগ্যেস করল, 'তুমি কে? কোন রকেটে এসেছ?

সে-কথার উত্তর দেবার উপায় নেই ইউনুসের। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে এমন ভান করল যেন দৌড়ে পালাবে। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে শুক্রগ্রহের লোকটির মাথা থেকে টুপিটা ছিনিয়ে নিল। অমনি বেরিয়ে পড়ল তার হলদে চুল।

সৈনিক দুজন অবাকভাবে তাকিয়ে রইল লোকটির চুলের দিকে। সেই সুযোগে লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নিল ওদের একজনের হাতের এল এম জি। তারপর সেটা দিয়েই খুব জোরে মারল অন্য সৈনিকটির মাথায়। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

শুক্রগ্রহের লোকটি এবার কড়া গলায় বলল, 'যে আমার সামনে আসবে, তাকে ঝাঁঝরা করে দেব!'

সবাই ভয় পেয়ে দূরে সরে দাঁড়াল। এমন কাণ্ড এই আর্মস্ট্রং স্টেশনে আগে কখনও হয়নি।

লোকটি এল এম জি উঁচিয়ে রেখে বলল, 'এবার চলো রকেট-স্টেশনে!'

ঝটিকা-বাহিনীর যে সৈনিকটির হাত থেকে এল এম জি-টা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সে এবার হেসে উঠল হা-হা করে। তারপর বলল, 'এখান থেকে পালানো অত সহজ! চালাও দেখি গুলি!'

ইউনুসও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। সে শুক্রগ্রহের লোকটিকে অগ্রাহ্য করে আবার মেয়েটির কাছে এসে চেপে ধরল তার হাতব্যাগটা।

লোকটি হিংস্র গলায় বলল, 'তবে তুমি মরো!'

এল এম জি-টা তুলে সে ট্রিগার টিপল। গুলি বেরুবার বদলে তার থেকে বেরুল

খানিকটা ধোঁয়া। ইউনুস আর কালো মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

এখানে মানুষ মারার কোনও অস্ত্রই ব্যবহার করা হয় না। এই এল এম জি-গুলো আগেকার দিনের মতন দেখতে হলেও এর মধ্যে গুলি থাকে না। এতে ভরা থাকে ঘুম-পাড়ানি ধোঁয়া।

ততক্ষণে অজ্ঞান সৈনিকটির এল এম জি-টা অন্য সৈনিকটি তুলে নিয়েছে। শুক্রগ্রহের লোকটি তার দিকে ফিরতেই দু-জনেই একসঙ্গে ট্রিগার টিপল। দুজনেই একসঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। রাস্তার লোকেরা এবার হাসতে লাগল সবাই। অদ্ভুত যুদ্ধ! কেউ মরেনি, পাঁচ জন অজ্ঞান।

হাসপাতালের কর্মীরা এসে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে গেল পাঁচ জনকেই। তখন জানা গেল, এর আগে হাসপাতালে একজন ডাক্তার আর একজন নার্সকে গলা টিপে অজ্ঞান করে, তাদের হাত-পা বেঁধে রেখে পালিয়ে এসেছে শুক্রগ্রহের লোকটি।

জেনারেল লি পো এই ঘটনার কথা শুনে দারুণ রেগে গেলেন। পুরো একদিন ওরা অজ্ঞান হয়ে থাকবে, এর মধ্যে আর শুক্রগ্রহের লোকটিকে জেরা করা যাবে না। দেখা যাচ্ছে এ লোকটি সাঙ্ঘাতিক নিষ্ঠুর, মানুষ খুন করতে ওর একটুও দ্বিধা নেই। ইউনুসকে মেরে ফেলার জন্যই তো ও ট্রিগার টিপেছিল।

জেনারেল লি পো হুকুম দিলেন, জ্ঞান ফেরার পর ওই লোকটিকে এক ঘণ্টা জেরা করা হবে, তাতেও ও যদি ওদের আস্তানার কথা না জানায়, তা হলে অপারেশন করা হবে ওর মস্তিষ্কে। এমন সাঙ্ঘাতিক লোককে আর বিশ্বাস করা যায় না। মস্তিষ্কের একটা অংশ অপারেশন করে বদলে দিলেই ও ভালো হয়ে যাবে। তখন মানুষ খুন তো দূরের কথা, একটা সামান্য পোকা-মাকড় মারতেও ওর কষ্ট হবে।

ইউনুস রইল হাসপাতালে, ঝিলম ফিরে এল হোটেলে। নী আর রা জেগে উঠেছে এর মধ্যে। নিচের তলার রেস্তোরাঁয় গিয়ে ওরা তিনজনে মিলে অনেকদিন পর পৃথিবীর খাবার খেল পেট ভরে। দেরাদুনের চালের সুগন্ধ ভাত, ঘি, মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, পালং শাক, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, সর্ষে-বাটা দিয়ে ইলিশ আর ভাপা দই।

নী বলল, 'ট্যাবলেট আর শুকনো স্যান্ডউইচ খেতে-খেতে মুখ একেবারে পচে গিয়েছিল!'

রা বলল, 'ইস, ইউনুসটা নেই, ও এসব খেতে পেল না!'

খাওয়ার পর ওরা গেল একটা সিনেমা দেখতে। ঝিলম খুব গম্ভীর, তার মুখে চিন্তার ছাপ। সে সিনেমায় মন দিতে পারছে না।

সিনেমা ভাঙার পর রা বলল, 'চলো, এখন বাষ্প-স্নানঘরে যাওয়া যাক। অনেক দিন স্নান করিনি!'

নী বলল, হ্যাঁ, তাই চলো রা-দি! তুমি বলেছিলে এখানকার বাষ্পঘর চাঁপাফুলের গন্ধে ভরা থাকে?'

রা বলল, হ্যাঁ রে, ভারী সুন্দর!'

ঝিলম বলল, 'তোমরা যাও, আমার কাজ আছে। একবার জেনারেল লি পো-র সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

ঠিক হল বাষ্প-স্নান সেরে নী আর রা ফিরে যাবে হোটেলে। ঝিলমও সেখানে এক ঘন্টা বাদে ফিরবে।

জেনারেল লি পো-র কাছে গিয়ে ঝিলম আর একটা দুঃসংবাদ শুনল। এলোইস নামের একটি নক্ষত্রে আরও কুড়ি জন মানুষকে পাওয়া গেছে, তাদেরও চোখ আর কানের পর্দা নেই। ঝটিকা-বাহিনীর একটা অনুসন্ধান দল এক-এক করে গ্রহ নক্ষত্র খুঁজে-খুঁজে দেখছে। এরকম আরও-কোথাও আরও কত মানুষ পড়ে আছে কে জানে!

চেয়ার ছেড়ে ঘরের মধ্যে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে-করতে জেনারেল লি পো বললেন, 'খুনে, গুন্ডার দল! সমস্ত মহাকাশ জুড়ে ওরা চোখ আর কান ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে! জীবন্ত মানুষের চোখ তুলে নেবে, কান ছিঁড়ে নেবে, এ কি কল্পনা করা যায়?'

ঝিলম জিগ্যেস করল, 'আপনি শুক্রগ্রহের সরকারকে জানাননি?'

লি পো বললেন, 'জানিয়েছি তো বটেই! তাঁরা কোনও দায়িত্ব নিতে চান না। তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করে বলছেন, শুক্রগ্রহ থেকে একটা দল সূর্যমণ্ডলের বাইরে বেরিয়ে গেছে, সেই দলটার ওপর শুক্রগ্রহ সরকারের কোনও কর্তৃত্ব নেই!'

ঝিলম থাকতে-থাকতেই আরও দুটো খবর এল।

আবার আর-একটা গ্রহে পাওয়া গেছে ওই রকম চোখ-কান খোবলানো বারোজন মানুষ। সেখানেও চারটি রকেট পড়ে আছে এমনি-এমনি। এই ডাকাতরা আর কিছু নেয় না। নেয় শুধু চোখ আর কানের পর্দা।

আর একটা খবর হচ্ছে, শুক্রগ্রহের লোকদের একটি রকেট মহাশূন্যে ঝটিকা-বাহিনীর একটি রকেট দেখেই আক্রমণ করে। সেখানে একটুক্ষণের মধ্যেই আরও দুটি ঝটিকা-বাহিনীর রকেট এসে পড়েছিল হঠাৎ। তখন শুক্রগ্রহের লোকদের রকেটটি পালাবার চেষ্টা করলেও সেটিকে ঘায়েল করা হয়েছে শেষ পর্যন্ত। শুক্রগ্রহের দুজন লোককে বন্দি করা হয়েছে। তাদের নিয়ে এখানে এসে পৌঁছতে দু-দিন সময় লাগবে।

ঝিলম হঠাৎ বলল, 'জেনারেল, আমি একটা অনুরোধ জানাব।'

'কী, বলো?'

'আমি রকেট নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়তে চাই। আমাদের সবচেয়ে আগে দরকার, শুক্রগ্রহের এই দলটির মূল ঘাঁটিটা খুঁজে বার করা। ঝটিকা-বাহিনী যেমন অনুসন্ধান চালাচ্ছে চালাক। আমি নিজেও একবার চেষ্টা করে দেখি।'

'তুমি একলা কী করবে? এখন তো দেখা যাচ্ছে এদিকে আকাশ-পথে চলাচল করাই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে! কখন ওরা কাকে আক্রমণ করবে ঠিক নেই।'

'ওরা আমাদের ধরতে পারবে না। দেখলেন তো একবার নী আর রা-কে ধরবার চেষ্টা করেও পারেনি।'

'তুমি যদি দুঃসাহস দেখাতে চাও, তাহলে আর আমার কী বলবার আছে? তুমি রকেট নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইলে তো আমার অনুমতির দরকার নেই?'

'আমি আপনার আশীর্বাদ চাই। তাছাড়াও আমার একটি প্রার্থনা আছে। শুক্রগ্রহের যে লোকটিকে আমরা বন্দি করে এনেছি তাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।'

'সে কী!'

'ওর কাছ থেকেই খবর বার করবার চেষ্টা করব।'

'আমরা এত চেষ্টা করেও পারিনি—'

'ওকে আমি হো-সানের কাছে নিয়ে যাব। তিনি নিশ্চয়ই ওর মনের কথা বুঝতে পারবেন।'

'হো-সান! তিনি মনের কথা পড়তে পারেন, এমন তো কখনও শুনিনি। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন।'

'তিনি সব পারেন। তাঁর ওপরে আমার অগাধ শ্রদ্ধা।'

'ঠিক আছে। তা হলে নিয়ে যাও ওকে। আর দু-জনকে তো বন্দি করে আনছেই। তবে দেখো, খুব সাবধান! ওই লোকটি সাপের থেকেও বেশি বিষাক্ত!'

সব ব্যবস্থা করার জন্য ঝিলম তখুনি উঠে পড়ল।

ঝিলম ভেবেছিল, নী আর রা-কে এখানেই রেখে যাবে। কিন্তু ওরা কিছুতেই রাজি নয়। এমন রোমাঞ্চকর অভিযানের সুযোগ ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। ঝিলম একটু বোঝাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। রা-কে বিপদের ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ নেই।

তাহলে ইউনুসকেই বা ফেলে যাওয়া যায় কী করে? ইউনুসের ঘুম ভাঙবে কাল সকালে। শুক্রগ্রহের লোকটিও জাগবে সেই সময়। তাহলে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়।

রাত্তিরটা ওরা আরাম করে ঘুমিয়ে নিল নরম বিছানায়।

৮

এই প্রথম ওরা রকেটে সবাই একসঙ্গে জেগে আছে। শুক্রগ্রহের লোকটির অবশ্য হাত আর পা বেঁধে রাখা হয়েছে। কন্ট্রোলে বসেছে ঝিলম। ইউনুস বসে আছে শুক্রগ্রহের লোকটির মুখোমুখি! ঝিলম তাকে লিখে জানিয়েছে, সে যেন চেষ্টা চালিয়ে যায় যতদূর সম্ভব ওই লোকটির মনের কথা জানবার।

ঝিলম প্রথমেই চলেছে হো-সানের কাছে।

হো-সান কখন কোথায় থাকেন তার কোনও ঠিক নেই। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, ভোরে উঠেই ঝিলম অনেকগুলো জায়গায় খবর নিয়ে জেনেছে যে, এখন হো-সান খুব কাছেই আছেন।

নী জিগ্যেস করল, 'রা-দি, এই হো-সান কে?'

রা বলল, 'তিনি এমনিতে একজন বৈজ্ঞানিক, আসলে তিনি একজন মহাপুরুষ। আমি ওঁর মতন মানুষ আর একজনও দেখিনি। ওঁকে দেখলেই শ্রদ্ধা হয়।'

নী বলল, 'বৈজ্ঞানিক ? যিনি প্রথম এনার্জিকে ম্যাটারে পরিণত করার উপায় আবিষ্কার করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি এখনো বেঁচে আছেন? সে তো কবেকার কথা! ওই জিনিসটা তো আবিষ্কার হয়েছিল দু-হাজার দশ সালে। আমরা ইস্কুলের বইতে পড়েছি, ঢাকার সায়েন্স-কংগ্রেসে

একজন বৈজ্ঞানিক একটা কাচের বাক্সের মধ্যে ঢুকে একটা দেশলাই-কাঠি জ্বালালেন। ফস করে আগুন জ্বলে উঠে বারুদটা পুড়ে গেল। তারপর তিনি যখন কাচের বাক্স থেকে বেরিয়ে এলেন, সবাই দেখল কাঠিটা আগের মতনই আছে। আবার সেটা জ্বালানো যায়। সবাই ভাবল, ওটা বুঝি ম্যাজিক। কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক বোঝালেন যে, বারুদ থেকে যদি আগুন হয়, তাহলে সেই আগুন থেকে আবার বারুদ হবে না কেন? সেই তিনিই তো?'

'হ্যাঁ। উনি আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। এমনকী সেদিন লালগোলাপে নেমে যে ট্যাবলেট খেলাম, যার জন্য কেউ আমাদের ছুঁতে পারল না, সেই ট্যাবলেটও ওঁর আবিষ্কার। ওঁর এখন কত বয়েস তা কেউ জানে না। তুই এসপারান্টো ভাষায় হো-সান মানে জানিস তো?'

'নিঃসঙ্গ।'

'উনি এখন সত্যিই নিঃসঙ্গ। এই নিঃসীম মহাশূন্যে ইচ্ছে করে হারিয়ে গেছেন। একদম একলা থাকেন।'

ঝিলম মুখ ফিরিয়ে বলল, 'রা, আমাদের বিয়ের খবর পেয়ে উনি যে একটা উপহার পাঠিয়েছিলেন, তা বললে না?'

নী বলল, 'কী উপহার, রা-দি?'

রা বলল, 'একটা ছোট্ট কালো রঙের চকচকে পাথর, তাতে দারুণ সুন্দর গন্ধ। পাথরের যে এমন চমৎকার গন্ধ থাকতে পারে, তা আগে আমার ধারণাই ছিল না। সব সময় কাছে রাখলে গন্ধটা পুরনো হয়ে যাবে বলে সেটা আমি সঙ্গে রাখিনি! আমার বাবা ওঁর লেবরেটরিতে কাজ করতেন এক সময়, সেই জন্য উনি আমায় খুব স্নেহ করেন।'

নী জিগ্যেস করল, 'উনি যে একদম একা থাকেন, ওঁর কষ্ট হয় না?'

রা বলল, 'উনি বলেন, বিজ্ঞানের চর্চাই ওঁর তপস্যা। শেষ বয়েসে উনি একা-একাই ওই তপস্যা করতে চান! উনি তো এখনও একটা দারুণ অস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছেন!'

'অস্ত্র?'

শুক্রগ্রহের লোকটিও এইসব কথা শুনছিল। ঝিলম তার দিকে ইঙ্গিত করে রা-কে বলল, 'ওকথা থাক, রা।'

রা একটু চুপ করে গেল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'আমারও বিশ্বাস, হো-সান এই লোকটিকে দেখলেই এর মনের কথা বলে দিতে পারবেন।'

নী বলল, 'আচ্ছা রা-দি, আমি সেদিন যখন নীল মেঘটায় নেমে স্নান করছিলাম, তখন আলো-রশ্মি দিয়ে কারা আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল? এরাই?'

রা বলল, 'আমার মনে হয়, ওই চুম্বক-আলো দিয়েই ওরা অনেক রকেটও নামিয়েছে। আমাদের এই সাত-দুই-নয়-শূন্য রকেটটাকে অবশ্য ওইভাবে নামানো খুবই শক্ত ব্যাপার। তবে অন্য দু-একটি দেশের কমজোরি রকেটগুলো টানতে পারে।'

নী ককপিটের সামনের কাচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইস, এখন আর একটাও মেঘ দেখা যাচ্ছে না।'

রা বলল, 'মেঘ থাকলেও তোমাকে আর নামতে দেওয়া হত না।'

ইউনুস একেবারে স্থিরভাবে শুক্রগ্রহের লোকটির দিকে চেয়ে বসে আছে। সে বেচারির তো এদের সঙ্গে কথাবার্তায় যোগ দেবার উপায় নেই।

হো-সান যেখানে থাকেন, সেই জিনিসটার নাম 'শান্তি'। সেটা উপগ্রহ কিংবা নক্ষত্র কিংবা রকেটও নয়। সেটা সাবানের ফেনার বুদবুদের মতন একটা গোল, স্বচ্ছ জিনিস। সেটাও চালাতে হয় না, সেটা আপনি-আপনি ভেসে বেড়ায়। বৃদ্ধ হো-সান এই বুদবুদটার মধ্যে ইচ্ছে করে নির্বাসন নিয়েছেন।

দূর থেকে ছোট্ট একটা বুদবুদের মতন দেখালেও সেটা অবশ্য সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতিতে ভরা। সবই হো-সানের নিজের হাতে তৈরি। কোনও রকেট ইচ্ছে করলেও এটাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যেতে পারবে না। কারণ এর চারপাশ ঘিরে প্রচণ্ড শক্তিশালী-বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বইছে। হো-সান নিজে কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে না চাইলেও সমস্ত স্পেস-স্টেশন ওই শান্তি নামের বুদবুদটির খোঁজ-খবর রাখে। মাঝে-মাঝে বিশেষ-বিশেষ কেউ দেখা করতে যায় ওঁর সঙ্গে।

শান্তির কাছাকাছি এসে ঝিলম সিগন্যাল দিতে লাগল।

কমপিউটার জিউস বলল, 'মেশিন বন্ধ করে দাও, ঝিলম। হো-সান একেবারে শব্দ সহ্য করতে পারেন না, মনে নেই? শান্তির দরজা খুললেই আমাদের রকেটের প্রচণ্ড শব্দ ভেতরে ঢুকবে।'

ঝিলম বলল, 'ধন্যবাদ, জিউস। আমরা শান্তি থেকে কতটা দূরে আছি?'

'মাত্র সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার ।'

'এবার আমরা ওর নিচের দিকে যাব তো?'

'হ্যাঁ। গতিপথ ঠিক করে দিয়েছি আমি, তুমি মেশিন বন্ধ করে দিলেই ঠিক চলে যাব—'

শান্তির ভেতর অনেকখানি জায়গা থাকলেও রকেটসুদ্ধু তার মধ্যে ঢোকা যায় না। রকেটটা ওর নিচে নিয়ে গেলেই একটা দরজা খুলে যায়, তখন রকেট থেকে বেরুলেই ওপরে টেনে নেয়। মনে হয় যেন একটা ঝড় এসে ঠেলে নিয়ে যায় ভেতরে।

ঝিলম বলল, 'জিউস, তোমার ওপর রকেটের ভার দিয়ে গেলাম।'

জিউস বলল, 'ঠিক আছে। মহাত্মা হো-সানের কাছ থেকে আমার জন্য আশীর্বাদ চেয়ে এনো।'

'নিশ্চয়ই!'

এর পর ঝিলম চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করল ইউনুসকে। ইউনুস আর ঝিলম দু-দিক থেকে ধরল বন্দিটিকে! সে বিশেষ বাধা দেবার চেষ্টা করল না। হো-সানকে দেখবার জন্য তারও কৌতূহল হয়েছে বোধহয়।

ওরা রকেটের ওপর এসে দাঁড়াতেই বুদবুদের মতন গোলকটির খানিকটা অংশ খুলে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গেই ওরা হুশ করে ঢুকে গেল ভেতরে। সেই অংশটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে গিয়ে ওরা খানিকটা হাওয়ার মধ্যে ভাসতে-ভাসতে তারপর আস্তে-আস্তে নেমে পড়ল নিচে।

ঠিক যেন সবুজ ঘাস আর গাছপালা ভরা একটি মাঠ আর তার মাঝখান দিয়ে

একটা সুরকি-বিছানো পথ। আসলে অবশ্য সবই আলোর কারসাজি। সুরকির বদলে ওই রঙের কাগজকুচি ছড়ানো আছে পথটায়। সেই পথের শেষে একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ি।

ওরা একটুখানি এগুতেই সেই বাড়িটির দরজা খুলে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। ছোট্টখাট্টো চেহারা, সাদা পাজামার ওপরে একটা সাদা ফতুয়া, পায়ে চটি। সেই বৃদ্ধের যে কত বয়েস তা বোঝবার উপায় নেই। তার মাথার চুল ধপধপে সাদা, মুখে পাতলা-পাতলা দাড়ি সাদা, গোঁফ সাদা, ভুরু সাদা, এমনকী চোখের পল্লব আর গায়ের লোমও সব সাদা। তিনি সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে পা টেনে-টেনে হাঁটেন। ইনিই মহাকাশের নিঃসঙ্গ মানুষ হো-সান।

বন্দির হাত ছেড়ে দিয়ে ঝিলম আর ইউনুস এগিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করল তাঁকে। নী আর রা প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে।

ঝিলম বলল, 'হে গুরুদেব, আপনার জীবন আনন্দময় নিশ্চয়ই?'

হো-সান বললেন, 'আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, তবু জীবন বড় সুন্দর, বড় মধুময়। তোমাদের জীবন আরও বিচিত্র, আরও সুন্দর হোক।'

রা-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন আছ, রাভী মামণি? তোমাকে সেই কত ছোট্ট দেখেছিলাম! এই মেয়েটি কে?'

রা বলল, 'এর নাম নীলাঞ্জনা। আমার আত্মীয় হয়।'

'বাঃ, বেশ নামটি তো!'

ঝিলম বলল, 'আমার বন্ধু ইউনুসকে চিনতে পারছেন তো? একবার মাত্র দেখেছেন আগে।'

'হ্যাঁ, চিনেছি। ও বুঝি নিঃশব্দ বড়ি খেয়েছে? এসো, তোমরা সবাই ভেতরে এসো। এই শুক্রগ্রহের লোকটিকে পেলে কোথায়?'

ঝিলম বলল, 'সে অনেক ব্যাপার আছে। এই জন্যেই আপনার কাছ থেকে পরামর্শ চাইতে এসেছি।'

দরজা দিয়ে ঢুকেই ভেতরে একটি বসবার ঘর। সোফা কৌচ দিয়ে সাজানো, এক পাশে একটা টি.ভি, দেয়ালে নানা রকম ফুলের বাঁধানো ছবি। ঠিক যেন পৃথিবীর যে-কোনও শহরের একটা বাড়ি। এখানে ঢুকলে বোঝাই যায় না যে, ওরা এখন অসীম মহাশূন্যের একটা ভাসমান বুদবুদের মধ্যে রয়েছে।

শুক্রগ্রহের বন্দিটিকে ইউনুস আর ঝিলম বসিয়ে দিল একটি সোফায়।

এবার সে কথা বলে উঠল। সে হো-সানের দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে বলল, 'আপনি হো-সান। আপনার নাম আমরাও শুনেছি। এরা আমায় ধরে এনেছে, আপনি নাকি আমার মনের সব কথা বার করে দেবেন। দেখি, কেমন আপনার শক্তি!'

হো-সান দু-দিকে মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, 'না, না, আমার সেরকম কোনও শক্তি নেই! এরা বাড়িয়ে বলে। একেবারে তিনকেলে বুড়ো হয়ে গেছি, চোখেও ভালো দেখতে পাই না। আমি কি আর ওসব পারি? আগে একটু আধটু পারতাম।'

তারপর তিনি নী-র দিকে ফিরে হাসি-মুখে বললেন, 'নীলাঞ্জনা, তুমি ধাঁধার উত্তর

দিতে পারো? একটা ধাঁধা জিগ্যেস করছি, বলো তো? কালোর মধ্যে আলো, আলো নিভলেও কালো। কী?'

নী প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, 'চোখ! চোখের মণি কালো, তাই দিয়ে সব আলো দেখা যায়। আবার চোখ বুজলেই সব কিছু কালো হয়ে যায়।'

হো-সান বললেন, 'বাপ রে। এই মেয়ের কী বুদ্ধি! একটু চিন্তাও করতে হল না।'

নী বলল, 'অবশ্য অনেকের চোখের মণি নীল কিংবা খয়েরিও হয়।'

হো-সান বললেন, 'তোমার চোখ কালো, রাভীর চোখ কালো, ঝিলম আর ইউনুসের চোখও তো কালোই দেখছি। আচ্ছা, আর একটা বলো তো? আকাশ থেকে আশ মেটাও, যেথায় ইচ্ছে যাও, একটা ছেড়ে আরেকটায়, তিনের অর্ধেক নাও!'

এবার নী-কে একটু ভাবতে হল! মন দিয়ে কিছু চিন্তা করার সময় নী একটু ট্যারা হয়ে যায়। তবু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে বলে উঠল, 'ও, বুঝেছি। কান! আকাশ থেকে আশ মেটাও, অর্থাৎ আশ বাদ দিলে থাকে কা, আর তিনের অর্ধেক করলে হয় তি আর ন, এর মধ্যে একটা ছেড়ে আরেকটায়, অর্থাৎ ন!'

হো-সান বললেন, 'এটাও ধরতে পেরেছে? বাঃ!'

ঝিলম আর রা অবাক হয়ে চোখাচোখি করল একবার।

হো-সান এবার বললেন, রাভী আর নীলাঞ্জনা, তোমরা একটু বাইরে বেরিয়ে ঘুরে ফিরে দ্যাখো জায়গাটা। আমি ঝিলমের সঙ্গে কথা বলি।'

মেয়ে দুটি বেরিয়ে যাবার পর ঝিলম শুক্রগ্রহের লোকদের ডাকাতির ঘটনাটা সংক্ষেপে শোনাল হো-সানকে।

সব শুনে তিনি দুঃখিতভাবে শুক্রগ্রহের বন্দিটিকে বললেন, 'ছিঃ আপনারা এ রকম করছেন কেন? আপনি ডাক্তার, আপনার কাজ হচ্ছে মানুষের প্রাণ বাঁচানো। সব মানুষের প্রাণের দাম সমান। আপনি একজন মানুষের চোখ আর কান তুলে অন্য একজনকে সুস্থ করে তুলছেন? আপনার বিবেকে লাগছে না?'

শুক্রগ্রহের বন্দিটি অবহেলার সঙ্গে বলল, 'সব মানুষের প্রাণের দাম মোটেই সমান নয়! মানুষের মধ্যে যাদের বুদ্ধি বেশি, শক্তি বেশি, তাদেরই বেঁচে থাকবার অধিকার বেশি!'

হো-সান বললেন, 'এ তো আপনি বলছেন জন্তু জানোয়ারদের কথা। মানুষই তো দুর্বলের সেবা করে, অন্যদের স্নেহ করে, ভালোবাসে। একটি অসুস্থ শিশুকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য আমরা ব্যস্ত হই কেন? সেই শিশুটির তুলনায় তো আমাদের বুদ্ধিও বেশি, গায়ের জোরও বেশি! যাই হোক শুনুন! আপনারা শুক্রগ্রহ ছেড়ে অজানার অভিযানে বেরিয়ে পড়েছেন, খুব ভালো কথা। কিন্তু মন থেকে অকারণ হিংসা আর লোভ মুছে ফেলুন! আপনাদের দলের কিছু লোকের যদি চোখ অন্ধ আর কানের পর্দা ফেটে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের সবাইকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমরা সানন্দে তাদের চোখ আর কান ঠিক আগের মতন করে দেব।'

বন্দিটি বলল, 'আমরা আপনাদের কোনও সাহায্য চাই না!'

'সাহায্য না চেয়ে, এ রকম মহাকাশে ডাকাতি করবেন ভেবেছেন?'

ঝিলম বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে, ওরা কোনও একটা অজানা গ্রহে কিংবা নক্ষত্রে এমন একটা কিছু আবিষ্কার করেছে, যার কথা আমাদের জানাতে চায় না কিছুতেই।'

হো-সান হেসে বললেন, 'কতদিন গোপন রাখবে? বেশিদিন গোপন রাখা কি সম্ভব? তোমার মতন কত অভিযাত্রী মহাকাশ ঘুরছে, তাদের কেউ না কেউ একদিন-না-একদিন খুঁজে পাবেই!'

ঝিলম বলল, 'সেই কথাটাই তো এরা বুঝছে না।'

ইউনুস বন্দিটির দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে আছে।

ঝিলম হো-সানকে বলল, 'ওই লোকটি এখানে থাক, ইউনুস পাহারা দেবে। গুরুদেব, আমি আপনার লেবরেটরিটা একবার দেখতে চাই।'

বাড়িটার পিছন দিকে বিরাট লেবরেটরি। হো-সান ছাড়া আর একজনও লোক নেই, এটা ভাবলেই কেমন যেন গা ছমছম করে। একেবারে সম্পূর্ণ একা কোনও মানুষ থাকতে পারে? বৃদ্ধ হো-সান যদি হঠাৎ এখানে কোনওদিন মরেও যান, কেউ টেরও পাবে না।

লেবরেটরিতে এসে ঝিলম জিগ্যেস করল, 'গুরুদেব, সেই অস্ত্রটার কতদূর কী হল?'

হো-সান বললেন, 'দিন ফুরিয়ে এসেছে আমার। বোধহয় আর শেষ করে যেতে পারব না। অনেকখানি এগিয়েছিলাম, কিন্তু আরও অনেক পরীক্ষা করতে হবে! কাজে লাগিয়ে দেখতে হবে!'

ঝিলম উত্তেজিতভাবে বলল, 'অনেকখানি এগিয়েছেন? তাহলে আমার ওপরে পরীক্ষা করুন!'

'তোমার ওপরে, তা কি হয়? এখনও অনেক বিপদের ঝুঁকি আছে!'

'আপনি জানেন, কোনও বিপদকে আমি ভয় করি না। যদি আপনার পরীক্ষার কাজে লাগতে পারি'

'আমি ভয় করি, ঝিলম, আমি ভয় পাই! একেবারে নিশ্চিন্ত না হয়ে কি পরীক্ষা করা যায়।'

হো-সান তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একটা প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্রত নিয়েছেন। তিনি যেটা আবিষ্কার করতে চলেছেন, সেটা আসলে কোনও অস্ত্র নয়, একটা শক্তি। এতকাল ধরে মানুষ শুধু মানুষ মারার জন্য কত রকম অস্ত্র আবিষ্কার করেছে। হো-সান আবিষ্কার করতে চান এমন এক প্রতিরোধ-শক্তি, যে শক্তি পেলে কোনও অস্ত্রই সেই মানুষকে ধ্বংস করতে পারবে না।

এরপর হো-সানের সঙ্গে ঝিলমের কিছুক্ষণ ধরে অনেক গোপন কথাবার্তা হল। তারপর হো-সান রা আর নীকে ডেকে আনলেন সেখানে। রা-র কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, 'রাভী মামণি, আমি একটা প্রতিরোধ শক্তি আবিষ্কার করেছি, যেটা এখনও পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এখনও বিপদের ঝুঁকি আছে। ঝিলম সেটা ব্যবহার করতে চাইছে। ওকে দেওয়া কি ঠিক হবে? ঝিলম যে আমার খুব স্নেহের, বড় আদরের, ওর যদি কোনও বিপদ হয়...'

রা বলল, 'ওকে দেবেন না। আপনি আমার ওপর দিয়ে সেটা পরীক্ষা করুন!'

'ওরে দুষ্টু মেয়ে। তোমার কোনও বিপদ হলে বুঝি আমার কম কষ্ট হবে?'

নী বলল, 'আমায় দিয়ে সেটা পরীক্ষা করা যায় না?'

রা বলল, 'তুই চুপ কর তো! তুই বাচ্চা মেয়ে!'

ঝিলম বলল, 'আমি কিন্তু আগে বলেছি, আমার দাবি প্রথম।'

হো-সান বললেন, 'এখনো আমার মন মানতে চাইছে না। চিন্নাস্বামীকে চেনো তো? আমার সহকারী ছিল এক সময়, তাকে খবর পাঠিয়েছি, সে এলে তাকে সব দিয়ে দেব। সে পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করবে!'

ঝিলম বলল, 'আমি কিন্তু আপনার কাছে এই জন্যই এসেছি।'

'চলো, ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলি!'

রা আর নী-কে বাইরে রেখে হো-সান ঝিলমকে নিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ঝিলম বেরিয়ে এল প্রায় তিন ঘন্টা পরে। নী আর রা তখন বাড়ির ছাদে প্রচন্ড শক্তিশালী টেলিস্কোপে অনেক দূরের-দূরের তারা দেখছিল। ঝিলম তাদের ডেকে বলল, 'চলো, এবার যেতে হবে!'

বিদায় দেবার সময় হো-সান মিষ্টিমুখ করাবার জন্য প্রত্যেকের হাতে একটি করে মিছরির দানার মতন জিনিস দিলেন। ঝিলম জানে, ওইটুকু জিনিস খেলেই তাদের আর চব্বিশ ঘন্টা খিদে পাবে না। হো-সান আজকাল প্রায় কিছুই খান না। এই গোলকে তাঁর জন্য প্রায় পঞ্চাশ বছরের খাবার মজুত আছে।'

হো-সান শুক্রগ্রহের বন্দিটিকেও এক টুকরো মিষ্টি দিয়েছিলেন। লোকটি এত অভদ্র যে, সেটা না খেয়ে ফেলে দিল।

তাতেও রাগ করলেন না হো-সান। নরম গলায় বললেন, 'আপনি এত গোপনীয়তার বোঝা আর কতদিন বয়ে বেড়াবেন? এই রকম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দিনের পর দিন ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে আপনার ভালো লাগবে? আমরা তো আপনাদের সাহায্য করতেই চাই!'

লোকটা রুক্ষভাবে উত্তর দিল, 'আমার যা হয় হোক, তার জন্য আমি আমার দলের কোনও ক্ষতি করতে চাই না!'

ঝিলম বলল, 'দেখা যাক। চলুক তবে ধৈর্যের পরীক্ষা!'

গোলকের একটা অংশ খুলে যেতেই ওরা বেরিয়ে এল বাইরে। রকেটের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে ওরা শেষবারের মতন হাত নেড়ে বিদায় জানাল হো-সানকে। সেই ছোট্টখাট্টো চেহারার বৃদ্ধ ওদের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আস্তে-আস্তে হাত নাড়ছেন।

ভেতরে ঢুকে রকেটটা চালু করা মাত্র চোখের নিমেষে সেটা এত দূরে চলে গেল যে, হো-সানকে আর দেখা গেল না।

ঝিলম বলল, 'ধন্যবাদ জিউস! হো-সান তোমায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন!'

জিউস বলল, 'হো-সান দীর্ঘজীবী হোন!'

নী বলল, 'কী চমৎকার মানুষ!'

রা বলল, 'আমার খুব মনটা খারাপ লাগছে। ওঁকে আর কোনওদিন দেখতে পাব তো? যতবার দেখি, ততবারই ভয় হয় এরকম একা-একা থাকেন!'

বন্দিটিকে একটা চেয়ারে বসিয়ে ইউনুস গিয়ে আবার বসেছে তার মুখোমুখি চেয়ারে।

ঝিলম দু-হাত উঁচু করে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর বলল, 'আমার কী রকম শরীরটা খারাপ লাগছে!'

রা বলল, 'শরীর খারাপ লাগছে, কই দেখি?'

ঝিলমের কপালে হাত রেখে সে আবার বলল, 'তোমার তো জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে! তুমি বরং হাসপাতাল-ঘরে গিয়ে একবার দেখিয়ে নাও!'

নী বলল, 'ঝিলমদা সেই সে জেনারেল লি পো'র সঙ্গে অভিযানে বেরিয়েছিলেন, তারপর তো আর ঘুমোননি।'

রা বলল, 'তাই তো, খুব অন্যায় করেছ ঝিলম! তোমার অন্তত কুড়ি দিন আয়ু খরচ হয়ে গেছে। চলো, হাসপাতাল ঘরে চলো।'

ঝিলম বলল, 'তার দরকার নেই। ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে। আমি আট দিনের জন্য ঘুমের বড়ি খাচ্ছি। ততদিন তুমি আর ইউনুস চালাও। তারপর আমি জাগলে তোমরা ঘুমোতে যাবে। তবে সাবধান, ওই লোকটার দিকে চোখ রেখো, ও যেন কোনও গন্ডগোল না করে আবার! চলো, নী!'

নী অবাক হয়ে বলল, 'আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি শুধু-শুধু জেগে থেকে আয়ু খরচ করবে কেন? তুমিও আমার সঙ্গে ঘুমোবে চলো।'

ইউনুস তার কথা বুঝতে পারবে না বলে একটা কাগজে লিখে ঝিলম সেই কাগজটা দিল ইউনুসের হাতে।

তখন জিউস বলে উঠল, 'ঝিলম, তুমি ঘুমোতে যাচ্ছ, কিন্তু রকেটটা এখন কোন দিকে যাবে সেটা বলে দিলে না?'

ঝিলম বলল, 'ও হ্যাঁ, আপাতত টিউলিপ নক্ষত্রের দিকে চলুক। ততদিনে যদি আমার ঘুম না ভাঙে, তাহলে মহাকাশ স্পেস স্টেশন ২ নম্বরের দিকে এগিয়ো। পথে সন্দেহজনক কিছু দেখলেও থামবে না। আমি জেগে উঠলে আবার সেখানে ফিরে আসব।'

জিউস বলল, 'ঠিক আছে। তোমাদের সুনিদ্রা হোক।'

ঝিলম ইউনুসের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় বিদায় নিয়ে একবার রা-র কাঁধে হাত রেখে বলল, 'সাবধানে থেকো!'

তারপর নী-কে নিয়ে সে চলে গেল ঘুম-ঘরে।

আগেকার পোশাক বদলে দু-জনেই খুব হালকা পোশাক পরে নিল। নী-কে আগে কাচের বাক্সে শুইয়ে তারপর নিজের বাক্সটায় গেল ঝিলম। সাধারণ বিছানার বদলে এই কাচের বাক্সে শুতে হয়। তার কারণ হঠাৎ রকেটের ভেতরটা বেশি ঠান্ডা বা গরম হয়ে গেলে সেটা ওরা টের পাবে না। এই ট্যাবলেট খাওয়া ঘুম মাঝখানে একবার ভেঙে গেলে খুব ক্ষতি হয়।

হাত বাড়িয়ে নী-কে ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে বাক্সের ডালা বন্ধ করবার আগে ঝিলম বলল, 'একটা কবিতা শোনোও তো, নী। অনেকদিন তোমার কবিতা শুনিনি।'

নী বলল ঃ

জলে ভেজা রোদে ভাজা
বরফ-দেশ কাঁপন
আমার আমি তোমার তুমি
সবার চেয়ে আপন
কেউ বা দুখে কেউ বা সুখে
করছে জীবন যাপন
আমার আমি তোমার তুমি
সবার চেয়ে আপন
নদীর পাশে... নদীর পাশে...
নদীর পাশে.....

আর শেষ করতে পারল না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল নী-র।

৯

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে একঘেয়ে লাগল রা-র। ইউনুসের সঙ্গে তো কথা বলার উপায় নেই। কিছুক্ষণ সুইচ টিপে গান শুনল।

শুক্রগ্রহের বন্দিটি বসে-বসে ঢুলছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে রা-র একটা কথা মনে হল। এই লোকটার তো আয়ুক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে কিছুদিন ঘুরলেই তো লোকটা বুড়ো হয়ে যাবে।

সে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা জিউস, এই লোকটাকে মাঝে-মাঝে ঘুম পাড়িয়ে রাখা উচিত নয়? শুধু-শুধু ওর আয়ু খরচ করে লাভ কী?'

জিউস বলল, 'ঝিলম তো কিছু বলেনি! ঝিলম জেগে উঠুক, তারপর দেখা যাবে!'

'ও ঘুমিয়ে থাকলে তো আমরাও নিশ্চিন্ত! এত পাহারা দিতে হয় না!'

'ও ঘুমোলে ইউনুস ওর মনের কথা পড়বার চেষ্টা করবে কী করে?'

'তা ঠিক!'

একবার রা উঠে গেল কফি বানাতে। তিনটে কাগজের গেলাসে কফি এনে একটা দিল ইউনুসকে। আর একটা গেলাস বন্দির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে, ডাক্তারবাবু, একটু কফি খান।'

লোকটি চোখ মেলে তাকাল।

ওর হাত বাঁধা, নিজে কফি খেতে পারবে না বলে রা গেলাসটা ধরল ওর মুখের কাছে।

লোকটি মুখের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল গেলাসটা!

রা বলল, 'ইস, দিলে নষ্ট করে? শুক্রগ্রহের মানুষগুলো এত অসভ্য আর গোঁয়ার কেন?'

রা নিজের কফি নিয়ে এসে আবার বসল কন্ট্রোল বোর্ডের সামনে। দূরে আবার একটা ধূমকেতু দেখা যাচ্ছে। নী জেগে থাকলে খুব আনন্দ পেত।

কফি শেষ করে ইউনুস একবার উঠে গেল। বাথরুমে গেলাসটা ফেলে সে এল ঘুম-ঘরে। নী আর ঝিলম অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সেখানে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে রকেটের নানান ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তারপর একসময় ইউনুস এসে দাঁড়াল কন্ট্রোল রুমে রা-র পাশে। রা মুখ তুলে তাকালেই ইউনুস রা-র হাত-ব্যাগটা তুলে নিল এক হাতে।

রা জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, ইউনুস? তুমি কিছু চাইছ?'

ইউনুস হঠাৎ কথা বলে উঠল।

সে গম্ভীরভাবে বলল, 'এবার আমি এই রকেটটার দখল নিচ্ছি! তুমি উঠে এসো, রা—।'

রা বলল, 'তুমি কন্ট্রোল বোর্ডে বসবে? আমার পাশে এসে বোসো না!'

ইউনুসের এক হাতে ছোট্ট একটা রিভলভার। সেটা উঁচু করে সে আবার বলল, 'আমার কথা শুনতে পাওনি? উঠে এসো! কোনও রকম বাধা দেবার চেষ্টা করলেই মরবে!'

রা খিলখিল করে হেসে উঠল। হসতে-হাসতেই বলল, 'বাবা রে বাবা, অদ্ভুত তোমার ঠাট্টা! এতদিন পর কথা বলতে শুরু করেই তুমি এমন ভয় পাইয়ে দিলে—'

ইউনুস খপ করে রা-র চুলের মুঠি চেপে ধরে কর্কশ গলায় বলল, ঠাট্টা! আমি অনেক দিন সহ্য করেছি! তোমরা আমার সঙ্গে চাকরের মতন ব্যবহার করো...।'

রা এবার ধমক দিয়ে বলল, 'কী হচ্ছে, ইউনুস? এরকম ইয়ার্কি আমি পছন্দ করি না! চুল ছেড়ে দাও!'

ইউনুস এবার প্রচণ্ড জোরে রা-র মুখে একটা চড় কষাল! দাঁতে-দাঁত চেপে বলল, 'ফের আমার সঙ্গে ওই রকম সুরে কথা বলছ? আমি তোমাদের চাকর? ঝিলম মনে করে চিরকাল আমি ওর সহকারী থেকে যাব? প্রাণে বাঁচতে চাও তো উঠে এসো, এই রকেট এখন আমার!'

চড় খেয়ে রা হতবাক হয়ে চেয়ে রইল ইউনুসের মুখের দিকে। এত জোরে কেউ তাকে কখনও মারেনি। ইউনুসের মুখখানা হিংস্র হয়ে গেছে, সে কটমট করে চেয়ে আছে রা-র দিকে।

রা এবার বলে উঠল, 'জিউস, কী ব্যাপার? ইউনুস কি হঠাৎ পাগল হয়ে গেল?'

জিউস কোনও উত্তর দিল না।

ইউনুস বলল, 'জিউসকে আমি আগেই ঠান্ডা করে রেখেছি। ওর কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাবে না। আমি পাগল! আমাকে তোমরাই জোর করে নিঃশব্দ-বড়ি খাইয়ে চুপ করিয়ে রেখেছিলে। যাতে আমি কোনও কথা বলতে না পারি, শুধু আমাদের হুকুম মেনে চলব! ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই ঝিলমকে আমি খুন করব!'

'ইউনুস, কী বলছ?'

'একটু পরেই দেখতে পাবে, আমি কী করি!'

শুক্রগ্রহের বন্দিটি প্রায় হাঁ করে তাকিয়ে ওদের কথা শুনছে। তার দিকে ফিরে ইউনুস বলল, 'আমি তোমার মনের কথা সব জেনে গেছি। তোমরা নটিলাস নামে একটি রকেটে চেপে সূর্যমন্ডলের বাইরে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ একটা মৃত নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছ। সেই নক্ষত্রটিতে দুটি বিরাট সোনার পাহাড় আছে, সে এত সোনা যে, পৃথিবীর মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। নিজেদের চেনাশোনা আড়াইশ লোক নিয়ে তোমরা আস্তে-আস্তে সেই নক্ষত্রে একটা আস্তানা তৈরি করেছ। সেই সোনা নিয়ে গিয়ে এর পর তোমাদের দলটাই পুরো শুক্রগ্রহের মালিক হতে চাও, তাই না?'

লোকটি বলল, 'সোনার পাহাড়, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! তা আবার হয় না কী?'

'তোমরা সেই গ্রহটার নাম দিয়েছ মিডাস। প্রথমবার সোনা তুলতে গিয়ে সেখানে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। সেখানে যে হিলিয়াম গ্যাস ছিল, তোমরা জানতে না। সেই বিস্ফোরণে তোমাদের দলের প্রায় দেড়শো জন লোকের চোখ অন্ধ আর কান কালা হয়ে গেছে। তারাই তোমাদের প্রথম সারির বিশিষ্ট লোক। আমার কাছে আর লুকোবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই।'

'ধরো যদি তোমার কথা সত্যিও হয়, তাতেই বা কী হবে?'

'এখন তোমার জীবন নির্ভর করছে আমার হাতে। তোমাকে আমি এই মুহূর্তে রকেট থেকে ফেলে দিতে পারি। আবার তোমাকে বাঁচাতে পারি একটি শর্তে। মহাশূন্য স্টেশন-আর্মস্ট্রং-এ তুমি কালো নার্স মেয়েটিকে তার দেহের ওজনের সমান সোনা দিতে চেয়েছিলে তোমার মুক্তির বিনিময়ে। তুমি যদি আমার দেহের ওজনের সমান সোনা দাও আমাকে, তাহলে আমি তোমাকে মুক্তি দেব।'

'মুক্তি দেবে মানে?'

'তোমাকে ওই মিডাস নক্ষত্রে পৌঁছে দিয়ে আসব। সেখানে তুমি আমায় সোনাটাও দিয়ে দেবে। তোমাদের ওই নক্ষত্রের কথা আর কারুকে জানাব না। সেই প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি।'

'তোমার কথায় বিশ্বাস কী?'

'আমার মুখের কথাই বিশ্বাস করতে হবে। আসলে মহাশূন্যে ওড়াউড়ি করতে আমার আর ভালো লাগে না। ওই সোনাটা পেলে আমি নিজের দেশে ফিরে গিয়ে আরামে জীবন কাটাতে চাই।'

'ঠিক আছে, রাজি!'

রা বলে উঠল, 'খবর্দার ইউনুস, ওকে তুমি বিশ্বাস করো না! তুমি কী ছেলেমানুষি করছ, ইউনুস? ওদের নক্ষত্রে একবার গেলেই ও আমাদের সবাইকে বন্দি করবে। তোমাকেও ছাড়বে না। ঝিলম এখন জেগে নেই...'

ইউনুস গর্জন করে বলল, 'তুমি চুপ করো! ঝিলম জেগে নেই! ঝিলমই বেশ সবকিছু পারে! আমার কোনও বুদ্ধি নেই?'

ইউনুস এগিয়ে গিয়ে শুক্রগ্রহের মানুষটির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল!

রা চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে হাত চাপা দিল নিজের মুখে। কী বোকামি করছে ইউনুস! ওই হিংস্র লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় কখনও?

ইউনুস লোকটিকে বলল, 'এই সুতো দিয়ে এবার ওই মেয়েটির হাত-পা বেঁধে ফেলো। তারপর তোমার সঙ্গে আমার আলোচনা হবে।'

লোকটি এসে রা-র হাত-পা বেঁধে ফেলল সঙ্গে-সঙ্গে। রা কোনও বাধা দেবার চেষ্টা করল না। কারণ, কোনও লাভ নেই। ইউনুস আগেই তার হাত-ব্যাগটা কেড়ে নিয়েছে। কোনও অস্ত্র নেই তার কাছে এখন। লোকটা তাকে টানতে-টানতে নিজের চেয়ারটায় বসিয়ে দিল।

ইউনুস বলল, 'এবার তুমি আমার কাছে এসে বোসো—'

ইউনুসের হাতে তখনও সেই রিভলভার। সে সেটা দেখিয়ে বলল, 'এবার এটা পকেটে ভরে রাখতে পারি? রিভলভার উঁচিয়ে কোনও সন্ধির কথা আলোচনা করা যায় না। তুমি হঠাৎ আমায় আক্রমণ করার চেষ্টা করবে না আশা করি। কারণ তাতে কোনও লাভ নেই। এই রকেটটা এমন ভাবে তৈরি যে, এটা আমি, ওই মেয়েটি আর ঝিলম ছাড়া আর কেউ চালাতে পারবে না। তুমি যদি এখন হঠাৎ আমায় মেরে ফেলো, তা হলে তোমাকে অনন্তকাল মহাশূন্যে ঘুরতে হবে।'

লোকটি বলল, 'বুঝলুম। তোমাকে মারব কেন, তোমার প্রস্তাবে তো আমি রাজিই হয়েছি! তুমি যা চাইলে, তার দ্বিগুণ সোনা দিতে রাজি আছি, যদি তুমি আমাদের আরও কিছু দাও!'

'কী?'

'এই দুটি মেয়ে আর অন্য লোকটিকেও আমাদের মিডাস-এ নামিয়ে দেবে! ওদের চোখ আর কানের পর্দাগুলো আমাদের চাই!'

'বেশ তো! ওদের আমি এমনিই ফেলে দিতাম। আমি যখন ফিরে যাব, তখন বলব, ওরা শুক্রগ্রহের লোকদের হাতে ধরা পড়েছে। কেউ আমার কথা অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমার চোখ আর কানের পর্দার ওপরেও তোমাদের লোভ নেই তো? আমাকে আটকে রাখবার চেষ্টা করবে না?'

'না, না!'

এই সময় রা হঠাৎ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ইউনুস দারুণ বিরক্ত ভাবে বলল, 'আঃ! এইজন্যই মেয়েগুলোকে আমি সহ্য করতে পারি না। একটু বিপদের গন্ধ পেতে-না-পেতেই ছিঁচকাঁদুনের মতন ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে কাঁদতে শুরু করে। কেঁদে আর কোনও লাভ নেই। বুঝলে রা? আমি বেশি রেগে গেলে এখুনি তোমার চোখ উপড়ে নিতে বলব এই ডাক্তারকে।' রা কান্না থামিয়ে মুখ তুলে বলল, 'বিপদের ভয়ে আমি কাঁদিনি, ইউনুস। আমি আর ঝিলম তোমাকে কত ভালোবাসি, তুমি আমাদের কত দিনের বন্ধু, দুঃখে-সুখে কতদিন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি, সেই তুমি সামান্য সোনার লোভে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে? ভালোবাসা, স্নেহ, প্রীতি, দয়া, মায়া, এসবই তুচ্ছ হয়ে গেল সোনার জন্য?'

ইউনুস বলল, 'আমরা এখন কাজের কথা বলছি। তোমার বক্তৃতা থামাও! ভেবো না, তোমার ওই প্যানপ্যানানি শুনে আমি গলে যাব! লোকে চাকর-বাকরকে যেমন ছিটেফোঁটা ভালোবাসে, তোমরা সেইরকম ভালোবাসতে আমাকে!'

শুক্রগ্রহের লোকটির দিকে তাকিয়ে ইউনুস বলল, 'এক কাজ করলে হয় না? রা-কেও ঘুম-ঘরে নিয়ে গিয়ে যদি বন্ধ করে দিই? তারপর ও-ঘরের বাতাস কমিয়ে দিলেই ওরা মারা যাবে। তাই করা যাক বরং। ঝিলম হঠাৎ জেগে উঠলে বিপদ হতে পারে। সে-ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। মরা মানুষের চোখও তো কাজে লাগে।'

শুক্রগ্রহের লোকটি বলল, 'কোনও কারণে দেরি হয়ে গেলে আর কাজে লাগে না। এক্ষুনি মেরে ফেলার দরকার নেই। ওই ঝিলম তো আট দিনের জন্য ঘুমের বড়ি খেয়েছে, অর্থাৎ এই রকেটের ভেলোসিটি অনুযায়ী আট ঘন্টা, তার অনেক আগেই আমরা মিডাসে পৌঁছে যাব।'

ইউনুস বলল, 'তা হলে শোনো, আমি কী ব্যবস্থা নিতে চাই। প্রথমে মিডাসে পৌঁছে আমি ওদের তিনজনকে সেখানে ফেলে দেব ওপর থেকে। আমার রকেট সেখানে নামবে না। তুমি তখনও ছাড়া পাবে না। তুমি খবর পাঠাবে সোনাটা কাছাকাছি কোনও গ্রহে কিংবা নক্ষত্রে পৌঁছে দিতে। মিডাসের সবচেয়ে কাছে কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে?'

লোকটি বলল, 'একদিকে সেন্ট মেরি নক্ষত্র আর একদিকে পীর জালাল নক্ষত্র। দুটোই সমান দূরত্বে প্রায়!'

রা অস্ফুট গলায় বলল, 'সেন্ট মেরি!'

ইউনুস রা-র দিকে ফিরে কঠোরভাবে বলল, 'ফের যদি আমাদের কথার মাঝখানে একটাও কথা বলো, তা হল তোমায় ঘুম-ঘরে আটকে রাখতে বাধ্য হব।'

শুক্রগ্রহের লোকটি রা-কে বলল, 'ওহে মেয়ে, বুঝতেই তো পারছ, আর তোমাদের মুক্তি পাবার আশা নেই! তুমি যদি আমার কথা শোনো তা হলে তোমার চোখ দুটো তুলে নেব না! মিডাসে আমাদের দলে মেয়ের সংখ্যা খুব কম। তোমার মতন একটি সুন্দরী মেয়েকে আমরা দলে নিতে রাজি আছি। তুমি সেখানে রানীর মতন থাকবে!'

রা জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের মিডাসে নামবার আগেই আমার মৃত্যু হবে। তোমরা কিছুতেই জ্যান্ত অবস্থায় আমার চোখ নিতে পারবে না। আমি ইচ্ছে করলেই যখন খুশি মরে যেতে পারি!'

ইউনুস বলল, 'যাক, ও-সব বাজে কথা বলে লাভ নেই ওর সঙ্গে। এসো, আমরা কাজের কথা সেরে নিই! সেন্ট মেরি নক্ষত্রটা মহাকাশ-ম্যাপে আছে। সুতরাং সেখান থেকে রাস্তা চিনে ফিরতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। তোমাদের মিডাসের ওপরে গিয়ে প্রথমে আমরা ওদের তিনজনকে নিচে নামিয়ে দেব। তুমি খবর পাঠাবে সোনাটা সেন্ট মেরিতে পৌঁছে দিতে। সেখানে সোনা রেখে তোমাদের লোকজন চলে গেলে তারপর আমি সেখানে টাচ-ডাউন করব। সোনা নিয়ে সেখানে আমি রেখে আসব তোমাকে। তারপর যথাসময়ে তোমাদের রকেট আবার তোমায় নিয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা ঠিক আছে?'

লোকটি বলল, 'তুমি দেখছি, এখনও আমাকে অবিশ্বাস করছ!'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। দুদিক থেকেই বন্দোবস্তটা পাকা করে রাখা দরকার। নিজের চোখ দুটোর ওপর আমার মায়া আছে। সব কিছু হয়ে যাবার পর হঠাৎ তোমাদের দলের অন্য লোকেরা যদি আমার চোখ দুটোও লোভ করে নিয়ে নিতে চায়, তখন আমি বাধা দেব কী করে? সেইজন্যই তোমাদের মিডাসে আমি নামতেই চাই না। আমার রকেটের

তিনজন লোককে প্রথমেই আমি নামিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং আমাকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই তোমাদের।'

'তোমার বন্ধু ওই ঝিলমের চেয়ে যে তোমার বুদ্ধি অনেক বেশি, তা আমি স্বীকার করতে বাধ্য!'

'তা হলে এই যুক্তিই ঠিক রইল? এসো, হাতে হাত মেলাও!'

দুজনে দুজনের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল আন্তরিকভাবে। রকেটের মুখ ঘুরে গেল। শুক্রগ্রহের লোকটি নির্দেশ দিয়ে দিল গতি পথের। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'অনেকদিন বাদে আমি মিডাসে নিজের লোকজনের মুখ দেখব! ধন্যবাদ তোমাকে। এবার আমি একটু কফি খেতে চাই!'

ইউনুস বাঁ-হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ওই তো পাশের রান্নঘর। তুমি নিজেই বানিয়ে নিয়ে এসো না!'

লোকটি উঠে গিয়ে রান্নাঘরে ঢোকার আগে একবার ঘুম-ঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এল ঘুমন্ত নী আর ঝিলমকে। তারপর রান্নাঘরে এসে কফি বানাতে-বানাতে গপ-গপ করে খেয়ে নিল কয়েকটা বিস্কুট আর স্যান্ডউইচ। ধরা পড়ার পর থেকে সে কিছুই খায়নি।

লোকটি চলে যেতেই রা ফিসফিস করে বলল, 'ইউনুস-ইউনুস, এখনও ভেবে দ্যাখো, তুমি কী সর্বনাশ করছ। সোনার লোভে মানুষের কত সর্বনাশ হয়েছে, তুমি জানো না? তুমি যদি দেশে ফিরে গিয়ে আরামে থাকতে চাও, এই রকেটটা বিক্রি করে সব টাকা আমরা তোমাকে দিয়ে দিতে পারি!'

ইউনুস উঠে গিয়ে রা-র মুখের সামনে দাঁড়িয়ে হিংস্র গলায় বলল, 'ফের একটা কথা বললে লাথি মেরে আমি তোমার মুখ ভেঙে দেব! তোমাকে দেখলেই রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে! রকেট বিক্রি করে সেই টাকা আমাকে দেবে, আমি কি ভিখিরি? এই রকেটটা তো এখন আমারই!'

দুগের্লাস কফি হাতে নিয়ে শুক্রগ্রহের লোকটি সেই অবস্থায় ইউনুসকে দেখে বলল, 'আহা-হা, মিঃ ইউনুস, ওকে মেরো না! ওর চোখে যদি হঠাৎ আঘাত লাগে, আমাদের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। ওরকম ভালো চোখ সহজে পাওয়া যায় না।'

রা শান্ত গলায় বলল, 'থেমে গেলে কেন ইউনুস? তুমি আমায় লাথি মারো। একজন বন্ধুর কাছ থেকে কতটা নির্দয় ব্যবহার পাওয়া সম্ভব, আমি তা দেখতে চাই!'

শুক্রগ্রহের লোকটি হাত ধরে টেনে নিয়ে এল ইউনুসকে। সে তখনও রাগে ফুঁসছে। কন্ট্রোল বোর্ডের সামনে দুটি আসনে দুজনে বসল আবার। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কফি পান করল।

সেন্ট মেরি নক্ষত্রটি মহাকাশ-মানচিত্রে আছে। খুব সাধারণ একটি ছোট আকারের নক্ষত্র, জল নেই, হাওয়া নেই, মূল্যবান কিছুই নেই, তাই ওটাতে কেউ নামে না। তার কাছেই যে মৃত নক্ষত্রটির নাম শুক্রগ্রহের এই অভিযাত্রী দল রেখেছে মিডাস, সেটাকে এতদিন কেউ লক্ষ করেনি, কারণ সেটা ধোঁয়ায় ঢাকা। একটা মৃত নক্ষত্র নিয়ে কেই বা মাথা ঘামায়, এমন লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি নক্ষত্র ছড়িয়ে আছে মহাকাশে। তা ছাড়া দূর থেকে ওটাকে দেখায় একটা ধূমকেতুর খসে-পড়া লেজের মতন।

সেখানে পৌঁছে সেই ধোঁয়ার আস্তরণে ঢোকার পর আবছা ভাবে দেখা গেল নক্ষত্রটিকে।

শুক্রগ্রহের লোকটি দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে বলল, 'এই যে এসে গেছি! ভাবতেই পারিনি, আর কোনওদিন এখানে বেঁচে ফিরে আসতে পারব!'

ইউনুস বলল, 'দাঁড়াও, আগে ভালো করে দেখে নিই!'

একটা জুম টেলিস্কোপে চোখ লাগাতেই দৃশ্যটা অনেক কাছে চলে এল। তারপরই সে বলে উঠল, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য! এরকম কখনও জীবনে দেখিনি!'

একটা নীল রঙের হ্রদের পাশে দুটি ঢিবির মতন গোল পাহাড়। সোনার রং ঠিকরে বেরুচ্ছে সেই পাহাড় দুটি থেকে। নীল হ্রদটির পাশে পাশে অনেকগুলো তাঁবু। সোনার পাহাড় দুটির চূড়া থেকে উঠে আসছে পিচকিরির রঙের মতন নীল আলো। ঠিক যেন স্বপ্নের মতন এক অপরূপ ছবি।

শুক্রগ্রহের লোকটি বলল, 'এবার বুঝলে, কেন এই জায়গাটার কথা আমরা গোপন রাখতে চাই?'

টেলিস্কোপ থেকে চোখ তুলে এসে ইউনুস বলল, 'এবার কাজ শুরু করতে হবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে দরজার কাছ থেকে আর-একজন বলল, 'হ্যাঁ, এবার কাজ শুরু করতে হবে!'

শুক্রগ্রহের লোকটি আর ইউনুস মুখ ফিরিয়ে দেখল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ঝিলম। তার হাতে একটি ছোট্ট রিভলভারের মতন অস্ত্র।

১০

ইউনুসও তক্ষুনি পকেট থেকে তার ছোট্ট রিভলভারটা বার করে শুক্রগ্রহের লোকটির বুকে ঠেকিয়ে বলল, 'হাত তুলে দাঁড়াও! কোনও রকম এদিক-ওদিক করলেই তোমায় গুঁড়িয়ে দেব! আমাদের এই অস্ত্র দিয়ে গুলি বেরোয় না। কোনও শব্দ হয় না, কিন্তু চোখের নিমেষে তোমায় ধুলো করে দিতে পারি!'

শুক্রগ্রহের লোকটি এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছে না! এত কাছে এসে এরকম পরাজয়! সে প্রায় তোতলাতে-তোতলাতে বলল, 'তু...তুমি...আ...আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে?'

ইউনুস হেসে উঠে বলল, 'ডাকাতের সঙ্গে আবার বিশ্বাসঘাতকতা কী? তুমি না বলেছিলে, তোমাদের এই জায়গাটার কথা আমরা কোনওদিন জানতে পারব না?'

রা-ও এত অবাক হয়ে গেছে যে, সে-ও কোনও কথা বলতে পারছে না।

ঝিলম এসে রা-র বন্ধন খুলে দিল। রা উঠে দাঁড়িয়ে ঝিলমের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাগলের মতন তাকে কিল মারতে-মারতে বলল, 'তোমরা দুজনে আগে থেকে সব ঠিক করে রেখেছিলে, আমাকে বলোনি কেন? কেন? কেন?'

ঝিলম হাসতে-হাসতে বলল, 'ওরে বাবা, লাগছে, লাগছে! এখনও অনেক কাজ বাকি আছে রা! তোমাকে আগে বলিনি, তা হলে তুমি এমন নিখুঁত অভিনয় করতে পারতে না।'

ইউনুস বলল, 'ওরকম ভাবে কাঁদতে পারতে, রা? তোমার কান্না দেখেই লোকটা আরও বিশ্বাস করেছিল আমার কথা! তোমার চুলের মুঠি ধরেছি, চড় মেরেছি, লাথি মারার জন্য পা তুলেছি, এগুলো সব আমার পাওনা রইল। তুমি একসময় শোধ দিয়ে দিও!'

শুক্রগ্রহের লোকটি ইউনুসের হাতে ওরকম ভয়ঙ্কর অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। ঝিলম বিদ্যুতের মতন লাফিয়ে এসে নিজের হাতের অস্ত্রটা দিয়ে খুব জোরে মারল লোকটির মাথায়। সেই এক আঘাতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল লোকটি। তার হাত পা বেঁধে ফেলা হল। তাতেও নিশ্চিন্ত না হয়ে ঝিলম তার হাতে একটা ইঞ্জেকশান ফুঁড়ে দিল, এর পর বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আর কিছুতেই ওর ঘুম ভাঙবে না।

ইউনুসের পিঠে হাত দিয়ে ঝিলম বলল, 'তুই অদ্ভুতভাবে লোকটাকে বিশ্বাস করিয়েছিস, এত সহজে যে কাজ হবে আমি ভাবতেই পারিনি। আমি এত ভালো অভিনয় করতে পারতাম না!'

জিউস এবার বলে উঠল, 'রকেটটা আরও উঁচুতে তুলে নাও ঝিলম, ওরা মিসাইল ছুঁড়তে পারে।'

রা বলল, 'জিউস তা হলে ঠান্ডা হয়নি। জিউসও জানত?'

ঝিলম বলল, 'জিউসও ভালো অভিনয় করেছে। ধন্যবাদ জিউস!'

রা প্রচন্ড অভিমানের সঙ্গে বলল, 'সবাই জানত, শুধু আমায় জানাওনি! নী-ও জানে নিশ্চয়ই।'

ঝিলম বলল, 'না। নী-কে সত্যিই ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিয়েছি। আমি নিজে খাইনি।'

ইউনুস বলল, 'কাজ শুরু করে দাও, রা। এই জায়গাটার সঠিক অবস্থান হিসেব করো। এ-কাজটা তুমি ভালো পারো আমাদের চেয়ে!'

ঝিলম বলল, 'ব্যস্ততার কিছু নেই। সেজন্য অনেক সময় আছে তোমাদের হাতে।'

ইউনুস বলল, 'তার মানে? আমাদের এক্ষুনি ফিরে যাওয়া উচিত না? রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঝটিকা-বাহিনীকে খবর দিলে তারা এসে যা করার করবে!'

ঝিলম বলল, হ্যাঁ, ঝটিকা-বাহিনীকে খবর দিতে হবে ঠিকই। কিন্তু তার আগে আমার আর একটা কাজ বাকি আছে।'

'তোর কাজ? তার মানে?'

'রাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্য যা দরকার, তা আমরা করেছি ঠিকই। এবার হো-সানের কাজ বাকি আছে। তিনি যে প্রতিরোধ শক্তি আবিষ্কার করেছেন. সেটা পরীক্ষা করার এটাই তো সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা?'

'তুই কী বলতে চাইছিস, ঝিলম?'

'আমি এখন একা ওই মিডাসের লোকজনের মধ্যে নামব। যদি ওরা আমায় মেরে ফেলতে না পারে, তাহলেই বোঝা যাবে হো-সানের আবিষ্কার সার্থক।'

'তুই ওখানে একা নামবি?'

ঝিলম বলল, 'তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? হো-সান কখনও ব্যর্থ হতে পারেন না।

আমি তাঁর কাছ থেকে ফর্মুলা নিয়ে এসেছি। সেটা আমি পরীক্ষা করে দেখবই। যদি আমি ব্যর্থ হই, তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে হো-সানকে খবর দেবে। তিনি বেঁচে থাকতে-থাকতেই যাতে আবার গবেষণা করে জিনিসটাকে একেবারে পারফেক্ট করে তুলতে পারেন।'

রা-কাতর গলায় বলল, 'এখন এই পরীক্ষাটা থাক ঝিলম। এই ক'দিনে আমাদের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আর সহ্য করতে পারছি না। এবার ফিরে চলো, পরে অন্য কোনও সময় ওই পরীক্ষা কোরো তুমি!

রা-র পিঠে হাত রেখে ঝিলম খুব নরম গলায় বলল, 'তুমি তো আমায় জানো রা! আমি একবার কোনও কিছু ঠিক করলে আর ফিরি না। আমার মতন গোঁয়ার-গোবিন্দকে বাধা দিয়ে কোনও লাভ আছে?'

ইউনুস বলল, 'আমরা তোকে কিছুতেই এভাবে একা যেতে দিতে পারি না, ঝিলম! ওরা সাঙ্ঘাতিক লোক!'

রা বলল, 'হো-সান নিজেই বলেছেন, তাঁর এই প্রতিরোধ-শক্তি পুরোপুরি সফল কি না তিনি নিজেও জানেন না!'

ঝিলম বলল, 'হো-সানের গবেষণার তুলনায় আমার জীবনের দাম অতি সামান্য। শুধু-শুধু আর দেরি করে লাভ নেই। যেতে আমাকে হবেই। আমি এখান থেকে নামব প্যারাসুটে। তোমাদের সঙ্গে আমার রেডিও যোগাযোগ থাকবে। ঠিক এক ঘণ্টা পর তোমরা একটা মনো-ইউনিট নামিয়ে দেবে নিচে। সেটাতে যদি আমি না ফিরি কিংবা তোমাদের সঙ্গে যদি আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আর দেরি না করে তক্ষুনি ফিরে যাবে তোমরা। প্রথমে খবর দেবে ঝটিকা-বাহিনীকে। তারপর হো-সানের কাছে খবর পাঠাবে।'

প্যারাসুট পরে নিয়ে ঝিলম ঝাঁপ দেবার জন্য তৈরি হল। কোনওরকম বিশেষ, পোশাক-পরিচ্ছদ নেই তার। সাদা প্যান্ট, সাদা জুতো আর একটা সাদা ঝোলা-কোট, তাতে অনেকগুলি পকেট।

ঝিলম রকেটের দরজা খুলতেই ইউনুস তার হাত ছুঁয়ে বলল, 'সাবধান, ঝিলম।'

ঝিলম বলল, 'চিন্তা করিস না, ইউনুস।'

রা কোনও কথা বলতে পারছে না। ঝিলম তার একটা হাত কোলে নিয়ে মুঠোয় চেপে ধরে বললে, 'রা, মনে নেই, বিয়ের সময় আমরা বলেছিলুম, আমরা দু'জনেই কেউ কখনও মৃত্যুকে ভয় পাব না!'

তারপর ইউনুসের দিকে ফিরে বলল, 'ইউনুস, তোর ওপর সব ভার রইল। আমি যদি আর না ফিরি...তুই ওদের দেখিস।'

সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঝিলম।

এখানকার আবহমহলে বাতাস নেই। ঝিলম অক্সিজেন বড়ি খেয়ে নিয়েছে আগেই। এই প্যারাসুটও যে কোনও পরিবেশে নামার মতন করে তৈরি। তার ওই কোটের প্রত্যেকটি বোতামই একটা করে যন্ত্র, তার মধ্যে একটি বোতাম রকেটের সঙ্গে রেডিও-যোগাযোগ রাখছে।

দুলতে-দুলতে নামতে লাগল ঝিলম। এই প্যারাসুটে ইচ্ছে মতন দিক বদলানো

যায়। নিচের নীল জলের হ্রদে গিয়ে যাতে না পড়ে, সেই ভাবে ঝিলম সরে-সরে যেতে লাগল। সোনার পাহাড় দুটোর দিকে সে তাকাতে পারছে না, চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে সোনা মিশে থাকে পাথরের মধ্যে, অনেক কষ্ট করে বার করতে হয়। এরকম খাঁটি সোনার পাহাড় যে কোথাও থাকা সম্ভব, সে আগে কল্পনাও করেনি। এখানকার খুঁটিনাটি সবকিছু হো-সান বলে দিয়েছেন তাকে। ইউনুস ওই শুক্রগ্রহের লোকটির মনের কথা সবটা জানাতে পারেনি। হো-সান এক নজর দেখা মাত্র সব জেনে গিয়েছিলেন। সব কথা ঝিলম একটা কাগজে লিখে ইউনুসকে দিয়েছিল।

মিডাস উপনিবেশের বহু লোক তাঁবু ছেড়ে চলে এসেছে বাইরে। তারাও অবাক হয়ে চেয়ে আছে ওপরের দিকে। একা একজন মানুষ প্যারাসুটে নামছে, তারা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যেন!

ঝিলম এসে নামল হ্রদটার পাশে। প্যারাসুটের বাঁধন থেকে বেরিয়ে এসে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একদল লোক একটু দূরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। তাদের সকলেরই হলদে চুল। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক লোক অন্ধ।

ঝিলম হাত তুলে বলল, 'আমি পৃথিবীর মানুষের দূত হয়ে এসেছি আপনাদের কাছে। আপনারা মহাকাশে অশান্তির সৃষ্টি করছেন। জীবন্ত মানুষের চোখ ও কানের পর্দা তুলে আনছেন ডাকাতি করে। আপনারা আত্মসমর্পণ করুন। আপনাদের পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে চোখ ও কানের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলব।'

ভিড়ের মধ্য থেকে এগিয়ে এল একজন মধ্যবয়স্ক লোক। এর এক চোখ কানা, সারা মুখে পোড়া -পোড়া দাগ। শুক্রগ্রহের সাদা ভাল্লুকের চামড়ায় তৈরি পোশাক পরা। লোকটি বলল, 'পৃথিবীর লোক! হ্যাঁ, কালো চুল দেখছি। একটা শিকার তাহলে নিজে থেকে এসে ধরা দিয়েছে। একে বাঁধো!'

ঝিলম বলল, 'আমাকে বন্দী করার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই।'

তিনজন লোক মোটা শিকল হাতে নিয়ে এগিয়ে এল ঝিলমের দিকে। শিকলটা সোনার তৈরি।

ঝিলম হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমায় ধরুন তা হলে!'

সঙ্গে-সঙ্গে ঝিলমের গা থেকে একরকম জ্যোতি বেরুতে লাগল। সেই জ্যোতি ঘিরে রইল তার সারা দেহ। আগেকার দিনের গল্পের বইয়ের ছবিতে যে-রকম দেবতাদের আঁকা হত, ঝিলমকে দেখতে লাগল সেই দেবতাদের মতন।

শিকল ঝনঝনিয়ে তিনটি লোক ঝিলমের তিন হাত দূরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর তারা এগুতে পারছে না। লোকগুলো যেন চুম্বকে আটকে গেছে।

ঝিলম হাঃ-হাঃ করে হেসে উঠে বলল, 'বললাম না, আমাকে আপনারা বন্দি করতে পারবেন না! ওহে শুক্রগ্রহের মানুষ, সোনার লোভে আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমি কি আপনাদের কাছে কোনও অন্যায় কথা বলেছি যে আমায় বাঁধতে চাইছেন?'

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন মোটামতন লোক বেরিয়ে এসে হুংকার দিয়ে বলল, 'এই লোকটা আমাদের ম্যাজিক দেখাচ্ছে। ওসব ম্যাজিক আমি গ্রাহ্য করি না। ওকে আমি ঝাঁঝরা করে দিচ্ছি।'

লোকটার হাতে একটা সাব মেশিনগান। র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট করে লোকটা এক ঝাঁক গুলি চালিয়ে দিল। অত গুলিতে অন্তত পঞ্চাশজন মানুষের মরে যাবার কথা, কিন্তু ঝিলমের শরীরে একটাও লাগল না। ঠিক যেন কোনও অদৃশ্য নিরেট দেয়ালে বাধা পেয়ে গুলিগুলো উঠে গেল শূন্যে।

ঝিলম আবার হেসে বলল, 'ওই সব পুরনো অস্ত্র দিয়েই যদি আমায় মারা যেত, তা হলে আর আমি এখানে এসেছি কেন?'

এবার কিছু লোক হাতের কাছে যা পেল তাই ছুঁড়ে মারতে লাগল, সবই ফিরে যেতে লাগল তাদের দিকে।

একচোখ-কানা লোকটি বলল, 'দাঁড়াও! ওকে কী করে শেষ করতে হয় আমি দেখাচ্ছি। ডিনামাইট স্টিক নিয়ে এসো!'

ঝিলম হাসিমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সোনার পাহাড় কাটবার জন্য ওদের কাছে অনেক ডিনামাইট স্টিক মজুত আছে। ঝিলমকে ঘিরে গোল করে সাজাল অনেকগুলো ডিনামাইট স্টিক। তারপর সবাই অনেক দূরে সরে যাবার পর একজন চার্জ করল ডিনামাইট। প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরণ হল একটা, সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হল পাহাড়ে-পাহাড়ে। ঝিলম লেলিহান আগুনের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেল।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে আগুন সরে গেলে দেখা গেল ঝিলম একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। তার সাদা পোশাকে একটা কালো দাগ পর্যন্ত লাগেনি।

ঝিলম বলল, 'আর কোনও অস্ত্র নেই?'

এবারে সবার গলা থেকে একটা ভয়ের আওয়াজ বেরিয়ে এলো। অনেকের ধারণা হলো ঝিলম কোনও জীবন্ত মানুষ নয়, একটা ট্রাই ডেস প্রতিচিত্র। অন্য কোনও উন্নততর সভ্যতা থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে।

সবাই পালিয়ে যাচ্ছে দেখে ঝিলম এগিয়ে এল তাদের দিকে। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'একটা জিনিস লক্ষ্য করেননি যে, আমি কোনও প্রতি-আক্রমণ করার চেষ্টা করছি না! আমার কোনও অস্ত্র দিয়ে আপনাদের মেরে ফেলছি না! আমি কোনও অন্যায় কথা বলছি না বলেই আপনারা আমাকে মারতে পারছেন না। এখনো বলুন, আপনারা আত্মসমর্পণ করতে চান কি না!'

কেউ একটা কথাও উচ্চারণ করল না।

ঝিলম বলল, 'এখন আমি আপনাদের রকেট স্টেশনের দিকে যাচ্ছি। যদি সাধ্য থাকে তো আমাকে আটকান।'

হ্রদটা ঘুরে একটা স্বর্ণ-পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগল ঝিলম। ওপর থেকে নামবার সময়ই সে দেখে নিয়েছে, এখানে কোথায় কী আছে। মিডাস নক্ষত্রটি খুবই ছোট। এই হ্রদ ও সোনার পাহাড় দুটি ছাড়া বাকি সবটাই এবড়ো-খেবড়ো ভূমি। প্রায় তিনশো তাঁবু খাটিয়ে শুক্রগ্রহের অভিযাত্রীরা এখানে উপনিবেশ গড়েছে। বোঝাই যায়, এখানে তারা বেশিদিন আসেনি। আসার পরই একটি দুর্ঘটনায় অর্ধেকের বেশি লোক অন্ধ হয়ে গেছে আর কানে শোনার ক্ষমতা হারিয়েছে। সুতরাং ভালো করে এখানকার কাজই শুরু হয়নি বলা যায়।

একটি সোনার পাহাড়ের পিছনে রকেট স্টেশন। ঝিলম সেদিকে যাবার আগেই একদল লোক একটা মোটা পাইপ এনে আগুনের হল্কা ছুঁড়তে লাগল তার দিকে। সোনার পাহাড় দুটির ওপরের গর্ত দিয়ে অনবরত নীল রঙের আগুন বেরিয়ে আসছে। ওরা ওই পাইপটার একটা মুখ জুড়ে দিয়েছে পাহাড়ের সেই আগুনের শিখার সঙ্গে।

সেই আগুনের ধাক্কায় ঝিলম পুড়ে গেল না বটে, কিন্তু ছিটকে গিয়ে পড়ল হ্রদের জলে। আর পড়া মাত্র ডুবে গেল সে। শুক্রগ্রহের লোকগুলি এবার আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

ঝিলম চলে গেল একেবারে তলায়। এ হ্রদে কোনও প্রাণী নেই। এখানে এই জল কবে থেকে জমে আছে কে জানে! ঝিলম দেখল হ্রদের তলাটাতেও রয়েছে কোনও চকচকে ধাতু। এই ছোট্ট মৃত নক্ষত্রটি সত্যিই খুব দামি।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে হুস করে ঝিলম ভেসে উঠল অনেক দূরে। হ্রদের অন্য পারে উঠে সে বলল, 'ওই আগুনটা আর একবার নিয়ে আসুন, আমার জামা-কাপড় শুকোনো দরকার!'

অবশ্য ঝিলমের পোশাক একটুও ভেজেনি। কোনও একটা অদৃশ্য তেজ তার চারপাশ ঘিরে রেখেছে। জলও তাকে ছুঁতে পারছে না। সবচেয়ে বড় কথা তার মনটা খুব হাল্কা হয়ে আছে, আগুন বা ডিনামাইট দেখেও একটুও ভয় জাগেনি। সে এগিয়ে যেতে লাগল সেই সোনার পাহাড়টির দিকে, যার পেছনে রকেট স্টেশন। শুক্রগ্রহের লোকগুলো ভয়ে-ভয়ে দূর থেকে অনুসরণ করতে লাগল তাকে।

সেই সোনার পাহাড়টির গায়ে একটি প্রকাণ্ড বড় খাদ। এখানেই প্রথম বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তখন ওরা জানত না এখানে বিষাক্ত গ্যাস আছে। বিস্ফোরণ যে অত প্রচন্ড হবে, সেইজন্যই তা ওরা বুঝতে পারেনি।

খাদের ধারে পাথরের টুকরো মতন সোনার টুকরো পড়ে আছে। একটা টুকরো তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল ঝিলম। দেখে চব্বিশ ক্যারাট সোনাই মনে হয় বটে। টুকরোটা আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল ঝিলম। তার কাছে সোনার কোনও আলাদা মূল্যই নেই। অন্যান্য ধাতুর মতন সোনাও তো আর একটা ধাতু মাত্র। তারপর পাহাড়টা ঘুরে রকেট-স্টেশনে এসে দাঁড়াল।

মাত্র বারোটি রকেট সেখানে সাজানো রয়েছে পরপর। এত কম রকেট কেন? মহাকাশে ডাকাতি করে ওরা চোখ আর কানের পর্দা নিয়ে আসছে! কিন্তু পৃথিবীর সেইসব মানুষদের রকেটগুলো এরা আনে না! খুব সম্ভবত এখানে রকেট চালাবার মতন লোক বেশির ভাগই অসুস্থ। অথবা পৃথিবীর মানুষদের উন্নততর রকেট এরা চালাতে জানে না।

শুক্রগ্রহের লোকগুলো এখনও হাল ছাড়েনি। যে-চৌকো বাক্সের মতন অস্ত্রে ওরা যে-কোনও জিনিস টেনে নিতে পারে, সে-রকম অনেকগুলি বাক্স এনে ঝিলমকে আছড়ে ফেলার চেষ্টা করল। কোনওটাতেই কাজ হল না।

ঝিলম বলল, 'এবার দেখুন আমি কী করি!'

কোটের পকেট থেকে তার ছোট্ট অস্ত্রটি বার করে সে তাক করল রকেটগুলোর দিকে। একটার-পর-একটা রকেট ঝুরঝুরিয়ে গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগল।

শুক্রগ্রহের লোকেরা হায়-হায় করতে লাগল। ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল তাদের মধ্যেকার কয়েকটি মেয়ে।

সবকটা রকেট শেষ করে দিয়ে ঝিলম বলল, 'রাষ্ট্র সঙ্ঘের ঝটিকা-বাহিনী আপনাদের কী শাস্তি দেবে বা কী ব্যবস্থা নেবে তা আমি জানি না। তার আগে, আপনাদের আমি এই শাস্তি দিলাম। আপনারা আত্মসমর্পণ করেননি, সেইজন্য আপনাদের আমি দিয়ে গেলাম এখানে নির্বাসন। যতদিন ঝটিকা-বাহিনী না আসে, ততদিনের জন্যে আপনাদের আর এখান থেকে পালাবার উপায় রইল না। ততদিন আপনারা এই সোনা নিয়ে থাকুন। ততদিনের মতন খাবার-দাবার আপনাদের আছে আশা করি? নইলে আপনাদের থাকতে হবে এই সোনা খেয়ে। ঝটিকা-বাহিনী যদি আর কোনওদিনই না আসে তা হলে এই হ্রদের তীরে আপনাদের চাষবাস শুরু করতে হবে, আবার ফিরে যাবেন আদিম জীবনে!'

একদল লোক এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা ক্ষমা চাইছি। আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান। দয়া করে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান।'

ঝিলম বলল, 'আর উপায় নেই!'

কট্ কট্ কট্ কট্ করে একটা শব্দ হল ওপরের আকাশে। একটা মনোইউনিট নেমে আসছে। ঠিক সময়ে ওটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে রা আর ইউনুস। স্বয়ংক্রিয় মনো-ইউনিট এসে থামল ঝিলমের কাছেই। আপনা-আপনি একটা দরজা খুলে গেল।

ঝিলম সেদিকে পা বাড়াতেই একজন মহিলা ছুটে এল তার দিকে। মহিলাটির কোলে একটি এক বছরের শিশু।

মহিলাটি কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'হে দেবদূত—'

ঝিলম বলল, 'আমি দেবদূত নই, আমি পৃথিবীর মানুষ।'

মহিলাটি বলল, 'আমার স্বামী এখানে বিস্ফোরণে মারা গেছেন। আমার এই ছেলেটির জন্ম হয়েছে এখানেই। এই নক্ষত্রে আর একটিও শিশু নেই। আমার যা হয় হোক, আপনি একে বাঁচান। আপনি দয়া করে একে নিয়ে যান পৃথিবীতে, যাতে ও মানুষের মতন মানুষ হয়ে বাঁচতে পারে।'

ঝিলম বলল, 'শিশুদের কোনও অপরাধ হয় না। আমার এই গাড়িটাতে একজনের বেশি জায়গা নেই। কোনওক্রমে এই শিশুটিকে নেওয়া যেতে পারে। ওকে মাটিতে নামিয়ে রাখুন। সোনা কী জিনিস তা ও এখনও চেনে না। আশা করি ও নির্লোভ মানুষ হয়ে বাঁচতে পারবে।'

মহিলাটি শিশুটিকে মাটিতে নামিয়ে রেখে একপা-একপা করে পিছু হটে গেল। ঝিলম শিশুটিকে বুকে তুলে নিল। সে ঘুমিয়ে আছে, সে কিছুই টের পাচ্ছে না।

ছেলেটিকে নিয়ে ঝিলম মনো-ইউনিটে উঠতেই দরজা বন্ধ হল সঙ্গে-সঙ্গে। তারপর সেটা আবার উড়ে গেল মহাকাশে। একটু পরেই অসীম নীলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

অন্ধকারে সবুজ আলো

সেদিন সকালবেলাতেই বিমান খবর পেল যে তার বন্ধু স্বপন গত রাত থেকেই অজ্ঞান হয়ে আছে। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। সবেমাত্র বালিগঞ্জের লেকে সাঁতার কেটে বাড়িতে ফিরছে বিমান। সামনের মাসে ব্যাঙ্গালোরে সাঁতারের কমপিটিশনে যোগ দিতে যাবে। লেক থেকে বাড়ি ফিরে রোজই সে আর একবার কলের জলে স্নান করে নেয়। সেদিনও বাড়ি ফিরে বাথরুমে যাচ্ছিল, এমন সময় প্রিয়ব্রতর ফোন এল।

'কী রে বিমান, লেক থেকে ফিরলি কতক্ষণ? শোন, কতক্ষণে রেডি হতে পারবি?'

'কে, প্রিয়দা? কেন, রেডি হব কেন? কোথায় যেতে হবে বলত।'

'আমি এক্ষুনি বেরুচ্ছি। গিয়ে বলব।'

'কিন্তু কোথায় যাব এখন? আমার তো আজ কলেজ আছে।'

'কলেজে আজ আর যাওয়া হবে না। একবার দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে রে!'

'দক্ষিণেশ্বরে? হঠাৎ এই সকালবেলা?'

'কেন, তুই শুনিশনি কিছু? স্বপনের যে এখনও জ্ঞান ফেরেনি রে!'

'স্বপন? আমাদের স্বপন? জ্ঞান ফেরেনি মানে? কী হয়েছে ওর?'

স্বপনের ঠিক যে কী হয়েছে, তা প্রিয়ব্রতও জানে না। সারারাত স্বপন অজ্ঞান হয়ে আছে, এইটুকুই শুধু সে জেনেছে। স্বপনের মামা প্রিয়ব্রতকে আজ ভোরে ফোন করেছিলেন। শুধু বোঝা গেল তিনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন।

স্বপনদের বাড়ি ভবানীপুরে। কিন্তু কয়েকদিন ধরে স্বপন দক্ষিণেশ্বরে তার মামার বাড়িতে রয়েছে, এ খবর বিমান জানত। সেই জন্যেই স্বপনের সঙ্গে বিমানের দেখা হয়নি এ-ক'দিন। পাঁচদিন ছুটি থাকার পর আজই ওদের কলেজ খুলছে।

ঝাঁ করে স্নান সেরে, চটপট দু-খানা টোস্ট আর একটা ডিম সেদ্ধ খেয়ে নিয়ে বিমান জামা-প্যান্ট পরে জুতোয় ফিতে বাঁধছে এমন সময় প্রিয়ব্রতর গাড়ির হর্ন বেজে উঠল রাস্তায়। তিনতলার বারান্দা থেকে বিমান হাত নেড়ে 'আসছি' বলেই ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

প্রিয়ব্রত বি. এ. পাশ করার পর পুলিশের চাকরি পেয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন করার পর তার আর ও-চাকরি ভালো লাগল না। তখন ওই চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা বেশ বড় কোম্পানিতে সিকিউরিটি অফিসারের কাজ নিয়েছিল। কিন্তু সে চাকরিতেও তার মন টিকল না। বাঁধাধরা কোনও কাজই তার পছন্দ হয় না। এখন তাকে বরং বেকারই

বলা যায়। তবে ওদের অবস্থা বেশ ভালো। এর মধ্যে কোথায় যেন একটা নিলাম থেকে সে একটা পুরোনো জিপ গাড়ি কিনে সেটাকে সারিয়ে-টারিয়ে টকটকে লাল রং করে নিয়েছে। প্রায়ই সে বলে এই গাড়িটা নিয়ে সে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে। স্বপন আর বিমানকেও সে সঙ্গী হিসেবে নিতে রাজি। কিন্তু সত্যি-সত্যি কবে যে যাওয়া হবে, তার ঠিক হয়নি এখনও।

জিপের স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে শিস দিয়ে প্রিয়ব্রত একটা গান গাইছিল। বিমান এসে তার পাশে বসতেই জিপে স্টার্ট দিল। এখান থেকে দক্ষিণেশ্বর অনেক দূরের পথ।

জিপটা চলতে শুরু করতেই বিমান জিগ্যেস করল, 'প্রিয়দা, স্বপন হঠাৎ কেন অজ্ঞান হয়ে গেল সে কথা ওর মামা কিছু জানাননি তোমায়? অমন সুস্থ, সবল ছেলে!'

'না। মনে হচ্ছে, ওর মামার বাড়ির কেউ-ই কারণটা ঠিক বুঝতে পারেননি। কোনও জায়গা থেকে পড়ে যায়নি, মাথায় কেউ ডান্ডাও মারেনি। শরীরে কোনও চোট নেই। হঠাৎ অজ্ঞান! তা-ও একেবারে সারা রাত ধরে অজ্ঞান! হ্যাঁরে, তুই কি জানিস, স্বপন আগে কখনও এরকম অজ্ঞান হয়েছে?'

'না তো।'

'এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকাটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, ভয়েরও। ওকে হাসাপতালে পাঠানো উচিত ছিল।'

'ওকে অজ্ঞান অবস্থায় কোথায় পাওয়া গেছে?'

'ছাতে।'

দক্ষিণেশ্বরে স্বপনের মামাবাড়ির ছাতের দৃশ্যটা মনে পড়ল বিমানের। সে ওখানে কয়েকবার গেছে। দেখবার মতন ছাত একটা। পুরোনো আমলের বাড়ি, মস্ত বড় ছাত। সেখানে অন্তত দেড়শোটা নানা জাতের ফুলের টব। কতরকমের ফুলই না রয়েছে সেখানে! বেশিরভাগ ফুলেরই নাম জানে না বিমান। স্বপন অবশ্য জানে। স্বপন গাছপালা খুব ভালোবাসে। ওই ছাতের বাগানটার জন্যেই স্বপন মাঝে-মাঝেই মামার বাড়িতে যায়। ছাতের মাঝখানে খড়ের ছাত দেওয়া একটা ঘর আছে। মামার বাড়িতে থাকার সময় সেখানে বসেই স্বপন পড়াশুনো করে।

প্রিয়ব্রত একটু পরে বলল, 'শুনলুম, কাল দুপুরেই নাকি ওখানকার একটা ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল স্বপনের।'

বিমান অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'স্বপন ঝগড়া করেছিল? যাঃ!'

স্বপনের চেহারা রোগা পাতলা, মাথার চুল কোঁকড়া-কোঁকড়া, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। ওই চশমা ছাড়া স্বপন প্রায় দেখতেই পায় না। স্বপন সবসময় হাসিঠাট্টা করতে আর মজা করে কথা বলতে ভালোবাসে, কখনও রেগে যায় না। সেই স্বপন কারও সঙ্গে ঝগড়া করেছে, এ কথা শুনলে তো আশ্চর্য হতেই হয়।

প্রিয়ব্রত বলল, 'ওদের পাড়ায় গুন্ডা মতন কিছু ছেলে আছে জানিস তো? তাদের কাজই হল লোকের সঙ্গে পায়ে পা বাঁধিয়ে ঝগড়া করা। সেইরকমই একটা ছেলে—'

'কিন্তু তারা ঝগড়া করতে চাইলেও স্বপন তো উলটে ঝগড়া করার ছেলে নয়!'

'শোন না! দুপুরবেলা স্বপন ওই ছাতের ঘরে বসে বই পড়ছিল। এক সময় সামনের রাস্তায় খুব চ্যাঁচামেচি হচ্ছে শুনে উঠে এসে রেলিং নিয়ে উঁকি মারলো। রাস্তায় কতকগুলো বেশ বড়-বড় ছেলে তখন ক্যাম্বিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলছিল। স্বপনকে দেখতে পেয়েই তারা বলল, তাদের বলটা ওভার-বাউন্ডারি হয়ে ওদের ছাতে চলে এসেছে। সেটা ফেলে দিতে বলল তারা। স্বপন এতক্ষণ বই পড়ছিল মন দিয়ে, বলটা পড়েছে কিনা টেরই পায়নি। তা ছাড়া অতবড় ছাতের কোনও একদিকে বল পড়লে টের না পেতেও পারে। সে খোঁজাখুঁজি করেও বলটা পেল না। চেঁচিয়ে ওদের বলল যে, বলটা পাওয়া গেল না। বোধহয় উড়ে অন্য কোথাও গিয়ে পড়েছে। কিন্তু রাস্তার ওই ছেলেগুলো শুনবে কেন সে কথা? ওরা বললে যে ওরা নিজেরা এসে দেখতে চায়। ওদের বাধা দেওয়ারও উপায় নেই! ওরা উঠে এল ছাতে—'

হঠাৎ প্রিয়ব্রত ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। রাস্তার মাঝখানে ড্রপ খাচ্ছে একটা ক্যাম্বিস বল, আর সেটা ধরার জন্য পাগলের মতন ছুটে আসছে একটা ছেলে। দেখা গেল ডান পাশের গলিতে ইটের উইকেট সাজিয়ে ক্রিকেট খেলা চলছে।

ছেলেটা বলটা কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পর প্রিয়ব্রত আবার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, 'শীত কবে শেষ হয়ে গেছে, এখনও পাড়ায়-পাড়ায় গলির মধ্যে ক্রিকেট খেলা চলছে! মনে হয় ভিশি কি গাভাসকার কি কপিলের অভাব হবে না আমাদের দেশে!' তারপর একটু দুঃখের সুরে বলল, 'কত ছেলে যে চাপা পড়ে এইভাবে!'

'প্রিয়দা, তুমি কখনও গলিতে ক্রিকেট খেলেছ?'

'খেলেছি বইকি। উপায় কী বল, কলকাতায় কটাই বা খেলার মাঠ আছে!'

'যাকগে, এখন বলো স্বপনের ওখানে কী হল তারপর? এতসব কথা তোমায় জানালই বা কে?'

'স্বপনের ছোটমামা ইন্দ্রবাবু। তিনিই তো আমায় টেলিফোন করেছিলেন। তুই হয়তো জার্নিস না, ওই ইন্দ্রদার কাছে আমি পড়েছি এক সময়। ইন্দ্রদার ধারণা, আমি এখনও পুলিশে কাজ করি।'

'বুঝেছি। তারপর?

'ছেলেগুলো তো ছাতে এসে বলটা খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিছুতেই আর পায় না। ওদের ছাতে এত ফুল গাছ, তার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে বলটা! খুঁজে পাওয়া সত্যিই শক্ত!'

'তাতে স্বপনের সঙ্গে ওদের ঝগড়া হবে কেন?'

'ওদের ধারণা হল, স্বপন বলটা লুকিয়ে রেখে, ইচ্ছে করেই ওদের দিচ্ছে না।'

'স্বপন তা করতেঃ পারে না।'

'সে তো তুই বলছিস। কিন্তু ওদিকে ব্যাপারটা কী হল জানিস, স্বপন ওদের সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়েই মুশকিল বাধাল। ওদের মধ্যে বেশ একটা ষন্ডা-গুন্ডা মতন চেহারার ছেলের হাতে ছিল ব্যাট। স্বপন তাকে বলল, আপনিই বলটা মেরেছিলেন তো? আপনার যা চেহারা, তাতে মনে হয় আপনি এত জোরে হাঁকড়েছিলেন যে বলটা এতক্ষণে উড়তে-উড়তে স্বর্গে পৌঁছে গেছে! সেই কথা শুনে রেগে গেল ছেলেটা, বলল, খুব তো দাঁত

বের করে কথা বলা হচ্ছে। এখন বলটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, বার করো তো চাঁদু! স্বপন তার উত্তরে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই যে একটা ফুটকি দেখতে পাচ্ছেন, ও—ই যে...মনে হচ্ছে আপনার বলটা এখনও স্বর্গের দিকে ছুটে চলেছে'!'

স্বপনের এই রকম ইয়ার্কি করাই তো স্বভাব!' বলল বিমান।

'কিন্তু সবাই তো ইয়ার্কি বোঝে না, আর হাসতেও জানে না। রেগে যাওয়া বরং সহজ। স্বপনের কথা শুনে সেই ছেলেটা রেগে গরগর করতে লাগল। ওদিকে অন্য ছেলেরা বলটা খুঁজতে গিয়ে ততক্ষণে ফুলগাছগুলো একেবারে তছনছ করেছে, দু-একটা টব উলটেও দিয়েছে। তাই দেখে স্বপন ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, আপনারা এভাবে গাছ নষ্ট করছেন কেন? পুরোনো বলটা গেছে যাক, আপনাদের আমি একটা নতুন বল কেনার পয়সা দিচ্ছি। যে-ই না এই কথা বলা, অমনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল সেই ছেলেটা। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, বড্ড যে টাকার গরম দেখাচ্ছ চাঁদ! আমাদের চেনো না দেখছি। বলটা এক্ষুনি বের করো, নইলে তোমার মুন্ডুটা নিয়েই আজ ক্রিকেট বল বানাবো!'

বিমান হেসে উঠল।

প্রিয়ব্রত বলল, 'তুই হাসছিস! কিন্তু ওই সব ছেলেদের বিশ্বাস নেই, যখন খুশি যা-তা কোনও কাণ্ড করে ফেলতে পারে।'

বিমান বলল, 'স্বপন শান্ত ছেলে, কিন্তু আমি হলে তক্ষুনি ওই ছেলেটার মুখের মতো জবাব দিয়ে দিতুম। হ্যাঁ, তারপর কী হল?'

'তারপর স্বপনের ছোটমামা এসে ছেলেগুলোকে বল কেনবার জন্যে পাঁচটা টাকা দিলেন। ওরা টাকাটা নিল ঠিকই, কিন্তু স্বপনের ওপর ওদের রাগ রয়েই গেল। যাওয়ার সময় সেই ছেলেটা স্বপনকে বলে গেল, বিকেলের মধ্যে আমাদের বলটা যদি ফেরত না পাই, তা হলে দেখো তোমার কী হয়!'

'এবার বুঝলুম, ইন্দ্রমামা কেন সকালবেলা তোমাকেই ফোন করেছিলেন।'

'ওঁরা বরানগর থানাতেও খবর দিয়েছেন। আমিও ওখানকার থানায় খবর নিলুম। ও. সি. আমার চেনা। ও. সি. আমায় বললেন, স্বপনদের মামার বাড়ির পাড়ায় ছোট এককড়ি নামে একটা উঠতি মস্তান আছে। খুব রগ-চটা, মারামারি করে একবার জেলও খেটেছে। কিন্তু সে যে স্বপনদের কোনও ক্ষতি করেছে, তার কোনও চিহ্ন বা প্রমাণ নেই। ছেলেটা শুধু মুখে ভয় দেখিয়েছে, আর কিছু করেনি। স্বপনও কাল সারাদিনে একবারও বেরোয়নি বাড়ি থেকে।'

'স্বপন কাল অজ্ঞান হয়েছে কখন?'

'রাত সাড়ে নটা-দশটার সময়! ওদের বাড়িতে শিবু বলে একটা ছেলে কাজ করে। সে ছাতে এসেছিল স্বপনকে খাওয়ার জন্যে ডাকতে। এসে দেখল ছাতের ঘরটার ঠিক দরজার সামনেই চিত হয়ে পড়ে আছে স্বপন। অনেকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে সে—'

গাড়িটা আবার আটকাল শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে। ট্র্যাফিক জ্যাম। ওদের জিপটার ঠিক গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট গাড়ি। সে-গাড়িতে এক ভদ্রলোকের পাশে বসে আছে একটা ন-দশ বছরের ছেলে। বোধহয় স্কুলে যাচ্ছে। বাচ্ছা ছেলেটি

জিপটার দিকে দেখিয়ে বলল, 'বাবা, দ্যাখো, দ্যাখো, কীরকম লাল টুকটুকে জিপ গাড়ি। আমার ওইরকম একটা খেলনা জিপ আছে না?'

প্রিয়ব্রত ছেলেটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

বিমান বলল, 'সত্যি, প্রিয়দা, তুমি গাড়িটার এমন রং করেছ, ঠিক যেন মনে হয় ডিংকি টয়। সবাই তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে!'

প্রিয়বত্র বলল, 'আমি তো তা-ই চাই!'

একটু বাদে গাড়িটা শ্যামবাজার পেরিয়ে বি. টি. রোড ধরে ছুটতে লাগল।

বিমান জিগ্যেস করল, 'পুলিশ কি এই ছোট এককড়ি না কী যেন ওই ছেলেটাকে ধরেছে?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'ধরবে কেন? বিনা প্রমাণে পুলিশ কারুকে ধরে রাখতে পারে? পুলিশ ভোরবেলা ওর কাছে গিয়ে কিছু কথা জিগ্যেস করে এসেছে। ছোট-এককড়ি বলেছে, সে কিছু জানে না। সামান্য একটা ক্যাম্বিসের বলের জন্য সে কি কাউকে মারতে পারে?'

'ধরো, এমন তো হতে পারে, ওই ছোট এককড়ি বা অন্য কেউ চুপি-চুপি সন্ধের পর ও-বাড়ির ছাতে উঠে এসে স্বপনকে কিছু দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে পালিয়েছে!'

'তুই তো আচ্ছা বুদ্ধু! মারলে দাগ থাকবে না? রক্ত বেরোবে না? সে-সব কিছুই নেই।'

'শুনেছি রবারের ডান্ডা কি বালির বস্তা দিয়ে মারলে কোনও দাগ থাকে না, রক্তও বেরোয় না, কিন্তু খুব লাগে।'

'ধুৎ! ওসব তো পুলিশি মার। এইসব রগ-চটা ধরনের গুন্ডা ছেলেরা ঝগড়ার সময় হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে দুম করে মেরে বসে। পরিকল্পনা ক'রে, বুদ্ধি খাটিয়ে মারা ওদেব স্বভাব নয়। তা ছাড়া যে-সব ছেলে ক্রিকেট খেলে তারা কখনো-কখনো মারামারি করতে পারে বটে, কিন্তু মানুষ খুন করে না।'

'খুন?'

'স্বপন বারো ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে আছে। যদি এমন মার কেউ মারে, যাতে একজনকে বারো ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকতে হয়, তা হলে তো সে খুনও হয়ে যেতে পারে।'

বিমান হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

জিপটা এবার দক্ষিণেশ্বরের দিকে বাঁক নিল। খানিকক্ষণ বিমান কোনও কথাই বলছিল না। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'একটানা বারো ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকা খুব খারাপ, তাই না প্রিয়দা?'

প্রিয়ব্রত উত্তর দিল, 'খারাপ তা বটেই!'

স্বপনের মামার বাড়ির গলিটার মুখেই একটা চায়ের দোকান। প্রিয়ব্রতর জিপটা যখন ওখানে পৌঁছুল তখন ওই দোকানটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল কতকগুলো ছেলে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় বেকার। বিমান আর প্রিয়ব্রত দুজনেই তাকাল ওদের দিকে। কে জানে এই ছেলেদের দলটাই হয়তো কাল গলিতে ক্রিকেট খেলছিল। এদের মধ্যেই বোধহয় কারুর নাম ছোট এককড়ি। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল ফিসফিস করে।

স্বপন যে অজ্ঞান হয়ে আছে, সে কথা ওরা নিশ্চয়ই জানে। সেই কথাই বোধহয় বলাবলি করছে—ভাবল বিমান।

জিপটা থামল একটা লোহার গেটওয়ালা বাড়ির সামনে। আরও দুটো গাড়ি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে একটা গাড়ি ডাক্তারের। প্রিয়ব্রত আর বিমান জিপ থেকে-থেকে আস্তে-আস্তে ঢুকল বাড়ির মধ্যে।

বাড়িতে তখন অনেক লোকজন। ভবানীপুর থেকে স্বপনের বাবা-মা এসে পড়েছেন। এখানকার একজন ডাক্তার তো রয়েছেনই, স্বপনের বাবাও তাঁদের আত্মীয় একজন বড় ডাক্তারকে এনেছেন সঙ্গে করে। দুই ডাক্তার বসে আছেন স্বপনের খাটের দুপাশে।

স্বপন শুয়ে আছে চিত হয়ে। চোখ দুটো বোজা, ঠিক মনে হয় যেন ঘুমিয়ে আছে। স্বপনের দিকে তাকিয়েই বিমানের মনে হল, স্বপনকে যেন একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। কী যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে তার মুখে! কিন্তু সেটা যে কী তা বিমান ঠিক ধরতে পারল না। স্বপনের চোখে এখন চশমা নেই, সেই জন্যেই কি ওইরকম দেখাচ্ছে তাকে?

অসুস্থ লোকের কাছে গেলেই লোকে একবার তার কপালে হাত ছোঁয়ায়। বিমানও স্বপনের শিয়রের কাছে গিয়ে তার কপালে হাত রাখল। নাঃ, স্বপনের জ্বর নেই, কপালটা বেশ ঠান্ডা।

বিমান স্বপনের মাথাটা ধরে জোরে নাড়িয়ে ডাকল, 'স্বপন, এই স্বপন!'

একজন ডাক্তার বললেন, 'উঁহু, ওরকম কোরো না, ওতে লাভ হবে না।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'ওকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, কাকাবাবু?'

স্বপনের বাবার সঙ্গে যিনি এসেছেন, সেই ডক্টর সোম বললেন, 'আমার তো তাই মনে হয়।'

স্বপনের বাবা তাকালেন স্বপনের বড়মামার দিকে। বড়মামা হাসপাতাল-টাসপাতালের মতন জায়গাগুলোকে খুব ভয় পান। ওঁর ধারণা, হাসপাতালে কেউ একবার গেলে সে আর বাড়ি ফেরে না। তিনি বললেন, 'কেন, হাসপাতালে নিতে হবে কেন? এখানে ওর চিকিৎসা হতে পারে না? কী যে হয়েছে ছেলেটার, সেটাই তো আপনারা এখনও ধরতে পারলেন না?'

স্থানীয় ডাক্তারটি বললেন, 'সত্যিই ধরতে পারছি না। শরীরে কোনও রোগের লক্ষণ নেই, আঘাত কি রক্তপাতের চিহ্নও নেই। কাল সারাদিনই যে সুস্থ ছিল, সে হঠাৎ অজ্ঞানই বা হয়ে গেল কেন আর এতক্ষণ অজ্ঞান হয়েই বা থাকবে কেন? ব্লাড প্রেসার ঠিক আছে। পালস বীট একটু শ্লো,তাও প্রায় স্বাভাবিকই ধরা যায়। সুতরাং এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকার কোনও কারণই বোঝা যাচ্ছে না।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'ধরুন কোনও ভারী কিছু জিনিস দিয়ে কেউ যদি ওর মাথায় মারে—'

বড়মামা বললেন, 'কে মারবে?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সেটা না হয় পরে দেখা যাবে...যদি সেরকম ভাবে কেউ মারে যাতে কাটল না, কি রক্ত বেরুল না, কিন্তু ভেতরে আঘাত লাগল—'

স্থানীয় ডাক্তারটি বললেন, 'ভারী কোনও জিনিসের আঘাত লাগলে জ্ঞান হারাতে পারে। কিন্তু তাতে তো কেউ এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকে না।'

ডাক্তার সোম বললেন, 'আমি পি জি-তে আছি। সেখানে ওকে নিয়ে গেলে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।'

স্বপনের ছোটমামা ইন্দ্রবাবু, বড়মামাকে বললেন, 'দাদা, আমারও মনে হয় হাসপাতালে পাঠানোই উচিত। হাসপাতালে নানারকম আধুনিক যন্ত্রপাতির যত সুবিধে পাওয়া যায় —'

বড়মামা ভয়-পাওয়া মুখে বললেন, 'পি-জি তো অনেক দূরে। এতখানি রাস্তা—'

প্রিয়ব্রত এই সময় চোখের ইশারায় বিমানকে ডেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিমান তার কাছে যেতেই প্রিয়ব্রত বলল, 'চল, ছাতটা একবার দেখে আসি!'

ছাতের দরজায় খিল দেওয়া। খিল খুলে ওরা ঢুকল ভেতরে। সমান সাইজ করে একটার পর ফুল গাছের টব সাজানো। মাঝখানে দাঁড় করানো আছে অনেক প্ল্যাস্টিকের পাইপ। ছাতের ট্যাঙ্ক থেকে ওই পাইপগুলোতে করে সব টবে জল দেওয়া হয়। দেখে মনে হচ্ছে, আজ সকালে জল দেওয়া হয়নি।

প্রিয়ব্রত ছাতটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলল, 'এত বড় ছাতে একটা বল হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া সত্যিই খুব শক্ত।'

বিমান এগিয়ে গেল খড়ের ঘরটার দিকে। ভারি সুন্দর ঘরটা। ঠিক মনে হয় গ্রামের একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর কেউ যেন শহরের এক তিনতলার বাড়ির ছাতের ওপর বসিয়ে দিয়েছে। ঘরটায় রয়েছে একটা টেবিল, দুটো চেয়ার আর একটা ইজিচেয়ার।

টেবিলের ওপরে স্বপনের বইপত্র ছড়ানো, একটা বই উলটে পড়ে আছে মাটিতে। বিমান বইটা তুলে দেখল এভারেস্ট অভিযানের ওপর লেখা একটা ইংরেজি বই। এই বইটা বিমানই স্বপনকে উপহার দিয়েছিল।

টেবিল ল্যাম্পটা তখনও জ্বলছে। কাল রাত্তিরে স্বপনকে এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখার পর গোলমালের মধ্যে কারুর আর আলোটা নিভিয়ে দেওয়ার কথা মনে পড়েনি। এ ঘরে ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্নই কিন্তু ছিল না।

এমন সময় প্রিয়ব্রত ঘরে ঢুকে বিমানের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল। 'এই দ্যাখ।'

প্রিয়ব্রতর হাতে কাদামাখা নোংরা একটা ক্যাম্বিসের বল।

বিমান অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'তুমি এসেই ওটা খুঁজে পেলে? ওরা সবাই মিলে খুঁজল—'

হাসতে-হাসতে প্রিয়ব্রত বলল, 'ওদের চেয়ে আমার খোঁজাটা তো একটু অন্যরকম হবেই। হাজার হলেও এক সময় পুলিশে চাকরি করেছি তো!'

'কোথায় পেলে?'

'ব্যাপারটা হয়েছিল কী জানিস! ওরা টবগুলো সরিয়ে-সরিয়ে তার আড়ালে বলটা আছে কি না খুঁজেছে। কিন্তু বলটা ছিল একটা টবের মাটিতে আধখানা গাঁথা অবস্থায়।

ফলে মাটির রং আর বলটার রং তো প্রায় একই হয়ে গিয়েছিল, তাই ওদের চোখে পড়েনি। যাক্, একটা জিনিস প্রমাণ হল যে স্বপন ইচ্ছে করে ওদের বলটা লুকিয়ে রাখেনি।'

'আমি তো বলেই ছিলুম, স্বপন ওরকম কাজ কক্ষনো করবে না।'

'বলটা দেখছি বেশ পুরোনো। এইরকম একটা সামান্য বলের জন্যে কেউ রাত্তিরবেলা চুপি-চুপি ছাতে উঠে স্বপনের মাথায় ডান্ডা মেরে যাবে, এটা বিশ্বাস করা যায় না। তবে একটু অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছি। অন্তত চারটে ফুলের টব কাত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কিন্তু...কেন?'

'পাড়ার ছেলেরা দুপুরে বলটা খোঁজার জন্যে কয়েকটা টব উলটে দিয়েছিল, তুমিই তো বলেছ।'

'এই তো তোদের দোষ, বিমান! তোরা যুক্তি অনুসরণ না করেই মতামত দিয়ে ফেলিস। ছেলেরা দুপুরবেলা টব উলটে দিতে পারে, কিন্তু তারপরও তো স্বপন বহুক্ষণ ছাতে ছিল। স্বপন ফুলগাছ ভালোবাসে। তার পক্ষে কি স্বাভাবিক ছিল না, টবগুলো আবার সোজা করে দেওয়া? কাত হয়ে পড়ার জন্যে অন্তত দুটো ফুলগাছের বেশ ক্ষতি হয়েছে দেখলুম!'

তা-ও তো ঠিক। স্বপনের একটা অদ্ভুত অভ্যেস আছে। মামার বাড়িতে ও যখনই এসে থাকে, প্রত্যেকদিন খুব ভোরে আর বিকেলবেলা ও প্রত্যেকটা ফুলগাছের গায়ে হাত বুলোয়। ওর ধারণা, গাছেদের আদর করলে গাছরা তা টের পায়। তারা খুশি হয়।

আর ধারণাটা বিশেষ ভুলও নয়। আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিকও এই কথা বলেন। গাছদের শুধু যে প্রাণ আছে তা নয়, তাদের অনুভূতিও আছে। একজন কেউ অকারণে গাছের পাতা ছেঁড়ে, আর একজন গাছকে আদর করে—এই দু-ধরনের লোকেদের গাছেরা চিনে রাখে।

বিমান কিছুক্ষণ এইসব ভেবে প্রিয়ব্রতকে বলল, 'তার মানে তুমি বলতে চাও, স্বপন অজ্ঞান হয়ে যাবার পর এই টবগুলো কেউ উলটে দিয়েছে?'

'সেটা ভেবে দেখতে হবে।'

এই সময় নিচ থেকে ওদের ডাক পড়ল। স্বপনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ঠিক হয়েছে। একবার কথা হয়েছিল, অ্যামবুলেন্স ডাকা হবে। কিন্তু তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে বলে এখন ডক্টর সোমের গাড়িতেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্বপনকে।

ধরাধরি করে একতলায় নামানো হল স্বপনকে। এই সময় স্বপনের মা কাঁদতে শুরু করে দিলেন। এতক্ষণ কেউ কাঁদেনি, এই প্রথম কান্না। স্বপনের মাকে কাঁদতে দেখে বড়মামার চোখে জল এসে গেল।

স্বপনের বাবা কিন্তু বেশ শক্ত আছেন। ডক্টর সোমের গাড়ির পেছনের সিটে শুইয়ে দেওয়া হল স্বপনকে। ওর বাবা বললেন, 'বিমান, তুই ওর মাথাটা কোলে নিয়ে বোস, আমি সামনে বসছি।'

আগে-আগে চলল প্রিয়ব্রতর জিপ, তারপর ডক্টর সোমের গাড়ি। মোড়ের চায়ের দোকানটার কাছে এসে প্রিয়ব্রত ছেলেদের দলটার দিকে বলটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এই যে! একটা টবে গেঁথে ছিল।'

স্বপনের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে থাকা অবস্থায় বিমানের বুকটা ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। স্বপন অজ্ঞান হয়ে আছে, কোনও কথা বলছে না, এরকম অবস্থায় স্বপনকে সে কখনও দেখেনি। স্বপনের যদি আর জ্ঞান না ফেরে!

গাড়ি অনেকটা চলে এসে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে যখন যাচ্ছে, তখন স্বপন চোখ মেলল। অবাক চোখে তাকিয়ে বললে, 'কে? আমি কোথায়?'

ডক্টর সোম সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িটা থামিয়ে দিলেন। বিমান বলল, 'স্বপন, স্বপন! জ্ঞান ফিরেছে তোর? আমি বিমান।'

স্বপনের বাবা পেছন দিকে ফিরে ব্যাকুল ভাবে বলে উঠলেন, 'ওরে স্বপন, এই দ্যাখ আমি।'

সারা শরীরটা ধনুকের মতন বাঁকিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করে স্বপন হঠাৎ অদ্ভুত বিকৃত গলায় খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই! ওই! সবুজ আলো! সবুজ আলো!'

তারপরই আবার ধপ করে পড়ে গেল বিমানের কোলে। আবার সে অজ্ঞান।

পি. জি.-তে স্বপনের জ্ঞান ফিরল দুদিন পরে। প্রথম চোখ মেলেই সে ডেকে উঠল, 'মা!'

হাসপাতালের ডাক্তাররা এই দুদিন হাজার চেষ্টা করেও তার অসুখ যে কী তা ধরতে পারেননি। অনেকরকম ওষুধ দিয়েও কোনও কাজ হয়নি।

স্বপনের মা সেই সময় হাসপাতালেই ছিলেন। স্বপনের জ্ঞান ফিরেছে শুনে তিনি ছুটে এসে ঢুকলেন কেবিনের মধ্যে। স্বপনের হাত ধরে বললেন, 'কী রে, খোকা! ওঃ, আমি যে ঠাকুরকে কত ডাকছিলুম তোর জন্যে—'

স্বপন উঠে বসে জিগ্যেস করল, 'মা, আমি হাসপাতালে কেন?'

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন নার্স। মা কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, 'ওঠো না, ওঠো না, তোমার শরীর এখনও দুর্বল!'

স্বপন খাট থেকে নেমে বলল, 'দুর্বল! কই, আমি তো একটুও দুর্বল নই। আমার চশমাটা কোথায়?'

বিমান আর প্রিয়ব্রত বসে ছিল হাসপাতালের মাঠে। খবর পেয়ে তারা ভেতরে আসবার আগেই স্বপন বেরিয়ে এল বাইরে। তার পেছন-পেছন ছুটে এল হাসপাতালের কয়েকজন আর্দালি আর নার্স।

স্বপন বাইরে এসেই বলল, 'বিমান তুই? প্রিয়দা তুমি? ব্যাপার কী! আমাকে এরা হাসপাতালে আটকে রেখেছে কেন?'

স্বপনকে এরকম সুস্থ অবস্থায় হঠাৎ বেরিয়ে আসতে দেখে বিমান এমনই খুশিতে অভিভূত হয়ে গেল যে-কোনও কথাই বলতে পারল না। শুধু বলল, 'তুই...তুই...'

প্রিয়ব্রত বলল, 'উঃ, কী চিন্তাতেই ফেলেছিলি আমাদের! আমরা ভাবলুম তুই বুঝি এবার মরেই গেলি।'

স্বপন বলল 'কেন, আমার কী হয়েছিল?'

প্রিয়ব্রত জিগ্যেস করল, 'কিচ্ছু মনে নেই তোর?'

স্বপন বলল, 'কী মনে থাকবে? আমি...আমি তো দক্ষিণেশ্বরে মামার বাড়ি

গিয়েছিলুম,...তারপর...রাত্তিরবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ছাতে...সেখান থেকে হাসপাতালে এলুম কী করে?'

একজন নার্স একজন ডাক্তারকেও ডেকে এনেছেন এর মধ্যে। তিনি এসে বললেন, 'এই যে স্বপন, তুমি তো দেখছি ভালো হয়ে গেছ। বাঃ, ফাইন! একবারটি ভেতরে এসো, তোমাকে একটু চেক আপ করে নিই।'

স্বপন আর কিছুতেই হাসপাতালের মধ্যে ঢুকতে চায় না। সে বলল, হাসপাতাল জায়গাটাই তার বিচ্ছিরি লাগে। এখানে কীরকম একটা গন্ধ থাকে, সেটা তার মোটেই সহ্য হয় না।

প্রিয়ব্রত আর বিমান অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে নিয়ে গেল ভেতরে। তারপর ওকে শুইয়ে দেওয়া হল একটা উঁচু মতন খাটে। দুজন ডাক্তার নানারকম করে ওকে পরীক্ষা করে দেখলেন। এর মধ্যে স্বপনদের আত্মীয় সেই ডাক্তার সোমও এসে পড়লেন। তিনি সব দেখেশুনে বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ, ওর শরীরে এখন তো কোনওরকম রোগের লক্ষণই নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ ছেলে, অথচ প্রায় তিনদিন অজ্ঞান হয়ে রইল!'

শুয়ে থাকা অবস্থাতেই স্বপন বলল, 'আমি তিনদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলুম! না, না, হতেই পারে না!'

একটু বাদেই ডাক্তাররা স্বপনকে ছেড়ে দিলেন, তাকে এখন আর হাসাপাতালে আটকে রাখার কোনও মানেই হয় না।

বাইরে এসে ওরা উঠল প্রিয়ব্রতর লাল রঙের জিপ গাড়িটায়।

স্বপন বিমানকে জিগ্যেস করল, 'আমার সত্যিই কী হয়েছিল বল তো!'

বিমান বলল, 'বাঃ, সেটা তো তুই-ই আমাদের বলবি!'

স্বপন বলল, 'আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ছে মামার বাড়ির ছাতের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'তোর মাথায় কি কেউ মেরেছিল হঠাৎ?'

স্বপন বলল, 'না, তো। আমায় আবার কে মারবে? কেনই বা মারবে?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সেদিন দুপুরে ও-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তোর ঝগড়া হয়েছিল, ছোট এককড়ি বলে একটা ছেলে তোকে মারবে বলে শাসিয়েছিল, সে কথা মনে আছে?'

স্বপন বলল, 'হ্যাঁ, আছে। সে তো একটা বলের ব্যাপারে...না, না, সে ছেলেটা ছাতে উঠে আমায় মারবে কী করে?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সে-ই তো সমস্যা! কেউ মারল না, তবু তুই অজ্ঞান হলি কী করে?'

বিমান বলল, 'প্রিয়দা, তোমাকে তো আমরা রহস্যভেদী বলি। এই রহস্যের তুমি সমাধান করতে পারো না? কিছু একটা হয়েছিল নিশ্চয়।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'আমি কাল স্বপনের মামার বাড়ি ঘুরে এসেছি একবার। কিন্তু এখ নও পর্যন্ত কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

পরের দিন থেকে স্বপন কলেজ যাওয়া শুরু করল। তার সব কিছুই আবার আগের মতন স্বাভাবিক। শুধু মাঝখানে ওই তিনদিন সে অজ্ঞান হয়ে ছিল। স্বপনকে অনেকে

মিলে জেরা করেও কিছু ফল হয়নি। সে কেন অজ্ঞান হয়েছিল, সে সম্পর্কে তার নিজেরই কোনও ধারণা নেই। ব্যাপারটা একটা ধাঁধাই রয়ে গেল।

দিন সাতেক পরে একদিন প্রিয়ব্রত হন্তদন্ত হয়ে হাজির হল বিমানের বাড়িতে। সেদিন ওদের কলেজের ছুটি ছিল। ছাতের ওপর একটা ছোট ঘরে বিমান পড়াশুনো করে। প্রিয়ব্রত সেখানে উঠে এসে বলল, 'কীরে বিমান, পড়ছিস?'

বিমান বলল, 'আর বলো কেন প্রিয়দা? আজ ছুটি, কালই আবার ফিজিক্স অনার্স-এর পরীক্ষা নেবে বলেছে।'

প্রিয়ব্রত হঠাৎ বলল, 'এই হ্যাঁ রে, আজকের খবরের কাগজ পড়েছিস?'

হঠাৎ প্রশ্ন শুনে বিমান একটু অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, পড়েছি তো। কেন?'

'তোর খটকা লাগে নি? খবরটা দেখেছিস?'

'কীসের জন্যে খটকা লাগবে? তুমি কোন খবরটার কথা বলছ?'

'এই তো তোদের দোষ। ভালো করে খবরের কাগজটাও পড়িস না। আমি রোজ সকালে উঠে তিনখানা কাগজ তন্ন-তন্ন করে পড়ি!'

'তোমাকে তো আর কলেজের পড়াশুনো করতে হয় না, প্রিয়দা।'

প্রিয়ব্রত পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা খবরের কাগজের পাতা বার করে সেটা ছড়িয়ে ধরল। তারপর বলল, 'এই যে তোর জন্যে নিয়ে এসেছি। এই জায়গাটা পড়ে দ্যাখ।'

একটা ছোট্ট খবরের চারদিকে লাল পেনসিলের দাগ। মফস্‌সলের সংবাদদাতার খবর। ওপরে লেখা আছে—

'বালকের অদ্ভুত ব্যাধি'

তার নিচের খবরটা এই ঃ মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে এক আদিবাসী বালকের অদ্ভুত একটা অসুখ হয়েছে। একদিন সন্ধেবেলা সে একটু বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল, তারপর সারারাত তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরের দিন সকালবেলা দেখা গেল, সে একটা মাঠের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তার শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও স্বাভাবিক। তবু অনেক চেষ্টা করেও তার জ্ঞান ফেরানো যায়নি। গ্রামের মানুষ সবাই ভূতপ্রেতে দারুণ বিশ্বাসী। ছেলেটির বাড়ির লোকেরা প্রথমে ভেবেছিল, রাত্তিরে ছেলেটাকে বোধহয় ভূতে পেয়েছে। রোজা, ঝাড়-ফুঁক সব চলল, কিন্তু কিছুতেই জ্ঞান ফিরছে না দেখে পরে তারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে সে দুদিন ধরে অজ্ঞান হয়ে আছে, ডাক্তাররা কিছুই করতে পারছেন না। তবে মাঝে-মাঝে সে হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে 'সবুজ বাত্তি', 'সবুজ বাত্তি' বলে চিৎকার করে ওঠে, তারপরই আবার ধপ করে বিছানায় পড়ে যায়। ছেলেটিকে দেখবার জন্যে হাসপাতালে বহুলোক ভিড় করে আসছে।

খবরটা পড়ার পর বিমান প্রিয়ব্রতর চোখের দিকে তাকাল।

প্রিয়ব্রত বলল, 'এবার বুঝলি? এখানেও সবুজ আলো!'

বিমান বলল, 'স্বপনও সবুজ আলো বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, আর কত দূরে ঝাড়গ্রামে একটা ছেলে ঠিক একই ভাবে একই কথা বলছে! খুবই আশ্চর্য মিল তো!'

'নিশ্চয়ই! শোন আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। চল, ঝাড়গ্রাম ঘুরে আসি।'

'কবে?'

'আজই। আজ তো তোদের ছুটি। আমার জিপে ঝাড়গ্রামে যেতে ঘণ্টা চারেকের বেশি লাগবে না। চল, ছেলেটাকে দেখে আসি।'

'কালকের মধ্যে ফিরতে পারব?'

'কেন পারব না? নে, চটপট তৈরি হয়ে নে?'

'প্রিয়দা, তুমি বাবার কাছ থেকে পারমিশানটা নিয়ে নাও। কাল আবার পরীক্ষার ব্যাপারটা আছে তো।'

'সে তোকে ভাবতে হবে না, আমি ম্যানেজ করছি। তুই তাড়াতাড়ি কর।'

'প্রিয়দা, স্বপনকে সঙ্গে নেবে না?'

প্রিয়ব্রত ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করতে লাগল।

বিমান বলল, 'এক কাজ করা যাক না! স্বপনকে আসল ব্যাপারটা কিছু বলবার দরকার নেই। ওকে বলব, চল, আজ একটু ঝাড়গ্রাম থেকে বেড়িয়ে আসি।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'স্বপনকে না নিলে হয় না?'

'কিন্তু স্বপন যখন শুনবে তোমাতে-আমাতে জিপে করে ঝাড়গ্রাম বেড়াতে গেছি, তখন ও কী ভাববে বলো তো? আমরা ওকে বাদ দিয়ে কখনো কোথাও গেছি?'

'আর তো কিছু নয়, আমার শুধু ভয় হচ্ছে, স্বপন যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে?'

'না, না। ও খুব ভালো আছে। কালও তো কলেজে চমৎকার ব্যাডমিন্টন খেলল।'

'তা হলে চল, স্বপনকে ডেকে নেওয়া যাক্।'

হঠাৎ ঝাড়গ্রাম যাওয়ার প্রস্তাব শুনে স্বপন বেশ অবাক হল। খবরের কাগজের ছোট্ট খবরটা ও পড়েনি। ওকে কিছু জানানোও হল না।

বাইরে বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে স্বপনের চিরদিনই খুব উৎসাহ। ও আধ ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল।

স্বপন উঠে বসতেই প্রিয়ব্রত গাড়িটায় স্টার্ট দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা ছাড়িয়ে বালি ব্রিজের দিকে ছুটে চলল প্রিয়ব্রতর লাল জিপ।

বালি ব্রীজের কাছেই দক্ষিণেশ্বরে স্বপনের মামার বাড়ি। সেখানেই ঘটেছিল দুর্ঘটনাটা।

ব্রিজের ওপর উঠে বিমান হঠাৎ জিগ্যেস করে বসল, 'আচ্ছা স্বপন, তুই কখনো খুব তীব্র সবুজ আলো দেখেছিস?'

স্বপন অবাক হয়ে বলল, 'সবুজ আলো? কীসের সবুজ আলো?'

বিমান বলল, 'না, মানে বলছি যে খুব জোরালো সবুজ আলো হঠাৎ কখনো তোর চোখে পড়েছিল?'

স্বপন বলল, 'হঠাৎ এ কথা জিগ্যেস করছিস কেন?'

বিমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়েই থেমে গেল। দেখল প্রিয়ব্রত ওর দিকে কটমট করে চেয়ে আছে। যেন চোখ দিয়ে বলতে চায়, বিমানের এই প্রসঙ্গটা এখন তোলা উচিত হয়নি।

কথাটা ঘোরাবার জন্যে প্রিয়ব্রত বলল, 'বিমানটার মাথায় যেন গোবর ভরা। সবুজ আলো তো সবাই দেখেছে। রেল লাইনের পাশে গ্রীন সিগন্যাল দেখা যায় না দূর থেকে জ্বলজ্বল করে।'

প্রিয়ব্রতর কাছে ধমক খেয়ে বিমান আর মুখ খুলল না। স্বপনও বসে রইল চুপ করে।

ব্রিজ পেরিয়ে ওরা চলল দিল্লি রোড দিয়ে। খানিক দূরে গিয়ে বাঁ-দিকে আর একটা ব্রীজ পেরিয়ে পাওয়া গেল বম্বে রোড। এই রাস্তা দিয়েই ঝাড়গ্রাম যাওয়া যাবে।

চা খাওয়ার জন্য ওরা থামল কোলাঘাটে।

স্বপন বলল, 'প্রিয়দা, তুমি কিন্তু বড্ড জোরে চালাচ্ছ!'

প্রিয়ব্রত বলল, 'এই জিপটা নিয়ে বিশ্বভ্রমণে যাব কি না, তাই একটু প্র্যাকটিস করে নিচ্ছি!'

বিমান বলল, 'কবে বিশ্বভ্রমণে যাবে, প্রিয়দা? তুমি তো অনেক দিন থেকেই বলছ। এবার দিন ঠিক করো, আমরা তৈরি হয়ে নিই।'

'তোরাও যাবি নাকি?'

'নিশ্চয়ই।'

'তা হলে চল, এই শীতেই বেরিয়ে পড়ি!'

স্বপন জিগ্যেস করল, 'প্রিয়দা, গ্রিসে যাবে তো? ওঃ, গ্রিস—গ্রিস আমার স্বপ্নের দেশ। যতবার ইতিহাস পড়ি, ততবারই আমার মনে হয়, একদিন না একদিন গ্রীসে যাবই।'

প্রিয়ব্রত হেসে বলল, 'ঠিক আছে, তোকে আমরা গ্রীসেই রেখে দিয়ে আসব!'

কোলাঘাট থেকে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল ঝাড়গ্রাম। কিন্তু প্রথমেই তো আর হাসপাতালে যাওয়া যায় না, তাহলে স্বপন সন্দেহ করবে। কলকাতা থেকে এত দূরে এসেই কি আর কেউ একটা হাসপাতাল দেখতে যায়!

ডাকবাংলোয় একটা ঘর বুক করল প্রিয়ব্রত। লাল মাটি আর শাল গাছের ঠাস বুনুনির মাঝে ঝাড়গ্রাম শহরটা। ছোট্ট হলেও বেশ সুন্দর। তাছাড়া স্বাস্থ্যকর শহর বলেও এর খ্যাতি দেশজোড়া। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামায় জায়গাটা যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠল।

স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে ওরা ভাত খেয়ে নিল আগে। তারপর প্রিয়ব্রত বলল, 'বিমান তুই স্বপনকে নিয়ে ডাকবাংলোতে গিয়ে বিশ্রাম কর, আমি একটু ঘুরে আসছি। আমার একজন চেনা লোক আছে এখানে, তার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।'

বিমান বুঝতে পারল, যে প্রিয়ব্রত এই ছুতোয় হাসপাতালটা একবার ঘুরে দেখে আসতে যাচ্ছে। যে-কোনো কারণেই হোক সেখানে স্বপনকে নিয়ে যেতে চায় না প্রিয়ব্রত।

প্রিয়ব্রত অবশ্য একেবারে মিথ্যে কথাও বলেনি। এখানে সত্যি তার চেনা লোক আছে একজন। এখানকার ডি. এফ. ও. অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার সুকোমল রায় ওর কলেজ জীবনের বন্ধু।

প্রিয়ব্রত চলে যাওয়ার পর বিমান আর স্বপন ডাকবাংলোর বারান্দায় দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে স্বপন বলল, 'প্রিয়দা যার সঙ্গে দেখা করতে গেল, দেখে নিস তার সঙ্গে আজ দেখা হবে না।'

বিমান চমকে উঠে বলল, 'তার মানে তুই জানিস প্রিয়দা কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে?'

'না, তা জানি না।'

'তা হলে কী করে বুঝলি দেখা হবে না?'

'আমার মাঝে-মাঝে এইরকম মনে হয়। প্রিয়দা ফিরে এলে দেখিস তুই, আমার কথা মেলে কি না! ঝাড়গ্রাম জায়গাটা বেশ সুন্দর তাই না রে, বিমান। এখানে কটা দিন থেকে গেলে হয় না?'

'কাল কলেজ খোলা আছে ভুলে গেছিস? আমার আবার একটা ক্লাস টেস্ট রয়েছে।'

'তা বলে আজ এসে আজই ফিরে যাব?'

'প্রিয়দা বলেছে, সন্ধের-পর রওনা হলে আমরা মাঝরাতের মধ্যে ফিরে যেতে পারি কলকাতায়।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর চেয়ারেই হেলান দিয়ে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল স্বপন।

বিমান উঠে পায়চারি করতে লাগল বাংলোর বাগানে।

একটু পরেই ফিরে এল প্রিয়ব্রত। বাংলোর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল বিমানকে। বিমান কাছে যেতেই জিগ্যেস করল, 'স্বপন কোথায় রে?

'ঘুমোচ্ছে।'

'ভালোই হল। ততক্ষণে কয়েকটা জরুরি কথা সেরে নিই। হাসপাতালে সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা হল না রে।'

বিমান অমনি একবার চট্ করে পেছন ফিরে ঘুমন্ত স্বপনের দিকে তাকাল।

তারপর বলল, 'আশ্চর্য! স্বপন আগে থেকেই সে কথা বুঝল কী করে! যাই হোক, ছেলেটার সঙ্গে দেখা হল না কেন?'

'আজকের খবরের কাগজে যে খবরটা বেরিয়েছে, সেটা আসলে পুরোনো খবর। ঘটনাটা ঘটেছে কয়েকদিন আগে! মফস্‌সলের খবর অনেক সময় এরকম দেরিতেই বেরোয়। ইতিমধ্যে ছেলেটা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি চলে গেছে।

'তা হলে ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না?'

'না রে না, আমি ছেলেটার নাম ঠিকানা জোগাড় করে এনেছি। ছেলেটা ঠিক

ঝাড়গ্রামের ছেলে নয়। দইজুড়ি নামে একটা গ্রাম আছে এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে, সেখানে থাকে। ওর নাম শম্ভু মাহাতো। এক আদিবাসী চাষীর ছেলে, বছর দশেক বয়েস।'

'এত দূরে এসে ছেলেটার সঙ্গে দেখা করে যাব না?'

'দেখা তো করতেই হবে। আজ আর তা হলে কলকাতায় ফেরা হচ্ছে না।'

'কিন্তু আমার পরীক্ষার কী হবে?'

'আরে ক্লাস টেস্ট তো? এর আগেকার টেস্টগুলো তো ভালোই দিয়েছিস! এটা না দিলেও তোর কোনও ক্ষতি হবে না। আর তোদের আর স্বপনদের বাড়িতে আমি হাসপাতাল থেকেই ফোন করে দিয়েছি। আমার সঙ্গে আছিস, তাই তাঁদের কোনও আপত্তিই নেই।'

'তুমি তো দেখছি আগেই আটঘাট বেঁধে নিয়েছ?'

'শুধু-শুধু কি আর এতদিন পুলিশে কাজ করেছি?'

'তা তো বুঝলুম, কিন্তু দইজুড়ি গ্রামে ছেলেটার বাড়িতে আমরা হঠাৎ যাব, তারা কী ভাববে?'

'আমরা বলব আমরা খবরের কাগজের রিপোর্টার। কলকাতা থেকে এসেছি ওই ছেলেটার রহস্যময় অসুখের ব্যাপারটা জানবার জন্যে।'

'স্বপনকেও খুলে বলতে হয় তা হলে?'

'এক্ষুনি জানাবার দরকার নেই। বীজপুর নামে এদিকে আর একটা সুন্দর জায়গা আছে, সেখানে একটা ভালো বাংলোও আছে। আজ রাতটা আমরা সেখানেই কাটাব। বীজপুর যাওয়ার পথেই পড়বে দুইজুড়ি গ্রাম। সেখান থেকে আমরা ছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'সেটাই ভালো হবে।'

'তুই এখন স্বপনকে ডেকে জিনিসপত্তর গুছিয়ে নে। আমি আমার বন্ধু ডি এফ. ওর সঙ্গে দেখা করে বীজপুরের বাংলোটা রিজার্ভ করে আসছি।'

প্রিয়ব্রত আবার চলে যেতেই বিমান এসে স্বপনকে ডাকল।

স্বপন চোখ মেলে বলল, 'যাঃ, কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি তো! একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলুম—'

বিমান বলল, 'তোর নামই তো স্বপন। নিশ্চয়ই তুই রোজই ঝুড়ি-ঝুড়ি স্বপ্ন দেখিস! তাই না? একেই বলে সার্থকনামা! হ্যাঁ, শোন, তোর ইচ্ছেটা পূর্ণ হল।'

'তার মানে?'

'আজ আর আমাদের ফেরা হচ্ছে না। আর রাতটা থেকে যেতে হচ্ছে।'

'হুররে! চমৎকার! কিন্তু থেকে যেতে হচ্ছে কেন?'

'প্রিয়দার কী একটা কাজ আছে এখানে। আজ হল না। কাল সকালে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজ রাত্তিরে আমরা থাকব এর চেয়েও ভালো জায়গায়। আরও খানিকটা দূরে বীজপুর বলে একটা জায়গায় এর চেয়েও নাকি অনেক সুন্দর একটা বাংলো আছে।'

'দারুণ ব্যাপার তো! আজ রাত্তিরে আমি ওই বাংলোতে মাংস রান্না করব!'

'তা হলেই হয়েছে আর কী! সে মাংস আর কাউকে খেতে হবে না! শিমুলতলায় গিয়ে সেই যে সেবারে তুই মুরগি রেঁধেছিলি? উঃ, কী নুনেপোড়া, কী নুনেপোড়া!'

'কিন্তু সেবারে আমার রান্না আলুভাজাটা তো ভালো হয়েছিল। বল, ভালো হয়নি?'

'হ্যাঁ ভালো হয়েছিল, খুব ভালো হয়েছিল। এখন নে, চটপট আমাদের জিনিসগুলো গুছিয়ে নিতে হবে। প্রিয়দা'র ক্যামেরাটা কোথায়? বিকেলে আমি রাস্তায় ছবি তুলব।'

'প্রিয়দা যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, তার সঙ্গে দেখা হয়নি নিশ্চয়ই?'

'তুই আগে থেকে এসব বলিস কী করে রে? তুই কি জ্যোতিষ জানিস নাকি?'

'হাঃ হাঃ বাবা! কায়দা আছে, কায়দা।'

প্রিয়ব্রত ফিরে এসে বলল, 'আমরা বীজপুরে না গিয়ে কাঁকড়াঝোড়েও যেতে পারি। সেটা আরও দূরে, একবারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে!

স্বপন বলল, 'তা হলে সেখানেই চলো। জঙ্গলের মধ্যে রাত্তিরে খুব ভালো লাগবে। সেখানে বাঘ আছে?

প্রিয়ব্রত বলল, 'বাঘ আছে কি না জানি না, তবে হাতি আছে। দু-তিনটে হাতি নাকি কয়েকদিন ধরে খুব উৎপাত করছে।

সে কথা শুনে আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠল বিমান আর স্বপন দুজনেই। ওরা কেউই আগে বুনোহাতি দেখেনি।

ঝাড়গ্রাম ছাড়িয়ে খানিক দূরে যেতেই রাস্তার পাশে মাইলপোস্টে দেখা গেল দইজুড়ির নাম। আর মাত্র দুমাইল দূরে। সেখানে গিয়ে শম্ভু মাহাতো নামের ছেলেটার বাড়ি খুঁজে বার রতে হবে। নিশ্চয়ই তাতে কোনও অসুবিধে হবে না। খবরের কাগজে যখন ওর কথা বেরিয়েছে তখন ছেলেটা নিশ্চয়ই বিখ্যাত হয়ে গেছে। এখন শম্ভু মাহাতোর নাম বললেই ওখানে সবাই চিনবে।

কিন্তু দইজুড়িতে গিয়ে শম্ভু মাহাতোর বাড়ি খুঁজতে হল না ওদের। তার আগেই একটা দারুণ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল।

দইজুড়িতে একটা তিন মাথার মোড় আছে। জিপটা তখনও সেখানে পৌঁছয়নি, দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটছে চার-পাঁচটা ছেলে। হঠাৎ তাদের দেখে স্বপন চিৎকার করে উঠল, 'থামো, থামো, প্রিয়দা, শিগগির গাড়িটা থামাও!'

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে প্রিয়ব্রত জিগ্যেস করল, 'কী রে, কী ব্যাপার!'

একটা ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে স্বপন বলল, 'কী আশ্চর্য! আজ দুপুরেই তো আমি ছেলেটাকে স্বপ্নে দেখেছি!'

কথাটা বলতে-বলতেই জিপ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল স্বপন।

তারপর দুটো হাত তুলে স্বপন চিৎকার করে উঠলো, 'সবুজ আলো, সবুজ আলো!'

ছেলেদের দলের মধ্যে বছর দশেক বয়েসের একটা ছেলেও ঠিক ওইরকম ভাবেই দু-হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'সবুজ বাত্তি! সবুজ বাত্তি!'

স্বপন দৌড়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরল ছেলেটিকে। সঙ্গে-সঙ্গে দুজনই অজ্ঞান হয়ে ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।

প্রিয়ব্রত আর বিমান অবাক হওয়ারও সময় পেল না। তক্ষুনি ওদের তোলা হল জিপে। প্রিয়ব্রত ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে চলে এলো ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে।

ডাক্তারেরা হাজার চেষ্টা করেও পুরো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওদের দু'জনের জ্ঞান ফেরাতে পারলেন না। কোনও কিছু খাওয়াবারও উপায় নেই। পাশাপাশি দুটো খাটে ওরা শুয়ে রইল নিথর হয়ে। সামান্য একটু নিশ্বাস পড়ছে। এ ছাড়া বেঁচে থাকার কোনও চিহ্নই নেই।

বিমান আর প্রিয়ব্রত রাতটা কাটাল ডাক বাংলোয়। স্বপনের বাড়িতে খবরটা দেওয়া উচিত। কিন্তু অনেকবার চেষ্টা করেও টেলিফোনের লাইন পাওয়া গেল না কলকাতার! প্রিয়ব্রত আর বিমান প্রায় সারা রাত জেগেই কাটাল। দুজনেই হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

স্বপন এর আগে কখনো ঝাড়গ্রামে আসেনি। ওই সাঁওতাল ছেলেটিকে তার চেনবার কোনও কারণই নেই। আর সাঁওতাল ছেলেটিই বা চিনবে কী করে স্বপনকে! তবু দু'জনে দু'জনকে দেখামাত্র ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল! আর দুজনেই চেঁচিয়ে উঠল 'সবুজ আলো' বলে।

কোথায় কলকাতা আর কোথায় ঝাড়গ্রাম! এই দুজায়গায় দুজন অচেনা ছেলে পরস্পরকে দেখে হঠাৎ 'সবুজ আলো' বলে চিৎকার করে উঠবেই বা কেন?

একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিমান জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা প্রিয়দা, এটা ওই যে কী বলে জাতিস্মর-টাতিস্মরের ব্যাপার নয় তো।

প্রিয়ব্রত বলল, 'ধ্যুৎ আমি ওসব মানি না।'

বিমান বলল, 'আমি কিন্তু শুনেছি, আগের জন্মের কথা অনেকের নাকি মনে থাকে। সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা' বইটাতে যেরকম আছে...'

প্রিয়ব্রত বলল, 'তুই বলতে চাস, দুজনেরই একসঙ্গে আগের জন্মের কথা মনে পড়ছে?'

'তা ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে?'

'তা হলে 'ওই সবুজ আলো'র ব্যাপারটা কী? আগের জন্মের আর কিছু মনে পড়ল না, শুধু ওই সবুজ আলোর কথাই মনে পড়ল! হতেই পারে না।'

'তা হলে?'

'নিশ্চয়ই এর অন্য ব্যাখ্যা আছে।'

ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই ওরা আবার ছুটল হাসপাতালে ছেলে দুটোর খবর নিতে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল তখনও সেই একই অবস্থা।

তখুনি ওরা ঠিক করল, আর ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। আজই স্বপনকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। আর ওই সাঁওতাল ছেলেটির বাড়ির লোকজন যদি রাজি হয় তা হলে ওকেও চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে।

কাছেই রেল স্টেশন। ওরা হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল প্ল্যাটফর্মে। দুজনে দু-ভাঁড়

চা নিল। সাতটার পর একটা ট্রেন আসবে জামসেদপুর থেকে। সেই ট্রেনে কলকাতায় খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায়। কিন্তু প্রিয়ব্রতর জিপটার তা হলে কী হবে? এই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করল দুজনে। তারপর ঠিক হল জিপে করেই সকলে মিলে ফেরা হবে। প্রিয়ব্রত ঠিক মতন চালালে ট্রেনের চেয়ে খুব বেশি দেরি লাগবে না।

স্টেশন থেকে বাইরে এসে ওরা জিপে উঠতে যাবে, এমন সময় একজন মাঝবয়েসি ভদ্রলোক এসে জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, এখানে হাসপাতালটা কোথায় বলতে পারেন?

লোকটি যেমন লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্যবান। মাথার চুল কাঁচা পাকা, নাকের নিচে শেয়ালের ল্যাজের মতন মোটা গোঁফ। পরনে একটা সিল্কের শার্ট, খাকি ফুল প্যান্ট আর পায়ে খয়েরি রঙের কাবুলি জুতো।

প্রিয়ব্রত লোকটিকে এক পলক দেখে নিয়ে বলল, 'হাসপাতাল এই তো কাছেই। আমরা সেখানেই যাচ্ছি।

ভদ্রলোক প্রিয়ব্রতর জিপটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই জিপটা আপনার? আপনি কি পুলিশ নাকি?

প্রিয়ব্রত বিমানের দিকে একবার তাকাল। প্রিয়ব্রত তো সত্যিই কিছুদিন আগেও পুলিশে চাকরি করত। তাকে দেখলে কি এখনও তা বোঝা যায়?

সে হাসতে-হাসতে বলল, 'না। পুলিশ নই। হঠাৎ একথা আপনার মনে হল কেন?

'জিপটার এরকম লাল রং দেখে।'

'ওঃ, তা-ই! ওটা আমার শখ।'

'আপনাদের গাড়িতে আমি যেতে পারি? আপনারা যখন হাসপাতালেই যাচ্ছেন।'

'ঠিক আছে, উঠুন।'

বিমান সরে গিয়ে জায়গা করে দিল ভদ্রলোককে। প্রিয়ব্রত গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ভদ্রলোক গাড়িতে বসেই হঠাৎ সবিনয়ে বললেন, 'নমস্কার। আমার নাম চক্রধারী সরখেল। আমি এই কাছেই গালুডিতে থাকি। আপনারা?

প্রিয়ব্রত তাদের দুজনের পরিচয় জানিয়ে বলল, 'আমরা আসছি কলকাতা থেকে।

'বেড়াতে এসেছেন?'

'তা এক রকম বেড়ানোই বলতে পারেন।'

'বেড়াতে এসেছেন, তা এই সকাল বেলাতেই হাসপাতালে যাচ্ছেন কেন?'

'আমাদের সঙ্গে আর একজন ছিল, সে হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তা আপনি হাসপাতালে যাচ্ছেন কেন? আপনার চেনা কেউ আছে বুঝি?'

'না, মশাই, চেনা-টেনা কেউ নেই। তবে কেন যে যাচ্চি সে কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। শুনলে আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না কে জানে।'

বিমান একটু কুঁকড়ে বলে আছে। লোকটির গায়ে ভীষণ পেঁয়াজের গন্ধ। তা ছাড়া এই গরমে সিল্কের জামা পরে আছে বলে গা-টাও কীরকম যেন চটচটে।

চক্রধারী সরখেল আবার বললেন, 'আমি মশাই ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করি। আমার দুখানা ট্রাক আছে। এই রাঁচি, জামসেদপুর, চাইবাসা, কলকাতা পর্যন্ত যায়। ড্রাইভার চালায়,

আমি নিজেও অনেক সময় চালাই। এক-একবার গাড়ি নিয়ে বেরোই, দু-তিন দিন পরে ফিরি।

প্রিয়ব্রত বলল, 'আপনার চক্রধারী নামটা দেখছি সার্থক!'

'কেন? ও কথা বললেন কেন?'

'গাড়ির স্টিয়ারিংটা তো অনেকটা সুদর্শন চক্রের মতনই দেখতে, তাই না? আপনি সেটা ধরে থাকেন...'

'বাঃ, বেশ বলেছেন তো! আগে কেউ বলেনি তো একথা। তা হলে আর একটা মজার কথা আছে, শুনবেন? এদিকে চক্রধরপুর বলে একটা জায়গা আছে, জানেন তো? সেখানে আমি গেলেই অনেকে বলে ওঠে, এই যে মালিক আ গিয়া মালিক আ গিয়া।

ভদ্রলোক নিজেই হেসে উঠলেন হো হো করে।

প্রিয়ব্রত হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'আপনি এত সকালে গালুডি থেকে এলেন কী করে? এখনও তো কোন ট্রেন আসেনি!

'আমার একটা ট্রাক যাচ্ছিল খড়্গপুরে, ভোর চারটেয় ছেড়েছে। সেটাতেই এসে নেমে পড়লাম এখানে। আমার মেয়ে জোর করে আমায় পাঠাল।

'কেন, গালুডিতে হাসপাতাল নেই?'

'আপনি বুঝি ভাবছেন এখানকার হালপাতালে আমি নিজের চিকিৎসার জন্য এসেছি? না,না, আমি ডাক্তার কবিরাজের কাছে পারতপক্ষে যাই না মশাই। আমার কোনও অসুখই হয় না। একটু কখনো জ্বর-টর যদি হয়ও আমি গ্রাহ্য করি না। এখন ব্যাপারটা হয়েছিল কী জানেন? আমি মশাই দিন তিনেক বাড়িতে ছিলাম না, ট্রাক নিয়ে গিয়েছিলাম থলকোবাদ। কোনওদিন গেছেন সেখানে? ভারি সুন্দর জায়গা। তা আপনারা তো বেড়াতেই এসেছেন, চলুন না, সেখান থেকে ঘুরে আসবেন একবার।

'না, মশাই আমাদের আজই কলকাতায় ফিরতে হবে।'

'আপনাদের সঙ্গে পথে এইভাবে আলাপ হল, ভেবেছিলাম, আপনাদের গালুডিতেও আমার বাড়িতে একবার নিয়ে যাব!'

'এবারেও হল না, পরে যদি আবার আসি যাওয়া যাবে।'

জিপটা একটু পরেই পৌঁছে গেল হালপাতালের সামনে। প্রিয়ব্রত বলল, 'এসে গেছি, নামুন!'

চক্রধারীবাবু বললেন, 'এইটে হাসপাতাল? ঝাড়গ্রামের ওপর দিয়ে কতবার গেছি, এসেছি, কোনওদিন খোঁজ করিনি তো!'

প্রিয়ব্রত নেমে পড়েছে, কিন্তু চক্রধারীবাবু নামেননি বলে বিমানও নামতে পারছে না।

'কী হল, নামুন!' তাড়া দিল বিমান।

'ও মশাই, আমার যে বড্ড ভয় করছে। আমি যে কোনওদিন হাসপাতালে যাইনি!'

প্রিয়ব্রত আর বিমান দুজনেই দারুণ অবাক। এমন একটা লম্বা-চওড়া জোয়ান লোকের মুখখানা সত্যিই ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গেছে!

প্রিয়ব্রত বলল, 'হাসপাতালে ঢুকতে ভয় পান, তা হলে এসেছেন কেন?'

চক্রধারীবাবু বললেন, 'আমি কি আর সাধে এসেছি? আমার মেয়ে জোর করে পাঠাল যে। আমার মেয়ের নাম সীতা! সে আমায় উঠতে-বসতে শাসন করে।'

'আপনার মেয়ে আপনাকে পাঠিয়েছে কেন? আপনার কি কোনও অসুখ করেছে?'

'না, না, বললুম তো, আমার কখনো অসুখ হয় না। আর সেরকম কোনও বড় অসুখ হলে কী আর জামসেদপুরে দেখাতে পারতুম না? এই ঝাড়গ্রামে আসতে হবে আমাকে?'

'কী মুশকিল, তা হলে এলেন কেন?'

'দয়া করে আপনি ভাই আমায় একটু সাহায্য করুন। আমার সবকথা শুনলেই আপনি বুঝবেন। একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন?'

'আমরা বিশেষ ব্যস্ত, আপনি সংক্ষেপে বলুন।'

'হ্যাঁ, তাই বলছি! ওই যে বললুম, আমি নিজে দুটো ট্রাকের মালিক হলেও প্রায়ই নিজেই ট্রাক চালাই। কখনো-কখনো তিন-চার দিন বাড়ি ফিরিনা—'

প্রিয়ব্রত একটু চটে গিয়েই বলল, 'তা তো আগেই শুনেছি। আসল কথাটা চটপট বলে ফেলুন।

বিমান আরও অধৈর্য হয়ে উঠেছে। এই লোকটাকে তার ভালোও লাগছে না। সে স্বপনের জন্যে খুবই চিন্তিত হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে এখন আবার এই লোকটা এসে ঝামেলা বাধাচ্ছে কেন?

চক্রধারীবাবু বললেন, 'আমরা যে কোথায় কখন থাকব, তার ঠিক নেই। অনেক সময় তো রাস্তার ধারে পাঞ্জাবীদের হোটেলে ট্রাক থামিয়ে রাত্তিরটা ঘুমিয়ে নিই ওদের খাটিয়ায় শুয়ে। কখনো-কখনো ট্রাকের মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকি।'

'বেশ, বুঝলুম সব। এখন আসল কথাটা বলুন।'

'আমি খবরের কাগজ-টাগজ বিশেষ পড়ি না, পড়ার অভ্যেস নেই, সময়ও পাই না।'

অধৈর্য হয়ে বিমান বলল, 'প্রিয়দা, তুমি তা হলে এঁর কাছে গল্প শোনো, আমি ভেতরে গিয়ে স্বপনের খবরটা নিয়ে আসি।

চক্রধারীবাবু বিমানের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'একটু দাঁড়াও ভাই, তুমিও শোনো। আমি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কখনো স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠি না। সবাই বলে ঘুমোলে আমার নাকি নাক ডাকে! কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে ভয় পেয়ে কখনো চেঁচিয়ে উঠেছি, এরকম কথা কেউ বলতে পারবে না।

প্রিয়ব্রত বেশ রাগত ভাবেই বলল, 'কী মুশকিল, আমরা কি এখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আপনার স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনব?

'দোহাই, রাগ করবেন না। সবটা শুনলেই আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবেন। আমি কি আর আপনাদের মতন গুছিয়ে কথা বলতে পারি! লেখাপড়াও বেশি শিখিনি, আর ট্রাক চালানোর সময় দিনের পর দিন কারুর সঙ্গে কথাই হয় না। আর ওই যে বললুম, খবরের কাগজ আমি পড়ি না, আমার মেয়ে কিন্তু পড়ে। মেয়ের পড়াশুনোয় খুব মাথা—

'একবার বলছেন ঘুমের কথা, একবার বলছেন খবরের কাগজের কথা। আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'চারদিন বাড়ি ছিলুম না, কাল রাতে বাড়ি ফিরেছি। অমনি আমার মেয়ে সীতা বললে, বাবা, তুমি কাল ভোরেই ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে চলে যাও।'

'কেন? সেটাই তো আমরা জানতে চাইছি!'

'খবরের কাগজে নাকি বেরিয়েছে যে এই হাসপাতালে একটা সাঁওতাল ছেলে ভর্তি হয়েছে। সে অজ্ঞান অবস্থায় চেঁচিয়ে ওঠে, সবুজ আলো! সবুজ আলো! আমার মেয়ে তো বললে এই কথা! মেয়ে তো আর মিথ্যে বলবে না! সে বললে, শিগগির যাও বাবা—।'

বিমান আর প্রিয়ব্রত পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। এই বাক্যবাগীশ লোকটার মুখেও সবুজ আলোর কথা শুনবে, ওরা আশাই করেনি!

'আপনি সেই ছেলেটিকে দেখতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'সেটা তো আমি নিজেই জানি না! তবে আমার মেয়ে বলছে, মেয়ের মা বলছে, আমি নাকি একদিন ট্রাকের মধ্যে শুয়ে থেকে বারবার 'সবুজ আলো', 'সবুজ আলো' বলে চেঁচিয়েছি! তারপর বারো-চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে কেউ আমায় ঠ্যালাঠেলি করেও নাকি জাগাতে পারেনি! আমার তো বিশ্বাসই হয় না। কিন্তু সবাই বললে...।'

প্রিয়ব্রত আর বিমান পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। বিমানের শরীরটা ছমছম করে উঠল একটু। তার মাথাও গুলিয়ে যাচ্ছে। তা হলে এই নিয়ে তিনজন হল!'

তিনজন মানুষ 'সবুজ আলো' 'সবুজ আলো' বলে কোনও না কোনও সময় চেঁচিয়ে উঠেছে! অথচ কেউ কাউকে চেনে না। একজন থাকে কলকাতায়, একজন ঝাড়গ্রামে আর একজন গালুডিতে। কেউ কারুকে কোনওদিন চোখে দেখেনি তো বটেই, তিনজনের বয়সেরও অনেক তফাৎ।

চক্রধারী সরখেলের বয়স অন্তত পঞ্চাশ বছর তো হবেই। ভদ্রলোক ট্রাকের মালিক, নিজেও ট্রাক চালান, বহু জায়গা ঘুরেছেন। এইসব লোক সাধারণত খুব শক্ত ধাতের হয়। কিন্তু চক্রধারীবাবুর মুখখানা এখন তো ভয়ে কুঁকড়ে গেছে একেবারে।

চক্রধারী সরখেল অসহায়ের মতন বললেন, 'এসব কী ব্যাপার বলুন তো মশাই? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! আমার মেয়ে আমাকে জোর করে পাঠাল এখানে—'

প্রিয়ব্রত জিগ্যেস করল, 'আপনি "সবুজ আলো" বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন কেন? আপনি কি কোনও সবুজ আলো দেখেছিলেন?'

চক্রধারীবাবু বললেন, 'কী জানি মশাই। আমার তো কিছুই মনে নেই। আমি নাকি কুম্ভকর্ণের মতন ভোঁস-ভোঁস করে গোটা একটা দিন ঘুমিয়েছি। ব্যাপারটা হয়েছিল কী, থলকোবাদ থেকে ট্রাক চালিয়ে ফিরছিলাম তো? খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বাড়ির একেবারে কাছাকাছি এসে...আর যেন পারি না, রাতও হয়ে গিয়েছিল অনেক। রাস্তার

ধারে ট্রাকটা থামিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে গেছি, ব্যাস, অমনি ঘুম এসে গেল! সেখান থেকে আমার বাড়ি মোটে আর এক মাইল।'

বিমান বলল, 'মাত্র এক মাইল দূরে আপনার বাড়ি, তা হলে বাড়ি ফিরেই তো ঘুমোতে পারতেন?'

'ঠিক! কিন্তু কেন যে ঘুমিয়ে পড়লুম কে জানে!'

'তারপর?'

'সেইভাবেই রাত কেটে গেল। ও হ্যাঁ, এখন যেন একটু-একটু মনে পড়ছে। একটা খুব জোরালো আলো আমার মুখে এসে পড়ায় আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একবার...'

'সেটা কি সবুজ রঙের আলো?'

'তা মনে নেই! কে যে সেই আলো ফেলেছিল তাও মনে করতে পারছি না...মাঝরাতে অনেক সময় রাস্তায় ডাকাতি হয়। কিন্তু ডাকাত হলে...কিছু নেয়নি তো আমার...কোমরের গেঁজেতে শ' আড়াই টাকা ছিল, তা ঠিক ছিল, তাতে ঘড়ি ছিল, তাও নেয়নি।'

'সেই আলোটা চোখে পড়ার পর জেগে উঠে আপনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না?'

'নিশ্চয়ই আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কিংবা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম, নইলে আব কিছু মনে করতে পারছি না কেন? সকালবেলায় আমায় ট্রাকের মধ্যে ঘুমোতে দেখে দুএকজন চেনা লোক আমার বাড়িতে খবর দেয়। তখন আমারই আর একজন ড্রাইভার রামস্বরূপ লোকজন নিয়ে আমায় ডাকতে আসে। কিন্তু অনেক ঠেলাঠেলি করেও তারা নাকি আমার ঘুম ভাঙাতে পারেনি। শেষপর্যন্ত রামস্বরূপ ট্রাকটা চালিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে। কয়েকজন মিলে নাকি আমায় ধরাধরি করে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। আমার মেয়ে তো ভেবেছিল যে আমি মরেই গেছি! একজন ডাক্তারও নাকি ডেকে এনেছিল। সেই ডাক্তার নাড়ি টিপে কিছুই বুঝতে পারেনি। কী সব ওষুধ-মোষুধ দিয়েছিল, তাও পেটে যায়নি আমার। সারাদিন ঘুমিয়েছি নাক ডাকিয়ে। মাঝে-মাঝে ওই ঘুমের মধ্যেই নাকি দু-চারবার 'সবুজ আলো', 'সবুজ আলো' বলে চেঁচিয়েছি!'

'এখন আপনার শরীর বেশ সুস্থ আছে তো?'

'হ্যাঁ। একদম আগেকার মতন।'

'তা বলে এই সক্কালবেলা হাসপাতালে এলেন কেন?'

'আমার মেয়ে যে বললে! সে খবরের কাগজে পড়েছে যে একটা সাঁওতাল ছেলে নাকি এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, সেও 'সবুজ আলো' বলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কী ভৌতিক ব্যাপার বলুন দেখি মশাই! কোথায় একটা সাঁওতাল ছেলে আর কোথায় আমি, দুজনেই ঘুমের মধ্যে একই দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে এক কথা বলে চ্যাঁচালুম? আর কী যে দুঃস্বপ্ন দেখেছি, তাও মনে করতে পারছি না ছাই!'

'আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, আমাদের এক বন্ধুও কলকাতায় ওই একইরকম চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল!

'অ্যাঁ? বলেন কী? কলকাতায়?'

'হ্যাঁ!'

প্রিয়ব্রত বলল, 'আপনারা দু'জনে এবার জিপ থেকে নামুন।'

চক্রধারীবাবু জিপ থেকে নেমে প্রিয়ব্রতর হাত চেপে ধরে বললেন, 'কলকাতার আপনাদের বন্ধু ওই একই দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, অ্যাঁ? তা আপনারা ঝাড়গ্রামে এসেছেন কেন?'

'আপনার মেয়ে যে কারণে আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে, সেই একই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছিলাম। ওই সাঁওতাল ছেলেটিকে দেখাবার জন্যই।'

'চলুন তা হলে আপনাদের সঙ্গে-সঙ্গে আমিও যাই। ভাগ্যিস আপনাদের সঙ্গে দেখা হল। আমি মশাই একলা এই হাসপাতালে ঢুকতে পারব না। কথাটা ভাবলেই আমার গা শিউরে উঠছে। চলুন স্যার—'

'নাঃ!'

'কী বললেন?'

'আপনার হাসপাতালের মধ্যে যাওয়া এখন ঠিক হবে না। আপনি বরং বাড়ি ফিরে যান।'

'কেন, এ কথা বললেন কেন? আমার মেয়ে যে বললে...যে ডাক্তার ওই সাঁওতাল ছেলেটিকে চিকিৎসে করছে, তার কাছে আমার সব কথা জানাতে। আমার মেয়ের বুদ্ধি, পড়াশুনোয় ফাস্ট হয়। সে তো এলেবেলে কথা বলবে না।'

'আপনার মেয়ে ঠিকই বলেছে। কিন্তু এর পরের ঘটনাটা তো সে জানে না। সাঁওতাল ছেলেটিকে আপনি দেখে ফেললে তার ফলও খারাপ হতে পারে!'

'ফল খারাপ হবে? তার মানে? একটা ছোট ছেলেকে দেখলে..'

বিমানের মনে পড়ল দইজুড়ি গ্রামের ঘটনাটার কথা। সাঁওতাল ছেলেটিকে দেখামাত্র স্বপন ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল! তারপর দুজনেই সবুজ আলো, সবুজ আলো বলতে-বলতে অজ্ঞান। চক্রধারী সরখেলের সঙ্গে ওদের দেখা হলেও ঠিক ওইরকমই হবে কি না কে জানে?

বিমান বলল, 'প্রিয়দা, তবু একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত না? এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলেও ওদের একই অবস্থা হয় কিনা—'

প্রিয়ব্রত বলল, 'কিন্তু যদি ওরা আবার অজ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে আমাদের আবার একটা দিন এখানে থাকতে হবে। তা ছাড়া বারবার এরকম অজ্ঞান হওয়াও তো ভালো নয় স্বাস্থ্যের পক্ষে।'

এই সময় হাসপাতালের গেট দিয়ে একজন ডাক্তার বেরিয়ে আসতে দেখে প্রিয়ব্রত এগিয়ে গিয়ে ডাকল, 'ডক্টর মৌলিক, একটু দাঁড়াবেন, দয়া করে?'

এই ডক্টর মৌলিকের অধীনেই কাল স্বপন আর সাঁওতাল ছেলেটিকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল।

ডক্টর মৌলিককে চক্রধারী সরখেলের ঘটনাটা সংক্ষেপে জানাল প্রিয়ব্রত।

সব শুনে ডক্টর মৌলিক বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ। ভেরি স্ট্রেঞ্জ! এরকম কক্ষনো শুনিনি তো! তা হলে তো পুলিশে খবর দেওয়া উচিত, তাই না?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'পুলিশ কী করবে? এর মধ্যে তো চুরি-ডাকাতি কিংবা মানুষ খুনের কোনও ব্যাপার নেই। যাই হোক, আপনি আপনার রুগীদের কেমন দেখলেন?'

'রুগি কোথায়, আজ সকালে ওরা তো সম্পূর্ণ সুস্থ। স্বপন চা খেয়েছে, আর শম্ভু মাহাতো নামে ছেলেটিকে দেওয়া হয়েছে এক গেলাস দুধ। দুজনকে রাখা হয়েছে দুটি পাশাপাশি বেডে, কিন্তু কেউ যে কাউকে চেনে এমন কোনও চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। অথচ,আপনি বললেন, কাল ওরা পরস্পরকে দেখা মাত্রই ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল।'

'সত্যিই তাই হয়েছিল। রহস্যটা আমিও বুঝতে পারছি না। যাই হোক, এখন এই চক্রধারীবাবুকে নিয়ে কী করা যায়?'

'উনি যদি হাসপাতালে ভর্তি হতে চান, আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি, ওঁর কোনও রোগ আছে কি না।'

'উনি বলছেন, উনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আমি চাই না এই ভদ্রলোকের সঙ্গে শম্ভু মাহাতো কিংবা স্বপনের দেখা হোক।'

'আমি কিন্তু চাই।'

'যদি ওরা তিনজনই আবার অজ্ঞান হয়ে যায়?'

'তা হলেও এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা কী করে ঘটছে, তা আমি নিজের চোখে দেখতে চাই। এক কাজ করুন না, বেশি লোকজনের সামনে এসব ঘটনা না ঘটাই ভালো...কাছেই আমার কোয়ার্টার্স, সেখানে আসুন। আমার ওখানে চা খাবেন, চক্রধারীবাবু থাকবেন, স্বপন আর শম্ভুকেও নিয়ে আসা হবে—'

'বারবার অজ্ঞান হলে ক্ষতি হবে না?'

'দুবারে তো কোনও ক্ষতি হয় নি দেখা যাচ্ছে। আর একটা জিনিস লক্ষ করেছেন, প্রথম বারের চেয়ে দ্বিতীয়বার ওদের জ্ঞান ফিরেছে অনেক তাড়াতাড়ি?'

'তা ঠিক।'

'তা হলে সেই ব্যবস্থাই করা যাক। ওই যে — দেখতে পাচ্ছেন তো আমার কোয়ার্টার্স? আপনারা চক্রধারীবাবুকে নিয়ে ওখানে চলে যান। আমি স্বপন আর শম্ভুকে রিলিজ করে নিয়ে আসছি এক্ষুনি।'

ডক্টর মৌলিক আবার ঢুকে গেলেন হাসপাতালে। প্রিয়ব্রত জিপটার কাছে এসে চক্রধারীবাবুকে বলল, 'চলুন!'

চক্রধারীবাবু জিগ্যেস করলেন, 'কোথায়?'

'ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার্সে। উনি আপনাকে চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন। সেখানে আপনার সবকথা ওঁকে খুলে বলবেন।'

চক্রধারীবাবু জিভ কেটে বললেন, 'এই যাঃ। আমি তো চা খাই না। ডাক্তারবাবু নেমন্তন্ন করলেন, অথচ আমি যদি চা না খাই, উনি রাগ করবেন না তো?'

'আপনি একদম চা খান না?'

'নাঃ। চা খেলে আমার অম্বল হয়। সকালবেলা আমার জিলিপি আর গরম দুধ

খাওয়া অভ্যেস। আজ এখনও কিছু খাইনি, খিদেটা বেশ পেয়েছে বটে...স্টেশনের ধারে গরম-গরম জিলিপি ভাজছিল তখন দেখেছি, কিনে নিয়ে আসব?'

'আবার অত দূরে যাবেন? ডাক্তারবাবু এখুনি এসে পড়বেন বোধহয়।'

'কতক্ষণ আর লাগবে? আপনারা গিয়ে বসুন না, আমি না হয় সাইকেল রিক্সা নিয়ে ফিরব, এই যাব আর আসব—'

যে কোনও কারণেই হোক, এই চক্রধারী সরখেলকে এখন একা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হল না প্রিয়ব্রতর। সে একটু চিন্তা করে বলল, 'থাক। জিলিপি-দুধ পরে খাবেন। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কাজটা আগে নেওয়া যাক। আপনি চা না খান, বিস্কুট খান তো? আমাদের জিপে বিস্কুট আর চীজ আছে, না রে বিমান?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'সেগুলো নামিয়ে নে। জিপটা এখানেই থাক।'

ওরা গিয়ে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার্সের সামনে দাঁড়াতেই হাসপাতাল থেকে একজন আর্দালি এসে বলল—'ডাক্তার সাব আপনাদের ভিতরে বসতে বলেছেন। উনি একটি পরে আসছেন।'

আর্দালি চাবি খুলে দিল। সামনেই একটা বসবার ঘর। একটা টেবিলের চারপাশে সাত-আটখানা চেয়ার। দেয়ালে নানান ওষুধ কোম্পানির ক্যালেণ্ডার এক দেয়ালে ব্যারোমিটার। এই কোয়ার্টার্সে ডক্টর মৌলিক একাই থাকেন মনে হল।

চক্রধারীবাবু চীজের গন্ধ শুঁকে বললেন, 'এতে যে মশাই পচা দুধের গন্ধ! এ আমি খাব না। দিন, ক'খানা বিস্কুটই শুধু খাই।'

অন্যমনস্কভাবে প্রায় সাত-আটখানা বিস্কুট খেয়ে নিয়ে তিনি ঘরের কোণার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওটা?'

প্রিয়ব্রত বললো, 'ওটা একটা ওজনের যন্ত্র।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছিল। তা হলে নিজেকে একটু ওজন করে দেখা যাক। অনেকদিন ওজন নিইনি।'

ওজন যন্ত্রটার ওপর উঠে দাঁড়িয়েই তিনি যেন একেবারে আঁতকে উঠলেন। ব্যাকুলভাবে বললেন, 'এ কী! আমার যে একেবারে মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে!'

প্রিয়ব্রত চমকে উঠে জিগ্যেস করল, 'কী হল?'

'আর মশাই, সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! গত মাসে আমার ওজন ছিল নব্বুই কিলো, এখন দেখছি মোটে পঁচাত্তর। একমাসে পনেরো কিলো কমে গেল! এ কী সর্বনেশে কথা!'

বিমান হাসতে-হাসতে বললো, 'তা ওজন কমা তো ভালোই আপনার পক্ষে, এখনও আপনার যে চেহারা!'

'তা বলে একমাসে পনেরো কিলো কমবে? এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে? সেই জন্যই শরীরটা দুর্বল লাগছে কাল থেকে।'

'আপনি খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন নাকি?'

'মোটেও না। খাওয়া-দাওয়াই যদি কম করব, তা হলে আর রোজগার করা কেন?

তা হলে টাকা-পয়সার কী দরকার? আমার কী হল বলুন তো? দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে ওঠা, তারপর এত ওজন কম...এরকম আগে কক্ষনো হয়নি।

প্রিয়ব্রত বললো, 'আহা, আগেই এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? হয়তো এই ওজনের যন্ত্রটা খারাপ, কিংবা একমাস আগে যেখানে ওজন নিয়েছিলেন সেটা খারাপ ছিল...'

'সেটা অনেক বড় যন্ত্র...মাল পত্তর চাপাবার জন্যে...'

'বুঝেছি। তবু দুটোর যে কোনও একটা খারাপ হতে পারে...আপনার চেহারা দেখে মোটেই দুর্বল মনে হচ্ছে না।'

মুখখানা বেজার করে চক্রধারীবাবু এসে চেয়ারে বসলেন, তারপর বললেন, 'স্টেশনের সামনে গরম-গরম জিলিপি...কিনে আনলেই হতো। বিস্কুটে কি খিদে মরে? দিন তো আর ক-খানা...'

একটু পরেই বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

প্রথমে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল স্বপন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই সে বলল, 'প্রিয়দা তোমার জিপটা হাসপাতালের সামনে রেখে এসেছ কেন?'

ডক্টর মৌলিক শম্ভুর হাত ধরে ছিলেন. তিনি তাকে দরজার সামনে এগিয়ে দিলেন।

শম্ভু আমাদের দেখবার আগেই তার চোখ পড়ল চক্রধারীবাবুর দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'সবুজ বাত্তি! সবুজ বাত্তি!'

স্বপনও চক্রধারীবাবুকে দেখতে পেয়ে একইভাবে চিৎকার করে উঠল, 'সবুজ আলো! সবুজ আলো!'

তারপর স্বপন আর শম্ভু দুজনেই চক্রধারীবাবুর দিকে ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ওই একই কথা বলতে লাগল ব্যাকুল ভাবে।

চক্রধারীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিব্রতভাবে বললেন, 'আরে, আরে, এ কী ব্যাপার! চোখ দুটো এমন করছে কেন! পাগল নাকি!'

স্বপন আর শম্ভু অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগেই প্রিয়ব্রত আর ডক্টর মৌলিক এসে ধরে ফেললেন ওদের।

বিমান অবাক হয়ে চেয়ে রইল চক্রধারীবাবুর দিকে। উনি অজ্ঞানও হননি, সবুজ আলো বলে চেঁচিয়েও ওঠেননি!

সকলেই এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল যে বেশ কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনও কথা বলতে পারল না।

তারপর স্বপন আর শম্ভুকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল পাশের ঘরে। বিমান উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'ওদের এক্ষনি আবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত নয় কি?'

ডক্টর মৌলিক বললেন, 'না, তার দরকার হবে না। কাল থেকে আমি ওদের অবজার্ভ করছি। শুধু অজ্ঞান হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও কমপ্লিকেশান নেই।'

চক্রধারীবাবু ধপ্ করে বসে পড়ে বললেন, 'কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! ছেলে দুটোর মির্গী রোগ আছে নাকি রে বাবা? ঘরে ঢুকেই অজ্ঞান হয়ে গেল? আর আমার দিকেই বা অমন করে ছুটে এল কেন?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'মনে হচ্ছে, ওরা আপনাকে চিনতে পেরেছে।'

চক্রধারীবাবু চোখদুটো প্রায় কপালে তুলে বললেন, 'আমাকে? ওরা আমাকে চিনবে কী করে? আমি তো জন্মে ওদের কখনো দেখিনি?'

'তা হলে ওরা আপনার দিকে ছুটে এলো কেন? অচেনা লোকের দিকে কেউ অমন ভাবে ছুটে আসে?'

'আমিও তো সেই কথাই জিগ্যেস করছি!'

'আপনিও ঘুমের ঘোরে সবুজ আলো বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ওরাও সবুজ আলো, সবুজ আলো চিৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে গেল। এই দিক থেকেও আপনার সঙ্গে ওদের মিল আছে।'

'এই সবুজ আলোর ব্যাপারটাই তো আমি বুঝতে পারছি না মোশাই। আলো আবার সবুজ রঙের হয় না কি?'

'কেন হবে না? সব রঙেরই আলো হয়। চক্রধারীবাবু, আপনি খুব, ভালো করে মনে করে দেখুন তো, আপনি যে বললেন মাঝরাস্তায় ট্রাক থামিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তারপর চোখে একবার তীব্র আলো পড়ায় জেগে উঠেছিলেন, সেই আলোর রং কি সবুজ ছিল?'

'আপনি যখন বলছেন, হতেও পারে।'

'হতেও পারেটারে ছাড়ুন। আমি জানতে চাই সেটা সত্যি-সত্যি অদ্ভুত ধরনের কোনও সবুজ আলো ছিল কি না।'

'সেটা আমার ভালো মনে নেই। অনেকটা যেন স্বপ্নের মতন...'

এই সময় ডক্টর মৌলিক পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে বললেন, ওদের দুজনেরই চোখে-পাতা মাঝে-মাঝে কেঁপে উঠছে। খুব সম্ভব তাড়াতাড়িই জ্ঞান ফিরে আসবে।

বিমান বলল, 'ওরা জেগে উঠে চক্রধারীবাবুকে দেখে যদি আবার অজ্ঞান হয়ে যায়?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'না, না, সে ঝুঁকি নেওয়া আর ঠিক হবে না। বারবার এরকম জ্ঞান হারানো মোটেই ভালো নয়। তাই না ডক্টর মৌলিক?'

চক্রধারীবাবু বললেন, 'আমি কি তা হলে বাড়ি ফিরে যাব? আমার তা হলে কোন চিকিৎসার দরকার নেই তো?'

ডক্টর মৌলিক বললেন, 'আপনার তো কোনও অসুখ নেই, তা হলে আর চিকিৎসা হবে কেন?'

চক্রধারীবাবু বললেন, 'বাঁচালেন ডাক্তারবাবু বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার মেয়েকে সেই কথাই বলব। কী সব ভুতুড়ে ব্যাপার রে বাবা! আমি ঘুমের ঘোরে সবুজ আলো বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। এখানে দুটো ছেলেও সেই সবুজ আলো, বলতে-বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল!'

বিমান বলল, 'আপনি কিন্তু অজ্ঞান হননি!'

চক্রধারীবাবু রীতিমতন অবাক হয়ে বললেন, 'আমি অজ্ঞান হব কেন? জলজ্যান্ত

সুস্থ লোক...আমার কোনও দিন মাথা ঘোরে না, বুক ধড়ফড় করে না, আমি কেন অজ্ঞান হব?'

বিমান বলল, 'আমাদের স্বপন যখন ওই শম্ভু ছেলেটাকে দেখে, তখন ওরা দুজনেই সবুজ আলো সবুজ আলো করে চেঁচিয়ে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আবার আজ একটু আগে স্বপন আর শম্ভু দুজনেই এই চক্রধারীবাবুকে দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল। কিন্তু চক্রধারীবাবুর কিছু হল না। অথচ, উনিও সুবজ আলোর লোক!'

চক্রধারীবাবু বললেন, 'আমি সবুজ আলোর লোক কি মশাই! আমি ট্রাক চালাই। কারুর ব্যাপারে মাথা গলাই না। আমি কোনও লাল বা সবুজ আলোর লোক নই!'

এই সময় স্বপন দুটো ঘরের দরজার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। এর মধ্যেই তার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

চক্রধারীবাবু বেশ খানিকটা যেন ভয়ে-ভয়েই তাকিয়ে রইলেন স্বপনের দিকে।

স্বপন এবার আর চেঁচিয়েও উঠল না, চক্রধারীবাবুকে চিনতেও পারল না।

সে বিমানের কাছে এসে বসল, 'তোরা এই ঘরে বসে গল্প করছিস, আর আমাকে পাশের ঘরে শুইয়ে রেখেছিলি কেন রে?'

বিমান বললো, 'তুই যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি?'

স্বপন বলল, 'আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম! কেন?'

প্রিয়ব্রত পেছন থেকে ইঙ্গিত করছে, যাতে বিমান স্বপনকে এইসব কথা এক্ষুনি না বলে দেয়।

কিন্তু বিমান তার ইশারা দেখতে পেল না। সে আবার স্বপনকে বলল, 'তুই আর শম্ভু এই ভদ্রলোককে দেখামাত্র কেমন যেন হয়ে গেলি। ''সবুজ আলো'' 'সবুজ আলো'' বলে চেঁচিয়ে ছুটে এঁকে জড়িয়ে ধরেই অজ্ঞান হয়ে গেলি!'

স্বপন চক্রধারীবাবুকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে দেখল! তারপর ভুরু কুঁচকে বললো, 'এই ভদ্রলোক কে? আগে তো এঁকে কখনও দেখিনি।'

চক্রধারীবাবু যেন অনেকখানি স্বস্তি পেয়ে বললেন, 'দেখলেন তো আপনারা, আমি ঠিকই বলেছিলুম! আমিও এই ছেলেটিকে চর্মচক্ষে কোনওদিন দেখিনি।'

ডক্টর মৌলিক বললেন, 'ব্যাপারটা যে ক্রমশ আরও দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে প্রিয়ব্রতবাবু। যাই, শম্ভু ছেলেটার কী হল দেখি?'

তিনি পাশের ঘরে গিয়ে দেখলেন শম্ভুর জ্ঞান ফিরে এসেছে, সে খাটের ওপর বসে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

এর আগে স্বপন আর শম্ভু দুজনেই অনেক বেশি সময় অজ্ঞান হয়েছিল। এবার ওদের জ্ঞান ফিরে এসেছে বড়জোর দশ মিনিটের মধ্যে।

এ ঘরে এসে শম্ভুও চক্রধারীবাবুকে চিনতে পারল না।

সে কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলল, 'হামারা ভুখ লেগেছে। হামি ঘরকে যাবে।' চক্রধারীবাবু বললেন, 'জিলিপি খাবে? স্টেশনের ধারে খুব গরম-গরম জিলিপি ভাজতে দেখেছি। দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি।'

ডক্টর মৌলিক বললেন, 'না, না, আপনাকে যেতে হবে না। আমার আর্দালিই আনিয়ে দেবে।'

কিন্তু চক্রধারীবাবু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে গেছেন। পেছন না ফিরেই বললেন, 'আমি যাব আর আসব। আপনারা ততক্ষণ কথা বলুন না। আমারও খুব খিদে পেয়েছে কি না।'

প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ডক্টর মৌলিক ততক্ষণ শম্ভুকে এক কাপ দুধ আর দু'খানা বিস্কুট খেতে দিলেন। স্বপন কিছুই খেল না, কারণ ও দুধ আর বিস্কুট এই দুটো জিনিসই খুব অপছন্দ করে। তা ছাড়া তার খিদেও পায়নি।

বিমান শম্ভুকে দেখিয়ে স্বপনকে জিগ্যেস করল 'হ্যাঁ রে স্বপন তুই এই ছেলেটাকে আগে দেখেছিস কখনো?'

স্বপন বললো, 'ও-ই তো পাশের ঘরে আমার পাশে খাটে শুয়ে ছিল। কে এই ছেলেটা? ওকে আগে আমি কখনো দেখিইনি।'

'সে কী রে! আমরা দইজুড়ি গ্রামের দিকে গিয়েছিলাম, সেখানে রাস্তায় এই ছেলেটার সঙ্গে তোর দেখা হল, তুই ওকে দেখে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলি! সেসব কথা তোর মনে নেই?

স্বপন বলল, 'পাগলের মতন কীসব বকছিস? আমি ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরব কেন?'

প্রিয়ব্রত আর বিমান চোখাচোখি করল।

প্রিয়ব্রত এবার শম্ভুকে জিগ্যেস করল, 'শম্ভু ভাইয়া, তুম্ এহি দাদাকো আগাড়ি কভি দেখা?'

শম্ভু বেশ বাংলা জানে। সে বললো, 'না দেখি নাই তো।'

'আচ্ছা শম্ভু, তুমি সবুজ বাত্তি দেখেছ কোথাও?'

শম্ভু দুদিকে মাথা নাড়ল।

বিমান হঠাৎ খুব বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'দুর ছাই! এ ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। যাই হোক গে, স্বপন আর শম্ভু তো ভালো হয়ে গেছে, চলো, প্রিয়দা এবার কলকাতায় ফিরে যাই।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সেই ভালো।'

এই সময় ডক্টর মৌলিক বললেন, 'আমাদের চক্রধারীবাবু কোথায় গেলেন বলুন তো প্রিয়ব্রতবাবু? এখনও তো ফিরলেন না জিলিপি নিয়ে?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'তাই তো, প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেল। উনি কি এক ঝাঁকা জিলিপি আনছেন নাকি?'

ডক্টর মৌলিক বললেন, 'কিন্তু আমি তো আর ওঁর জন্যে বসে থাকতে পারছি না। আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে। আপনারা বরং আসুন...'

প্রিয়ব্রত বলল, 'না, না আমরাও আর বসতে চাই না। আমরাও বরং স্টেশনের

দিকে এগোই। চক্রধারীবাবুর কাছ থেকে ওখানেই বিদায় নেব। তারপর শম্ভুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমরা জিপ নিয়ে ফিরব কলকাতার দিকে।'

এর পরও ডাক্তারবাবুর অনুরোধে মিনিট দশেক অপেক্ষা করল ওরা। কিন্তু চক্রধারীবাবু তখনও ফিরলেন না দেখে ডাক্তারবাবুকে হাসপাতালের কাছে ছেড়ে দিয়ে ওরা জিপটা নিয়ে চলে এল স্টেশনের কাছে। পথে চক্রধারীবাবুর দেখা পাওয়া গেল না। জিলিপির দোকানেও তিনি নেই। দোকানদারের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল, ওইরকম চেহারার কোনও লোক তার কাছ থেকে আধঘণ্টার মধ্যে জিলিপি কিনতে আসে নি।

প্রিয়ব্রতর ভুরুদুটো কুঁচকে উঠল। ডক্টর মৌলিকের কোয়ার্টার্স থেকে জিলিপির দোকানটা আর কতটাই বা পথ! এর মধ্যে ভদ্রলোক কোথায় উধাও হয়ে গেলেন? নাকি ইচ্ছে করেই চলে গেলেন অন্য কোথাও?

স্টেশনের কাছে পৌঁছে ঠিক হল শম্ভু মাহাতোকে আগে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসা হবে। সবাইকে জিপে তুলে স্টার্ট দিল প্রিয়ব্রত।

খানিকটা যাওয়ার পর স্বপন জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, প্রিয়দা, আমরা এখানে কবে এসেছি?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'ত' দুদিন কেটে গেছে।'

বিমান বলল, 'এর মধ্যে এত কিছু ঘটে গেল যে মনে হচ্ছে যেন অনেকগুলো দিন কেটে গেছে।'

স্বপন জিগ্যেস করল, 'কী কী ঘটনা ঘটেছে রে?'

বিমান বলল, 'সবই তো তোকে নিয়ে।'

'আমাকে নিয়ে? তার মানে?'

প্রিয়ব্রত গম্ভীরভাবে বলল, 'ওসব কথা এখন থাক। কলকাতায় গিয়ে হবে।'

দইজুড়ি গ্রামে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না।

শম্ভু মাহাতোর বাবা লুকা মাহাতো বেশ একজন ভারিক্কি ধরনের লোক। লম্বা, পেটানো চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। তিনি তখন হাসপাতালে যাওয়ার জন্য বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

জিপ থেকে নেমেই শম্ভু ছুটে বাবার কাছে চলে গেল। লুকা মাহাতো কপালের ওপর হাত রেখে রোদ আড়াল করে ভালো করে দেখলেন গাড়িটা, তারপর কাছে এগিয়ে এসে জিগ্যেস করলেন, 'আপলোগ কেয়া পুলিশ হ্যাঁয়?'

প্রিয়ব্রতর লাল রঙের জিপটা দেখে অনেকেই একথা মনে করে।

প্রিয়ব্রত মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, আমরা কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি।'

লুকা মাহাতো এবার জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো? হামার লেড়কাটাকে আপনারা লিয়ে চইলে গেলেন...'

প্রিয়ব্রত বলল, 'আপনার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাই ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'হাঁ, হাঁ, বিমারি তো হয়েই ছিল, তা আপনারা কেন লিয়ে গেলেন?'

'আমাদের এজনেরও তো ওই একই বিমারি। সেইজন্য তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করবার জন্য...'

'ইতো বড়া আজীব বিমারি! সবুজ বাত্তি, সবুজ বাত্তি বলে চিল্লাতে থাকে, তারপর ব্যস! আর লড়ে না চড়ে না। ইটা কী বিমারি রে?

'ব্যাপারটা তো আমরাও বুঝতে পারছি না। তবে, আপনার ছেলেকে এখন থেকে একটু সাবধানে রাখবেন। দেখবেন, ও যেন রাত্রে একা বের না হয়। আচ্ছা, আমরা এখন তা হলে চলি।'

প্রিয়ব্রত আবার স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরাল।

বিমান বলল, 'প্রিয়দা, আমরা একদিনের মধ্যে ফিরব বলে এসেছিলুম, বাড়িতে নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে।'

স্বপন বলল, 'আমার কিন্তু বেড়াতে খুব ভালো লাগছে। এদিকে আর দু-একটা জায়গা ঘুরে গেলে হয় না?'

বিমান বলল, 'খুব মজা না? কলেজ খুলে গেছে, মনে নেই?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে একবার গালুডি ঘুরে যাওয়া দরকার। চক্রধারীবাবু কোথায় হাওয়া হয়ে গেলেন? আমার ভাই খটকা লাগছে।'

বিমান বলল, 'না, প্রিয়দা, আর দেরি করা সম্ভব নয়। বাবা রাগ করবেন।'

'তুই তা হলে এক কাজ কর, বিমান। তুই আর স্বপন ফিরে যা, তোদের আমি ট্রেনে তুলে দিচ্ছি।'

স্বপন বলল, 'কী বললে, প্রিয়দা? আমরা ফিরে যাব?'

'হ্যাঁ, সেটাই তো ভালো।'

'কথাটা তুমি বলতে পারলে!'

'তোদের কলেজ খুলে গেছে, তোরা কলকাতায় ফিরে যা। আমি ব্যাপারটা আরও একটু ভালো করে দেখে যেতে চাই।'

'তুমি একলা-একলা মজা করবে, আর আমরা কলকাতায় গিয়ে কলেজ করব?'

'এর মধ্যে আবার মজার কী আছে?'

বিমান মুখ গোঁজ করে বসে আছে, সে আর কোনও কথাই বলছে না। বোঝাই যায়, সে রেগে গেছে খুব। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'চক্রধারীবাবুর বাড়িতে গিয়ে কি লাভ হবে? উনি বলবেন, আমার ইচ্ছে হয়েছে, তাই চলে এসেছি।'

'তা বলে আমাদের কিছু না বলে এভাবে চলে যাবেন?'

'কতক্ষণ লাগে গালুডি যেতে?'

'খুব বেশি দূর তো নয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব।'

'তা হলে চল, আমরা সবাই মিলে সেখানে যাই। চক্রধারীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে আর কতক্ষণ লাগবে? তারপর আমরা সবাই একসঙ্গে কলকাতায় ফিরব।'

'কিন্তু যদি কোনও কারণে দেরি হয়ে যায়? আমরা আরও অন্যদিকে চলে যাচ্ছি তো। হয়তো আজ রাতের মধ্যে কলকাতায় ফেরাই হবে না! সেইজন্যই বলছি, তোরা বরং ট্রেনে চেপে ফিরে যা।'

স্বপন বলে উঠল, 'না, তা কিছুতেই হবে না।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'তা হলে এক কাজ করে নেওয়া যাক। আগে তোদের কারুর একজনের বাড়িতে একটা ট্রাঙ্কল কিংবা টেলিগ্রাম পাঠানো যাক। দায়িত্ব তো আমাকেই নিতে হবে।'

ঝাড়গ্রাম স্টেশনের কাছে আবার ফিরে এল সবাই। এবার ভাগ্য ভালো। পোস্ট-অফিস থেকে কলকাতায় লাইন পাওয়া গেল। বিমানের বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বলল প্রিয়ব্রত। তারপর স্বপন আর বিমান যে ভালো আছে সে কথা বোঝাবার জন্যে ওরাও টেলিফোনে কথা বলল একটু করে।

টেলিফোন করার পর একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আর এক কাপ করে চা খেয়ে নিয়ে এবার ওরা ছুটল গালুডির দিকে।

এর আগে ওরা স্টেশন থেকে খবর নিয়ে এসেছে যে ইতিমধ্যে একখানা ট্রেন গেছে গালুডির দিকে। তা ছাড়া বাসেও যাওয়া যায় অবশ্য। অর্থাৎ চক্রধারীবাবুর এর মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার কথা।

গালুডি পৌঁছে চক্রধারীবাবুর বাড়ি খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধেই হল না। ছোট জায়গা, সবাই সবাইকে চেনে। তা ছাড়া, চক্রধারীবাবুর যখন ট্রাকের ব্যবসা, তখন পেট্রোল পাম্পের লোকেরা চিনবেই।

জিপ গাড়িতে পেট্রল ভরে নেওয়ার জন্য ওরা সেখানে ঢুকে পড়ল। যে ছেলেটি পেট্রল দেয়, তাকে চক্রধারীবাবুর নাম বলতেই সে হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ওই যে মাঠের ওধারে ছোট্ট সাদা কুঠিটা দেখছেন, ওটাই।'

চক্রধারীবাবু নিজের বাড়ির যে-রকম বর্ণনা দিয়েছিলেন, বাড়িটা সেইরকমই সামনে একটা ছোট্ট বাগান, সেখানে অনেকগুলো পুরোনো লরি-টরি পড়ে আছে।

গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একজন বুড়ো মতন লোক বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করল, 'কৌন?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'চক্রধারীবাবু হ্যাঁয়?'

বুড়ো কোনও উত্তর না দিয়ে চলে গেল ভেতরে। এরপর বেরিয়ে এল একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে।

সে জিগ্যেস করল, 'আপনারা কাকে চান? কোথা থেকে আসছেন?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'আমরা আসছি ঝাড়গ্রাম থেকে। একবার চক্রধারীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

প্রিয়ব্রত আশা করেছিল, এবার মেয়েটি বলবে, উনি তো ঝাড়গ্রামেই গেছেন, কিংবা উনি তো ঝাড়গ্রাম থেকে এইমাত্র ফিরলেন।

কিন্তু মেয়েটি সে কথা বলল, না, একটুও অবাকও হল না। সে বলল, 'উনি তো ঘুমোচ্ছেন।'

ঘড়িতে বাজে সকাল সাড়ে এগারোটা। এসময় কোনও মানুষের ঘুমোবার কথা নয়। চক্রধারীবাবু কি ঝাড়গ্রাম থেকে এসেই ঘুমিয়ে পড়লেন?

প্রিয়ব্রত বলল, 'একটু বিশেষ দরকার আছে। ওঁকে ডাকা যায় না?'

মেয়েটি বলল, 'তা হয়তো যায়। কিন্তু সাড়া কি পাওয়া যাবে? উনি তো দুদিন ধরেই একটানা ঘুমোচ্ছেন।'

বিমান চমকে উঠে বলে উঠল, 'দুদিন ধরে?'

বিমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রিয়ব্রত তার হাত চেপে ধরে বললো, 'তাই নাকি? কেন, ওঁর কি কোনও অসুখ করেছে?'

মেয়েটি বলল, তা তো বুঝতে পারছি না। কেন যেন দু-দিন ধরে ঘুমিয়েই রয়েছেন।'

'জাগাবার চেষ্টা করেননি?'

'হ্যাঁ, ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন বটে, চোখ মেলে চাইছেনও। আবার ঘুমিয়ে পড়ছেন।'

প্রিয়ব্রত দুএক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনি চক্রধারীবাবুর মেয়ে নিশ্চয়ই?'

মেয়েটি ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা জানলেন কী করে?'

বিমান আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রিয়ব্রত তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'ওঁকে আমরা চিনি তো, ওঁর মুখ থেকেই আপনার কথা শুনেছি। যদি কিছু মনে না করেন, আমরা একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ, আসুন না।'

মেয়েটি ওদের নিয়ে গেল ভেতরের একটি ঘরে। পুরোনো আমলের একটা বড় খাটে শুয়ে আছেন চক্রধারীবাবু। সকালবেলা ওঁকে যে পোশাকে ঝাড়গ্রামে দেখা গিয়েছিল, অবিকল সেই পোশাক।

বিমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি দারুণ মিথ্যেবাদী তো। বলে কিনা দু'দিন ধরে একটানা ঘুমোচ্ছে—তাহলে সকালে দেখা হল কার সঙ্গে?

প্রিয়ব্রত এগিয়ে গিয়ে চক্রধারীবাবুর শিয়রের কাছে দাঁড়াল।

বিমান আর স্বপন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, প্রিয়ব্রত হাতছানি দিয়ে বলল, 'স্বপন, তুই আমার কাছে আয় তো।'

স্বপন কাছে আসতেই প্রিয়ব্রত ফিসফিস করে ডাকল, 'চক্রধারীবাবু, ও চক্রধারীবাবু।'

কোনও সাড়া নেই।

দু তিনবার ডেকেও যখন কোনও ফল হল না, তখন প্রিয়ব্রত ওঁর গায়ে হাত দিয়ে একটু ঠেলল। সঙ্গে-সঙ্গে উনি চোখ মেললেন। মুখ ঘুরিয়ে প্রথম দেখলেন প্রিয়ব্রতকে। তারপর স্বপনের দিকে চোখ পড়তেই উনি আস্তে-আস্তে উঠে বসলেন, তারপর দুহাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'সবুজ আলো! সবুজ আলো!'

সে চিৎকার শুনে স্বপন পিছিয়ে গেল কয়েক পা। উত্তরে সে কিন্তু সবুজ আলো বলে চেঁচাল না। বরং চক্রধারীবাবু স্বপনকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে উঠে আসতেই স্বপন যেন খানিকটা ভয় পেয়েই দৌড় দিল।

প্রিয়ব্রত কড়া গলায় বলে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছেন?' বলেই চক্রধারীবাবুর হাতটা চেপে ধরল।

অমনি একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেলে।

প্রচন্ড বিদ্যুতের শক লাগলে যেমন হয় তেমনি কেঁপে উঠল প্রিয়ব্রতর সমস্ত শরীরটা। যে যন্ত্রণায় গোঁ-গোঁ শব্দ করে দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দারুণ কর্কশ গলায় 'সবুজ আলো', 'সবুজ আলো' বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে চক্রধারীবাবু দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন স্বপনের দিকে।

স্বপনের মুখখানা ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। সে 'না' 'না' বলে চেঁচিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই সমস্ত ঘটনা ঘটে যাওয়ায় বিমান প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। স্বপন কেন অত ভয় পাচ্ছে, সে বুঝতে পারল না। প্রিয়দাই বা কেন পড়ে গেল মাটিতে? চক্রধারীবাবুরই বা ওরকম করার কারণ কী? সে স্বপনকে সাহায্য করবার জন্যে বাইরে যাবে, না প্রিয়দাকে আগে দেখবে?

প্রিয়ব্রত মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়াচ্ছে আর গোঁ গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে। হঠাৎ তার শরীরটা থেমে দেল, মুখের আওয়াজও বন্ধ হল।

বিমান তক্ষুনি প্রিয়ব্রতর পাশে বসে পড়ে ব্যাকুলভাবে ডাকল, 'প্রিয়দা! প্রিয়দা!'

কোনও সাড়া নেই!

চক্রধারীবাবুর মেয়ে সীতা এইসব দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমান বলল, 'জল! শিগগির একটু জল নিয়ে এসো।'

সেই ঘরেই একটা জলের কলসি ছিল। সীতা তার থেকে জল গড়াতে লাগল।

প্রিয়ব্রতর শরীরটা এমনই নিস্পন্দ হয়ে গেছে যে, বিমানের একবার মনে হল, প্রিয়দা মরে যায়নি তো? চক্রধারীবাবুকে ছোঁয়ামাত্র এরকমটা হলই বা কেন?

বিমান প্রিয়ব্রতর শরীরটাকে চিৎ করে তার বুকে মাথা কান ছোঁয়াল। হ্যাঁ, একটু দুপ-দুপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখল, নিশ্বাসও পড়ছে একটু-একটু।

সীতা এক ঘটি জল নিয়ে আসতেই বিমান সেই জল সবটা ছিটিয়ে দিতে লাগল প্রিয়ব্রতর চোখেমুখে। কয়েকবার ঝাপটা লাগাবার পর প্রিয়ব্রতর চোখ দুটো পিট-পিট করে উঠল একবার।

বিমান ব্যাকুলভাবে ডাকল, 'প্রিয়দা, প্রিয়দা!'

এবার প্রিয়ব্রত ভালোভাবে তাকিয়ে বলল, 'ভয় নেই, আমি ঠিক আছি।'

বিমান জিগ্যেস করল, 'তোমার কী হয়েছিল? চক্রধারীবাবু তোমায় কী করলেন?'

সীতা প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'আমার বাবা এরকম করছেন কেন? আপনারা কে? কোথা থেকে আসছেন?'

প্রিযব্রত ধড়মড় করে উঠে বসে সীতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই লোকটা তোমার বাবা নয়।'

তারপর বিমানকে জিগ্যেস করল, 'স্বপন কোথায়?'

বিমান বলল, 'স্বপন বাইরে পালিয়েছে। চক্রধারীবাবু ওকে তাড়া করে গেছেন।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'ওই লোকটা কিছুতেই চক্রধারীবাবু হতে পারেন না। নিশ্চয়ই অন্য কেউ। শিগগির চল। স্বপনকে বাঁচাতে হবে।'

সকলে হুড়মুড়িয়ে চলে এল ঘরের বাইরে।

বাড়িটার সামনের মাঠে তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার চলছে।

চক্রধারীবাবু স্বপনকে ধরবার জন্য তাড়া করে চলেছেন আর স্বপন গোল হয়ে ঘুরছে। চক্রধারীবাবুর হাত দুটো একরকম ভাবে সামনে বাড়ানো। কানামাছি খেলার সময় চোখ-বাঁধা ছেলেরা সামনে দুহাত বাড়িয়ে যেমন ছোটে, ঠিক সেইরকম দেখাচ্ছে।

প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে বলল, 'স্বপন, সাবধান! দেখিস, তোকে যেন কিছুতেই ধরতে না পারে!'

সীতা কয়েক পা এগিয়ে যেতে-যেতে বলল, 'বাবা, তোমার কী হয়েছে? তুমি ওরকম করছ কেন?'

প্রিয়ব্রত চট্ করে সীতার হাত ধরে টেনে এনে বলল, 'খবরদার, ওকে ছুঁয়ো না। বললুম না, ওই লোকটা তোমার বাবা নয়।'

সীতা বলল, 'আমার বাবা নয়? তা হলে ও কে? আমার বাবা তবে কোথায় গেল?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সবকথা এখন বুঝিয়ে বলার সময় নেই। পরে বলবো। ওই লোকটা স্বপনকে ধরে ফেললেই খুব বিপদ হবে! হ্যাঁ শোনো, তোমাদের বাড়িতে বাঁশের লাঠি আছে?'

গোলমাল শুনে এর মধ্যে সীতার মা আর সেই বুড়ো লোকটিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন বাড়ির বাইরে। সীতার মা বললেন, 'অ সীতা, এসব কী কাণ্ড হচ্ছে? উনি অমন করছেন কেন?'

সীতা কিছু বলবার আগেই প্রিয়ব্রত প্রায় ধমক দিয়ে বলল, 'লাঠি আনতে বললুম না! লাঠি কই?'

সীতা দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

চক্রধারীবাবুর মতন দেখতে লোকটা তখনও ছুটছে আর স্বপন কিত কিত খেলার কায়দায় একবার এদিকে আর একবার ওদিকে পালাচ্ছে।

সীতা এই সময় একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে এল।

প্রিয়ব্রত বলল, 'না, এতে হবে না। বাঁশের লাঠি নেই?'

বুড়ো লোকটি বলল, 'লাঠি? ও সীতা, আমার লাঠিটা এনে দে।'

সীতা এবার নিয়ে এল একটা তেলচকচকে বাঁশের লাঠি।

প্রিয়ব্রত সেটা হাতে বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেল চক্রধারীবাবুর মতন দেখতে লোকটার দিকে।

সীতাও তার সঙ্গে-সঙ্গে এসে বলল, 'একী, আপনি আমার বাবাকে মারবেন নাকি?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'বললুম তো, ওই লোকটা তোমার বাবা নয়!'

সীতা বলল, 'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করব কেন? আমার বাবাকে আমি চিনি না? বাবা হঠাৎ অদ্ভুত মতন ব্যবহার করছে বলেই আপনি তাকে লাঠি দিয়ে মারবেন?'

বিমানও এগিয়ে এসেছে প্রিয়ব্রতর পাশে-পাশে। প্রিয়ব্রত তাকে বলল, 'বিমান, এই মেয়েটিকে ধরে থাক, দেখিস যেন এগোতে না পারে। তোরা দুজনেই দূরে থাকবি, কোনওমতেই যেন ওই লোকটার সঙ্গে তোদের ছোঁয়া না লাগে!'

বিমান সীতার একটা হাত চেপে ধরতেই সে জোড় করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে-করতে বলল, 'ছেড়ে দিন। আমায় ছেড়ে দিন। আপনারা কে? কেন আমার বাবাকে মারছেন?'

বিমান বলল, 'ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় নেই। আমরা তোমার কিংবা চক্রধারীবাবুর শত্রু নই। আমরা এসেছি কলকাতা থেকে। এখানে ভয়ংকর কিছু কাণ্ড চলছে। প্রিয়দা পরে সব বুঝিয়ে বলবে।'

প্রিয়ব্রত লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে চক্রধারীবাবুর মতন লোকটির দিকে এগিয়ে গেল এক পা-এক পা করে। প্রিয়ব্রতকে দেখে সাহস পেয়ে স্বপন তার পাশে এসে দাঁড়াল।

লোকটা তখনও হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে স্বপনের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল 'সবুজ আলো! সবুজ আলো!'

প্রিয়ব্রত জিগ্যেস করল, 'আপনি কে?'

লোকটা সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সোজা এগিয়ে আসতে লাগল। স্বপনের দিকে।

প্রিয়ব্রত বলল, 'কে আপনি? কেন ওকে ধরতে চাইছেন? ওকে আপনি কিছুতেই ধরতে পারবেন না।'

লোকটা সে কথা গ্রাহ্যই করল না।

তখন প্রিয়ব্রত হাতের লাঠিটা ঘুরিয়ে খুব জোড়ে মারল লোকটার পায়।

সেই মার খেয়ে লোকটা লাফিয়ে উঠল। এত উঁচুতে লাফিয়ে উঠল সে যা কোনও মানুষের পক্ষে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

প্রিয়ব্রত তখন স্বপনকে ঠেলে দিয়ে বললে, 'তুই সরে যা! লোকটাকে আমি ঠান্ডা করছি। ওই বাড়ির মধ্যে পালিয়ে যা তুই।'

লোকটা মাটিতে নেমে এবার প্রিয়ব্রতর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

প্রিয়ব্রত বলল, 'এখনও বলুন আপনি কে? কী চান এখানে?'

লোকটার চোখে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলে উঠল। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'সবুজ আলো!'

প্রিয়ব্রতর মনে হল, সে ওই কথা দুটো ছাড়া আর কোনও কথা জানে না।

লোকটা এইবার প্রিয়ব্রতর দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

প্রিয়ব্রত বলল, 'সাবধান, আমাকে ধরবার চেষ্টা করবেন না। আমি জানি, আপনার শরীরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আছে।'

লোকটা তবু এগিয়ে এল ওকে ধরতে।

প্রিয়ব্রতর এবার লাঠিটা ঘুরিয়ে মারতে গেল লোকটার কাঁধে। কিন্তু ওর গায়ে লাগবার আগেই লোকটা হাত বাড়িয়ে ধারে ফেলল লাঠিটা। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল সেটা। অসম্ভব শক্তি লোকটার গায়ে। সেই টানের চোটে প্রিয়ব্রত আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিল হুমড়ি খেয়ে।

লোকটা কিন্তু লাঠিটা নিয়ে প্রিয়ব্রতকে সেটা দিয়ে উলটে মারবার চেষ্টা করল না। লাঠিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে এল প্রিয়ব্রতকে ধরতে।

এবার প্রিয়ব্রত পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল দৌড়ে, তারপর রিভলবারের নিশানা ঠিক করে বলল, 'আমি সাবধান করে দিচ্ছি, মানুষ মারতে আমি চাই না, কিন্তু আর এক পা এগোলেই গুলি ছুঁড়ব।'

এর মধ্যে মাঠের এক দিকে কিছু লোকের ভিড় জমে গেছে। তারা কেউই বুঝতে পারছে না কী ব্যাপার চলছে। প্রিয়ব্রতকে রিভলবার বার করতে দেখে সবাই ভয়ে শব্দ করে উঠল।

হঠাৎ সেই ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলেন আর একজন চক্রধারীবাবু।

তিনি দুহাত তুলে বললেন, 'কী ব্যাপার? ও প্রিয়বাবু, এসব কী ভুতুড়ে কাণ্ড হচ্ছে আমার বাড়িতে? এই লোকটা কে?'

প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে বলল, 'আসবেন না, এদিকে আসবেন না। আপনি দূরে থাকুন।'

চক্রধারীবাবু বললেন, 'এ যে দেখছি ঠিক আমারই মতন চেহারার একজন লোক। এ কী কাণ্ড? অ্যাঁ? এ কোথা থেকে এল?'

প্রিয়ব্রত বললো, 'বলছি, এখানে আসবেন না। দূরে থাকুন।'

প্রথম লোকটি এবার দ্বিতীয় চক্রধারীবাবুর দিকে ফিরে হুকুমের সুরে বলল, 'সবুজ আলো। সবুজ আলো!'

সেই কথা শুনে দ্বিতীয় চক্রধারীবাবু কাঁপতে-কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লেন।

প্রিয়ব্রত দেখল, ভিড় ঠেলে স্বপনও আবার এদিকে ছুটে আসছে।

প্রিয়ব্রত বলল, 'স্বপন, স্বপন, আসিস না। পালিয়ে যা।'

স্বপন সে নিষেধে কান না দিয়ে দ্বিতীয় চক্রধারীবাবুর পাশে এসে মাটিতে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। তারপর দুজনে একসঙ্গে এমনভাবে হাত জোড় করে রইল, যেন ওরা ওই লোকটিকে পুজো করছে।

প্রিয়ব্রতর মনে হল, লোকটির চোখ দিয়ে সবুজ মতো একটা অস্বাভাবিক আলো বেরুচ্ছে। আর সে কাঠের পুতুলের মতন টলতে-টলতে এগিয়ে আসছে চক্রধারীবাবু আর স্বপনের দিকে।

প্রিয়ব্রত আর ঝুঁকি নিতে চাইল না। লোকটিকে একবার ছুঁয়ে সে নিজেই বুঝেছে যে ওর গায়ে অসম্ভব জোরালো বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আছে। ও যদি চক্রধারীবাবু আর স্বপনকে জড়িয়ে ধরে, তাহলে ওরা দুজন আর বাঁচবে না।

প্রিয়ব্রত খানিকটা এগিয়ে এসে স্বপনদের আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি যে-ই হও, আমি এখনও সাবধান করে দিচ্ছি। আর এক পা এগোলেই আমি গুলি করব।

লোকটা তবু এগোবার জন্য পা বাড়াতেই গুলি চালাল প্রিয়ব্রত।

ওর হাতের টিপ সাঙ্ঘাতিক। তার ওপর এত কাছ থেকে গুলি ছুঁড়েছে, গুলি না লেগে পারেই না। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল লোকটা।

দিন-দুপুরে এমন অদ্ভুত কাণ্ড কেউ কখনো দেখেনি।

মাত্র দশ-বারো হাত দূর থেকে গুলি ছুঁড়েছে প্রিয়ব্রত, মানুষ হলে গায়ে না লেগে

পারত না। কিন্তু লোকটা কি তাহলে মানুষ নয়? কোথায় গেল সে? প্রিয়ব্রতর সারা শরীরটা কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়।

দূরে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারা ভূত মনে করে ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

বিমানও এসব দেখে এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল যে বেশ কিছুক্ষণ সে কোন কথাই বলতে পারল না। তার মনে শুধু তোলপাড় করতে লাগল, 'এটা কী কোনও ভুতুড়ে ব্যাপার, না অলৌকিক কাণ্ড? চোখের সামনে থেকে একটা মানুষ এভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে কী করে?'

ওদিকে স্বপন আর চক্রধারীবাবু তখনও বসে আছে সেই একভাবে। চোখ বড়-বড় করে খোলা, পলক পড়ছে না।

প্রিয়ব্রতই প্রথমে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বলল, 'চল বিমান, আমাদের এরকম খোলা মাঠের মধ্যে থাকা উচিত নয়। কোনও একটা বাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে আমাদের।'

বিমান খানিকটা তোতলাতে-তোতলাতে বলল, 'প্রি-প্রি—প্রিয়দা, ব্যাপারটা কী-কী-কী হল?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সে পরে আলোচনা করা যাবে। এখন স্বপনদের তুলতে হবে।'

হঠাৎ আকাশে একটা গুম-গুম শব্দ শোনা গেল। মনে হল অনেকটা দূর দিয়ে যেন একটা জেট প্লেন উড়ে যাচ্ছে।

বিমান দুপা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এই স্বপন ওঠ, চক্রধারীবাবু, উঠুন।'

ওরা কোনও সাড়া দিল না। বিমান স্বপনের গায়ে ধাক্কা দিয়ে দেখল, ওর শবীরটা যেন কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে।

প্রিয়ব্রত রিভলবারটা তখনও পকেটে ভরেনি। চারদিক ঘুরে একবার দেখে নিল খুব সাবধানে। সেই লোকটা কোথাও নেই, সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সীতা ছুটতে-ছুটতে এসে বলল, 'আমার বাবা...আমার বাবাকে আপনি গুলি করলেন...! বাবা কোথায় গেল? ইনি কে?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'ইনিই তোমার বাবা; তুমি ওঁকে ধরো, এক্ষুনি বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।'

সীতা জিগ্যেস করল, 'তা হলে যে ছিল সে কে?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সে তোমার বাবার কার্বন কপি।'

'তার মানে?'

'সব এখন বুঝিয়ে বলার সময় নেই। আগে তোমার বাবাকে টেনে তোলো।'

কিন্তু ওরা সবাই মিলে টানাটানি করেও স্বপন আর চক্রধারীবাবুকে তুলতে পারল না। ওরা দুজনে যেন জড়-ভরত হয়ে গেছে। কোনও কথা নেই, মানুষ চিনতে পারছে না।

ওদিকে আকাশে গুম গুম শব্দটা ক্রমেই জোর হচ্ছে। প্রিয়ব্রত মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। তারপর সে আর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল।

সকাল থেকেই আকাশটা ছিল মেঘলা। মেঘ ক্রমেই জমাট বাঁধছিল। হঠাৎ দেখা

গেল, আকাশে ঘন মেঘের পরদার মাঝখানটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। ঠিক যেন মেঘ কেটে বেরিয়ে আসছে একটা খুব চওড়া নদী। কিন্তু কী দিয়ে যে মেঘটা ওরকম ভাবে কেটে যাচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে না।

প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে বলল, 'আর একটুও সময় নেই বিমান, তুই আর সীতা মিলে স্বপনকে জোর করে টেনে নিয়ে যা। আমি চক্রধারীবাবুকে কাঁধ তুলে নিচ্ছি।'

কিন্তু সে সুযোগ আর ওরা পেল না। সেই চক্রধারীবাবুর মতন দেখতে লোকটা আবার ফিরে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল।

এখন আর তাকে লোকটা বলা যায় না। ঠিক যেন একটা স্ফটিকের মূর্তি, তার সারা গা দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে! তার চোখ দুটোর জায়গায় এখন কিছুই নেই। কপাল থেকে বেরিয়ে আসছে একটা তীব্র সবুজ আলোর রেখা।

প্রিয়ব্রত রিভলবারটা উঁচু করেও গুলি ছুঁড়তে পারল না। তার আগে নিজেই 'সবুজ আলো' সবুজ আলো বলে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

বিমান আর সীতারও সেই অবস্থা। তারাও ওই একই রকম চিৎকার করতে-করতে পড়ে গেল মাটিতে। স্ফটিকের মুর্তিটা একটা হাত তুলল স্বপন আর চক্রধারীবাবুর দিকে। অমনি তারা দু'জন মন্ত্রমুগ্ধের মতন উঠে দাঁড়িয়ে এক পা-এক পা করে এগিয়ে গেল তার দিকে!

মাথার ওপর জেট প্লেনের মতো সেই শব্দটা এখন সাঙ্ঘাতিক জোর হয়ে উঠছে। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

পরের মুহূর্তেই সেই মূর্তিটা স্বপন আর চক্রধারীবাবুকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশের বুকে।

বিকেলের মধ্যেই গালুডি শহর একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। দূর-দূর জায়গা থেকে লোক ছুটে আসছে। পুলিশের বড়-বড় কর্তা, আরও অনেক সরকারি ব্যক্তিও এসেছেন। ঠিক কী যে হয়েছে ব্যাপারটা, কেউই সঠিক বলতে পারছে না। ফলে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে চার দিকে।

মাঠ থেকে অজ্ঞান অবস্থায় প্রিয়ব্রত, বিমান আর সীতাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। সেখানে তাদের জ্ঞান ফেরাবার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

দেশ-বিদেশের সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা এল তার পরের দিন। প্রিয়ব্রতদের অজ্ঞান অবস্থায় ছবি ছাপা হল অনেক কাগজে। তা দেখে বিমান আর স্বপনের বাবা ছুটে এলেন গালুডিতে।

তিনদিন পরে প্রথম জ্ঞান ফিরে এল প্রিয়ব্রতর। তারপর বিমান আর সীতার।

বিছানায় উঠে বসেই প্রিয়ব্রত জিগ্যেস করল, 'আমার কী হয়েছিল?'

তখন পুলিশের লোক আর রিপোর্টাররা ছেঁকে ধরল প্রিয়ব্রতকে। সবাই একসঙ্গে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। প্রিয়ব্রত একটারও উত্তরও দিল না। সে খালি বলতে লাগলো, 'আমার কী হয়েছিল, আগে বলুন! আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।'

তারপর এসে পড়ল মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের লোক। সবাইকে সরিয়ে দিয়ে তারা

ওদের তিনজনকে নিয়ে চলে গেল জামসেদপুরে। সেখানে কোনও গোপন জায়গায় ওদের জেরা চলতে লাগল।

পরের দিন জামসেদপুরে বসেই ওরা খবর পেল যে চক্রধারীবাবু ফিরে এসেছেন। ভোরবেলা তাঁর বাড়ির সামনের মাঠে তাঁকে পাওয়া গেছে অজ্ঞান অবস্থায়। শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। ঠিক যেন ঘুমোচ্ছেন।

তক্ষুনি জামসেদপুর থেকে মিলিটারির গাড়ি চলে গেল চক্রধারীবাবুকে নিয়ে আসবার জন্যে।

স্বপনের বাবা ট্রাঙ্ককল করলেন কলকাতায়। তাতে জানালেন স্বপনও ফিরে এসেছে। তাকেও অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে ছাতে, সেই দক্ষিণেশ্বরে মামাদের বাড়িতে।

মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের লোক, পুলিশ আর ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেও প্রিয়ব্রতদের কাছ থেকে কোনও খবরই বার করতে পারল না। সত্যিই ওদের কারুর কিছু মনে নেই। এমনকী নিজেদের নামও ওরা ভালো করে মনে করতে পারছে না।

দিনসাতেক বাদে ছেড়ে দেওয়া হল ওদের। ওরা যে যার বাড়িতে ফিরে গেল।

সীতা বাড়ি ফিরে চক্রধারীবাবুকে দেখেই কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। চক্রধারীবাবুও সীতাকে দেখে চিনতে পারলেন না, শুধু জিগ্যেস করলেন, 'এই মেয়েটি কে?'

দু-জনকে শুইয়ে রাখা হল আলাদা দুটো ঘরে।

তিনদিন পরে! চক্রধারীবাবু হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'বাবা রে বাবা! আমি কতকাল এরকম ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি? আমার ব্যবসা-পত্তর সব যাবে যে! সীতা, ও মা সীতা! আমার খাবার দিতে বলো। আমি আজই ট্রাক নিয়ে বেরুব।

সীতাও খুব স্বাভাবিকভাবেই এ-ঘরে চলে এসে বলল, 'বাবা, তুমি তো আজ বাজারই করোনি, রান্না হবে কী?'

ক্রমে সবই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। মাঝখানে যেন কিছুই ঘটেনি। মাঝের সেই অংশটা ওদের কারুরই একদম মনে নেই। এখনও অন্য কেউ এসে চক্রধারীবাবুকে যখন জিগ্যেস করে, আপনি যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তারপর কী হয়েছিল? তখন চক্রধারীবাবু ফ্যাল-ফাল করে তাকিয়ে থাকেন। কিংবা কখনো রাগ করে বলে ওঠেন, 'কী বাজে কথা বলছেন? আমি আবার অদৃশ্য হলুম কবে!'

ওদিকে কলকাতায় স্বপন, আর প্রিয়ব্রতও স্বাভাবিক হয়ে উঠল আস্তে-আস্তে। সবুজ আলোর কোনও ঘটনাই এখন আর ওদের মনে নেই। স্বপন আর বিমান কলেজে যাওয়া শুরু করে দিয়েছে। প্রথম-প্রথম ওদের বন্ধুরা খুব বিরক্ত করত ওদের। খবরের কাগজে সব ঘটনা পড়েছিল তারা। তারা চেপে ধরত স্বপন আর বিমানকে 'হ্যাঁরে, স্বপন তুই সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলি, না কোথাও লুকিয়ে ছিলি ঘাপটি মেরে? কীরে, বিমান, তুই নাকি চারদিন একটানা ঘুমিয়ে ছিলি? গুল দেওয়ার আর জায়গা পাসনি তোরা?

স্বপন আর বিমান কোনও কথা বলে না। চুপ করে থাকে। আর বলবেই বা কী? সত্যিই তো তাদের কিছু মনে নেই।

এর পর কেটে গেছে প্রায় ছ-মাস।

এর মধ্যে প্রিয়ব্রত বম্বে, গোয়া আর আরও অনেক জায়গা ঘুরে এসেছে। আগামী মাসেই সে তার লাল জিপটা নিয়ে ইউরোপের দিকে বেরিয়ে পড়বে ঠিক করেছে।

সেদিন একটা বিয়েবাড়ির নেমন্তন্নয় ওদের তিনজনের দেখা হল অনেক দিন পরে। খাওয়া-দাওয়া সারতে-সারতে অনেক রাত হয়ে গেল ওদের। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটছে তিনজনে, এমনসময় আকাশে একটা গুর গুর আওয়াজ হতেই ওরা চমকে তাকাল আকাশের দিকে।

নাঃ, অন্য কিছু নয়! লাল-নীল আলো জ্বেলে উড়ে যাচ্ছে একটা সত্যিকারের প্লেন।

প্রিয়ব্রত হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'সেসব দিনের কথা তোদের কিছু মনে পড়ে না, না রে?'

বিমান বলল, 'গত কয়েকদিন ধরে আমার যেন ঝাপসা মতন মনে পড়ছে। তবে জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখছি কিনা তাও বুঝতে পারছি না। একটা স্ফটিক দিয়ে গড়া মূর্তির মতন মানুষ। তার চোখ নেই। কপাল দিয়ে বেরুচ্ছে কীরকম যেন ধকধকে সবুজ আলো!'

স্বপন বলল, 'আরে। আমি তো ভাবছিলুম যে ওটা স্বপ্ন। পরশু থেকে বারবার যেন দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'তা হলে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের তিনজনেরই স্মৃতি ফিরে আসছে একসঙ্গে। আমার আরও মনে পড়ছে। ঠিক চক্রধারীবাবুর মতন চেহারার একটা নকল লোক এসেছিল। সেই লোকটাকে আমি গুলি করতেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার সে-ই ফিরে এল একটা স্ফটিকের মূর্তি হয়ে।'

বিমান বলল, 'হ্যাঁ, এসবই আমরা নিজের চোখে দেখেছি ঠিকই, তবু কেন যেন বিশ্বাস করতে পারছি না!'

প্রিয়ব্রত বলল, 'চল, সামনের পার্কটায় একটু বসি।'

স্বপন বলল, 'রাত্তির বেলা খোলা জায়গায় বসলে আজকাল আমার কেমন যেন গা ছম-ছম করে।'

'কেন রে?'

'দুদিন আগেও বুঝতাম না কেন ভয় করে। আজ বুঝতে পারছি। সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে যায় বলে। আবার যদি সেরকম সবুজ আলো দেখি!'

পার্কের বেঞ্চিতে বসে প্রিয়ব্রত বলল, 'ভয়ের কী আছে? আর যাই হোক, যারা ওই সবুজ আলো দেখিয়েছিল, তারা তো আমাদের কোনও ক্ষতি করেনি। যদিও ইচ্ছে করলেই তারা আমাদের মেরে ফেলতে পারত।'

বিমান জিগ্যেস করল, 'যারা মানে কারা প্রিয়দা?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'জোর দিয়ে কিছু বলা শক্ত। তবে, তোরা 'এনকাউন্টার অফ দ্য থার্ড কাইন্ড' ফিল্মটা দেখেছিস? আমার মনে হয় সেরকমই কিছু ব্যাপার।

বিমান বলল, 'না ওই ফিল্মটা দেখিনি। কী ছিল তাতে?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'অন্য কোনও গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ

করতে চাইছে। তারা আমাদের শত্রু নয়। কিন্তু তারা তো আমাদের ভাষা জানে না, তাই ঠিকমতো যোগাযোগ করতে পারছে না কিছুতেই। এবারও মনে হয় সেইরকমই একটা চেষ্টা করেছিল।'

বিমান বলল, 'ওই সবুজ আলো দেখলেই আমরা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যেতাম কেন?'

'ওরা বোধহয় ওই আলো দিয়েই কথা বলে। কিন্তু আমরা ওই অত কড়া আলো সহ্য করতে পারি না। কিংবা আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। ওই আলো দিয়ে ওরা হয়তো আমাদের ছবি তুলে নিয়েছে। ঠিক সাধারণ ছবি নয়। তৈরি করে নিয়েছে অবিকল আমাদের মতন একটা করে মানুষ। যেরকম ভাবে একজন দ্বিতীয় চক্রধারীবাবুকে আমরা দেখেছিলাম। মনে হয় ওই আলোর মধ্যে এক ধরনের চুম্বকের মতন ব্যাপার আছে, সেই জন্য যে যে আলো দেখেছে, তারা নিজেদের দেখলেই চিনতে পারে!

স্বপন বলল, 'কিন্তু প্রথম চক্রধারীবাবু তো ঝাড়গ্রামে সেই ডাক্তারের বাড়িতে আমাদের দেখে সবুজ আলো বলে চেঁচিয়ে ওঠেননি।'

'উনি বয়স্ক লোক, গায়ে আর মনেও জোর বেশি। উনি তখন বোধহয় সেই চুম্বকের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন।

বিমান জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, স্বপন, তুই যখন অদৃশ্য হয়ে গেলি, তখন তোকে নিশ্চয়ই ওরা ওদের রকেটে তুলে নিয়েছিল। তাই না? সেখানে কী হল রে?'

স্বপন বলল, 'সে-সব কথা একদমই মনে নেই। একেবারে অন্ধকার। ভেতরের ব্যাপার আমাদের জানতে দেবে কেন?'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল ওরা।

তারপর প্রিয়ব্রত আকাশের দিকে চেয়ে বলল, 'আজ আকাশ কেমন পরিষ্কার। কত গ্রহ-নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। হয়তো ওরই মধ্যে কোনও একটা থেকে এসেছিল ওরা! হয়তো যেখানে ঠিক আমাদের মতন চেহারার আর একজন করে মানুষ এখন রয়েছে, ওরা তাদের নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে। আর একটা প্রিয়ব্রত, আর একটা বিমান, স্বপন, চক্রধারী, সীতা...'

বিমান বলল, 'যাই বলো প্রিয়দা, এখনও বিশ্বাস হয় না। সবই যেন স্বপ্ন।'

হঠাৎ স্বপন জোরে চেঁচিয়ে উঠল 'প্রিয়দা, ওই দ্যাখো আবার সবুজ আলো, ওই যে পার্কের কোণে—'

প্রিয়ব্রত চমকে সেদিকে তাকিয়ে একটু দেখে নিয়ে বলল, 'দূর বোকা! ওটা তো রাস্তায় ট্রাফিকের সবুজ আলো। এই দ্যাখ, আবার লাল হয়ে গেল। তুই কি সবুজ আলো দেখলেই ভয় পাচ্ছিস নাকি স্বপন?

বিমান হেসে উঠল হো-হো করে।
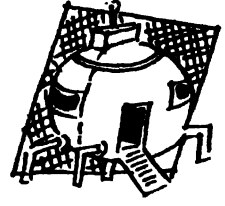
মহাকালের লিখন

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, এ কী! এগুলো কীসের ডিম?

সন্তুও বেশ অবাক হয়েছিল। ডাকবাংলোর কুক তাদের দুজনের জন্য একটা প্লেটে চারটে ডিম সেদ্ধ দিয়ে গেছে। ওরকম ডিম সন্তু কক্ষনো আগে দেখেনি। মুরগির ডিমের চেয়েও একটু ছোট, পুরোপুরি গোল। ঠিক পিং-পং বলের মতন। প্লেটে সাজানো যেন অবিকল চারটি বল, এক্ষুনি ওগুলো নিয়ে টেবিল টেনিস খেলা যায়।

বিমান আগেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছে। সে শুধু এক কাপ চা নিয়ে বসেছে খানিকটা দূরে।

বিমান হাসতে-হাসতে বললেন, কাকাবাবু, আপনি চিনতে পারলেন না?

বাংলোর কুকটি বাঙালি। সে একটু কাঁচু-মাচু হয়ে বলল, স্যার, এখানে হাঁসের ডিম তো পাওয়াই যায় না। মুরগির ডিম চালান আসে, তাও মাঝে-মাঝে কম পড়ে যায়। কিন্তু কচ্ছপের ডিম পাওয়া যায় যথেষ্ট।

কাকাবাবু বললেন, ছি-ছি-ছি-ছি।

বিমান বললেন, খেতে কিন্তু খারাপ নয়। আপনারা খেয়ে দেখুন। আমি বলছি ভালো লাগবে।

কাকাবাবু বললেন, তুমি আমাকে কচ্ছপের ডিম চেনাচ্ছ? এক সময় কত কচ্ছপের ডিম খেয়েছি। কচ্ছপের মাংস খেয়েছি। এক একটা কচ্ছপ মারলে তার পেটেব মধ্যে চোদ্দ-পনেরোটা ডিমও পাওয়া যেত। এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও! আমরা খাব না।

বিমান বললেন, এক সময় খেতেন, এখন খাবেন না কেন? আপনার আর সহ্য হয় না? তা হলে সন্তু খেয়ে নিক।

কাকাবাবু বললেন, না, সন্তুও খাবে না। তোমরা জানো না, কচ্ছপ মারা নিষেধ? সারা পৃথিবীতেই কচ্ছপের সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে। আর কিছুদিন পর কচ্ছপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। শুধু এইভাবে কচ্ছপের ডিম নষ্ট করার কোনও মানে হয়?

বিমান বললেন, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এগুলো তো সেদ্ধই হয়ে গেছে। এগুলো খেয়ে নিন। এগুলো থেকে তো আর বাচ্চা বেরুবে না!

কাকাবাবু বললেন, তবুও খাওয়া উচিত নয়। তুমি যদি ভাবো এই ডিমগুলো তো আমি নিয়ে আসিনি, আমি সেদ্ধও করিনি। সুতরাং আমার খেয়ে দোষ কী? তা

হলে অন্য লোক আরও বেশি করে এই ডিম ধরবে, বাজারে এনে বিক্রি করবে। সেইজন্য একদম খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। ডিম নিয়ে যাও, আমরা শুধু টোস্ট আর চা খাব।

বাংলোর কুকটি বললেন, আপনি বললেন, স্যার, কচ্ছপ কমে যাচ্ছে। এদিকে কিন্তু অনেক কচ্ছপ পাওয়া যায়। ওরা সমুদ্রে থাকে, কিন্তু ডিম পাড়বার সময় ওপরে উঠে আসে। মাটি খুঁড়ে সামান্য একটু গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে, তারপর আবার মাটি চাপা দিয়ে চলে যায়। লোকেরা সেই মাটি খোঁড়া দেখলেই চিনতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, লোকেরা অমনি সেই ডিমগুলো চুরি করে আনে, তাই তো! এখন যতই কচ্ছপ থাক, এইভাবে ডিম নষ্ট হলে একদিন কচ্ছপের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে না? পৃথিবীর কত প্রাণী এইভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে!

বিমান বললেন, কচ্ছপ মারাও যে খুব সোজা। একবার ধরে উলটে দিতে পারলেই হল। ওরা নিজে থেকে সোজা হতে পারে না।

কাকাবাবু বললেন, নিরীহ প্রাণী বলেই এক সময় সাহেবরা হাজার-হাজার কচ্ছপ মেরে ফেলেছে। ভারত মহাসাগরে এমন অনেক দ্বীপ ছিল সেখানে লক্ষ-লক্ষ কচ্ছপের বাসা ছিল। এক একটা দ্বীপে যখন সাহেবদের জাহাজ নেমেছে, তখন খেলার ছলে তারা যত ইচ্ছে কচ্ছপ মেরেছে!

বিমান বললেন, সাহেবরা তো সর্বভুক। কচ্ছপের মাংসও নিশ্চয়ই ওরা খায়!

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, টারটল সুপ তো অনেকের প্রিয়। কিন্তু শুধু খাওয়ার জন্য নয়। বললাম না, খেলার জন্যও মেরেছে? একদিনে কি হাজার-হাজার কচ্ছপ খাওয়া যায়? মজা করার জন্য জাহাজের খালাসিরা কচ্ছপগুলোকে ধরে-ধরে উলটে দিত। কে কটা পারে তার প্রতিযোগিতা হতো। তারপর ওরা জাহাজ নিয়ে চলে যেত। দিনের পর দিন হাজার-হাজার কচ্ছপ অসহায় ভাবে চিৎ হয়ে পড়ে থাকত। দৃশ্যটা ভাবো তো! তারপর তারা আস্তে-আস্তে শুকিয়ে মরে যেত!

সন্তু বললে, ইস!

বিমান বললেন, চলুন, কাকাবাবু এবার আমাদের বেরুতে হবে।

কাকাবাবু চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ডাইনিং রুম ছেড়ে সবাই চলে এল বাইরে। একটা ঝকঝকে নতুন জিপসি গাড়ি অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। উর্দি পরা ড্রাইভার দরজা খুলে দিল।

কাকাবাবু জোরে একবার শ্বাস টেনে বললেন, আঃ, এখানকার বাতাস কী পরিষ্কার। চমৎকার টাটকা গন্ধ। এইটুকু রাস্তা আর গাড়িতে গিয়ে কী করব। চলো, হেঁটেই যাই!

বিমান বলল, হাঁটতে অসুবিধে হবে না আপনার?

কাকাবাবু হেসে বললেন, না হে, এই ক্রাচ নিয়েই আমি মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারি। চলো, চলো।

রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। একেবারে লেখার কালির মতন ঘন নীল জল। রয়াল ব্লু। খুব কাছেই একটা দ্বীপ। সবুজ গাছপালায় এমন ভর্তি যে এখান থেকে মনে হল, এক ইঞ্চিও জায়গা খালি নেই। এমন নিবিড় জঙ্গল সন্তু আর কোথাও দেখেনি।

সন্তু এই দ্বিতীয়বার এসেছে আন্দামানে। পোর্ট ব্লেয়ার শহরটা তার বেশ চেনা লাগছে। মনটা বেশ খুশি-খুশি লাগছে তার। এখানকার সমুদ্র অন্য রকম, দীঘা কিংবা পুরীর সঙ্গে কোনও মিল নেই। তীরের কাছে জল একটুও ঘোলা নয়, একবারে স্বচ্ছ, একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মাছের ঝাঁক দেখা যায়।

মটোর লঞ্চটাও রেডি হয়ে আছে। ওপরের ডেকের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এর মালিক রূপেন মিত্র। কাকাবাবুদের দেখে দুহাত জুড়ে নমস্কার করে বললেন, আসুন, আসুন, মিঃ রায়চৌধুরী। আমরা ঠিক নটার সময় স্টার্ট করব।

লঞ্চটা মাঝারি আকারের। নীচে চারখানা ক্যাবিন, অনায়াসে আটজন লোক শুতে পারে। রান্না-বান্নার ব্যবস্থাও আছে। এক সঙ্গে বেশ কয়েকদিন সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়ানো যায়। রূপেনবাবুদের ঝিনুক আর মাদার অফ পার্ল-এর ব্যবসা। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি সমুদ্রে ঝিনুকের অন্ত নেই। কত রকম ঝিনুক, মাঝে-মাঝে শঙ্খও উঠে আসে। মাদার অফ পাল দিয়ে মেয়েদের গয়নার লকেট হয়।

এবার অবশ্য এই লঞ্চে ঝিনুক তুলতে যাওয়া হচ্ছে না।

বিমান একজন বিমান-চালক। তার নামের সঙ্গে কাজের খুব মিল। সে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের পাইলট, মাঝে-মাঝেই তাকে আন্দামানে আসতে হয়। রূপেন মিত্তিরদের সঙ্গে তার খুব ভাব রূপেন কাকাবাবুদের এখানে বেড়াতে আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ওপরের ডেকে কয়েকটা চেয়ার পাতা আছে, সবাই বসল সেখানে। লঞ্চটা বন্দর ছেড়ে ছুটে চলল গভীর সমুদ্রে। পাশ দিয়ে মাঝে-মাঝেই অন্য লঞ্চ যাচ্ছে, সেগুলোতে যাত্রী ভর্তি। এখানে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতে হলে লঞ্চ ছাড়া উপায় নেই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোন দিকে যাব?

রূপেনবাবু বললেন, আমরা যাব রঙ্গত আয়ল্যান্ডের দিকে। পথে অবশ্য আরও অনেক দ্বীপ পড়বে।

বিমান বললেন, এখানে কত যে দ্বীপ। অনেক দ্বীপের কোনও নামই নেই। কাকাবাবু, আপনি তো জানেন, আপনি এদিকটা ভালো করে ঘুরেছেন।

কাকাবাবু দু-দিকে মাথা নাড়লেন।

বিমান আবার বললেন, জানেন, রূপেনবাবু, একবার কাকাবাবু আর সন্তু, একেবারে হিংস্র জানোয়ারদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন।

রূপেনবাবু বললেন, তাই নাকি? যে দ্বীপটায় জারোয়া উপজাতি থাকে, আমরা তো সেটা এড়িয়ে চলি। কাছেই যাই না। আপনি গেলেন কী করে? ওরা আপনাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করেনি?

কাকাবাবু মৃদু হেসে বললেন, সে এক লম্বা গল্প। এখন সে কথা থাক। আচ্ছা রূপেনবাবু, আপনি কি নিজের চোখে মারমেড দেখেছেন?

রূপেনবাবু বললেন, না, আমি দেখিনি। আমি লঞ্চে করে এখানকার সমুদ্রে অনেক ঘুরেছি। বড়-বড় তিমি দেখেছি। হাঙরের ঝাঁক তো যখন-তখন দেখতে পাওয়া যায়। ফ্লাইং ফিস দেখেছি। ডলফিনও দেখেছি। কিন্তু মারমেড জাতীয় কিছু কখন আমার চোখে পড়েনি।

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে বললেন, বিমান যে বলল, আপনি দেখেছেন? মারমেড দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তো বিমান আমাদের এখানে টেনে আনল।

বিমান বলল, রূপেনবাবু নিজের চোখে দেখেছেন, সে কথা আমি বলিনি। আমি বলেছি যে রূপেনবাবুর লোকজনেরা দেখেছে।

রূপেনবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমার লঞ্চের দুজন খালাসি নাকি দেখেছে। মাস খানেক ধরে এখানে একটা গুজব রটেছে যে একটা মারমেড বা জলকন্যাকে নাকি মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে। কোনও নির্জন দ্বীপের ধারে বালির ওপর সে বসে থাকে! মানুষের সামান্য সাড়াশব্দ পেলেই চোখের নিমেষে জলে ঝাঁপ দেয়, তারপর গভীর সমুদ্রে মিলিয়ে যায়। রঙ্গত আর মায়া বন্দরের বেশ কয়েকজন লোকই নাকি দেখতে পেয়েছে তাকে।

কাকাবাবু জিগ্যেস করলেন, আপনি এটা বিশ্বাস করেন!

রূপেনবাবু বললেন, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নেই। নিজের চোখে তো দেখিনি!

কাকাবাবু আবার জিগ্যেস করলেন, যারা দেখেছে, তারা মারমেডটিকে কেমন দেখতে বলেছে?

রূপেনবাবু বললেন, ওপরের দিকটা একটা সুন্দরী মেয়ে, লম্বা চুল, ফরসা রং, টানা-টানা চোখ। তার তলার দিকটা মাছের মতন। দুটো পা নেই, তার বদলে লেজ যেমন হয়।

কাকাবাবু বললেন, সবাই এইরকমই বলে। কোপেনহ্যাগেন শহরে এইরকম একটি মারমেডের মূর্তিও আছে।

বিমান বললেন, সেটা তো বিখ্যাত। আমি দেখেছি।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, মূর্তিটা তুমি দেখেছ। কিন্তু আসল মারমেড এপর্যন্ত কোনও মানুষ চোখে দেখেনি।

বিমান বললেন, অ্যাঁ? কেউ দেখেনি? তবে যে বহুকাল ধরে এত গল্প।

কাকাবাবু বললেন, সবই গল্প। মানুষের কল্পনা। কোনও প্রমাণ নেই। মাঝে-মাঝে গুজব ওঠে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ছবি তুলতে পারেনি।

সন্তু বলল, আমি ক্যামেরা এনেছি। সত্যি যদি একটা মারমেড দেখতে পাই, তা হলে পটাপট ছবি তুলব। তা হলে সেটা একটা বিরাট আবিষ্কার হবে তাই না?

কাকাবাবু বললেন, তা হবে। কিন্তু বেশি আশা করিস না। বেশি আশা করলে বেশি নিরাশ হতে হয়। সমুদ্রে ওরকম কোনও প্রাণী থাকতে পারে না।

বিমান অবিশ্বাসের সুরে বলল, থাকতে পারে না? একথা কী করে বললেন? সমুদ্রে এখনও কত রকম রহস্যময় প্রাণী আছে, মানুষ কি সব জান?

কাকাবাবু বললেন, রহস্যময় প্রাণী থাকতে পারে। কিন্তু যে-প্রাণীর ওপরের দিকটা মানুষের মতন, তার হার্ট আর লাংসও তো মানুষের মতন হবে। সে বেশিক্ষণ জলে ডুবে থাকবে কী করে? তবে, অন্য দুটি প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের দেশে অনেক মানুষ বলে ভুল করে।

সন্তু জিগ্যেস করলে, মানুষের মতন প্রাণী?

কাকাবাবু বললেন, মোটেই মানুষের মতন নয়। একেবারে জলজন্তু-একটির নাম মানাটি আর একটির নাম ডুগং। এরা বিরাট-বিরাট প্রাণী। এক-একটির ওজন প্রায় এক টন। তিমি মাছ যেমন জলের ওপর মুখ ভাসিয়ে নিশ্বাস নেয়, তেমনি মানাটি আর ডুগং-রাও প্রায়ই জলের ওপর মুখখানা ভাসিয়ে থাকে। বহুকাল ধরেই গভীর সমুদ্রে নাবিকরা এদের দেখেছে! এদের মুখের সঙ্গে মানুষের কিছুটা মিল আছে।

একটু থেমে, অনেকখানি চওড়া করে হেসে কাকাবাবু আবার বললেন, মেয়েরা তো জাহাজের নাবিক হয় না। নাবিকরা সবাই পুরুষ। সেইজন্য মানুষের মুখের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে এমন প্রাণী দেখেই নাবিকরা তাকে কোনও মেয়ে বলে মনে করে। সেই থেকেই জলকন্যার কাহিনি চালু হয়েছে।

সন্তু জিগ্যেস করলে, ওই মানাটি আর ডুগং-দের কেমন দেখতে?

কাকাবাবু বললেন, আমি নিজের চোখে দেখিনি, ছবি দেখেছি। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক দেখে লিখেছেন যে ওদের মুখ বিচ্ছিরি, রাগি বুড়োর মতন। সাধারণ মানুষের মুখের চেয়ে অনেকটা বড়। এদের তলার দিকটা মাছের মতন। কিন্তু এর মাছ নয়। ম্যামাল। অর্থাৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী, শিরদাঁড়া আছে।

বিমান বলল, দূর ছাই!

কাকাবাবু বললেন, আমি মারমেড দেখার আশা করিনি। তবে একটা মানাটি কিংবা ডুগং যদি দেখতে পাই, সেটাই যথেষ্ট। এদিককার সমুদ্রে সাধারণত ওদের দেখা পাওয়া যায় না।

রূপেনবাবু বললেন, আমার খালাসি দুজন কিন্তু জোর দিয়ে বলেছে, ওরা একটা মেয়ের মতন প্রাণীকেই দেখেছে। আমাদের আজ ঠিক দেখাবে।

কাকাবাবু বললেন, ভালো কথা!

এরপর কফি এল। কফি খেতে-খেতে ওরা তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। নির্জন, সুন্দর-সুন্দর দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে লঞ্চটা। মাঝে-মাঝে বড়-বড় ঢেউয়ে লাফিয়ে-লাফিয়েও উঠছে। জল ছিটকে আসছে ওপরের ডেক পর্যন্ত। কাকাবাবু, সন্তু, বিমান তিনজনই প্যান্ট-শার্ট পরা। কিন্তু রূপেনবাবু, বনেদী বাঙালিদের মতন পরে আছেন কুচোনো ধুতি আর ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি। একবার জলের ছিটেয় তাঁর পাঞ্জাবি অনেকটা ভিজে গেল।

কাকাবাবু একটা বায়নোকুলার এনেছেন। সেটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে অন্যরাও দেখছে।

এক সময় সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, ওই যে, ওই যে!

সবাই চমকে ঘুরে তাকাল।

না, জলকন্যাও নয়, মানাটি কিংবা ডুগংও নয়, এক ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ। ফ্লাইং ফিস! পার্শের মতন সাইজ, দু-পাশে ডানা, মাছগুলো জল থেকে লাফিয়ে উঠে ফর-ফর-ফর-ফর করে বেশ খানিকটা উড়ে আবার জলে ডুব দিল।

কাকাবাবু বললেন, এও তো একটা বেশ ভালো জিনিস দেখলি রে সন্তু।

এরপর আরও তিন ঘণ্টার মধ্যে আর কিছু দেখা গেল না।

সমুদ্র যতই সুন্দর হোক, বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে একঘেয়ে লাগে। লঞ্চের ভট-ভট-ভট ভট শব্দটাও বিরক্তিকর। যদিও বেশ হাওয়া দিচ্ছে। কিন্তু মাথার ওপর গনগন করছে সূর্য। গরম না লাগলেও চোখ ঝলসে যাচ্ছে যেন।

এক সময় লঞ্চটা হঠাৎ থেমে গেল।

রূপেনবাবু নিচের একটা ক্যাবিনে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবিটা পালটাতে! ওপরে এসে বললেন, আমার খালাসিরা একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছে। কাছেই ওই যে দ্বীপটা দেখছেন, ওর ধারেই নাকি দুবার দেখা গেছে মারমেডকে। এখানে অপেক্ষা করলে তার দেখা মিলতেও পারে। কিন্তু লঞ্চের শব্দ শুনলেই সে পালাবে। একটা নৌকো করে আমরা ওই দ্বীপটায় গিয়ে অপেক্ষা করতে পারি। দুপুরের খাবারেরও তো সময় হয়েছে। ওখানে গিয়েই আমরা খেয়ে নেব।

কাকাবাবু বললেন, চমৎকার আইডিয়া! জলকন্যা কিংবা বিরাট কোনও জলজন্তু দেখা যাক বা না যাক, নতুন একটা দ্বীপে পিকনিক তো হবে। সেটাই হোক!

বিমান সভয়ে বলল, এই দ্বীপে আবার জারোয়ারা থাকে না তো?

রূপেনবাবু বললেন, না, না। দেখছ না, ছোট্ট দ্বীপ। চার পাশটাই তো দেখা যাচ্ছে। আন্দামানের জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুক থাকে না। নির্ভয়ে ঘোরা যায়!

সন্তু জিগ্যেস করল, এই দ্বীপটার নাম কী?

রূপেনবাবু বললেন, তা তো জানি না। বোধ হয় কোনও নাম নেই। এখানকার অনেক দ্বীপ শুধু নম্বর দিয়ে চেনা হয়।

সন্তু বলল, আমি এই দ্বীপটার নাম দিলাম মারমেড আয়ল্যান্ড!

লঞ্চের গায়েই বাঁধা রয়েছে একটা ডিঙ্গি নৌকো। সেটা ভাসানো হল জলে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল ছোট্ট দ্বীপটায়।

দ্বীপটা একেবারে সুন্দর আঁকা একটা ছবির মতন। তীরের কাছে মিহি, সাদা বালি ছড়ানো। তারপর নানান রঙের নুড়ি পাথর। তারপর গাছপালা। তবে এখানকার জঙ্গল খুব ঘন নয়। বোধহয় কখনো-কখনো সমুদ্র ফুলে উঠে পুরো দ্বীপটা ডুবিয়ে দেয়। ঘাস কিংবা ঝোপ-ঝাড় কিছু নেই। বড়-বড় গাছ আর মাঝে-মাঝে ফাঁকা জায়গা।

তীর থেকে খানিকটা ভেতরে চলে এসে সন্তু দেখতে পেল একটা গোল মতন পাথরের টিবি। জুতো খুলে সন্তু তর-তর করে সেটার ওপরে উঠে গেল।

তারপর আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, এই জায়গটায় সবাই মিলে বসলে খুব ভালো হয়। এখান থেকে সবদিকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

কাকাবাবু পাথরটার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, বেশ পেছল! আমি আর খোঁড়া পা নিয়ে ওপরে উঠব না।

বিমানও জুতো খুলে উঠে গেল ওপরে। টিবিটা একতলা সমান উঁচু। এখানে খুব বড় গাছ নেই বলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বিমান বলল, বাঃ, এরকম জায়গায় একটা বাড়ি বানাতে পারলে গ্র্যান্ড হতো। বেশ নিজস্ব একটা দ্বীপ। তাতে একটাই বাড়ি থাকবে।

কাকাবাবু বললেন, আমি সমুদ্রের ধার দিয়ে দ্বীপের চারপাশটা এবার ঘুরে আসি।

কাকাবাবু আড়ালে চলে যেতেই বিমান একটা সিগারেট ধরাল। কাকাবাবুর সামনে সে সিগারেট খায় না কক্ষনো।

ছোট নৌকোটা লঞ্চের দিকে ফিরে যাচ্ছে খাবার-দাবার আনতে। লঞ্চটা স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছে, এখন ভাসতে-ভাসতে এদিকেই যেন সরে আসছে।

সন্তু আর বিমান গল্প করছে, হঠাৎ চমকে উঠল দুজনেই।

পাথরটা একবার কেঁপে উঠল না? মাটি কাঁপছে?

ওরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, কোনও কথা বলবার আগেই আবার পাথরটা কেঁপে উঠল বেশ জোরে।

এবার বিমান চেঁচিয়ে করে উঠল, ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!

সন্তুও সড়াৎ করে পাথরটা থেকে গড়িয়ে নেমে চেঁচিয়ে বলল, কাকাবাবু, সাবধান! ভূমিকম্প হচ্ছে!

সন্তুর ধারণা হল, ভূমিকম্পে দ্বীপটার মাঝখানটা ফেটে দুভাগ হয়ে যাবে, তারপর সবসুদ্ধু ডুবে যাবে সমুদ্রে।

কাকাবাবু জলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পিছিয়ে এলেন খানিকটা। সন্তু আর বিমান দুজনেই চ্যাঁচাচ্ছে, তিনি ওদের কাছে এসে বললেন, কী হয়েছে? কোথায় ভূমিকম্প? আমি তো কিছু টের পেলাম না।

রূপেনবাবু এসে বললেন, আমিও তো বুঝতে পারিনি।

বিমান বললেন. পাথরটা দুবার জোরে কেঁপে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু চোখ বড়-বড় করে সাঙ্ঘাতিক বিস্ময়ে বলল, একী! একী!

ওদের সামনে পাথরের ঢিবিটা দুলতে শুরু করেছে। আর একটু-একটু এগোচ্ছে। ঠিক জীবন্ত কোনও প্রাণীর মতন।

ভয় পেয়ে সবাই ছিটকে দূরে সরে গেল।

বিমান বলল, ওরে বাপ রে, এটা কোন বিরাট জন্তু?

রূপেনবাবু এক দৌড় মেরে জলের ধারে গিয়ে তাঁর খালাসিদের ডেকে বলতে লাগলেন, ওরে রঘু, ওহে রতন, মানসিং, শিগগির লঞ্চটা নিয়ে এসো। প্রকাণ্ড জানোয়ার! মেরে ফেলবে। মেরে ফেলবে।

পাথরের ঢিবির মতন প্রাণীটা কিন্তু একটু-একটু নড়তে লাগল শুধু। ওদেব দিকে তেড়ে এল না।

কাকাবাবু সাহস করে একটু এগিয়ে এসে একটা ক্রাচ দিয়ে পাথরটার গায়ে একটু ঘষে দিলেন। সেটার ওপরে শ্যাওলা জমে আছে, একটুখানি খসে গেল।

কাকাবাবু বললেন, এটা তো মনে হচ্ছে একটা কচ্ছপ!

বিমান বলল, অ্যাঁ? এতবড় কচ্ছপ? তা কখনো হতে পারে?

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও দেখি, কচ্ছপ হলে নিশ্চয়ই একটা মুখ থাকবে। মুখটা দেখলেই বোঝা যাবে!

কাকাবাবু প্রাণীটার চারপাশে ঘুরতে লাগলেন। বেশি খুঁজতে হল না। একটা গাছের আড়াল থেকে ঝটাং করে বেরিয়ে এল তার গলা আর মুখ। হাতির শুঁড়ের মতন মোটা। ক্রিকেট বলের সাইজের দুটো চোখ যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে।

কাকাবাবু তবু ভয় পেলেন না। তিনি বললেন, মুখটা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা কচ্ছপ। সমুদ্রে অনেক বড়-বড় কচ্ছপ থাকে বটে, কিন্তু এত বড় কচ্ছপ যে হতে পারে। তা কখনো শুনিনি!

সন্তু বলল, কাকাবাবু, আর এগিও না।

কাকাবাবু বললেন, কচ্ছপ যখন, তখন ভয়ের কিছু নেই। এরা নিরীহ প্রাণী, মানুষকে তেড়ে এসে কামড়ায় না।

এর মধ্যে রূপেনবাবুর চ্যাঁচামেচি শুনে লঞ্চটা হুইশল দিতে-দিতে চলে এল এদিকে। লাঠি, লোহার রড নিয়ে নেমে এল ছ-সাতজন খালাসি। হইহই করে কাছে এসে বললেন, কোন জানোয়ার? কোথায়? কোথায়?

এতবড় একটা কচ্ছপ দেখে তাদেরও চক্ষু ছানাবড়া। একজন বলল, একটা পাহাড়ের মতন কচ্ছপ? স্বপ্ন দেখছি না তো?

আর একজন বললেন, এটাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে?

রূপেনবাবুও এখন খানিকটা ধাতস্থ হয়েছেন। তিনি এবার খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাকে পোর্ট ব্লেয়ার নিয়ে যাব। তারপর কলকাতায় নিয়ে যাব। এরকম কচ্ছপ কেউ কখনও দেখেনি। তারপর বিলেত আমেরিকায় পাঠাব। এটাকে উলটে দাও। উলটে পা-গুলো বাধো।

কিন্তু এত বিরাট কচ্ছপকে উলটে দেওয়া সহজ নাকি? কচ্ছপটা তার মুন্ডুটা এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে।

একজন বলল, সাবধান! কচ্ছপের মুখের কাছে গেলে কামড়ে দেবে। হাত কিংবা পা কামড়ে ধরলে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না। ওর মুখটাকে আগে আটকাতে হবে!

একজন একটা লোহার রড বাড়িয়ে দিল কচ্ছপটার মুখের কাছে। কচ্ছপটা সেটা সঙ্গে-সঙ্গে কামড়ে ধরে, দুটো ঝটকা মারতেই রডটা ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেল।

রূপেনবাবু দূর থেকেই এক লাফ দিয়ে বললেন, বাপরে! দাঁতের কী জোর!

রঘু নামের একজন খালাসি বলল, সার, আমি কচ্ছপ ধরার কায়দা জানি। একটা শক্ত নাইলনের দড়ি চাই।

একজন দড়ি আনতে ছুটে গেল। অন্য সবাই গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এতবড় চেহারা নিয়েও কচ্ছপটা বোধহয় বেশ ভীতু প্রাণী। সে দৌড়ে পালাবারও চেষ্টা করল না, কারুকে তেড়ে কামড়াতেও এল না।

রঘু নাইলনের দড়িটা পেয়ে একটা ফাঁস তৈরি করল। তারপর সেটা ছুঁড়ে দিল কচ্ছপটার মুখের দিকে। দু-তিনবারের চেষ্টায় ফাঁসটা জড়িয়ে গেল তার গলায়। দুজন খালাসি দুদিক থেকে টান মারতেই সেটা আঁট হয়ে গেল। কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার চোখ দুটো দিয়ে।

সন্তু বলল, কচ্ছপটা বোধহয় খুব বুড়ো।

কাকাবাবু বললেন, শুনেছি ওরা বহুদিন বাঁচে। এর বয়েস কয়েকশো বছর হলেও আশ্চর্য কিছু নেই।

রঘু বলল, এবার সবাই মিলে হাত লাগিয়ে ওকে উলটে দিতে হবে।

সবাই কাছে এসে হাত লাগাবার আগেই কচ্ছপটার পিঠটা কেঁপে উঠল কয়েকবার! ওর পিঠে কিছু-কিছু মাটির চামড়া ছিল, তা খসে গেল। তখন দেখা গেল, তার পিঠে অনেক হিজিবিজি দাগ।

সন্তু বলল, কাকাবাবু দেখুন, দেখুন, এই দাগগুলো। মনে হচ্ছে এক জায়গায় বাংলা অ লেখা আছে।

কাকাবাবু বললেন, ঘরের দেয়ালে জল পড়ে নোনা ধরলেও অনেক সময় এরকম মনে হয়। অ নয় রে, আ, পাশের দাগটা ঠিক আকারের মতন।

বিমান রূপেনবাবুরাও ঝুঁকে এসেছেন দেখতে। বিমান বলল, তার পাশেই তো র। কেউ যেন লিখেছে 'আর'।

কাকাবাবু ক্রাচ দিয়ে কচ্ছপটার পিঠটা খুব ভালো করে ঘষলেন। অনেক ময়লা সরে গেল। এবার ফুটে উঠল আরও অক্ষর! 'আর'-এর একটু পরেই 'মা'।

সন্তু বলল, তারপর এটা কী? এ? মা এ?

কাকাবাবু বললেন, এ নয় তয়ে র-ফলা। মাত্র তা হলে হল, 'আর মাত্র'।

রূপেনবাবু বললেন, আশ্চর্য! আশ্চর্য! কচ্ছপের পিঠে এরকম লিখল কে?

কাকাবাবু গভীর বিস্ময়ে কচ্ছপের পিঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর অভিভূতভাবে বললেন, প্রকৃতি লিখে দিয়েছে। কিংবা মহাকালও বলতে পারেন। প্রবাদ আছে, মহাকূর্ম অর্থাৎ বড় কোনও কচ্ছপের পিঠে মহাকাল তার ইতিহাস লিখে রাখে।

সন্তু বলল, আরও কিছু লেখা আছে!

কাকাবাবু বললেন, আমি সবটা পড়তে পেরেছি। এই দ্যাখো ভালো করে। 'আর মাত্র দুটি। মেরো না, মেরো না, মেরো না!

সন্তু বললেন, হ্যাঁ, স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। প্রকৃতি লিখে দিয়েছে যে পৃথিবীতে এরকম কচ্ছপ মাত্র দুটো বেঁচে আছে।

বিমান বলল, কী বলছিস! প্রকৃতি কিংবা মহাকাল বাংলায় লিখবে নাকি?

কাকাবাবু বললেন, মহাকাল কখন কোন ভাষায় লেখেন, তার তুমি-আমি কী জানি! কথাগুলো যে লেখা রয়েছে, তা তো সত্যি! কচ্ছপটা নিজেই পিঠ ঝাঁকিয়ে তা আমাদের দেখল।

তারপর হঠাৎ কাকাবাবু হাত জোর করে আবেগের সঙ্গে খালাসিদের বললেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, ওকে ছেড়ে দিন। বন্দি অবস্থায় যদি ও মরে যায়, তা হলে পৃথিবী থেকে এই কচ্ছপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এদের ধ্বংস করার কোনও অধিকার আমাদের নেই।

খালাসিরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রূপেনবাবু বললেন, ওরে বাপ রে বাপ! জন্মে কখনো এমন দেখিনি। ভগবান নিজে লিখে দিয়েছেন ওকে মেরো না। ওকে বন্দি করলে আমাদের মহাপাপ হবে। ইনি সাক্ষাৎ কূর্ম অবতার। ওরে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, শিগগির ছেড়ে দে!

খালাসিরা এবার ফাঁস খুলে নিল ওর গলা থেকে। কাকাবাবু সবাইকে দূরে সরে যেতে বললেন। সকলে সার বেঁধে কচ্ছপটার পেছনে দিকে গিয়ে দাঁড়াল।

কচ্ছপ এবার থপ-থপ করে এগোতে লাগল জলের দিকে।

রূপেনবাবু হাত জোড় করে বললেন, জয় বাবা কূর্ম অবতার। আমাদের দোষ নিও না!

তাঁর দেখাদেখি অন্য খালাসিরাও নমস্কার করল।

কচ্ছপটা জলের কাছাকাছি গিয়ে একবার মুখটা ফিরিয়ে ওদের দেখল। তারপর প্রবল আলোড়ন তুলে মিলিয়ে গেল নীল সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে।
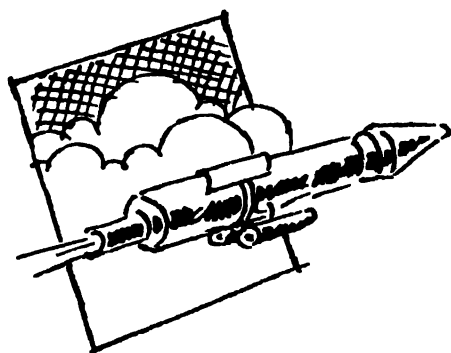
ইচ্ছাশক্তি

শূন্যের আর্মস্ট্রং স্টেশনের ওপরে ঘুরছে ঝিলমদের রকেট।

এর আগে ঝিলমরা এখানে এসেছে অনেকবার। প্রত্যেকবারই এসেছে আনন্দ ভরা মন নিয়ে। আর্মস্ট্রং স্টেশন চমৎকার জায়গা। এখানে এলেই মন ভালো হয়ে যায়। মহাশূন্যে ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেই ইচ্ছে করে দু-একদিন আর্মস্ট্রং স্টেশনে কাটিয়ে আসতে। এখানে নাচ, গান, হই-হল্লা, যে-কোনও পছন্দ মতন খাবার, সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু এবারে এই রকেটের যাত্রীরা এসেছে অনেকগুলো বিপদ কাটিয়ে এবং দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে।

রকেটটা চালাচ্ছে ইউনুস, তাকে সাহায্য করছিল রা। সে মাঝে-মাঝেই চোখের জল সামলাতে পারছে না। নী নামের অল্পবয়েসি মেয়েটি, যে সব সময়েই হাসিখুশি থাকে আর মুখে কবিতা বানায়, সেও ব্যাপার-স্যাপার দেখে যেন বোবা হয়ে গেল।

গ্রাউন্ড কন্ট্রোল থেকে একটা গলা ভেসে এল, রকেট নং তিন হাজার সাতাশ, সুস্বাগতম আমি রাইন বলছি! আর্মস্ট্রং স্টেশনের তিন নম্বর গেট তোমাদের জন্য খোলা হচ্ছে। জীবনটা খুব সুন্দর, তাই না ঝিলম?

ইউনুস একবার ঝিলমের দিকে তাকাল। ঝিলম বসে আছে একটা পাথরের মূর্তির মতন। তার গায়ের রং আগুনের মতন লাল। সত্যি যেন তার গা থেকে আগুনের ছটা বেরুচ্ছে। তার চোখের মণি স্থির। সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না!

ইউনুস বললেন, জীবন শুধু সুন্দর নয়, রাইন। জীবন অতি বিচিত্র। আমি ইউনুস বলছি! ঝিলম একটু অসুস্থ হয়েছে। রকেটের কন্ট্রোলে এখন আমি আছি।

রাইন জিগ্যেস করল, কী হয়েছে ঝিলমের?

ইউনুস বলল, সেটা দেখা হলে বুঝিয়ে বলব। রাইন, তুমি ঝটিকা বাহিনীতে তৈরি থাকতে বলো তিন নম্বর গেটে। হাসপাতালে খবর দিয়ে রাখো। ঝিলমকে এক্ষুনি সেখানে ভর্তি করতে হবে!

রাইন ঝিলমের বন্ধু। একথা শুনে বিচলিত হয়ে বলল, কী বলছ, ইউনুস? ঠিক আছে, আমার ডিউটি শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমি নিজে উপস্থিত থাকছি তিন নম্বর গেটে!

ইউনুস বলল, শোনো, আর একটা কথা আছে। আমাদের বন্ধু কমপিউটার জিউস কোনও কথা বলছে না। সুতরাং ঠিক মতন টাচ ডাউন হবে কি না জানি না। তুমি এমার্জেন্সির ব্যবস্থা রেখো।

রাইন বলল, সে কী! তোমাদের কমপিউটার কাজ করছে না? ঘুমিয়ে পড়েনি তো। জাগাবার চেষ্টা করে দেখেছ?

ইউনুস বলল, হ্যাঁ দেখেছি। ও জাগবে না, ওর হার্ট বীট থেমে গেছে!

তা হলে নেমো না, এখন নেমো না! ওপরে ঘুরতে থাকো!

কতক্ষণ ঘুরব, আমাদের ফিউয়েল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে!

সর্বনাশ! কিন্তু কোনও উপায় নেই, ইউনুস। আর্মস্ট্রং স্টেশনে ফোর্সড ল্যান্ডিং নিষিদ্ধ। কমপিউটার খারাপ হলেও নামতে দেওয়া হয় না। এখানে কোনও রকম বিস্ফোরণের ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

তা হলে আমি কী করব?

তুমি যেমন ভাবে পারো রকেটটাকে ভাসিয়ে রাখো! যেটুকু ফিউয়েল আছে তা দিয়ে সোজা ওপরে উঠে যাও, তারপর আস্তে-আস্তে নামো! তার মধ্যেই ব্যবস্থা হচ্ছে।

কান্না থামিয়ে রা বললে, ইউনুস, রকেটটা হালকা করার জন্য আমি প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারি।

ইউনুস বলল, রা, তুমি ভুলে গেছ, আমাদের অম্লজান ট্যাবলেট সব শেষ। এমনি-এমনি রকেটের বাইরে যাওয়ামাত্র তোমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

রা কপাল চাপড়ে বলল, উঃ, এক সঙ্গে এতগুলো বিপদ!

ইউনুস বলল, রা, ধৈর্য ধরো। তুমি নী-কে সামলাও, দ্যাখো, নী কাঁপছে!

নী রা-কে জড়িয়ে ধরে বলল, রা-দি, আমি আমাদের জন্য ভয় পাচ্ছি না! কিন্তু ঝিলমদার কী হবে? ঝিলমদার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না! দ্যাখো, চামড়া দিয়ে একটু-একটু ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ভেতরে কিছু পুড়ছে।

রা ঝিলমের দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখে হাত চাপা দিল।

ইউনুস অনেকটা ওপরে উঠে এসে রকেটের সব কটা বুস্টার ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে সেটাকে পাখির মতন ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু বেশিক্ষণ এই ভাবেও থাকা যাবে না। আর্মস্ট্রং সেক্টারের পরিধি প্রায় পঞ্চাশ মাইল, তার একটা মাধ্যাকর্ষণ আছে, সে টানছে।

ঠিক চার মিনিটের মধ্যে দুটি রেসকিউ রকেট উড়ে এল নিচ থেকে। তারা ইউনুসের রকেটের দুদিকে জয়েন্ট করলে।

ইউনুস দরজা খুলে দিতেই তিনজন উদ্ধারকারী ঢুকে পড়ল। তাদের মধ্যে একজনকে ইউনুস আগে থেকেই চেনে। তার নাম জুকভ। মোটা-সোটা চেহারার অতি ভালো মানুষ।

জুকভ প্রথমে মহিলা দু-জনের দিকে তাকিয়ে মাথায় টুপি ছুঁয়ে অভিবাদন জানাল।

তারপর ইউনুসকে বলল, তোমাদের জীবন আনন্দময় হোক, ইউনুস। আর চিন্তা নেই। তোমরা আমাদের রকেটে ঢুকে পড়ো। এই বকেটের ভার আমরা নিচ্ছি!

অন্য একজন ঝিলমের দিকে তাকিয়ে বলল, এ কী! ওই লোকটি যে জ্বলছে!

জুকভ বলল, এ কে ইউনুস?

ও ঝিলম! ওর একটা বিপদ হয়েছে!

ঝিলম? চেনাই যাচ্ছে না! ওর গা থেকে আগুন বেরুচ্ছে কেন?

একজন উদ্ধারকারী বলল, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আপনারা পাশের রকেটে যান। কিন্তু ওই লোকটিকে তো নেওয়া যাবে না আর্মস্ট্রং সেন্টারে?

রা আর ইউনুস প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠল, সে কী! কেন নেওয়া যাবে না!

জুকভ দুঃখিত ভাবে বলল, তাই তো! আর্মস্ট্রং-এ কোনওরকম আগুন জ্বালানো নিষিদ্ধ! ঝিলমকে নিয়ে যাই কী করে? ওর গা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে।

রা বলল, আমস্ট্রং-এ আগুন নিষিদ্ধ ? কে বলেছে? ওখানে যে আমরা কত রকম রান্না খাই!

জুকভ বলল, হে মাননীয়া, আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন। আর্মস্ট্রং-এ সত্যিই কক্ষনো আগুন জ্বালানো হয় না। সমস্ত রান্না-বান্না হয় মাইক্রোওয়েভে।

ইউনুস বলল, শোনো জুকভ, ঝিলমের গা থেকে যা বেরুচ্ছে, তা আগুন নয়, অন্য কিছু। আগুনের মতনই দেখাচ্ছে যদিও। কিন্তু ওরকম ভাবে আগুনে পুড়লে কেউ বাঁচে? ওর গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখো, গা-টা ঠান্ডা!

জুকভ এগিয়ে গিয়ে ঝিলমের গায়ে হাত দেওয়াতেই ঝিলম একটা হাত তুলে তাকে একটা ধাক্কা মারল। অত বড় চেহারা নিয়েও সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ে গেল জুকভ!

নী চেঁচিয়ে বলল, ঝিলমদা, এরা আমাদের শত্রু নয়। বন্ধু! এরা আমাদের উদ্ধার করতে এসেছেন!

ইউনুস বলল, ও কিছু শুনতে পাচ্ছে না!

ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েও জুকভ কিন্তু রেগে গেল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, ওর গাটা ঠান্ডা! ওকে নেওয়া যেতে পারে।

একজন উদ্ধারকারী বলল, আমি দুঃখিত, মার্সাল জুকভ। ঠান্ডা হোক, গরম হোক। ওর গা থেকে আগুন বেরুচ্ছে, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! এই অবস্থায় ওকে নিচে নিয়ে গেলে আইন ভঙ্গ হবে!

ঝিলম হঠাৎ হেসে উঠল হা-হা করে। লোহার শিকলের ঝংকারের মতন সেই হাসির শব্দ। তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে এগোতে লাগল দরজার দিকে। তার হাঁটার ভঙ্গিটা মানুষের মতন নয়, খারাপ হয়ে যাওয়া রোবটের মতন।

রা আর্ত গলায় বলল, ওকে আটকান, আপনারা ওকে আটকান!

কেউ কিছু করবার আগেই ঝিলম পৌঁছে গেল দরজার কাছে। অন্য রকেটটি গায়ে-গায়ে লেগে আছে। ঠিক যেমন পা দিয়ে নৌকো সরিয়ে দেওয়া হয়। সেইরকম ভাবে ঝিলম অন্য রকেটটির গায়ে একটা লাথি মারল। অসীম তার ক্ষমতা! অন্য রকেটটি একটু সরে যেতেই ঝিলম ঝাঁপ দিল শূন্যে।

রা আর নী একসঙ্গে কেঁদে উঠল।

জুকভ চোখ বুঁজে ফেলে বলল, ইস, ছি-ছি-ছি! ঝিলম এত ভালো ছেলে, এরকম দুঃসাহসী অভিযাত্রী আমি খুব কম দেখেছি। তার এই পরিণতি! সব শেষ!

ইউনুসই একমাত্র ঘাবড়াল না। সে বলল, রা তুমি এরকম করছ কেন?

মিডাস নক্ষত্রের কথা মনে নেই? ঝিলমের কিছু হবে না?

তারপরই সে বেতার-টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলল, রাইন, রাইন! খুব জরুরি, তুমি শুনতে পাচ্ছ? ঝিলম একলা নেমে পড়েছে, তোমরা ওকে গুলি করার চেষ্টা করো না...

রাইন বলল, একলা নেমে পড়েছে মানে? প্যারাসুট ডাইভ? এখানে একটা ফোর্স ফিল্ড আছে জানো না? সোজা আছড়ে পড়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে!

ইউনুস বলল, ঝিলমের সেসব কিছু হবে না। ঝিলম সেসবের ঊর্ধ্বে চলে গেছে। আমি শুধু বলছি, ওর গায়ে আগুন জ্বলছে তোমরা দেখতে পাবে। কিন্তু ওটা আগুন নয়। ওর কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করো না। বন্ধুত্বের দিব্যি দিলাম। তুমি ঝটিকা বাহিনীকে জানিয়ে দাও!

তারপর সে জুকভের দিকে ফিরে বলল, শিগগির চলুন!

২

রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল লী পো আজই পৌঁছেছেন আর্মস্ট্রং সেন্টারে। গত শতাব্দীর প্রথম মহাকাশযাত্রী ইউরি গ্যাগারিন-এর নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে মঙ্গলগ্রহে, তিনি সেটা উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন। তারপর ভিনাসে যাওয়ার পথে তিনি এখানে থেমেছেন দু-দিন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য।

জেনারাল লী পো-র বয়স হয়েছে। দুপুরে তিনি একটু ঘুমোতে ভালোবাসেন! তা ছাড়া অনেকদিন বাদে তিনি এখানে ভালো-ভালো আসল জাপানি খাবার খেয়েছেন।

তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে শান্তি বাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার একটি চমকপ্রদ খবর দিল।

আকাশ থেকে একজন মানুষ নাকি এখানে একা-একা নেমেছে। আগুন বেরুচ্ছে তার গা দিয়ে। কিছুতেই বন্দি করা যাচ্ছে না তাকে। কোনও অস্ত্রই তার গায়ে লাগছে না। নীল আর্মস্ট্রং-এর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে সে নাকি পাগলের মতন হা-হা করে হাসছে!

ঘুম চোখ রগড়াতে-রগড়াতে জেনারেল লী পো বললেন, কী সব গাঁজাখুরির কথা শোনাচ্ছ আমাকে! এখানে কোনও আবহাওয়াই নেই, তার মধ্য দিয়ে কোনও মানুষ এমনি-এমনি নামতে পারে? কোনও মানুষের পক্ষে এক মিনিটও বেঁচে থাকা অসম্ভব!

অফিসারটি বলল, সার, তা হলে বোধহয় এ মানুষ নয়, আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি। সে বেঁচে আছে!

মানুষ নয়, তবে কী।

অনেকে বলছে, মানুষের মতন চেহারা হলেও আমাদের বিজ্ঞানের অজানা কোনও প্রাণী। কেউ-কেউ বলছে দেবতা!

লী পো ভুরু কুঁচকোলেন!

বহু জায়গা ঘুরে তিনি দেখেছেন যে বিজ্ঞানের এত উন্নতি হলেও এখনও অনেক বৈজ্ঞানিকের মনে নানা রকম কুসংস্কার আছে। তারা কেউ মনে করে যে এই মহাশূন্যের কোথাও দেবতাদের বাস। স্বর্গ বলে একটা জায়গা আছে।

তিনি বললেন, চলো তো, দেখে আসি!

আর্মস্ট্রং সেন্টারে মনোরেল চলে চব্বিশ ঘণ্টা। তাতে চেপে যে-কোনও জায়গায় পৌঁছানো যায়।

চাঁদে প্রথম যে মানুষটি পা দিয়েছিল সেই নীল আর্মস্ট্রং-এর একটি বিশাল মূর্তি আছে এখানে। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল দারুণ ভিড় জমে গেছে। রক্ষী বাহিনীর লোকেরা

ঘিরে রেখেছে মাঝখানের জায়গাটা। সেখানে সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে মানুষের মতন চেহারার একটি প্রাণী। তার শরীর থেকে লক-লক করছে আগুনের শিখা।

লী পো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সত্যিই লোকটি আকাশ থেকে নেমেছে?

রক্ষী বাহিনীর প্রধান এসে জানাল. স্যার, আমরা একে জান দিয়ে বন্দি করবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়েছি, ওর গায়ে লাগেনি। এমনকী গুঁড়ো করার যন্ত্র চালু করেছি, তাতেও এর কিছু হয়নি। একে বন্দি করার সাধ্য আমার নেই!

লী পো জিগ্যেস করলেন, এ কী কারুর কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে?

প্রধান জানাল, না, সার, তা করেনি। কিন্তু ওর গা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে, সেটাই তো যথেষ্ট বিপদের কারণ! প্রতি মুহূর্তে এখানকার অমূল্য বাতাস খরচ হয়ে যাচ্ছে!

লী পো এগিয়ে গিয়ে প্রথমে এসপারান্টো ভাষায় জিগ্যেস করলেন, হে আগুন্তুক, আমি শান্তি বাহিনীর অধ্যক্ষ, গ্রহ-গ্রহান্তরে, সৌরমন্ডলে, মহাশূন্যে শান্তি আসুক। আপনি কে?

অগ্নিময় প্রাণীটি কোনও উত্তর না দিয়ে হা-হা করে হাসলেন!

লী পো এবারে সরল ইংরিজিতে জিগ্যেস করলেন, আপনি কে?

একই রকম ব্যাপার হল।

তারপর তিনি চীনা, স্প্যানিশ, বাংলা, ল্যাটিন, জাপানি ও সংস্কৃত ভাষায় একই প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন, কোনও কাজ হল না।

এই সময় ভিড় ঠেলে ইউনুস লী পোর কাছে এসে তাঁর বাহু ছুঁয়ে বলল, সার, আপনার সঙ্গে একট্যা জরুরি কথা আছে।

লী পো বললেন, পরে-পরে। আমি এখন ব্যস্ত।

ইউনুস বলল, স্যার, আমি এই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি। আমার নাম ইউনুস, আমাকে চিনতে পারছেন না?

লী পো এবারে কৌতূহলী হয়ে ফিরে তাকালেন। বললেন, ইউনুস? হ্যাঁ তোমাকে তো দেখেছি। তুমি বিখ্যাত অভিযাত্রী ঝিলমের বন্ধু। সে কোথায়?

ইউনুস বলল, স্যার আপনি চোখের সামনে ওই যাকে দেখছেন, সে-ই ঝিলম!

লী পো প্রচণ্ড বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, তুমি বলছ কী, ইউনুস? ঝিলমের এই অবস্থা! আমি যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। ওকে আমি এত ভালোবাসি, অথচ ওর চেহারা দেখে আমি চিনতে পারছি না! তুমি জানো, মিডাস নক্ষত্রে ঝিলম যা করেছে সেজন্য ওকে বিশ্বশান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেই পুরস্কার যে ওর হাতে তুলে দেব, সেজন্য তো ওকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। ওর কী করে এই অবস্থা হল, আমায় বলো!

অনেক কিছু বলতে হবে। এখানে হবে না। স্যার, চলুন, কোনও নিরিবিলিতে যাই।

কিন্তু ও, মানে ঝিলম, এখানে ওই অবস্থায় থাকবে?

ওকে বন্দি করার কোনও উপায় নেই। আমাদের জানা বিজ্ঞানের অনেক বাইরে ও চলে গেছে। চলুন, আপনাকে সবকথা খুলে বলব। ঝিলম এখানেই থাক।

৩

রা আর নী-কে জোর করেই ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদের মন এমনই দুর্বল হয়ে গেছে যে এখন খুব বিশ্রাম দরকার। তিন দিনের আগে ওরা জাগবে না।

ইউনুস আর লী পো এসে বসলেন তারাসকোভা উদ্যান-রেস্তোরাঁয়।

মহাশূন্যের ঘোরাঘুরির ধকলের পর গন্ধলেবুর সরবত খেলে অনেকটা চাঙ্গা লাগে। ইউনুস সেই একটা সরবত নিল। লী পো নিলেন এক গেলাস পোর্ট।

ইউনুস বলল, স্যার, মিডাস নক্ষত্রে ঝিলম কী করেছে, তা তো আপনি জানেন। সেখানকার লোকেরা বিচ্ছিন্ন মহাকাশ যাত্রীদের ধরে-ধরে চোখের মণি আর কানের পরদা চুরি করছিল। ঝিলম তাদের শাস্তি দিয়ে ওই ব্যাপারটা বন্ধ করেছে।

লী পো বললেন, জানি, সেইজন্যই তো ঝিলমের নামে বিশ্বশান্তি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু ঝিলম কী করে পোড়া মিডাস নক্ষত্রে থামল, সেখানকার সাংঘাতিক হিংস্র লোকদের দমন করল, সেটা শুনেছেন কি?

না, পুরোটা শুনিনি!

আপনার কি একবারও মনে এই প্রশ্ন জাগেনি যে ঝিলম একা-একা কী করে এই অসাধ্য সাধন করল?

তোমরাও সাহায্য করেছ তাকে। ঝিলম-দুঃসাহসী।

আমরা কিছুই করিনি। সবকিছুই করেছেন মহাত্মা হো-সান!

মহাত্মা হো-সান? কী বলছ তুমি ইউনুস? তিনি এখনও বেঁচে আছেন!

এই মুহূর্তে বেঁচে আছেন কিনা জানি না। আমরা যখন তাঁকে শেষ দেখি, তখন তাঁর বয়েস একশো বিরাশি বছর। স্বাস্থ্য বেশ ভালো, বুদ্ধিও পরিষ্কার। তিনি আরও বেশ কিছুদিন বাঁচবেন আশা কবা যায়।

কিন্তু ঝিলমকে তিনি কীভাবে সাহায্য করলেন?

আপনি জানেন, মহান বিজ্ঞানী হো-সান নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁর নিজস্ব একটা শূন্য যান আছে, সেটাতে আর কেউ থাকে না। খাবার-দাবার কিছুরই তাঁর প্রয়োজন নেই, তিনি কোথায় কখন ভেসে বেড়ান তা কেউ জানে না।

তিনি ঝিলমকে কী করেছেন! বলো-বলো, ইউনুস, আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না।

মিডাস নক্ষত্রে অভিযান চালানোর আগে আমরা হো-সানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি ঝিলমকে খুব ভালোবাসেন। ঝিলমকে তিনি ডাকেন 'দুষ্টু ছেলে' বলে। রা-কে উনি নিজের মেয়ের মতন মনে করেন। তাই আমরা গিয়েছিলাম ওঁর আশীর্বাদ চাইতে।

আসল কথাটা বলো, ইউনুস।

সবটা খুলে না বললে আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনি কি জানেন, হো-সান এমন একটা শক্তি নিয়ে গবেষণা করেছেন, যেরকম শক্তির কথা কেউ কখনও শোনেনি?

না, জানি না তো!

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে হো-সান মহাবিশ্বের সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন যে আর কেউ যেন কোনওরকম অস্ত্র না বানায়। মানুষ আর মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের লড়াই হবে না।

এসব তো পুরোনো কথা। অনেকেই হো-সানের কথা মানেনি। অনেকে বলেছিল, মানুষে-মানুষে লড়াই না হলেও মহাশূন্যের কত গ্রহ-নক্ষত্রে অন্য অনেকরকম সাঙ্ঘাতিক প্রাণী থাকতে পারে। তাদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য অস্ত্র বানাতেই হবে।

মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বা বুদ্ধিমান কোনও প্রাণীর খোঁজ কিন্তু এখনও পাইনি। কমিক স্ট্রিপে কিংবা টেলিভিশানের ছোটদের নাটকে নানারকম অতিকায় অদ্ভুত-অদ্ভুত প্রাণী দেখানো হয় বটে, কিন্তু আপনি তো মহাশূন্যে চড়ে বেড়িয়েছেন, আপনি যে কোনও ড্রাগন কিংবা মাকড়সা কিংবা ইঁদুর-মুখো মানুষ দেখেছেন?

না, দেখিনি। মহাশূন্যে আমরা অন্য কোনও প্রাণীর সন্ধান এখনও পাইনি, তা ঠিক।

হো-সানের কথা বৈজ্ঞানিকরা শুনলেন না বলেই তো তিনি রাগ করে নির্বাসনে চলে গেলেন। সেখানেও কিন্তু তাঁর গবেষণা থেমে যায়নি। তিনি এমন একটা শক্তি নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন, যেটা হবে সমস্ত অস্ত্রের চেয়ে বেশি জোরাল।

তার মানে, আর একটা অস্ত্র।

না। সেই শক্তি দিয়ে অন্য কারুকে মারা যাবে না। কিন্তু প্রতিরোধ করা যাবে। যে মানুষ সেই শক্তিটা পাবে, কোনও অস্ত্রই তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। তাকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেও সে পুড়বে না। বাজুকা দিয়ে তাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও তার গায়ে আঁচড় লাগবে না। এমনকী নিউক্লিয়ার পাওয়ার দিয়েও তাকে একচুল সরানো যাবে না।

লী পো চেয়ারে মাথা হেলান দিয়ে হতাশভাবে বললেন, এসব তুমি আমাকে কী শোনাচ্ছ ইউনুস? এইজন্য আমাকে ডেকে আনলে? এ কখনো সম্ভব?

ইউনুস লী পো-র হাতটা চেপে ধরে ব্যগ্রভাবে বলল, সার আপনি কথাটা শুনুন। যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না, হো-সান তাও বাস্তবে পরিণত করতে পারেন।

কিন্তু এরকম শক্তিও তো খুব বিপজ্জনক। এরকম শক্তি যদি কেউ পায়, তাহলে সে তো সমস্ত মানুষের ওপর প্রভুত্ব করতে চাইবে। সে হবে মহাবিশ্বের ডিকটেটর। আগেকার দিনে যাকে ভগবান বলত।

না। হো-সান সেদিকটা চিন্তা করেছেন। এই শক্তি শুধু তো শরীরের পরিবর্তন ঘটায় না। মনেরও পরিবর্তন ঘটায়। এই শক্তি যে পাবে, কোনও মানুষের ক্ষতি করার চিন্তা তার মনেই আসবে না। সে রাজা হতে চাইবে না। কারুর ওপর আধিপত্য করতেও চাইবে না।

হো-সান কি সত্যিই এইরকম শক্তি আবিষ্কার করেছেন!

হ্যাঁ করেছেন। তবে এখনও এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজে আছে, কোনও মানুষের ওপর তো সেটা পরীক্ষা করতে হবে। তিনি সেটা করতেই ভয় পাচ্ছিলেন।

নিজের ওপর করছিলেন না কেন?

নিজের ওপর করলে যদি কোনও গোলমাল হয়, তা হলে আর শোধরাবার উপায় থাকবে না।

তা ঠিক।

ঝিলমকে তো জানেন, ও কী রকম পাগল? ঝিলম একরকম জোর করেই বাধ্য করিয়েছে তাঁকে।

সেইজন্যই ঝিলম ওইরকম হয়ে গেছে?

সেই প্রতিরোধ শক্তি নিয়ে ঝিলম একা মিডাস নক্ষত্রে নামল। আমরা ওপর থেকে দেখছিলুম। সেখানকার লোকগুলি কী সাঙ্ঘাতিক তা তো আপনি জানেন। অনেক রকম উন্নত অস্ত্রও ওদের ছিল। ঝিলমকে ওরা কিছুতেই ধ্বংস করতে পারল না। শেষপর্যন্ত ওরা ভয় পেয়ে ঝিলমকে মনে করল কোনও দেবতা।

এখানেও অনেকেই তা ভাবছে।

মিডাস নক্ষত্রের অভিযানে তো ঝিলম সার্থক হল। তার পরেই শুরু হল গন্ডগোল। আগেই বলেছি, জিনিসটা এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজে ছিল, এর কী কী সাইড এফেক্ট হতে পারে, তা দেখা হয়নি। দু-এক দিনের মধ্যেই ঝিলম-এর স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেল। সে আমাদের চিনতে পারে না। বোধহয় ও কানেও শুনতে পায় না এখন। তারপর ও গা থেকে আগুনের শিখা বেরুতে লাগল। আগেকার দিনে বিভিন্ন ধর্মের ভগবানের ছবিতে যেসব মূর্তির মাথা বা শরীর ঘিরে একটা জ্যোতি দেখা যেত, অনেকটা সেইরকমই হয়! তা হলে কি ঝিলম ভগবানই হয়ে গেল?

লী পো এক ধমক দিয়ে বললেন, কীসব বাজে কথা বলছ, ইউনুস। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও এসব কথা তোমার মাথায় আসে? ভগবান বলে কিছু আছে নাকি? ভগবান তো মানুষের একটা সুন্দর কল্পনা। আমরা মহাশূন্যে তোলপাড় করে খুঁজে দেখেছি। ভগবান বা দেবতা বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। ঝিলম-এর এই অবস্থা হয়েছে, ওকে আবার হো-সানের কাছে নিয়ে যাওনি কেন? ঝিলম তো যেতে চাইছে না?

ইউনুস দু-হাতে মুখ ঢেকে বলল, না জেনারেল, দোষ হয়তো আমারই। আমি শত চেষ্টা করেও হো-সানকে আর খুঁজে পাচ্ছি না। যে গোল বুদবুদটায় তিনি থাকেন, সেটা যে এখন কোথায় তা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। ঝিলম সুস্থ থাকলেও সে হয়তো খুঁজে বার করতে পারত। আমি কিংবা রা কিছুতেই পারিনি। কোটি-কোটি কিলোমিটার আমরা ঘুরে বেরিয়েছি, আমাদের খাদ্য ফুরিয়ে গিয়েছিল, আমরা না খেয়ে থেকেছি! কিন্তু রকেটটা আর ধকল সহ্য করতে পারছিল না। খুব সম্ভবত মেটাল ফেটিনো আমাদের কম্পিউটার অচল হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় আমরা এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি।

লী পো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে এক্ষুনি তো ঝিলমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ঝিলমকে যে ধরাই যাচ্ছে না। ও যদি চিকিৎসা করতে রাজি না হয়?

ইউনুস বলল, সে ব্যবস্থা করা যাবে। ঝিলমের মধ্যে একখানা একটা মানবিক ব্যাপার আছে। ও একটানা বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারে না। এক সময় ও ঘুমিয়ে পড়বে। তখন দেখবেন, ওর শরীরটা তুলোর মতন হালকা। একটা বাচ্চা ছেলেও ওকে তুলে নিয়ে যেতে পারবে।

৪

এ পর্যন্ত যত রকম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়েছে, সেই সবের থেকেও মানুষের মন যে কত বেশি শক্তিশালী তা বোঝা যায় কয়েকজন মানুষকে দেখে।

কে সেইরকম একজন মানুষ।

কে'র পুরো নাম কেউ জানে না, পৃথিবীর কোন অঞ্চলে তার জন্ম তাও সে বলে না। বেঁটে-খাটো ছোট্ট চেহারার মানুষ মাথায় চকচকে টাক, গায়ের রং ফরসা। কে এখানকার একটি হোটেলের ম্যানেজার।

তার এমন একটা গুণ আছে যে কোনও কম্পিউটারও এপর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারেনি।

ঘুমন্ত ঝিলমকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর পাঁচ জন বড়-বড় ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। কিন্তু ঝিলমের শরীর থেকে ঠান্ডা আগুনের শিখা কেন বেরুচ্ছে তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না। এক্সরে-তে ঝিলমের শরীরের ভেতরের কোনও ছবিই উঠল না।

পাঁচজন ডাক্তারই স্বীকার করলেন, এ যা দেখছেন, তা তাঁদের অভিজ্ঞতার বাইরে। কোনও মানুষের শরীর যে এরকম হতে পারে তা তাঁরা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতেন না।

এখন হো-সানকে খুঁজে বার করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

এক হাজারটা মহাশূন্যে কেন্দ্রে খবর পাঠানো হল। কেউ হো-সান-এর কোনও সন্ধান দিতে পারল না। তিনি ইচ্ছে করেই কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না।

তখন লী পো আর ইউনুস হো-সান-এর একটি ছবি নিয়ে এল কে-র কাছে।

কে কাউন্টারে বসে হিসেব মেলাচ্ছিল। ওদের দেখে হাসিমুখে বলল, শুভ সন্ধ্যা! সুন্দর জীবন! আবার কার খোঁজ পড়ল?

লী পো বললেন, মাননীয় কে, আপনার সুন্দর স্বাস্থ্য কামনা করি। একটা বিপদে পড়ে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি।

হাতের ছবিটা তুলে ধরে লী পো জিগ্যেস করলেন, এই মানুষটি কোথায় আছে আপনি বলতে পারেন? ইনি বেঁচে আছেন না মরে আছেন?

কে কয়েক পলক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ছবিটির দিকে।

তারপর বলল, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। এই ছবির চেয়েও ইনি এখন অনেক বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন। বেঁচে আছেন। সাবানের ফেনা দিয়ে যেরকম বুদবুদ হয়, ইনি সেইরকম একটা গোল স্বচ্ছ জিনিসের মধ্যে রয়েছেন। তার মধ্যে বাড়ি আছে, বাগান আছে। ইনি শুয়ে আছেন খাটে। মোষের শিং-এর মতন একটা কিছু। সেটাতে উনি ফুঁ দিচ্ছেন, তাতে শব্দ হচ্ছে।

ইউনুস লী পোর হাত চেপে ধরে বলল, ইনি ঠিক বলেছেন, ঠিকই দেখতে পাচ্ছেন। হো-সান মোষের শিং-এর ভেঁপু বাজান মাঝে-মাঝে।

লী পো বললেন, মাননীয় কে, এই বুদবুদটা কোথায়? তার অবস্থানটা বলতে পারেন?

কে হেসে বলল, ওইটা তো আমি বলতে পারব না। আমি অঙ্কে বড্ড কাঁচা।

তবে দূরত্ব দেখে মনে হচ্ছে আমাদের চেনাশুনো কোনও গ্রহের কাছাকাছি নয়। ওখানে আকাশের রং সাদা।

যাক, তবু জানা গেল হো-সান বেঁচে আছেন। তার সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় কী এখন?

সমস্ত মহাশূন্য স্টেশন থেকে বেতার তরঙ্গে বহু ফ্রিকোয়েন্সিতে খবর পাঠানো হতে লাগল। যদি হো-সানের কাছে পৌঁছয়। কিন্তু কোনও সাড়া এল না। হো-সান এমনিতেই কারুর সঙ্গে সংযোগ রাখতেই চান না।

আর একটা শেষ চেষ্টা করা যেতে পারে।

ইদানীং দেখা গেছে চর্চা করলে মনের শক্তি অনেক বাড়ানো যায়। বেতার তরঙ্গ যতদূর পৌঁছয় তার চেয়েও অনেক তাড়াতাড়ি আর অনেক দূরে পাঠানো যায় মানসিক তরঙ্গ।

খুব মন দিয়ে একজনের কথা চিন্তা করলে সে অনেক দূরে থাকলেও তা টের পেয়ে যায়। কারুর-কারুর এই মানসিক শক্তি অনেক বেশি হয়। ট্রেনিং নিলে মনের এই শক্তি বহু গুণ বাড়ানো যায়। এই ট্রেনিং-এর জন্য অনেকগুলি কলেজ খোলা হয়েছে।

মেয়েদেরই এই শক্তি বেশি হয়। অন্য একটি স্টেশন থেকে ডেকে আনা হল মার্থা আর ভারতীকে।

তারপর কে, মার্থা আর ভারতীকে বসানো হল হাসপাতালের একটি ঘরে। পাশেই শুয়ে আছে ঝিলম। সে এখন ঘুমুচ্ছে, তবু সারা শরীর থেকে বেরুচ্ছে আগুনের হলকা।

কে শুধু দেখতে পায়, কিন্তু মানসিক বার্তা পাঠাতে পারে না। মার্থা আর ভারতী চোখ বুজে ঠিক ধ্যান করার ভঙ্গিতে বসে আছে।

এক ঘণ্টার বেশি কেটে গেল, কেউ একটাও কথা বলল না। ইউনুস, রা আর নী দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। ওরা আর ধৈর্য ধরতে পারছে না।

রা ফিসফিস করে বলল, ইউনুস আমি একটা কথা ভাবছি। হো-সান ওইরকম একটা পরীক্ষামূলক শক্তি ঝিলমের ওপর ব্যবহার করলেন, তারপর তার ফলাফল কী হল সেটা তিনি জানতে চাইলেন না? ঝিলমের যে কোনও বিপদ ঘটতে পারে, সেটা তিনি ভাবেননি?

ইউনুস বলল, ঝিলম তো ইচ্ছে করেই, বলতে গেলে জোর করেই ওটা নিয়েছে।

তবু উনি ঝিলমের জন্য চিন্তা করবেন না? এটা কখনো হতে পারে?

উনি হয়তো ভেবেছেন, আমরাও যাব ওঁর কাছে! আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলব সেটা উনি বুঝবেন কী করে?

আমাদের দেরি হচ্ছে দেখে উনি নিজেই আমাদের খোঁজ করতে পারতেন।

হয়তো উনি খুব অসুস্থ!

এর মধ্যে ভারতী বলে উঠল, সাড়া পাচ্ছি! হো-সান আমার কথা শুনতে পেয়েছেন।

কে বলল, হো-সান বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। উনি জল খাচ্ছেন।

ইউনুস বলল, ভারতী, তুমি ওকে ঝিলমের কথা জানিয়েছ?

ভারতী কোনও উত্তর দিল না। সে সম্মোহিতের মতন হয়ে আছে। সে অন্য কিছু শুনতে পাচ্ছে না। তাঁর ঠোঁট নড়ছে।

কে বলল, হো-সান এদিকেই তাকালেন। তাঁর মুখে হাসি।

কে তাকিয়ে আছে সাদা, দেয়ালের দিকে। অথচ সে এমনভাবে কথা বলছে যেন সিনেমার পরদায় ছবি দেখতে পাচ্ছে।

ভারতী আবার বলে উঠল, মহাত্মা হো-সান, আপনি ঝিলমকে ডাকছেন? আপনি কোথায়? ঝিলম অত দূর যাবে কী করে?

কে বলল, হো-সান হাত তুলছেন। তাঁর হাতে একটা চকচকে পাথর।

ইউনুস বলল, ওটা ওঁর ক্রিস্টাল সেট। ওটা থেকে তিনি গান-বাজনা শোনেন।

ভারতী আবার বলল, হো-সান আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আপনি কোথায়? আপনি কোথায়?

কে বলল, হো-সান হাসছেন। উনি আমাদের কথা শুনে মজা পাচ্ছেন মনে হল।

রা কান্না-কান্না গলায় বললেন, আপনারা কেউ ওঁকে বলুন, ঝিলমের সাংঘাতিক বিপদ। ও আমাদের চিনতে পারছে না। ওর গায়ে আগুন জ্বলছে!

এই সময় ঝিলম ঘুম ভেঙে উঠে বসতেই সবাই চুপ করে গেল।

ঝিলম ঘরের সবার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি শান্ত। উঠে দাঁড়িয়ে সে হাত দুটোকে প্রার্থনার ভঙ্গিতে ওপরে তুলল। তার সারা শরীরে আগুনের শিখা এমন লক-লক করে উঠল যে সেদিকে আর চোখ রাখা যাচ্ছে না।

ঝিলম পরিষ্কার গলায় বলল, আমায় যেতে হবে? আমি যাচ্ছি!

এবারে ভারতী নামের মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল ঝিলমের দিকে। তার চোখ বন্ধ। সে ফিসফিস করে বলল, ঝিলম, আমি হো-সান বলছি। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। আমার চেষ্টা সার্থক হয়েছে!

রা ইউনুসের হাত চেপে ধরল। ভারতীর গলা দিয়ে হো-সান কথা বলছেন।

ঝিলম বলল, গুরুদেব, আমি ভয় পাইনি। আমি জানতাম, আপনি আমার ওপর নজর রাখছেন।

ভারতী বলল, ঝিলম, তোমার মেটামরফোসিস হয়ে গেছে, তুমি আর সাধারণ মানুষ রইলে না। যে প্রচণ্ড শক্তি তোমার মধ্যে ঢুকেছে, তা দিয়ে তুমি বিশ্ব জয় করতে পারো। তুমি কি তাই-ই চাও?

ঝিলম বলল, না গুরুদেব, আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না। আমার মনে হয়, আমার সব আছে।

ভারতী বলল, ঝিলম, তোমার আর কোনওদিন ক্ষুধা বা তৃষ্ণাও পাবে না। তুমি সবসময় পরিপূর্ণ। কিন্তু তুমি আর মানুষের মধ্যেও থাকতে পারবে না। তোমার শরীর ক্রমশ আগুনের মতন জ্যোতিতে ছেয়ে যাবে। মানুষ তোমার দিকে তাকাতে পারবে না। তুমি চলে এসো!

ঝিলম বলল, কোথায়?

ভারতী বলল, ঝিলম, তুমি আমার উত্তরাধিকারী। আমার আয়ু আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। তুমি আমার এই বুদবুদে চলে এসো। তুমি একা থাকলেই তোমার শক্তি আরও বাড়বে!

ঝিলম বলল, আমি আসছি।

রা ছুটে এসে বলল, না ঝিলম, তুমি যেও না। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে?

ভারতী আস্তে-আস্তে বসে পড়ল, তারপর চোখ খুলে বলল, আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না। কে বলল, হো-সান শুয়ে পড়েছেন। দু-হাতে মুখ চাপা দিয়েছেন।

ঝিলম বলল, আমি আর দেরি করতে পারছি না!

রা বলল, ঝিলম-ঝিলম, আমি রা। আমাকে চিনতে পারছ না? ঝিলম বলল, হ্যাঁ আমি তোমায় চিনতে পারছি। তোমার নাম রাভী? ডাক নাম রা। কিন্তু আমি আর ঝিলম নই। ঝিলমের চোখ, কান, নাক, মগজ কিছুই আর আমার নয়। আমি এখন আর মানুষ নই।

রা বলল, তা হলে তুমি কী?

ঝিলম বলল, আমি একটা ইচ্ছাশক্তি। সেই জন্যই আমাকে আর কেউ ধ্বংস করতে পারবে না।

রা বলল, তুমি চলে যাচ্ছ, আমরা তোমাকে আর দেখতে পাব না?

ঝিলম বলল, আমি ফিরে আসব। মাঝে-মাঝেই ফিরে আসব। আমি তো সমস্ত মানুষেরই ইচ্ছাশক্তি!

ঝিলম বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। সবাই চলে এল তার পেছন-পেছন।

দূর থেকে জেনারেল লী পো ছুটতে-ছুটতে এসে বললেন, কী হল, হো-সান-এর সন্ধান পাওয়া গেল?

ইউনুস বলল, হ্যাঁ। ঝিলম আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

জেনারেল লী পো বললেন, না, না, ও কোথায় যাবে! আমি রাষ্ট্র সঙ্ঘের হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠিয়েছি। সেখান থেকে বাছাই করা একটা মেডিক্যাল টিম পাঠাচ্ছে, তারা ঝিলমকে পরীক্ষা করে দেখবে।

ঝিলম তার দিকে তাকিয়ে বলল, জেনারেল, বিদায়, আমি চলে যাচ্ছি! লী পো বললেন, ঝিলম, তুমি আমায় চিনতে পেরেছ? যাক নিশ্চিন্ত হলাম। তোমার এখন কোথাও যাওয়া হবে না। সব গেট বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কোনও রকেট তোমাকে নেবে না। তোমার নিজের রকেট খারাপ হয়ে আছে।

ঝিলম হাসল। আবার তার হাসিতে ঝলসে উঠল আগুনের শিখা। কিন্তু সে খুব নরম গলায় বলল, আর আমার রকেটের দরকার হবে না। আমাকে যেতে হবে হো-সানকে বাঁচিয়ে তুলতে।

এক মুহূর্তে একটা বিদ্যুৎ-চমকের মতন ব্যাপার হল। সবাই চোখ বুজে ফেলল। তারপর চোখ মেলতেই দেখা গেল ঝিলম সেখানে নেই।

রা বলল, ওই যে, ওই যে ঝিলম আকাশে উড়ে যাচ্ছে!

লী পো ওপরের দিকে তাকিয়ে মহা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, মাই গড! একজন মানুষ, কোনও কিছুর সাহায্য ছাড়াই উড়ে যাচ্ছে আকাশ দিয়ে? এ কোন বিজ্ঞান?

ক্রমশ ছোট হতে-হতে একটা বিন্দু হয়ে মহাকাশে মিলিয়ে গেল ঝিলম।

বিশ্বমামা ও নকল ফুল

ঘরে ঢুকেই বিশ্বমামা বললেন, কীসের একটা সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি। ছোটমাসি বললেন, সে কি, তুই ফুলের গন্ধ চিনিস না? আমেরিকায় গিয়ে কি ফুলের গন্ধও ভুলে গেলি?

ঘরের এক পাশে একটা নিচু টেবিলের ওপর একটা ফুলদানিতে একগুচ্ছ ফুল রাখা আছে। সাদ. আর গোলাপি রং মেশা। ফুলদানিটার গায়েও সুন্দর ছবি আঁকা।

বিশ্বমামা ভুরু কুঁচকে বললেন, ফুলের এত তীব্র গন্ধ? তবে যে অনেকে বলে, আজকাল ফুলের গন্ধ খুব কমে গেছে। গোলাপ ফুলে গন্ধই থাকে না।

আমার দিকে ফিরে বিশ্বমামা জিগ্যেস করলেন, এগুলো কী ফুল রে নীলু?

এই রে, আমি বিপদে পড়ে গেলুম। আমি তো অত ফুল চিনি না। গোলাপ, গাঁদা আর জবা চিনতে পারি বড়জোর। 'ঘেঁটু' বলে একটা ফুলের কথা গল্পের বইতে পড়েছি। কিন্তু সেটা কী রকম দেখতে, তা আমি জানি না।

আমার মুখের অবস্থা দেখেই বিশ্বমামা বুঝে গেলেন।

এবার আমার দাদার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, বিলু, তুই বলতে পারবি?

দাদা আমার থেকে অনেক চালাক।

সে বললে, ওগুলো কী ফুল নয়, তা আমি বলতে পারি। সূর্যমুখী নয়, রজনীগন্ধা নয়, চাঁপা ফুল নয়, কুমড়ো ফুল নয়।

ছোটমাসি বললেন, ধ্যাৎ! কুমড়ো ফুল কেউ ফুলদানিতে রাখে নাকি?

দাদা বললে, রাখলেই হয়। কুমড়ো ফুল বুঝি ফুল নয়?

ছোটমাসি বললেন, কুমড়ো ফুল ভাজা করে খায়। আজই খাওয়ার টেবিলে পাবি।

বিশ্বমামা বললেন, বাঃ, কুমড়ো ফুল ভাজা আমার খুব ফেভারিট। বিদেশে আজকাল এঁচোর আর পটল পর্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু কুমড়ো ফুল কোত্থাও দেখিনি।

বিশ্বমামা তো সারা বিশ্ব টহল দিয়ে বেড়ান। অনেক দেশে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়। প্রায়ই থাকেন না কলকাতায়। মাঝে-মাঝে যখন আসেন, তখন অনেক আত্মীয়দের বাড়িতে তাঁকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো হয়। ওঁর দুই ভাগ্নে হিসেবে নেমন্তন্ন জুটে যায় আমাদেরও।

আজ ছোটমাসির বাড়িতে নেমন্তন্ন।

সব চেনাশুনো বাড়ির মধ্যে ছোটমাসির বাড়ির নেমন্তন্নই সবচেয়ে বিখ্যাত।

পাঁচ রকমের মাছ আর তিন রকমের মাংস তো থাকবেই।

ছোটমাসি বললেন, আর কেউ এত সহজে গন্ধ পায় না, বিশ্ব ঠিক গন্ধ পাবেই। ছোটবেলা থেকেই ও এরকম। কত বড় নাক।

বিশ্বমামা নিজের লম্বা নাকটার ওপর হাত বুলিয়ে বললেন, আমি এক কিলোমিটার দূর থেকেও যে-কোনও জিনিসের গন্ধ পাই। এই গন্ধটা চেনা-চেনা লাগছে, কিন্তু এই ফুল আগে দেখিনি।

ফুলদানির পাশের সোফায় বসে পড়ে বিশ্বমামা ফুলের তোড়াটা ভালো করে দেখতে লাগলেন।

ছোটমেসো মুখের সামনে মেলে ধরে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। এবার কাগজটা সরিয়ে মুচকি হেসে বললেন, ওটা বিদেশি ফুল। বিশ্ব, তুমি তো অস্ট্রেলিয়া ঘুরে এসেছ, সেখানে দেখোনি?

বিশ্বমামা বললেন, কোনও দেশে গেলেই কি সেখানকার সব ফুল দেখা যায়? অনেক জায়গায় ফুল দেখার সময়ই পাই না। এ ফুল এখানে কোথায় ফোটে? বেশ টাটকা দেখছি, এখনও শিশির লেগে আছে।

ছোটমেসো বললেন, হর্টিকালচার বাগানে ফোটে। আমাদের বাড়ির ছাদের টবেও ফোটে।

ছোটমাসি বললেন, মানিকতলায় একটা কারখানাতেও হয়।

বিশ্বমামা বললেন, কারখানায়? ভেতরে বাগান আছে বুঝি?

ছোটোমেসো হো-হো করে হেসে উঠলেন।

ছোটমাসিও হাসতে-হাসতে বললেন, আজ বিশ্বকে খুব ঠকানো গেছে। তুই বুঝতেই পারলি না, বিশ্ব, ওগুলো তো নকল ফুল।

আমি আর বিলুদা একসঙ্গে বলে উঠলুম, অ্যাঁ!

সত্যিই বোঝবার উপায় নেই। পরীক্ষা করার জন্য আমি একটা পাপড়ি নোখ দিয়ে চেপে ধরলুম। আসল ফুল হলে নোখের ধারে পাপড়িটা ছিঁড়ে যেত, এর কিছুই হল না।

জলের ফোঁটাগুলো পর্যন্ত নকল।

বিশ্বমামা তবু দমে না গিয়ে বললেন, ছোড়দি, তোমার এরকম অধঃপতন হয়েছে। তুমি নকল ফুল দিয়ে ঘর সাজাচ্ছ? ছি ছি!

ছোটমাসি বললেন, কেন, নকল ফুলের দোষ কী হল? আজকাল এমন চমৎকার ভাবে বানায়, আসল আর নকলের তফাৎ একটুও বোঝা যায় না।

তুই ও তো বুঝতে পারিসনি।

ছোটমেসো বললেন, ঘরের মধ্যে খানিকটা ফুল থাকলে ঘরটা বেশ উজ্জ্বল দেখায়। রোজ-রোজ আর টাটকা ফুল কোথায় পাচ্ছি বলো।

ছোটমাসি বললেন, টাটকা ফুল শুকিয়ে যায়, ফেলে দিতে হয়। ফুলদানির জল পালটাতে হয়, অনেক ঝামেলা। এ ফুলের তো জলও লাগে না। দেখতেও খুব সুন্দর।

আমি জিগ্যেস করলুম, নকল ফুলের তো গন্ধ থাকে না! এই ফুলে গন্ধ এল কী করে?

ছোটমাসি বললেন, আমার পারফিউমের শিশি থেকে রোজ দু-এক ছিটে দিয়ে দিই। সেই গন্ধই থাকে অনেকক্ষণ।

বিশ্বমামা বললেন, সেইজন্যই গন্ধটা চেনা-চেনা লাগছিল। শ্যানেল ফাইভ পারফিউম, তাই না?

ছোটমাসি বললেন আগে তো ধরতে পারিসনি!

কথা ঘোরাবার জন্য বিশ্বমামা বললেন, ছোটবেলায় আমরা বলতুম সেন্ট, এখন বলি পারফিউম। যেমন, আগে যাকে বলা হত, স্পোর্টস গেঞ্জি, এখন তাকেই বলি টি-শার্ট।

খাওয়ার টেবিলে বিশ্বমামাকে খুব মন-মরা মনে হল।

বিশ্বমামাই সব জায়গায়, নানান জায়গায় কথা বলে সবাইকে জব্দ করে রাখেন, আজ নিজেই প্রথম জব্দ হয়ে গেছেন, তাই সেটা মেনে নিতে পারছেন না।

টেবিলে কত রকম খাবার, তবু বিশ্বমামা চুপচাপ। খাচ্ছেনও ফেলে ছড়িয়ে। ছোটমেসো তাঁকে কয়েকবার খুঁচিয়ে চাঙ্গা করার চেষ্টা করলেন। তাতেও কোনও ফল হল না। খাবার ঘরেও একটা ফুলদানিতে নকল ফুল।

এর দু-দিন পর আমরা বিশ্বমামার সঙ্গে বেড়াতে গেলুম মধ্যপ্রদেশে।

আমাদের বেড়ানো, বিশ্বমামার কিছুটা কাজও আছে।

মধ্যপ্রদেশে বস্তার জেলার জঙ্গল বিখ্যাত। এখানে ছোট-ছোট পাহাড় আর জঙ্গলই বেশি।

আমরা উঠলুম একটা ডাকবাংলোতে। তার খুব কাছ থেকেই জঙ্গলের শুরু।

এই জঙ্গলে বাঘ আছে। ডাকবাংলোর চৌকিদার বলল, পরশুদিনই একজন কাঠুরেকে বাঘে মেরেছে। আর কয়েকজনের চোখের সামনেই বাঘটা সেই লোকটাকে ঘাড় কামড়ে নিয়ে চলে গেল।

আর আছে ভালুক। সেগুলো বাঘের চেয়েও কম হিংস্র নয়। ভালুক নাকি দিনের বেলাতেও দেখতে পাওয়া যায়। জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। লোকজনদের পরোয়া করে না।

এই জঙ্গলে আমাদের তিনদিন ঘুরে-ঘুরে খুঁজতে হবে একটা গাছের পাতা।

বিশ্বমামা জিগ্যেস করলেন, কী রে, ভয় পাবি না তো?

বিলু বলল, ভয় না পেতেও পারি। কিন্তু বন্দুক-টন্দুক না নিয়ে খালি হাতে জঙ্গলে গিয়ে বাঘের কামড়ে মরার কি খুব দরকার আছে?

বিশ্বমামা বললেন, একেবারে খালি হাতে তো নয়। আমার কাছে একটা রিভলবার আছে। সেটা তোর কাছে রাখবি।

রিভলভার! আমরা সিনেমায় দেখেছি, বাঘ শিকার করার জন্য বড়-বড় বন্দুক কিংবা রাইফেল লাগে! ছোট্ট একটা রিভলভার দিয়ে কি বাঘ মারা যায়?

বিশ্বমামা বললেন, মারতে হবে কেন? আমি কোনও জানোয়ার মারা পছন্দ করি

না। মাঝে-মাঝে এমনিই এক-একটা গুলি ছুঁড়বি। এ রিভলভারটায় খুব জোর শব্দ হয়। সেই শব্দ শুনলে বাঘ বা ভালুক আর কাছে আসবে না। এই শব্দ শুনলেই ওরা ভয় পায়।

পরদিন বেরুনো হল সকালবেলা।

কোন গাছের পাতা খুঁজতে হবে?

বিশ্বমামা বললেন, তোরা কখনো চা গাছ দেখেছিস?

আমি বললুম, হ্যাঁ, অনেকবার। দার্জিলিং গেলেই দু-দিকে চা বাগান দেখা যায়। একবার কুচবিহার যেতে গিয়েও অনেক চা-বাগান দেখেছি।

বিশ্বমামা বললেন, তবে তো ভালোই। আমরা তিনজনেই জঙ্গলে গিয়ে চা-গাছ খুঁজব। দেখতে পেলে পাতা ছিঁড়তে হবে।

বিনু বলল চা গাছ? আমরা যে ভূগোল বইতে পড়েছি, ইন্ডিয়াতে শুধু বাংলা, অসম আর ত্রিপুরাতেই চা হয়। অন্য কোথাও হয় না।

বিশ্বমামা বললেন, তা ঠিকই পড়েছিস। বই-টইগুলো লেখা হয়ে যাওয়ার পরেও তো অনেক নতুন কিছু জানা যায়। কিছুদিন হল জানা গেছে যে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলেও কিছু চা-গাছ দেখা গেছে। সেগুলো বুনো চা-গাছ। সে গাছের পাতার নমুনা নিয়ে গিয়ে আমাদের বিসার্চ করে দেখতে হবে। যদি ভালো জাতের চা-গাছ হয়, তাহলে এখানেও চা-বাগান বসানো যাবে।

শুরু হল আমাদের অভিযান।

রিভলভারটা বিশ্বমামা বিলুর হাতে দিয়েছেন, কারণ সে আমার চেয়ে বয়সে বড়। আমার হাতে শুধু একটা গাছের ডালভাঙা লাঠি। বিশ্বমামাও, হাতে ওইরকম একটা লাঠি রেখেছেন, কারণ বাঘ ভালুক ছাড়াও যদি সামনে একটা সাপ চলে আসে, সেটাকে ভয় দেখাতে হবে তো?

প্রথমে জঙ্গলটা বেশ পাতলা। দু-একটা লম্বা গাছ আর কিছু ঝোপ-ঝাড়। জন্তু-জানোয়ার কিছু নেই।

আমরা প্রথম দেখলুম দুটো খরগোশ। ছাই-ছাই গায়ের রং আর লাল রঙের চোখ।

আমি উত্তেজিত ভাবে বললুম, ওই দ্যাখো, ওই দ্যাখো।

বিশ্বমামা ফিরে তাকিয়ে বললেন, কী? কোথায়?

আমি বললুম, খরগোশ।

বিশ্বমামা বেশ চটে গিয়ে বললেন, খরগোশ কি একটা দেখার জিনিস? এসেছি চা-গাছ খুঁজতে আর তুই দেখছিস খরগোশ। আগে কখনো খরগোশ দেখিসনি?

আমি বললুম, খাঁচায় দেখেছি। জঙ্গলে দেখিনি।

বিশ্বমামা বললেন, নে। এবার শুধু চা দ্যাখ।

চা-গাছ তো খুব লম্বা হয় না। ঝোপেরই মতন। এখানকার কোনও ঝোপই চা গাছের মতন নয়।

একটু পরে জঙ্গল বেশ ঘন হয়ে এল। অনেক বড়-বড় গাছ।

হঠাৎ একটা জায়গায় হুড়মুড় শব্দ হতেই ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। বাঘ না ভালুক?

তা নয়, এক দঙ্গল বাঁদর। ছোট, বড়, মাঝারি।

এবারেও আমি চেঁচিয়ে কিছু বলে ফেলতে যাচ্ছিলুম। সামলে নিলুম কোনওরকমে।

বাঁদর আগে থেকেই দেখেছি ঠিকই, কিন্তু এই বাঁদরগুলো তো জঙ্গলের প্রাণী।

বাঁদরগুলো সব গাছ থেকে নেমে আমাদের সামনে-সামনে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে ফিরে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। একটা বেশ বড় বাঁদর এমন ভেংচি কাটছে আমার দিকে, তা দেখলেও ভয় লাগে।

বিলু বলল, বিশ্বমামা, একবার শূন্যে গুলি ছুঁড়ব নাকি। তাহলে ওরা সামনে থেকে সরে যাবে।

বিশ্বমামা বললেন, খবরদার না। গুলির আওয়াজে ওরা ভয় পায় না, বরং তেড়ে আসতে পারে। জানিস তো বাঁদররাই আমাদের পূর্বপুরুষ। ওদের অশ্রদ্ধা করতে নেই।

আমি জিগ্যেস করলুম, ওই বাঁদরটা শুধু-শুধু আমার দিকে ভেংচি কাটছে কেন?

বিশ্বমামা বললেন, ওই গোদা বাঁদরটা বোধহয় নিজেকে ভাবছে আমাদের জ্যাঠামশাই। বুঝে গেছে যে তুই অতি দুরন্ত ছেলে, তাই তোকে বকুনি দিচ্ছে।

যদিও নিজের জ্যাঠামশাই বকুনি দিলেও তাঁর মুখের ওপর কিছু বলা যায় না। কিন্তু এই বাঁদরটা তো আর সত্যি-সত্যি আমার নিজের জ্যাঠা নয়, তাই আমিও একবার ওর দিকে ভেংচি কেটে দিলুম।

একটু পরে বাঁদরগুলো হুপ-হুপ করতে-করতে অন্য দিকে চলে গেল।

সেদিন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও চা-গাছ দেখতে পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় দিনেও কিছু হল না।

শেষ চেষ্টা করার জন্য তৃতীয় দিন আবার এলুম জঙ্গলে।

সে রাত্তিরেই আমাদের ফিরে আসতে হবে। ট্রেনের টিকিট কাটা আছে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই বিশ্বমামা আবিষ্কার করে ফেললেন একটা চা গাছ।

মস্ত বড় একটা ঝোপের মধ্যে অন্যান্য গাছ আর লতা-পাতা, তার ঠিক মাঝখানের গাছটাই চা-গাছ। এমনিতে বোঝায় উপায় নেই। বিশ্বমামা ঠিক চিনেছেন।

সে গাছের একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে হাতে কচলে প্রথমে নিজের নাকের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর আমাদের দিকে হাতটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, দ্যাখ তো চায়ের গন্ধ পাস কি না।

সত্যি পাতাটায় একটু-একটু চায়ের গন্ধ।

এরপর কাছাকাছি আরও কয়েকটা গাছ পাওয়া গেল।

বিশ্বমামা তাঁর কাঁধের ঝোলা ব্যাগে অনেকগুলো পাতা ছিঁড়ে ভরে নিলেন। বললেন, আর বেশি দরকার নেই। এতেই কাজ হয়ে যাবে।

এবার ফিরলেই হয়।

ফেরার পথে ভারি সুন্দর একটা ব্যাপার হল।

আমরা খানিকটা হেঁটে আসতেই একটা বড় গাছের আড়ালে দেখতে পেলুম একটা ময়ূর। পুরো পেখম মেলে আছে। ঠিক ছবির মতন।

বিশ্বমামা বললেন, ইস, কেন যে ক্যামেরা আনিনি। এরকম পেখম মেলা ময়ূর আর জীবনে ক-বার দেখা যায়।

ময়ূর মানুষ দেখে মোটেই লজ্জা পায় না, ভয়ও পায় না। সে সরে গেল না, এ অবস্থায় এক পা এক পা ফেলে হাঁটতে লাগল।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বিশ্বমামা হঠাৎ বললেন, আরে। কথাটা তাহলে সত্যি?

আমি বললুম, কী কথা?

বিশ্বমামা বললেন, সবাই বলে, আকাশে মেঘ করলে ময়ূর এরকম পেখম তুলে নাচে। এখন আকাশে মেঘ আছে? দ্যাখ না, পরিষ্কার নীল আকাশ। আরও একটা কারণে ময়ূর নাচে, যখন অপ্সরা ফুল ফোটে। এ ফুল মাত্র একবার ফোটে দু-বছরে।

আঙুল দিয়ে বিশ্বমামা দেখালেন, ওই দ্যাখ।

একটা বড় গাছের গা থেকে বেরিয়েছে আর একটা ছোট গাছ, যাকে বলে পরগাছা। সেই পরগাছায় ফুটে আছে একটি মাত্র ফুল। লম্বা ডাঁটির ওপর গোল মতন ফুল, মাঝখানটা নীল আর পাশের দিকে সাদা। খুব সুন্দর দেখতে।

বিশ্বমামা বললেন, এর গন্ধও খুব ভালো। কিন্তু ময়ূরটা না সরে গেলে ফুলের গন্ধ পাওয়া যাবে না। ময়ূরের গায়েও তো গন্ধ থাকে।

বিলু বলল, অপ্সরা ফুল, কখনো নাম শুনিনি।

বিশ্বমামা বললেন, ইংরেজিতে বলে হেভেন্‌স্ মেইডেন। আমি বাংলায় নাম দিয়েছি অপ্সরা ফুল। এ ফুল আমাদের নদীর ধারে খুব দেখা যায়।

ময়ূরটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সরবার নাম নেই। ও কি ফুলটা পাহারা দিচ্ছে?

বিশ্বমামা বললেন, ফুলটা ছোড়দির জন্য নিয়ে যাব ভাবছি। এ ফুল অনেকদিন টাটকা থাকে।

আমি একটু এগিয়ে যেতেই বিশ্বমামা আমার হাত ধরে টেনে বললেন, দাঁড়া, দাঁড়া কাছে যাস না। ময়ূর দেখতে এত সুন্দর হলে কী হবে, খুব হিংস্রও হয়। ধরতে গেলে চোখ খুবলে নিতে পারে।

বিলুকে বললেন, রিভলভার দিয়ে একবার আওয়াজ কর তো?

সেই শব্দ শুনেই ময়ূরটা পেখম গুটিয়ে ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দ করে ছুটে পালাবে।

বিশ্বমামা খুব সাবধানে ডাঁটিশুদ্ধ ফুলটা তুলে আনলেন।

সত্যিই বেশ সুন্দর, মিষ্টি গন্ধ আছে ফুলটার।

বিশ্বমামা বললেন, যাক, এখানে এসে আমার কাজও হল, আর ছোড়দির জন্য একটা উপহারও পাওয়া গেল।

পরদিন সকালে কলকাতায় ফেরার পরও দেখা গেল, ফুলটা একইরকম টাটকা আছে।

বিশ্বমামা ছোটমাসিকে ফোন করে বললেন দুপুর বেলা যাব তোমার বাড়ি, ভালো-

ভালো জিনিস রান্না করো, গল্‌দা চিংড়ির মালাইকারী যেন থাকে, আর রাবড়ি। তোমার জন্য একটা দারুণ জিনিস এনেছি।

ছোটমাসি তখনি জিগ্যেস করলেন, কী এনেছিস রে? কী? কী?

বিশ্বমামা বললেন, এখন বলব না। দেখতেই তো পাবে।

দুপুরবেলা সদলবলে হাজির হলুম ছোটমাসির বাড়িতে।

ছোটমাসি ফুলটা পেয়ে খুবই খুশি। বারবার বলতে লাগলেন, বাঃ কী সুন্দর, কী সুন্দর। এমন ফুল কখনো দেখিনি।

বিশ্বমামা বললেন, পাড়া-প্রতিবেশীদেরও ডেকে দেখাতে পারো, এ ফুল মাসের পর মাস ফুটবে না। তবে, বাড়িতে এই একটা ফুল রাখলে আর অন্য ফুল মানায় না। ওইসব নকল ফুল-টুলগুলো ফেলে দিতে হবে।

ছোটমেসো বললেন, আরে তা কেন? বেশি ফুল রাখলেই ঘরের শোভা বাড়ে। এটাও থাক, অন্যগুলোও থাক, লোকে বুঝতেই পারবে না, কোনটা আসল, কোনটা নকল।

বিশ্বমামা বললেন, এই অপ্সরা ফুল নিরিবিলিতে থাকতে ভালোবাসে। আশে-পাশে অন্য ফুল ফোটে না। একবার যা একটা ব্যাপার আমি দেখেছি...।

বিশ্বমামা বললেন, থাক, এখন বলব না। পরে তোমরা নিজেরাই দেখতে পাবে।

অপ্সরা ফুলটাকে রাখা হল নকল ফুলের তোড়াটার পাশেই।

তারপর অনেকক্ষণ গল্পের পর ডাক এল খেতে বসার।

আজ বিশ্বমামার খাওয়ার কী উৎসাহ। খেয়ে ফেললেন চারখানা বড়-বড় চিংড়ি। চাটনি আর রাবড়ি খাওয়ার পরেও বললেন, আব একটা চিংড়ি দাও তো!

খাওয়া শেষ হলেও বিশ্বমামা গল্প জুড়ে দিলেন। পৃথিবীর কোন দেশে কেমন চিংড়ি পাওয়া যায়। নিকোবর দ্বীপে নাকি এমন চিংড়ি দেখেছেন, তার নাম টাইগার প্রান। ওপরের খোসাটা বাঘের মতনই হলুদ কালো ডোরা কাটা আর এক-একটা দেড় হাত লম্বা।

গল্প শুনতে-শুনতে আমরা হাত ধুতে ভুলে গেলুম। আমাদের হাতে এঁটো শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেল।

এক সময় ছোটমাসি বললেন, এবার সবাই উঠে পড়ো। বসবার ঘরে গিয়ে বাকি গল্প হবে।

হাতটাত ধুয়ে আমরা সবাই এসে বসলুম বসবার ঘরে।

বিশ্বমামা বললেন, ছোড়দি, মশলা নেই। খুব খাওয়া হয়ে গেছে আজ।

মশলা আনতে গিয়ে ছোটমাসি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠলেন, এ কী? এ কী অদ্ভুত কাণ্ড!

সত্যিই অদ্ভুত কাণ্ড।

অপ্সরা ফুলটা যেন হাসিতে ঝলমল করছে। আর তার পাশের নকল ফুলের তোড়াটা শুকিয়ে গেছে, খসে পড়েছে অনেকগুলো পাপড়ি!

বিশ্বমামা বললেন, এটাই তো তখন বলতে যাচ্ছিলুম। আমাজন নদীর ধারে একবার

দেখেছিলুম এই কাণ্ড। এ রকম একটা অপ্সরা ফুল ফুটে আছে, আর আশেপাশের অন্য সব ফুলের পাপড়ি ঝরে যাচ্ছে। এ ফুল অন্য ফুলদের সহ্য করতে পারে না।

আমাদের চোখের সামনেই নকল ফুলের সব পাপড়ি খসে পড়ে গেল।

ছোটমেসো দারুণ অবাক হয়ে বললেন, নকল ফুলেরও পাঁপড়ি খসে পড়ে? এরকম কখনো শুনিনি!

বিশ্বমামা বললেন, তা হলেই বুঝুন, আসল আর নকলের তফাত।

ছোটমেসো বললেন, কী করে এটা হল, সত্যি করে বলো তো, বিশ্ব!

বিশ্বমামা বললেন, ম্যাজিক, ম্যাজিক!

বিশ্বমামার ভূত ধরা

আমার বন্ধু বাপ্পা কী দারুণ ভাগ্যবান। তার কাকা লটারিতে এক কোটি টাকা পেয়ে গেলেন।

বাপ্পা নিজে পায়নি, তাতে কী হয়েছে। ওর কাকা তো পেয়েছেন। এক মাত্র কাকা।

এক কোটি টাকা মানে কত? একের পিঠে সাতটা শূন্য! ওরে বাবা, এত টাকা দিয়ে মানুষ কী করে! অত টাকার কথা ভাবতে আমারই মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

কেউ হঠাৎ বড়লোক হলে অমনি তার আশেপাশে ভিড় জমে যায়। বাপ্পাদের বাড়িতে এখন সব সময় অনেক লোক। তারা নানারকম পরামর্শ দেয়। কেউ বলে বোতলের জলের ব্যবসা করতে, কেউ বলে, আপনার মায়ের নামে একটা মন্দির বানিয়ে ফেলুন না। আর সবাই বললেন, আমাদের গ্রামে একটা রাস্তা বানিয়ে দিন।

বাপ্পার বীরুকাকা এইসব শুনে মুচকি-মুচকি হাসেন। কারও-কে হ্যাঁ-ও বলেন না, না-ও বলেন না। কত লোক চাঁদা চাইতে আসে। তাদের তিনি বলেন হবে, পরে হবে।

হঠাৎ একদিন বীরুকাকা উধাও হয়ে গেলেন।

একমাস বাদে তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল। বাপ্পার বাবাকে তিনি চিঠি লিখে জানিয়েছেন, তিনি টাকি নামে একটা জায়গায় একটা বাড়ি কিনেছেন, সেখানেই থাকবেন, কলকাতায় আর ফিরবেন না কখনো। ওখানে আর কেউ তাকে জ্বালাতন করতে পারবে না।

প্রথমবার বাপ্পা টাকিতে গিয়ে সেই বাড়ি দেখে এসে আমাদের যা বলল, তা শুনে আমরা একেবারে হাঁ। সে যে কী দারুণ সুন্দর বাড়ি আর কী বিশাল বাগান, তা আমরা কল্পনাও করতে পারব না? সেটা আগে এক জমিদারের বাড়ি ছিল, তারা এখন খুব গরিব হয়ে গেছে, তাই বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে।

বীরুকাকা সেই বাড়িটা কিনেছেন বিরাশি লক্ষ টাকা দিয়ে। জমিদারদের বংশে এখন তেইশ জন শরিক, তাদের মধ্যে টাকাটা ভাগাভাগি হয়ে যাবে। আমি মনে-মনে বিরাশিকে তেইশ দিয়ে ভাগ করার একবার চেষ্টা করলাম। তারপরই মনে হল, আমি তো টাকা পাচ্ছি না। আমার হিসেব করার দরকার কী?

অত টাকা দিয়ে শুধু-শুধু একটা বাড়ি কেনার কোনও মানে হয়?

বীরুকাকা বলেছেন, সারাজীবন তিনি ভাড়া বাড়িতে থেকেছেন, তাই তাঁর নিজস্ব একটা বাড়ির খুব শখ ছিল। লটারিতে জেতার খবরটা যেদিন পান, তার আগের রাত্তিরেই তিনি একটা বাড়ির স্বপ্ন দেখেছিলেন। পুরোনো আমলের সুন্দর দোতলা বাড়ি, সামনে মস্ত বড় পুকুর, দুপাশে বাগান। ওইরকম স্বপ্ন তিনি দেখলেন কেন? নিশ্চয়ই লটারির টাকা পাওয়ার সঙ্গে ওই রকম একটা বাড়ির সম্পর্ক আছে। অনেক খুঁজে-খুঁজে টাকিতে তিনি প্রায় স্বপ্নের সঙ্গে মিলে যাওয়া বাড়িটা দেখতে পেলেন আর অমনি কিনে নিলেন।

বাপ্পা আর ওর বোনেরা সেখানে প্রত্যেক শনিবারে যায়। সে বাড়ির পুকুর ভর্তি কত বড়-বড় মাছ, আর বাগানে কত ফুল, সেই গল্প করে।

আর একমাস পরেই জানা গেল, সেটা ভূতের বাড়ি। এক রবিবার বাপ্পা টাকি থেকে ফিরে এল, তার বাঁ-পায়ে মস্ত বড় ব্যান্ডেজ বাঁধা। ভূতে তার পা ভেঙে দিয়েছে।

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে বাপ্পাই সবচেয়ে বেশি গুলবাজ! এমন সুন্দর ভাবে গল্প বলে যে বিশ্বাস করে ফেলতে হয়। টাকির ওই অতবড় বাড়ির গল্প কি তবে গুল। বলতে-বলতে একেবারে ভূত এনে ফেলেছে।

আমি জিগ্যেস করলুম, ভূতে তোর পা ভাঙল কী করে রে? ঠেলা মারল? ঠিক দুক্কুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা।

বাপ্পা বলল, নীলু তুই বিশ্বাস করিস না তো? তুই এই শনিবার চল আমার সঙ্গে। নিজের কানে শুনবি।

শুনেই আমি এক পায়ে খাড়া। আর কিছু না হোক, বেড়ানো তো হবে!

টাকি খুব দূর নয়। কলকাতা থেকে একটা বাসে যাওয়া যায় হাসনাবাদ। সেখান থেকে আর এক বাসে টাকি।

পৌঁছে দেখি, বাপ্পা তো একটুও মিথ্যে বলেনি। বিরাট লোহার গেট, তারপর লাল সুরকি বেছান রাস্তা, বাড়িটা প্রায় দুর্গের মতন। তার সামনে একটা চারকোণা মস্ত বড় পুকুর, সেটাকে দিঘিই বলা উচিত। টলটলে জল। অনেক মাছ থাকতেই পারে। দুপাশে বাগান, একদিকে সব ফুল গাছ। আর একদিকে ফলের গাছ। মস্ত-মস্ত সব গাছ, সে বাগানটা অনেকখানি ছড়ানো।

বাড়িটা বেশ পুরোনো, দেওয়ালে শ্যাওলা জমে গেছে। এরকম বাড়িতে ভূত থাকা স্বাভাবিক। সিমলায় এ রকম ভূতের বাড়ি দেখা যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, ছোটবেলা থেকেই আমি বিশ্বমামার চ্যালা। বিশ্বমামা যে বলে দিয়েছেন, ভূত বলে কিছু নেই। আজ পর্যন্ত কেউ সত্যি-সত্যি ভূত দেখেনি। অনেক মানুষ এমনি-এমনি ভয় পায়।

আমি জিগ্যেস করলুম, ভূতটা কোথায় থাকে রে? এই বাড়ির ছাদে, চিলেকোঠায়?

বাপ্পা বললে, না।

তারপর আঙুল দেখিয়ে বললে, থাকে ওই ফলের বাগানে। বোধহয় ব্রহ্মদৈত্য। ব্রহ্মদৈত্যেরা বাড়িতে থাকে না। গাছে থাকে।

আবার জিগ্যেস করলুম, তুই নিজের চোখে দেখেছিস?

বাপ্পা বলল, দেখা দেয় না। কথা শোনা যায়, ভয় দেখায়।

বীরুকাকা বসে আছেন বৈঠকখানায়। হাতে একখানা বই। সেই ঘর ভর্তি অনেক বই, পাশের ঘরে তিন চারখানা বই ভর্তি আলমারি। বীরুকাকা এখানে সর্বক্ষণ বই পড়েন।

এত বড় বাড়িতে এখন দুজন মাত্র কর্মচারী। এক জন দরোয়ান, আর একজন রান্নার ঠাকুর। দারোয়ানের আবার কাল থেকে জ্বর হয়েছে। আমি বীরুকাকাকে প্রণাম করতেই তিনি বাপ্পার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, এ কে?

বাপ্পা বললে, আমার বন্ধু নীলু, ও খুব আসতে চাইছিল—

বীরুকাকা বললেন, ওকে বুঝি ভূত দেখাতে এনেছিস? এবার সারা কলকাতায় রটে যাবে দলে-দলে লোক ছুটে আসবে।

বাপ্পা বলল, না, না, নীলু আর কারুকে বলবে না।

আমি ফস করে জিগ্যেস করলুম, বীরুকাকা, সত্যি এখানে ভূত আছে?

বীরুকাকা বললেন, আছে তো বটে, কিন্তু সে তো কারুর ক্ষতি করে না।

বাপ্পা বলেছিল, ওর কথা শুনে আমার যে পা ভাঙল।

বীরুকাকা বললেন, তুই ভয় পেয়ে দৌড়েছিলি, তাই আছাড় খেয়ে পা ভেঙেছিস।

বাপ্পা বলল, রান্নার ঠাকুর যে বমি করল?

বীরুকাকা বললেন, আমি কারুকে এখন ওই বাগানের দিকে যেতে বারণ করেছি, এখন ওদিকে যাওয়ার দরকার নেই। আমার এ বাড়িতে নতুন এলে তো, তাই ব্রহ্মদৈত্য ঠিক মেনে নিতে পারছে না। কিছুদিন কেটে যাক, আমরা যদি ওকে বিরক্ত না করি, তাহলে ও আর কিছু বলবে না।

সত্যিই তাহলে ব্রহ্মদৈত্য আছে? তবে তো একবার দেখতেই হয়। বীরুকাকা বারণ করলেও যেতে হবে। বাপ্পাও তো আমাকে সেই জন্যই নিয়ে এসেছে।

বীরুকাকা বিকেলের দিকে একবার বাজারে যান। এখানে বিকেলে বাজার বসে।

বীরুকাকা বেরিয়ে যেতেই আমরা দুজনে চলে গেলুম ফলের বাগানের দিকে। বাপ্পার পা এখনো সারেনি, লেংচে-লেংচে হাঁটছে।

বাপ্পা বলল, শোন নীলু, ভয় পাবি না কিন্তু। দৌড়বি না। তুই দৌড়লে আমি পিছিয়ে পড়ব। তখন যদি আমার গলা টিপে দেয়।

আমি মনে-মনে হাসলুম। বীরুকাকা যাই-ই বলুন, আমি অত সহজে ভূত কিংবা ব্রহ্মদৈত্য বিশ্বাস করতে রাজি নই। বিশ্বমামার চ্যালারা অত সহজে ভয় পায় না।

বাগানের প্রথম দিকেই অনেকগুলো আমগাছ। কচি-কচি আম হয়েছে। তারপর জাম, কাঁঠাল, লেবু, আরও কত রকম গাছ। আমি চিনি না। একটা গাছ ভর্তি বেল।

হাঁটতে-হাঁটতে অনেকটা দূর চলে এলুম। বাগান তো নয়, যেন জঙ্গল। এদিক থেকে ওদিক দেখা যায় না। এপাশেও একটা ছোট পুকুর আছে। এমনিতেই বাগানের ভেতরটা ছায়া-ছায়া, এখন আবার সন্ধে হয়ে এসেছে। বেড়াতে ভালো লাগছে। ভয় করছে

না একটুও। কোথায় ভূত কিংবা ব্রহ্মদৈত্য? তাহলে কি বাপ্পার মতন বীরুকাকাও গুল মারেন?

পুকুরটার ধার দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ গম্ভীর গলায় কে যেন ধমকে উঠল। ওখানে কে রে? ওখানে কে রে? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। আওয়াজটা আসছে শেষ গাছের ওপর থেকে। এবার ভয়ে সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। মারলুম টেনে একটা দৌড়। বাপ্পা কাতর গলায় বলতে লাগল, এই নীলু, দাঁড়া, দাঁড়া, আমায় ফেলে যাস না!

আমি দৌড় থামালুম একেবারে বৈঠকখানার সিঁড়িতে পৌঁছে।

বাপ্পা এসে গেল একটু পরে। চোখ পাকিয়ে বলল, বিশ্বাসঘাতক, কাওয়ার্ড। আমাকে ফেলে পালাতে লজ্জা করল না? যদি আমার গলা টিপে দিত?

আমি একটু চুপ করে রইলুম। সত্যিই তো আমার দোষ!

তারপর ফিস-ফিস করে জিগ্যেস করলুম, তুই ওকে দেখতে পেলি?

বাপ্পা বললে, ওরা অশরীরী? সবসময় কি দেখা যায়? মাঝে-মাঝে স্বরূপ ধরে। এবার নিজের কানে শুনলি তো?

আমি বললুম, আমার কিন্তু পা ভাঙেনি, কোনও ক্ষতিও হয়নি।

বাপ্পা বলল, দ্যাখ না কী হয়। ও ধমকালে একটা না একটা কিছু হবেই।

সত্যিই, সে রাতে আমার জ্বর এসে গেল। রাত্তিরবেলা খালি মনে হতে লাগল, মুখ ভর্তি দাঁড়ি-গোঁফ, মাথায় জটা, চোখ দুটো আগুনের ভাটার মতন, একটা ব্রহ্মদৈত্য জানলা দিয়ে আমাকে দেখছে!

পরদিন সকালে আমি জ্বর গায়েই পালিয়ে এলুম কলকাতা।

বিশ্বমামা কিছুদিন ধরে খুব ব্যস্ত। বিনা বিদ্যুতে ঘরের পাখা চালানো যায় কিনা তা নিয়ে পরীক্ষা করছেন। মন দিয়ে শুনলেন আমার কথা।

তারপর বললেন, আমার চ্যালা হয়ে তুই যখন ভয় পেয়েছিস, তখন তো ব্যাপারটা সিরিয়াস মনে হচ্ছে। তুই নিজের কানে শুনেছিস?

—হ্যাঁ।

—স্পষ্ট?

—স্পষ্ট মানুষের গলা।

—কোনও লোককে দেখতে পাসনি।

—না। গাছের ওপর-ওপর লুকিয়ে থাকতে পারে।

—তাহলে তো এগিয়ে দেখতে হয়। চল কালকেই যাই।

—কিন্তু বীরুকাকা যদি রেগে যান? উনি এ নিয়ে বেশি হই-চই পছন্দ করেন না। কলকাতা থেকে কেউ যাক, উনি চান না।

—আরে বীরুকাকা মানে বীরেশ্বর দত্ত তো? আমাকে উনি ভালোই চেনেন। লটারির টাকা পেয়ে বড়লোক হয়েছেন বলে তো আর আমাকে ভুলে যাবেন না!

পরদিন বিশ্বমামার গাড়িতে চেপে বসলুম আমি আর বাপ্পা।

খানিকবাদে বিশ্বমামা বললেন, তোরা গাড়ি-ভূত দেখেছিস কখনো?

আমি আর বাপ্পা চোখ বড়-বড় করে তাকালুম।

বিশ্বমামা বললেন, একটু চুপ করে থাক।

হঠাৎ মিষ্টি মেয়েলি গলায় কে যেন বলে উঠল আজ মঙ্গলবার, ৭ সেপ্টেম্বর, এখন বেশ ভালো রোদ উঠেছে। কিন্তু বিকেলের দিকে বৃষ্টি হবে। রাস্তাটা ভালো নয়, একটু সাবধানে চালাও!'

কথাটা থেমে যাওয়ার পর বিশ্বমামা বললেন, দেখলি আমার গাড়ি কীরকম কথা বলে।

আমি বললুম, এটা গাড়ি-ভূত তো নয়, গাড়ি-পেত্নী হতে পারে। মেয়ের গলা।

বিশ্বমামা বললেন, তা ঠিক গাড়ি-পেত্নী শুনতে ভালো না। গাড়ি-পরী বললে কেমন হয়?

বাপ্পা বললে, আপনি গাড়িতে কোনও যন্ত্র লাগিয়েছেন।

বিশ্বমামা বললেন, এটা আমার আবিষ্কার করা যন্ত্র। আবহাওয়া বলে দেবে, রাস্তার অবস্থা বলে দেবে।

বাপ্পা বললে, আমার কাকার বাগানবাড়িতে আমরা শুনেছি, তা কিন্তু কোনও যন্ত্র হতে পারে না। বাগানে কে যন্ত্র বসাবে? তাছাড়া যখনই ও ধমকে বলে, দেখাচ্ছি মজা, তারপরই কারুর জ্বর হয়, কারও পা মচকায়, কারুর বমি হয়।

বিশ্বমামা বললেন, হুঁ!

টাকির সেই বাগানবাড়িতে পৌঁছে বিশ্বমামা খুব খুশি। বারবার বলতে লাগলেন, দারুণ বাড়ি। চমৎকার বাড়ি। এত খোলামেলা। এখানে এসে মাঝে-মাঝে থাকতে হবে।

বীরুকাকার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি সেই কথা শুনে বললেন, বিশ্ব, তুমি এসেছ, বেশ করেছ। যতদিন ইচ্ছে থাকো। কিন্তু বাগানের দিকে গিয়ে গোলমাল করো না।

বিশ্বমামা বললেন, বীরুকাকা আপনি ভূত পুষেছেন এখানে।

বীরুকাকা বললেন, আমি কুকুর পুষি না। বেড়াল পুষি না। ভূত পুষতে যাব কেন? ভূত কাকে বলে আমি জানিই না। তবে বাগানে কে একজন কথা বলে। আমরা কেউ ওদিকে যাই, সে পছন্দ করে না। তাই ধমকায়।

বিশ্বমামা জিগ্যেস করলেন, আপনিও শুনেছেন?

বীরুকাকা বললেন, হ্যাঁ, একবার শুনেছি। আর ওদিকে যাই না।

বিশ্বমামা বললেন, আপনার কোনও ক্ষতি হয়েছে? জ্বর কিংবা পেটের অসুখ?

বীরুকাকা বললেন, নাঃ, সেরকম কিছু হয়নি।

বিশ্বমামা বললেন, আপনি বাড়ির মালিক বলে আপনার কোনও ক্ষতি করেনি। কিন্তু আপনারই বাগান অথচ সেখানে আপনি যেতে পারবেন না, এটাই বা কেমন কথা!

বীরুকাকা বললেন, আমার ধারণা, আর কিছুদিন থাকলেই ওই ভূত আমাদের চিনে যাবে। তারপর কিছু বলবে না।

বিশ্বমামা বললেন, বীরুদা আপনি লটারিতে বহু টাকা পেয়ে এমন দুর্দান্ত একটা বাড়ি কিনেছেন। ওই টাকা নিয়ে আপনি সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে পারবেন, বাড়িতে দশটা কাজের লোক রাখতে পারবেন, সারাজীবন রোজ রাবড়ি খেতে পারবেন। কিন্তু

একটা কী জিনিস পারবেন না বলুন তো? এই যে বিশ্ব আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে কান ধরে ওঠবোস করাতে পারবেন? এক কোটি টাকা পুরোটা দিয়ে দিলেও পারবেন না।

বীরুকাকা অবাক হয়ে বললেন, তোমাকে আমি কান ধরে ওঠ-বোস করাতে যাব কেন?

বিশ্বমামা বললেন, ছোটবেলা থেকেই আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে। আমাকে যদি কেউ ভূত দেখাতে পারে তার সামনে আমি দশবার কান ধরে ওঠ-বোস করব। সেই জন্যই আপনার বাগানে আমি দু-একবার যেতে চাই। ভূতকে আমি বিরক্ত কবব না, তাড়াবারও চেষ্টা করব না। শুধু একবার দেখব।

বীরুকাকা বললেন, শুনেছি ভূত সবসময় চোখে দেখা যায় না। অশরীরী হয়ে থাকে। আমিও তো দেখিনি শুধু তার কথা শুনেছি।

বিশ্বমামা বললেন, কথা শুনলেও চলবে। কোনও মানুষ নেই, অথচ শূন্য থেকে কথা বলছে, তাও তো ভূতের কাণ্ডই বলতে হবে।

বীরুকাকা বললেন, যেতে চাও যাও, তবে সাবধানে থেকো। বেড়াতে এসেছ, তোমার কোনও ক্ষতি হোক, তা আমি চাই না।

তারপর চা-জলখাবার খেয়ে বিকেল বেলা বাগানের কাছে এসে বিশ্বমামা বললেন, নীলু, বাপ্পা, তোরা কোন জায়গায় ভূতের কথা শুনেছিস, সেই জায়গাটা আমাকে দেখিয়ে দে। তোদের সঙ্গে যেতে হবে না। আমি একা যাব।

আমার ইচ্ছে ছিল, বিশ্বমামার সঙ্গে গিয়ে ব্যাপারটা কী হয় তা দেখা। কিন্তু বিশ্বমামা দারুণ গোঁয়ার মানুষ, একবার যখন বলেছেন একা যাবেন, তখন আর ওলটানো যাবে না।

বিশ্বমামা চলে গেল বাগানে। আমরা বসে রইলুম পুকুরটার ধারে। ঘন-ঘন তাকাচ্ছি বাগানের দিকে। খালি মনে হচ্ছে, এই বুঝি বিশ্বমামা দৌড়ে বেরিয়ে আসবে।

বিশ্বমামা বাগান থেকে বেরিয়ে এল প্রায় এক ঘণ্টা পরে। দৌড়ে নয়, আস্তে-আস্তে হেঁটে।

এই রে, বিশ্বমামা ভূতের কথা শুনতে পাননি নাকি? বিশ্বমামা এত বড় বিজ্ঞানী, তাঁকে দেখেই কি ভূত ভয় পেয়ে চুপ করে গেছে।

বিশ্বমামা তাঁর লম্বা নাকটার ওপর হাত তুলেছেন। ওটা দেখেই বোঝা যায়, ওর মাথায় কিছু একটা নতুন আইডিয়া এসেছে।

আমাদের কাছে এসে বললেন, বেশ সুন্দর বাগানটা! পিকনিক করার পক্ষে আদর্শ।

আমি কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিগ্যেস করলুম, বিশ্বমামা, তুমি কিছু শুনতে পাওনি?

সে আর উত্তর না দিয়ে বিশ্বমামা বললেন, বল তো, কোন গাছে বাজ পড়েছে, তা কী করে বোঝা যায়?

এখন এই সব কথা শুনতে কারুর ভালো লাগে?

আমি আবার জিগ্যেস করলুম, শুনতে পেয়েছ কিনা, সেটা আগে বলো।

বিশ্বমামা বললেন, হ্যাঁ শুনেছি। খুবই স্পষ্ট। আমার ধারণা ছিল ভূতরা নাঁকি সুরে কথা বলে। তা কিন্তু নয়। অবিকল মানুষের মতন গলা।

বাপ্পা জিগ্যেস করল, সেখানে কোনও মানুষ ছিল?

বিশ্বমামা মাথা নেড়ে বললেন, না কোনও মানুষ ছিল না। আমি ভালো করে দেখেছি। গাছের ওপরেও কেউ লুকিয়ে ছিল না।

বাপ্পা বলল, তবে?

বিশ্বমামা বললেন, মানুষ নেই, অথচ কথা বলছে। এতো রহস্যময় ব্যাপার বটেই। তবে কি এবার সত্যি-সত্যি কান ধরে ওঠবোস করতে হবে? আর একটা দিন সময় দরকার। তোরা কথাটা কবার শুনেছিলি?

বাপ্পা বলল, আমি দুবার।

আমি বললুম, আমি একবার শুনেই...

বিশ্বমামা বললেন, তারপর দৌড় মেরেছিলি, তাই তো? ঠিক আছে। রাত্তিরে বীরুদা কী খাওয়াবে? এইসব জায়গায় খুব ভালো কচি পাঁঠার মাংস পাওয়া যায়—মাংসের ঝোল আর লুচি যদি হয়।

আমরা ভেবেছিলুম, বিশ্বমামার জ্বর কিংবা বমি হবে। সেরকম কিন্তু কিছুই হল না। দিব্যি লুচি মাংস খেলেন, তারপর ঘুমোতে গেলেন তাড়াতাড়ি।

পরদিন সকালে উঠে ভূত বিষয়ে কোনও কথাই বললেন না। গাড়ি নিয়ে আমরা ঘুরলাম গ্রামে-গ্রামে। এখানকার নদীতে নৌকা চেপে বেড়ানোও হল। নদীর ধারেই একটা দোকানে গরম-গরম জিলিপি পাওয়া গেল, শিঙাড়া খেলুম প্রাণভরে। এক ঠোঙা নিয়েও আসা হল বীরুকাকার জন্য।

বীরুকাকা জিলিপি খেতে-খেতে জিগ্যেস করলেন, কী বিশ্ব, কিছু বুঝলে? তোমার মতন একজন বৈজ্ঞানিক, পৃথিবীতে কত দেশে বক্তৃতা দিতে যাও, তুমি কান ধরে ওঠ-বোস করবে, এটা ভাবতেই আমার মজা লাগছে।

কিছু না বলে বিশ্বমামা মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন।

বীরুকাকা বললেন, অবশ্য, তোমাকে যে ওরকম করতেই হবে, তার কোনও মানে নেই। আমি তো আর তোমার সঙ্গে বাজি ধরিনি। তুমি নিজেই ঠিক করেছ।

বিশ্বমামা বললেন, বীরুদা, আজ সন্ধেবেলা একবার আমার সঙ্গে বাগানে যাবেন?

বীরুকাকা বললেন, না, না, আমি তো বলেইছি ওসব অপদেবতাদের ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক নয়। সে তো আমাদের কোনও ক্ষতি করছে না। আমরাই বা তাকে ডিসটার্ব করতে যাব কেন? আর কথাটা বেশি রটে গেলে অনেক লোক ভিড় করে এসে ভূতের বাড়ি দেখতে চাইবে।

বিশ্বমামা বললেন, আমি ভূত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করব না। ডিসটার্বও করব না। একটা অন্য জিনিস দেখাব, নীলু আর বাপ্পাকে সঙ্গে নিতে পারি। কিন্তু ওদের ভয় পেয়ে দৌড়োনো চলবে না। না দৌড়োলে জ্বরও হবে না, পা-ও মচকাবে না।

সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর বেরিয়ে পড়লুম সদলবলে।

বাগানের মধ্যে ঢুকে বিশ্বমামা এমনভাবে এগোলেন, মনে হল উনি কোথায় যাবেন, আগে থেকেই ঠিক করা আছে।

একটা লম্বা গাছের কাছে গিয়ে তিনি থামলেন। সেটাকে গাছ বোঝাই যায় না। তালগাছ ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ওপরের ডালপালা কিছু নেই।

বিশ্বমামা বললেন, এই গাছটার ওপর বাজ পড়েছিল অনেক দিন আগে। সাধারণত এরকম লম্বা গাছের ওপরই বাজ পড়ে।

বীরুকাকা বললেন, বাজ পড়া গাছের সঙ্গে ওই ব্যাপারটার কী সম্পর্ক তা তো বুঝলাম না।

বিশ্বমামা বললেন, বুঝিয়ে দিচ্ছি। কেউ কোনও কথা বলবেন না। একদম চুপ। ভূতের রং কুচকুচে কালো।

তারপর ভূতের গলার আওয়াজ শোনার আগেই বিশ্বমামা চেঁচিয়ে বললেন, ওখানে কে রে? ওখানে কে রে? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।

সঙ্গে-সঙ্গে কোথা থেকে যেন শোনা গেল, ওখানে কে রে? ওখানে কে রে? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।

আর কেউ নেই সেখানে, তবু শোনা গেল সেই কথা।

বিশ্বমামা একগাল হেসে বললেন, বীরুদা, নীলু, বাপ্পা, তোমরা তিনজনেই এই একই কথা শুনেছ?

তিনজনেই মাথা নেড়ে বললুম, হ্যাঁ।

বিশ্বমামা বললেন, ভূত কি শুধু এই একটাই কথা জানে? আর কিছু বলতে পারে না?

বিশ্বমামা এবার চেঁচিয়ে বললেন, রাধাকৃষ্ণ।

আর কিছু শোনা গেল না।

বিশ্বমামা আবার বললেন, ময়না, বলো রাধাকৃষ্ণ।

এবার শোনা গেল, রাধাকৃষ্ণ।

বীরুকাকা চোখ বড়-বড় করে বললেন, ময়না?

বিশ্বমামা বললেন, নিশ্চয়ই। টকিং বার্ড। অবিকল মানুষের গলা নকল করতে পারে। কারুর বাড়ির পোষা ময়না, আগেকার মালিক ওই কথাটা শিখিয়েছিল, চোর-টোরদের ভয় দেখাবার জন্য। আপনি রাধাকৃষ্ণ বলতে শেখান, তাই শিখবে। রাম-সীতাও শেখাতে পারেন। ভূত তো কখনো রামনাম উচ্চারণ করে না।

আমাদের তিনজনেরই চোখে তখনই অবিশ্বাসের ছাপ দেখে বিশ্বমামা আবার বললেন, ময়না পাখি সাধারণত নির্জন জায়গায় বাসা বাঁধে। এমন গাছের ভেতরে থাকে, যে গাছে সাধারণত মানুষ ওঠে না। এই জন্য ওরা বাজ-পড়া গাছ বেশি পছন্দ করে। দেখবেন পাখিটা?

পোড়া তালগাছটা ধরে খানিকটা ঝাঁকাতেই তার ডগা থেকে ঝটপট করে একটা কালো রঙের পাখি বেরিয়ে উড়তে লাগল, আর বলতে লাগল, ওখানে কে রে? ওখানে কে রে? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা! রাধাকৃষ্ণ!

বিশ্বমামা বললেন, আমি ইচ্ছে করলে ওকে ধরে খাঁচায় রাখতে পারতুম, কিন্তু আগেই কথা দিয়েছি, ওকে ডিসটার্ব করব না। ও থাক নিজের মতন!

বীরুকাকা বললেন, বিশ্ব, তোমাকে আর কান ধরে ওঠ-বোস করতে হল না। তার বদলে তোমাকে একটা পুরস্কার দিতে চাই। কী চাও, বলো!

বিশ্বমামা বললেন, গলদা চিংড়ি ভাজা!

বিশ্বমামার খুদে বন্ধু

সাপ দেখলে সবচেয়ে ভয় পান বিশ্বমামা, আর সবচেয়ে ভালোবাসেন পিঁপড়ে। একবার শান্তিনিকেতনে একটা সাপ দেখে বিশ্বমামা এমন দৌড় লাগালেন যে...। সাপের, জন্য তিনি খোঁড়া হয়ে রইলেন কয়েকটা দিন।

না, তাঁকে সাপে কামড়ায়নি, কিন্তু ভয় পেয়ে দৌড়তে গিয়ে তিনি আছাড় খেয়ে পড়লেন, তাতেই মচকে গেল গোড়ালি।

বড়দের তো দৌড়বার অভ্যেস থাকে না। তাই তাদের যখন-তখন ভয় পেয়ে দৌড়নো উচিত নয়।

তা ছাড়া সাপ দেখলে দৌড়লেই বেশি বিপদ। তখন তেড়ে গিয়ে কামড়ে দিতে পারে। চুপ করে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তারা কিছু করে না।

বিশ্বমামা এত বড় পণ্ডিত, তিনি এটা জানেন না?

সেবারে পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে শুয়ে থাকতে-থাকতে বিশ্বমামা বলেছিলেন, হ্যাঁ, জানি, সবই জানি। তবু সাপ দেখলেই আমার মাথা গুলিয়ে যায়।

সেবারে জার্মানিতে বিশ্বমামার একটা জরুরি মিটিং-এ যাওয়ার কথা ছিল, আর যাওয়াই হল না।

গত মাসে আমরা পিকনিকে গেলাম কাকদ্বীপে। বিশ্বমামাকে নিয়ে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। বিশ্বমামা গেলে অনেক মজার-মজার গল্প শোনা যায়। তা ছাড়া খুব চেপে ধরলে আইসক্রিমও খাওয়ায় সবাইকে।

কিন্তু বিশ্বমামাকে সে পিকনিকের কথা বলতেই তিনি আঁতকে উঠে বললেন, ওরে বাবা, কাকদ্বীপ! ওখানে যখন-তখন সাপ বেরোয়।

আহা, সাপের ভয়ে কেউ বুঝি কাকদ্বীপে যায় না? এত লোক তো ওখানে থাকে, তারা কি সাপের কামড়ে মরছে?

আমরা দিব্যি পিকনিক করে এলাম, একটাও সাপ দেখিনি।

সেই যে শান্তিনিকেতনে একবার সাপ দেখে পা মচকেছিলেন তারপর থেকে আর শান্তিনিকেতনে যেতে চান না। একমাত্র শীতকাল ছাড়া। শীতকালে সাপ বেরোয় না।

শান্তিনিকেতনে বর্ষাকাল কী সুন্দর, রাস্তায় কাদা জমে না। অজস্র ফুল ফোটে আর অনেক দূর থেকে বৃষ্টি আসছে দেখা যায়। আমাদের মিনুমাসিদের বাড়ি আছে সেখানে-কতবার যেতে বলেন বিশ্বমামাকে, তিনি কিছুতেই যাবেন না।

বিশ্বমামার সাপের ভয় যেমন বেশি-বেশি, তেমনি পিঁপড়েদের প্রতি ভালোবাসাও খুব বেশি।

ছোট্ট-ছোট্ট পিঁপড়েদের যখন-তখন যেখানে-সেখানে দেখা যায়। কোথা থেকে যে ওরা আসে, তা বোঝার উপায় নেই। পিঁপড়ে দেখলেই বিশ্বমামা মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকেন।

আমাদের বলেন, দেখেছিস, দেখেছিস, পিঁপড়েরা কী সুন্দর, কী অপূর্ব!

পিঁপড়ে আবার সুন্দর হয় কী করে। তা আমি বুঝি না ওইটুকু-ওইটুকু পিঁপড়ে, কামড়ে দিলে বেশ জ্বালা করে।

বিশ্বমামা যে টেবিলে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে কাজ করেন একদিন সেই টেবিলের ওপরেই দেখা গেল সারি-সারি পিঁপড়ে।

বিশ্বমামা সেগুলো মারলেন না, সরালেন না। কী করলেন না, শুধু তাকিয়ে রইলেন আর আমাকে বললেন, বল তো, নীলু, এই পিঁপড়েগুলো এখানে এসেছে কেন?

তা আমি কী করে জানব? পিঁপড়েরা কেন আসে তা কি কেউ বলতে পারে?

বিশ্বমামা বললেন, কাল আমি এখানে বসে কাজ করতে-করতে একটা কেক খেয়েছিলাম। কিছু তো গুঁড়ো টেবিলে পড়বেই। আমি ভালো করে পরিষ্কার করেছি, তবু এক আধটু গুঁড়ো তো টেবিলের ফাঁকে-ফাঁকে থেকে যাবেই। পিঁপড়েগুলো এসেছে সেই টুকরোগুলো খুঁজতে। এটা এক আশ্চর্য ব্যাপার না?

পিঁপড়েরা খাবার খুঁজতে আসবে, এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? এসব পোকা-মাকড় আর জন্তু-জানোয়ার তো খাবার খুঁজে বেড়ায়?

বিশ্বমামা বললেন, আমি যে এখানে বসে কাল কেক খেয়েছি, তা পিঁপড়ে কী করে জানল? তখন তো এখানে একটাও পিঁপড়ে ছিল না? সব পরিষ্কার করার পরেও একটু কেকের গুঁড়ো থেকে যাবে, তাই-ই ওরা টের পেল কী করে? কে ওদের খবর দেয়।

অনেক সময় দেখা যায়, একলা-একলা একটা পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইরকমভাবে ওরা সব জায়গায় খাবার খুঁজে বেড়ায়। একজন খোঁজ পেলেই অন্যদের ডেকে আনে।

আমার দাদা বিলুর আবার একটা বাতিক আছে।

একদিন একটা ছোট্ট লাল পিঁপড়ে ওর চোখের পাতায় কামড়ে দিয়েছিল, সেই থেকে পিঁপড়েদের ওপর ওর খুব রাগ।

পিঁপড়ে দেখলেই ও মারে।

হাত দিয়ে মারে না, জল ঢেলে-ঢেলে পিঁপড়েদের নর্দমায় ঢুকিয়ে দেয়। এটা ওর একটা খেলার মতন।

একদিন বিলুদা দেওয়ালে জল ঢেলে-ঢেলে পিঁপড়ে মারছিল, তা দেখতে পেয়ে বিশ্বমামার কী রাগ! বিলুদাকে প্রায় মারতে গিয়েছিলেন।

বিশ্বমামা এমনিতে হাসিখুশি মানুষ, সহজে রাগেন না।

সেদিন বললেন, তুই কী করছিস বিলু, তা তুই জানিস? তোর থেকেও বুদ্ধিমান একটা প্রাণীকে মারছিস?

বিলুদা বলেছিল, বিশ্বমামা, তুমি আর বাড়াবাড়ি করো না। মানুষের চেয়ে পিঁপড়ের বুদ্ধি বেশি?

বিশ্বমামা, নিশ্চয়ই! তোর এতবড় একটা মাথা তার মধ্যে অনেকখানি ঘিলু মানে ব্রেন আছে। আর পিঁপড়ের মাথা একটা আলপিনের ডগার থেকেও ছোট, তার মধ্যে ইংরেজি ফুলস্টপের চেয়েও ছোট ওর ঘিলু। তাই নিয়েই পিঁপড়ে কত কিছু বোঝে? কীরকম লাইন বেঁধে চলে। সবাই মিলে কাজ করে, নিজেদের মধ্যে কক্ষনো মারামারি করে না। আরও কত গুণ আছে। তাহলে তুলনা করে দ্যাখ!

বিলুদা বললেন, কিন্তু আমার চোখের ওপর কামড়াবে কেন? আমার চোখটা কি ওর খাওয়ার জিনিস?

বিশ্বমামা বললেন, সকালে ভালো করে চোখ-মুখ ধুয়েছিলি? নিশ্চয়ই কিছু লেগেছিল? আমার চোখে তো পিঁপড়ে কামড়ায় না। নীলুর চোখে কামড়ায়?

বিশ্বমামা ইচ্ছে করে কেকের গুঁড়ো, বিস্কুটের গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখেন ঘরের এক কোণে। সেখানে তো পিঁপড়ে আসবেই। বিশ্বমামা কাজের ফাঁকে-ফাঁকে সেই পিঁপড়েদের আনাগোনা দেখেন। ওগুলো যেন তার পোষা পিঁপড়ে।

মিনুমাসি একদিন এসে বললেন, আমার ছেলের জন্মদিন এবার শান্তিনিকেতনের বাড়িতে হবে। নীলু, তোদের কিন্তু আসতেই হবে।

আমি আর বিলুদা তো সঙ্গে-সঙ্গে রাজি।

বিশ্বমামা গেলে ভালো লাগত, কিন্তু উনি তো শান্তিনিকেতনে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

মিনুমাসি বললেন, এখন তো নভেম্বর মাস। শীত পড়ে যাচ্ছে। এখন আর বিশ্বর ভয় কী? ওকে বুঝিয়ে বল।

বিশ্বমামার বাড়িতে গিয়ে দেখি, একটা কমপিউটারের সামনে বসে চিঠি পড়ছেন। এখন তো আর বিদেশ থেকে চিঠি পিওন দেয় না, কমপিউটার দেখলেই পাওয়া যায়।

বিশ্বমামা বললেন, ডাক এসেছে, অস্ট্রেলিয়া যেতে হবে।

আমি বললুম, এই তো কদিন আগে ঘুরে এলে সে দেশ থেকে।

বিশ্বমামা বললেন, একবার গেলে বুঝি আবার যাওয়া যায় না? আগেরবার গিয়েছিলাম নিউজিল্যান্ড।

বিশ্বমামা সত্যিই সারা বিশ্ব টহল দিয়ে বেড়ান। বৈজ্ঞানিক হিসেবে দিন-দিন তাঁর নাম বাড়ছে।

শান্তিনিকেতনে যাওয়ার কথা শুনে বললেন, নভেম্বর মাস, ভালো করে শীত তো পড়েনি, এখন ওসব সাপের জায়গায় যাব না।

আমি বললুম, কলকাতার থেকে শান্তিনিকেতনে অনেক আগে শীত আসে। ওখানে এখনই রাত্তিরে কম্বল গায়ে দিতে হয়।

এসব বলে কয়ে বিশ্বমামাকে রাজি করানো গেল।

অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আরও সাতদিন সময় আছে। তার মধ্যে দুদিন শান্তিনিকেতন।

মিনুমাসির ছেলে বিন্টুকে তিনি ভালোবাসেন খুব। বিন্টু এবার চার বছরে পা দেবে।

তার জন্মদিনের জন্য বিশ্বমামা কিনে ফেললেন একটা এরোপ্লেন। আসল নয়, খেলনা। সেটা কিন্তু ঘরের মধ্যে উড়তে পারে।

মিনুমাসিরা চলে গেলেন আগেই।

আমি আর বিলুদা বিশ্বমামার সঙ্গেই গেলুম শনিবার। বোলপুর স্টেশনে নেমে সাইকেল-রিক্সা।

মিনুমাসির বাড়ি অনেকটা দূর। বেশ ফাঁকা-ফাঁকা জায়গায়।

সে বাড়ির সামনে সাইকেল রিক্সা থামতেই দেখি হুলুস্থুলু কাণ্ড চলছে।

বাড়ির সামনে বাগানে সব গাদা লোক, তারা উত্তেজিত ভাবে কী যেন বলাবলি করছে।

মিনুমাসিও রয়েছেন সেই ভিড়ের মধ্যে। আমাদের দেখেই কাকে যেন বললেন, এই, এই, বিশ্বকে এখন কিছু বলো না। বলো না!

কিন্তু রমেনমেসো সেটা শুনতে পাননি।

তিনি এগিয়ে এসে বললেন, সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়েছে, ঘরের মধ্যে একটা...ও হো, বিশ্ব, বিশ্ব, না, না, তেমন কিছু না।

আমি জিগ্যেস করলুম, ঘরের মধ্যে একটা চোর ঢুকে বসে আছে?

বিশ্বমামা গম্ভীরভাবে বললেন, চোর নয়, সাপ। তাই না?

রমেনমেসো চুপ।

বিশ্বমামা বললেন, আগেই বলেছিলুম, নভেম্বরে শীত পড়ে না। এখন তো রীতিমতন গরম। এই সময় সাপ বেরোয়। আমি আর ও বাড়িতে ঢুকছি না। পরের ট্রেনেই ফিরে যাচ্ছি।

মিনুমাসি দৌড়ে কাছে এসে বললেন, দাঁড়া বিশ্ব। সাপ কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ইঁদুর-টিদুরও হতে পারে।

বিশ্বমামা বললেন, ইঁদুর আর সাপের চেহারা কি একরকম? কে দেখেছে? মোট কথা, আমি আর থাকছি না এখানে।

মিনুমাসি বললেন, শোন-শোন তোকে এ বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হবে না। সামনের বাড়িটা খালি। ওটা আমাদেরই এক বন্ধুর বাড়ি। ওটা আমরা নিয়েছি। তুই ও বাড়িতে থাকবি। এখানে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। পুলিশে খবর দিয়েছি।

বিশ্বমামা বললেন, পুলিশ এসে সাপ তাড়াবে এরকম হাসির কথা জন্মে শুনিনি।

বিশ্বমামাকে নিয়ে যাওয়া হল উলটোদিকের বাড়িতে।

আমরা রয়ে গেলাম এই বাগানে।

ঘটনাটা শোনা গেল।

রারান্দায় খেলা করছিল বিল্টু। তাকে পাহারা দিচ্ছিল এ বাড়ির কাজের লোক রঘু।

সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল সাপ-সাপ বলে।

মিনুমাসি ছুটে এসে কিন্তু শেষে সাপ দেখতে পাননি।

রঘুর মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে দুহাত ছড়িয়ে বলেছিল, এই অ্যাত বড় সাপ। আর একটু হলেই বিল্টুকে কামড়ে দিত।

রঘু চেঁচিয়ে উঠতেই সাপটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

মিনুমাসি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েও দেখতে পাননি সাপ।

ঘরের মধ্যে একটা খাট, তার তলায় একটা মাদুর গোটানো রয়েছে। সাপটা নাকি ঢুকে বসে আছে ওই মাদুরের মধ্যে। মস্ত বড় সাপ ফনা তুলেছিল।

রঘু সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে, তা কী করে বোঝা যাবে?

মিনুমাসি বিল্টুকে জিগ্যেস করলেন, তুই সাপ দেখেছিস?

বিল্টু একগাল হেসে বলেছিল, ছাপ! মস্ত বড় ছাপ!

বিল্টু নিজে দেখেছে না রঘুর কথা শুনে বলছে, তা বোঝার উপায় নেই। বিল্টুটা খুব দুষ্টুও হয়েছে।

কিন্তু ঘরে মাদুরের মধ্যে যদি একটা সাপ ঢুকে থাকে, তাহলে তো ও ঘরে ঢোকাই যাবে না! ওই ঘর দিয়েই অন্য ঘরে যেতে হয়।

সবাই ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে।

পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা আসবে কেন? তারা চোর-ডাকাত ধরারই সময় পায় না।

শান্তিনিকেতনে সাপুড়েও নেই।

সুরুলে নাকি একজন লোক সাপ মারায় ওস্তাদ, একজন লোক গিয়েছিল তাকে ডেকে আনতে।

লোকটি ফিরে এসেছে। সাপ-মারা লোকটির দারুণ জ্বর, সে আসতে পারবে না।

তাহলে উপায়।

বিশ্বমামাকে গিয়ে সব ঘটনা জানালাম।

বিশ্বমামা বললেন, আমি ও বাড়ির ধারে-কাছেও যাচ্ছি না। মিনুদিকে বল, সবাই মিলে এ বাড়িতে চলে আসুক।

কিন্তু ওই ঘরেই তো অন্নপ্রাসনের সব জিনিসপত্র রয়েছে।

বিশ্বমামা বললেন, বিকেলবেলা ফেরার ট্রেন কখন রে?

এবারে বিলুদা বললেন, বিশ্বমামা, তুমি সাপের নাম শুনে কাপুরুষের মতন পালিয়ে যাবে? ওই ঘরের কাছাকাছি না যাও, একটা কিছু বুদ্ধি দাও।

বিশ্বমামা বললেন, যারা সাপ তাড়াবার জন্য পুলিশ ডাকে তাদের আমি কী বুদ্ধি দেব?

আমি বললুম, গ্রামে তো আজকাল সাপের ওঝাও পাওয়া যায় না। তাহলে কি ডাক্তার ডাকতে হবে?

বিলুদা বললেন দূর বোকা। সাপ কামড়ালে ডাক্তাররা চিকিৎসা করে, ডাক্তাররা কি সাপ ধরে নাকি? ডাক্তাররাও সাপ দেখলে ভয় পায়।

বিশ্বমামা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

হাসতে-হাসতে বললেন, সাপের জন্য পুলিশ, ডাক্তার এবার কি বলবি মন্ত্রী ডাকার কথা।

তারপর বললেন, শোন—

বিণ্টু চলে এসেছে এ ঘরে। কী যেন খাচ্ছিল, সে হাতটা চাটলে এখনো।

বিশ্বমামা আমাদের শুধু শোন বলে থেমে গেলেন। বিণ্টুকে কাছে ডেকে আদর করতে-করতে বললেন, কী খাচ্ছিস রে, বিণ্টু।

বিণ্টু বলল, চিনি, চিনি।

বিশ্বমামা বললেন, আহা রে, খিদে পেয়েছে বুঝি? তোকে কেউ চকলেট দেয়নি, সন্দেশ দেয়নি। শুধু চিনি খাচ্ছিস। আমি বিকেলে বেরিয়ে চকলেট কিনে দেব।

আমি বললুম, বিশ্বমামা, তুমি কী বলছিলে যেন?

বিশ্বমামা বললেন, সাপটারও খিদে পেয়ে থাকতে পারে। ওকেও কিছু খাবার দেওয়া উচিত।

বিলুদা বললেন, সাপেরা কী খায়? দুধ আর কলা।

বিশ্বমামা বললেন, ওটা বাজে কথা। কে রটিয়েছে কে জানে! সাপ দুধও খায় না, কলাও খায় না। ওরা কোনওরকম ফল খেতে পারে না। দুধও চেটে খাওয়ার ক্ষমতা সাপের নেই।

তবে কী খাবে?

বিশ্বমামা বিণ্টুর নকল করে বললেন, চিনি, চিনি।

তারপর বললেন, সাপটাকে এক বাটি চিনি খাওয়াতে পারবি? মিষ্টি খেতে সবাই ভালোবাসে।

বিলুদা বলল, সাপকে কী করে চিনি খাওয়াব? কাছে গেলেই তো কামড়ে দিতে পারে।

বিশ্বমামা বললেন, কাছে যেতে হবে কেন? একবাটি চিনি জোগাড় করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সবটা চিনি ছুঁড়ে দে সাপটার ওপর। যা, এক্ষুনি গিয়ে ব্যবস্থা কর। কী হল আমাকে এসে জানাবি।

দৌড়ে গিয়ে মিনুমাসিকে কথাটা জানাতেই তিনি বললেন, সাপ চিনি খায় জন্মে শুনিনি। তাছাড়া, খেতেটেতে দিলে ওতো আরও বেরুতে চাইবে না।

আমি বললুম. তবু, বিশ্বমামা বলেছেন যখন!

মিনুমাসি আর আপত্তি করেন না। মানুষটা যে খুব জ্ঞানী তা তো সবাই জানে।

বিশ্বমামা কী ভেবে কোন কথাটা বলেন, তা আগে বুঝতে দেন না।

রমেনমেসো নিজে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একবাটি ভর্তি চিনি ছুঁড়ে দিলেন মাদুরটার ওপর।

কিছু হল না। মাদুরটায় কোনও নড়াচড়াও টের পাওয়া গেল না।

কেউ-কেউ বলল, ঢুকলেও হয়তো বেরিয়ে গেছে আবার কোন ফাঁকে।

কেউই কিন্তু সাহস করে ঘরের মধ্যে ঢুকে মাদুরটা টেনে দেখতে চাইছে না।

বিশ্বমামা চিনি ছোঁড়ার কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে। দুঘণ্টা অপেক্ষা কর। আর দু-একজন দরজার কাছে পাহারায় থাক। যদি মাদুরের মধ্যে সাপটা লুকিয়ে থাকে, তাহলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সাপটা বেরিয়ে আসতে বাধ্য।

রমেনমেসোর সঙ্গে আমি আর বিলুদা রইলুম দরজার কাছে পাহারায়।

সত্যি সাপটা ওখানে আছে কী নেই, তা না জেনে কিছুতে স্বস্তি পাওয়া যাবে না।

রমেনমেসোর হাতে একটা লোহার ডান্ডা, আমার আর বিলুর হাতে লাঠি।

বিল্টুও এখানে আসবেই আসবে, তাকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে অন্য বাড়িটায়।

দুঘণ্টাও লাগল না।

তার আগেই মাদুরটা একটু নড়াচড়া শুরু হল। তারপর খুব জোড়ে ওলোট পালোটের মতন।

তারপর সড়াৎ করে সেখান থেকে বেরিয়ে এল একটা মস্ত বড় সাপ।

সাপটা তারপর আর এগোতেই পারছে না। এমনভাবে একবার এদিক আর একবার ওদিক করছে, যেন অন্ধ হয়ে গেছে।

আমরা লক্ষ করিনি, কখন যেন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে রাশি-রাশি পিঁপড়ে। কোথায় এত পিঁপড়ে থাকে কে জানে।

চিনির জন্য এত পিঁপড়ে এসে জুটেছে, সাপটার সারা শরীরও ছেয়ে গেছে পিঁপড়েতে।

যে সাপ দেখে মানুষ ভয় পায়, সে সাপও পিঁপড়েদের কাছে অসহায়।

বেচারি সাপটাকে আর মারতেও হল না, সে অত পিঁপড়ের কামড়ে একেবারে নেতিয়ে পড়লে।

রঘু সবটা সত্যি বলেনি। ও সাপটা বেশ বড় বটে, কিন্তু মোটেই ফনা তুলতে পারে না। বিষাক্তও নয়।

অনেকেই বললেন, ওটা একটা দাঁড়াস সাপ, ওকে মেরে লাভ নেই। ওরা ব্যাঙ আর পোকামাকড় খায়। মানুষকে সাধারণত কামড়ায় না। কামড়ালেও মানুষ মরে না।

রমেনমেসো তাঁর ডাণ্ডার ডগায় সেটাকে তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে এলেন অনেক দূরে।

সব শুনে বিশ্বমামা বললেন, দেখলি, দেখলি, কেন আমি পিঁপড়েদের এত প্রশংসা করি? ওরা আমার বন্ধু!

বিশ্বমামা ও গলদা চিংড়ি

মা একদিন বিশ্বমামাকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে চান। আমাকে বললেন, 'আহা ছেলেটা দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়, তখন হোটেলে খেতে হয়। রোজ-রোজ কি আর হোটেলের খাবার ভালো লাগে। একদিন ওকে ভালো করে বাঙালি রান্না খাওয়াব। যা তো নীলু, জিগ্যেস করে আয়, ও কী কী মাছ খেতে ভালোবাসে? সাহেবদের দেশে গিয়ে তো শুধু মাংসই খায় শুনি।'

বিশ্বমামা কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। সেখানে থাকেন একলা। বিয়েটিয়ে তো আর করলেন না! এ ফ্ল্যাটে রান্নার পাটই রাখেননি। একজন কাজের লোক আছে, সে দোকান থেকে খাবার কিনে আনে।

বিশ্বমামার ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি, কীসব যন্ত্রপাতি নিয়ে মেতে আছেন। লোডশেডিং! হাওয়া নেই, বিশ্বমামার লম্বা নাকটায় ঘাম জমে আছে। জামা খোলা, জিগ্যেস করলাম, 'কী করছ। বিশ্বমামা?'

বিশ্বমামা মুখ তুলে বললেন, 'উঃ যা গরম! আমি গরম সহ্য করতে পারি না! তাই দেখছি, লোডশেডিং-এর সময়েও পাখা চালানো যায় কি না। সস্তায় বিদ্যুৎ তৈরি করার একটা কিছু উপায় আবিষ্কার করতেই হবে।

আমি বললাম, 'লোডশেডিং-এর সময়েও পাখা চলবে না কেন? একটা জেনারেটর কিনে নাও!'

বিশ্বমামা নাক কুঁচকে বলল, 'বিচ্ছিরি শব্দ, তা ছাড়া ধোঁওয়া বেরোয়, খুব অস্বাস্থ্যকর। যাক হঠাৎ এসেছিস কী জন্য?'

'বিশ্বমামা তুমি মাছ বেশি ভালোবাসো, না মাংস?'

'কেন রে? খাওয়াবি নাকি? নিজের দেশে থাকলে মাছ ভালোবাসি আর বিদেশে গেলে মাংস। ওসব দেশে মাছ আমার ভালো লাগে না। আর আমাদের দেশে মাংস খুব ভালো নয়।'

'মাছের মধ্যে কী কী মাছ তুমি বেশি পছন্দ করো?'

'তুই কি আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিস? আগে বল, তুই কী মাছ ভালোবাসিস?'

'চিংড়ি।'

'দূর বোকা! চিংড়ি আবার মাছ হল কবে থেকে। ও তো এক ধরনের জলের পোকা। জলে এরকম অনেক পোকা থাকে। আমাদের দেশে তিমিকেও লোকে বলে তিমি মাছ। তিমি মোটেই মাছ নয়। মানুষের মতনই এক ধরনের প্রাণী।'

'কী বলছ বিশ্বমামা? তিমি আর মানুষ এক?'

'মোটেই তা বলিনি। মানুষ কি মাছের মতন ডিম পাড়ে? মায়ের পেট থেকে বাচ্চা হয়। তিমি মাছও ডিম পাড়ে না, তাদেরও বাচ্চা হয়। যাদের সরাসরি বাচ্চা হয় তাদের বলে ম্যামাল। সুতরাং মানুষ আর তিমি একই প্রজাতি।'

'ওসব জানি না। যারা জলে থাকে, তাদেরই আমরা মাছ বলি।'

'মানুষও এক সময়ে জলে থাকত। যাক গে ওসব কথা থাক। সত্যি কথাটা হচ্ছে, চিংড়ি মাছ পোকাই হোক আর মাছই হোক, আমারও চিংড়ি খেতেই সবচেয়ে ভালো লাগে। বড়-বড় গলদা চিংড়ি, মস্ত মোটা মাথা, তার মধ্যে ঘিলু, আরও চমৎকার।'

'ঠিক আছে বিশ্বমামা, এই রবিবার তুমি দুপুরে আমাদের বাড়িতে গলদা চিংড়ি খাবে। মা তোমাকে রান্না করে খাওয়াবে।'

'বিশ্বমামা সারা মুখে হাসি ভরিয়ে বললেন, 'তাই নাকি? গ্র্যান্ড ব্যাপার। নারকোল দিয়ে মালাইকারি করতে বলবি, আর একখানা আস্ত ভাজা খাব!'

এই সময় পাখাটা ঘুরতে শুরু করল। আমি বললাম, 'ওই তো লোডশেডিং শেষ হয়ে গেছে।'

বিশ্বমামা উঠে সুইচ টিপে বললেন, 'কে বললে শেষ হয়েছে? আলো জ্বলছে না। শুধু পাখা ঘুরছে।'

আমি বললাম, 'তাহলে ইনভার্টার লাগিয়েছ বুঝি?'

বিশ্বমামা বললেন, 'খুব শিখেছিস! ইনভার্টারে ব্যাটাবি লাগে, আমার যন্ত্রে কোনও ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছিস? আমার আবিষ্কার সফল হলে, লোকে বাড়িতে বসেই নিজেদের দরকার মতো বিদ্যুৎ বানিয়ে নিতে পারবে। ওসব এখন বলা যাবে না। এখন কেটে পড়, রোববার দেখা হবে।'

বড় গলদা চিংড়ির অনেক দাম। তাই বাজার থেকে আনা হয় না। আমরাও অনেকদিন খাইনি। বিশ্বমামার সঙ্গে আমাদেরও খাওয়া হয়ে যাবে।

এমনই মজার ব্যাপার, রবিবার বাজারে যেতেই হল না। বিলুদা বাজারের থলি টলি নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি, এই সময় ছোটকাকা এসে হাজির। ছোটকাকা থাকেন এখন সোনারপুরে, সেখানে কীসব ব্যবসা করেন। ছোটকাকা সঙ্গে এনেছেন ছ-খানা বিরাট সাইজের গলদা চিংড়ি। ওঁর বাড়ির পুকুরে হয়েছে। একেই বলে যোগাযোগ।

দুপুর বেলা খেতে বসে বিশ্বমামা মহা খুশি। মুড়ো থেকে ঘিলু টানতে-টানতে মাকে বললেন, 'দিদি, এত টাটকা চমৎকার স্বাদের চিংড়ি বহুদিন খাইনি। আর, মনটা একেবারে জুড়িয়ে গেল!'

ছোটকাকাও কাজটাজ সেরে এসে খেতে বসেছেন আমাদের সঙ্গে। মা বললেন, 'এ মাছ তো ঠাকুরপো এনেছে। ওর পুকুরের। টাটকা হবে না?'

বিশ্বমামা অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি ছকুদা, পুকুরে এত বড় চিংড়ি হয়?'

ছোটকাকা বললেন, 'যাকে বাগদা চিংড়ি বলে, সেগুলো হয় না। সেগুলো নোনা জলের মাছ। কিন্তু এই গলদা চিংড়ি পুকুরে বেশি ভালো হয়। আমার পুকুরের গলদা জাপানে চালান হয়!'

বিশ্বমামা বললেন, 'এ মাছের তো অনেক দাম শুনেছি। আপনার খুব লাভ হচ্ছে নিশ্চয়ই।'

ছোটকাকা বললেন, 'প্রথম-প্রথম খুবই লাভ ছিল। কিন্তু মুশকিল কী জানো, বড্ড চুরি হয়। এ মাছ ধরাও খুব সোজা। রাত্তিরবেলা হাত দিয়েও ধরা যায়।'

মা বললেন, 'এরকম মাছের লোভে তো চোর আসতেই পারে। তুমি পাহারাদার রাখোনি?'

ছোটকাকা বললেন, 'তা তো রাখতেই হয়েছে। আমার পাহারাদার চুনী সিং লম্বা-চওড়া জোয়ান। চোরেরা তাকে দেখলেই ভয় পাবে। খুব বিশ্বাসী। সে রাতে টর্চ জ্বেলে ঘুরে-ঘুরে পাহারা দেয়, তবু চুরি হয়! আমার ধারণা, কোনও চেনাশুনো লোকই চুরি করছে। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না।'

বিশ্বমামা চোখ সরু করে জিগ্যেস করলেন, 'কী করে বুঝলেন, চেনা লোক?'

ছোটকাকা বললেন, 'রাত্তিরে আমার পোষা কুকুরটা বাগানে ছাড়া থাকে। সব জায়গাটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাইরে থেকে রাত্তিরে কেউ এলেই কুকুরটা ডেকে উঠবে। একমাত্র চেনা লোকদের দেখলেই কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে না। তুমি একবার সোনারপুরে গিয়ে দু-এক রাত থাকবে বিশ্ব? দেখো, যদি চোর ধরার কোনও উপায় বার করতে পারো!'

বিশ্বমামা একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'এক্ষুনি তো যাওয়ার উপায় নেই। একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে আমাকে জার্মানিতে যেতে হবে, সেখান থেকে ইটালি। ফিরতে-ফিরতে একমাস তো হবেই, তারপর সোনারপুর যাব। এর মধ্যে আপনি এক কাজ করুন। ওই পুকুরে কিছু কুচোমাছ ছেড়ে রাখুন!'

ছোটকাকা অবাক হয়ে বললেন, কুচো মাছ? তা দিয়ে কী হবে?

বিশ্বমামা জিগ্যেস করলেন, কুচোমাছ মানে, পুঁটি, মৌরলা এগুলো ভাজা খেতে ভালো লাগে না? সোনারপুরে গিয়ে যখন থাকব, তখন রোজ-রোজ তো গলদা চিংড়ি খাব না। ওই সব ছোট মাছও ভালো লাগবে।

বিশ্বমামা বিদেশে চলে গেলেন, তারপর কবে যে ফিরলেন, তা আমি জানতেও পারিনি।

একদিন ছোটকাকা গাড়ি পাঠালেন সোনারপুর থেকে। ড্রাইভারের হাতে একটা চিঠি। তাতে লিখেছেন, 'নীলু আর বিলু, তোরা এই গাড়িতে করে আজই সোনারপুরে চলে আয়। বিশ্ব দুদিন ধরে এখানে আছে। চোর ধরার ব্যাপারে ওর খুব উৎসাহ! কত সব কাণ্ড যে করছে তার ঠিক নেই। তোদের কথা খুব বলছে বিশ্ব।'

আমরা সঙ্গে-সঙ্গে রেডি। চেপে বসলাম গাড়িতে।

ছোটকাকার খামারবাড়িটা ঠিক সোনারপুরে নয়। সেখান থেকেও অনেকটা দূরে। মাঠের মধ্যে। সুন্দর নীল রঙের দোতলা বাড়ি। সামনের দিকে চওড়া বারান্দা। পুকুরটা খুব বড় নয়, চারপাশে অনেকখানি বাগান। শুধু মাছ নয়, ছোটকাকার খামারে আলু, পেঁয়াজ, পটল, এরকম অনেক কিছুই হয়। পুরো জায়গাটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

পুকুরটায় মাছ চাষ হয় বলে কেউ সেখানে স্নান করে না। একটা লাল রঙের ঘাট আছে। পুকুরের ধারে-ধারে অনেক রকম ফুলের গাছ।

সবসুদ্ধ দশজন লোক এখানে কাজ করে। তাদের মধ্যে ছ-জন সন্ধের পর নিজেদের বাড়িতে চলে যায়। তিনজনের জন্য বাগানের একপাশে ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। পাহারাদার চুনী সিং তার বউ নিয়ে থাকে অন্য দিকের একটা ঘরে।

সন্ধের পর বারান্দায় বসে ছোটকাকা বললেন, 'দ্যাখো, দিনের বেলা এত লোক থাকে যে তার মধ্যে চোর ঢুকে পুকুরে মাছ ধরবে, এটা সম্ভবই নয়, সন্ধের পর গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। রাত্তিরবেলা চোরকে আসতে হলে পাঁচিল ডিঙিয়ে আসতে হবে। ওই দ্যাখো, আমার বাঘা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইরের কোনও লোক দেখলে ও তো ছাড়বে না।'

কুকুরটাকে আমরা আগেই দেখে নিয়েছি। ভয়ংকর চোখ দুটো। দেখলে নেকড়ে বাঘ বলে মনে হয়। দিনের বেলা বাঁধা থাকে, ছেড়ে দেওয়া হয় সন্ধের পর। আমাদেরও সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, রাত্তিরে একা-একা বাগানে যাওয়া চলবে না। বাঘা কামড়ে দেবে।

বিশ্বমামা বললেন, 'ছকুদা, আপনার লোকদের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম, কারুকেই তো চোর বলে মনে হল না।'

ছোটকাকা বললেন, 'চুরি করবে কেন, সেটাই আমি ভাবি। সবাইকেই ভালো মাইনে দিই, আমার লাভের কিছুটা অংশ দিই। খাওয়া-পরাও ভালো পায়। তবু চুরি করবে?'

বিশ্বমামা বললেন, 'চুরি করা যাদের স্বভাব, তারা চুরি করেই। পৃথিবীর যারা বড়-বড় চোর, তাদের কিন্তু খাওয়া-পরার কোনও অভাব নেই।'

বিলুদা বললেন, 'আজ চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে। বিশ্বমামা, তোমার একটা গান হোক। এখন চুরি-টুরির কথা শুনতে ভালো লাগছে না।'

বিশ্বমামা বললেন, 'আমরা চোর ধরতেই এসেছি। এখন গান-টান চলবে না। বরং আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তে হবে।'

তাই হল, দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ। একখানা বড় ঘরে আমরা শুয়ে পড়লাম। তিনজনেই। বিশ্বমামা বললেন, 'ঘুমোনো চলবে না কিন্তু। আজ রাতেই কিন্তু একটা কিছু ঘটবে মনে হয়। ফিসফিস করে গল্প চলতে পারে।'

জানলা দিয়ে দেখা গেল, কোথা থেকে কালো-কালো মেঘ এসে জ্যোৎস্না মুছে দিয়েছে। বাইরে আর বাগান-টাগান কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু মিটি-মিটি একটা টর্চ জ্বলছে, আর পাওয়া যাচ্ছে মাটিতে লাঠি ঠোকার শব্দ। পাহারা দিচ্ছে চুনী সিং। লোকটার কর্তব্যজ্ঞান আছে বটে।

ছোটকাকা পাশের ঘরে শুয়ে পড়ে একটু পরেই এমন নাক ডাকতে লাগল যেন মনে হয় মেঘ গর্জন।

আমরা শুয়ে আছি তো শুয়েই আছি। কিছুই ঘটছে না। ঘুমও আসছে না উত্তেজনায়।

মাঝরাত পেরিয়ে গেল, তখন সবে একটু ঢুলু-ঢুলু ভাব এসেছে, এই সময় একটা চিৎকার শোনা গেল পুকুর পাড়ে। কে যেন দারুণ ভয় পেয়ে, ওগো মাগো, বাবাগো বলে ডাকছে। সঙ্গে-সঙ্গে বাঘা ডেকে উঠল ঘেউ-ঘেউ করে।

বিশ্বমামা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে ছোটকাকাকে ধাক্কা মেরে বললেন, 'উঠুন, উঠুন, আপনার কুকুর সামলান আমরা চোর ধরে ফেলছি!'

সবাই মিলে দৌড়ে পুকুর ঘাটে গিয়ে দেখা গেল, নীল শাড়ি পরা একটি মেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর যথেষ্ট কাঁপছে। তাই দেখে ডেকে চলেছে বাঘা। চুনী সিং মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছে।

ছোটকাকা বললেন, 'এ কী, এ তো চুনী সিং-এর বউ আংটি।'

বিশ্বমামা বললেন, 'চুনীর বউ আংটি, বাঃ, বেশ মিলেছে তো।'

চুনী সিং বললেন, 'সাব, আমার বউকে নিশ্চয়ই সাপে কামড়েছে ওকে বাঁচান।'

বিশ্বমামা বললেন, 'মোটেই সাপে কামড়ায়নি। ও জলে নেমেছিল। ওর কোঁচড়ে চিংড়ি মাছ আছে কি না দেখুন তো!'

সত্যিই তাই। চুনী সিং-এর কোমরে একটা থলি বাঁধা। তার মধ্যে দুটো বড়-বড় গলদা চিংড়ি।

বিশ্বমামা বললেন, 'বাঃ চমৎকার ব্যবস্থা। চুনী সিং পাহারা দেওয়ার নাম করে ঘুরে বেড়ায়। আর ওর বউ চুপি-চুপি জলে নেমে মাছ চুরি করে। বাঘা ওকে চেনে। তাই ঘেউ-ঘেউ করে না। রোজ এরকম দামি মাছ দু-তিনটে করে বিক্রি করলেই ভালো রোজগার হয়।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'ওর শারীরটা থরথর করে কাঁপছে কেন? মরে যাবে নাকি?'

বিশ্বমামা বলল, 'ও কিচ্ছু না। একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে, ইলেকট্রিক শক খেয়েছে। তাই ভয়ের চোটে ভাবছে, বুঝি সাপে কামড়েছে।'

ছোটকাকা বললেন, 'জলে নেমে...শক খেল কী করে? বিশ্ব, তুমি কি সমস্ত পুকুরের জলটা ইলেকট্রিফাই করে দিয়েছ? সর্বনাশ!'

বিশ্বমামা বললেন, 'আমি কি পাগল নাকি যে পুকুরের জলে কারেন্ট পাস করাব? তাহলে তো সব মাছও মরে যাবে। আমি শুধু দুটো মাছ ছেড়ে দিয়েছি!'

আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'মাছ।'

বিশ্বমামা বললেন, 'কেন, তোমরা ইলেকট্রিক ফিসের কথা জানো না? এবার ইটালি থেকে একটা টর্পেডো মাছ, আর একটা ইল মাছ নিয়ে এসেছি। ওরা নিজেদের শরীরে বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে। ইল মাছের বিদ্যুৎ প্রায় তিনশো-চারশো ভোল্ট হয়।'

ছোটকাকা বিড়বিড় করে বললেন, 'মাছের বিদ্যুৎ!'

বিশ্বমামা বললেন, 'ওরা সমুদ্রের জল ছাড়া বাঁচে না। তাই এক মণ নুন মিশিয়ে দিয়েছি তোমার এই পুকুরের জলে। ইটালিতে আমি এই মাছের বিদ্যুৎ তৈরি কী করে হয়, সেই গবেষণা করতেই গিয়েছিলাম। দ্যাখো, মাছ দুটো কীরকম কাজে লেগে গেল।

এই মাছ তোমার ওই গোসাপ আর বড়-বড় দাঁড়াওয়ালা গলদা চিংড়ি খেতে পারে না, তাই তাদের খাদ্য জোগাবার জন্য তোমাকে পুঁটি, মৌরলা ছেড়ে দিতে বলেছিলাম।'

চুনী সিং-এর বউয়ের কাঁপুনি আস্তে-আস্তে থেমে গেল। সে উঠে বসে ছোটকাকার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে বলল, 'বাবু, এবারের মতন মাপ করে দিন, আর এমনটি করব না।'

বিশ্বমামা বললেন, 'যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কথা বলে, সেইরকম মাছ দিয়েই মাছচুরি ধরা হল, বল? এবার একটা গান ধরা যেতে পারে।'

বিশ্বমামা হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে গেয়ে উঠল ঃ

চিংড়ি রানি, চাঁদবদনী, তোমার মতন কে!
পাবদা, ট্যাংরা, কাতলা, বোয়াল, হেরে গিয়েছে!
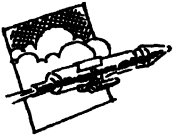
বিশ্বমামা ও বেড়াল-ভূত

মনে আছে, সেই দিনটির কথা। দু-বছর কিংবা আড়াই বছর আগে। সকালবেলা বিশ্বমামা হঠাৎ এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান, কখন কোথায় থাকেন তার ঠিক নেই। তাই এরকম হঠাৎ-হঠাৎই আসেন। বাবা বাজারে গেছেন, মায়ের সঙ্গে দাদা আর আমি চা খেতে বসেছি, বিশ্বমামা একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, 'দিদি, আমাকে চা দাও।'

মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বিশ্বমামা খেতে ভালোবাসেন। দূর-দূর দেশে থাকেন, সাহেবি খাবার খেতে হয়, বাঙালি খাবার তেমন জোটে না। আমরা সকালে চায়ের সঙ্গে দুখানা টোস্ট খাই জ্যাম-জেলি মাখিয়ে, কোনও-কোনও দিন সঙ্গে থাকে ডিম সেদ্ধ। বিশ্বমামার এসব একেবারে পছন্দ নয়। তিনি ভালোবাসেন লুচি আর আলু-ফুলকপির তরকারি। সাহেবরা লুচি বানাতে জানে না, ওসব দেশে ফুলকপির স্বাদও এত ভালো হয় না।

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'বিশ্ব একটু অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুনি লুচি ভেজে দিচ্ছি।' বিশ্বমামা আমাদের অবাক করে দিয়ে বললেন, 'না দিদি, আজ আর লুচি খাব না। বরং আরও আট-দশখানা টোস্ট করে নিয়ে এসো। আজ আমিই তোমাদের একটা নতুন খাবার খাওয়াব।'

পকেট থেকে তিনি একটা গোল কৌটো বার করলেন, ওপরে হাঁসের ছবি আঁকা। কয়েকটা তার দিয়ে সেই কৌটোটা শক্ত করে বাঁধা, সেই তার উলটো করে পাকাতেই কৌটোর মুখটা আপনা-আপনি খুলে গেল। বিশ্বমামা একটা ছুরিতে তার ভেতরের

জিনিসটা খানিকটা তুলে একটা টোস্টে মাখালেন। আমার হাতে সেটা দিয়ে বললেন, 'খেয়ে দ্যাখ।'

একটা কামড় দিয়েই আমার মুখের চেহারাটা বদলে গেল। এমন চমৎকার খাবার জীবনে খাইনি।

দাদা আর মা দুজনেই খেয়ে একই কথা বললেন। এর স্বাদ একেবারে নতুন রকমের। একটু খেলেই মনে হয়, আরও খাই, আরও খাই।

দাদা জিগ্যেস করল, 'বিশ্বমামা, এটা কি তোমার আবিষ্কার?'

বিশ্বমামা বললেন, 'না রে, কাল তো ফ্রান্স থেকে ফিরেছি। সেখান থেকে খেয়ে এসেছি। বেশ দামি জিনিস। এর নাম মনে রাখতে পারবি? নাম হচ্ছে, পাতে ফোয়া গ্রা।'

দাদা বলল, 'আমার পাতে আর একটু ওই পাতে দাও।'

এই সময় ঘরে ঢুকলো বুলেট। সে আমার কাকার ছেলে, কেন যে তার নাম বুলেট রাখা হয়েছিল। তার বয়েস মোটে ন-বছর, কিন্তু এমন দুষ্টু ছটফটে ছেলে পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

বুলেটের আগেই খাওয়া হয়ে গেছে। তবু সে বলল, 'তোমরা কী খাচ্ছ, আমায় দাও, আমায় দাও।'

তাকেও দেওয়া হল সেই 'পাতে' মাখানো একটা টোস্ট।

সে সেটা নিয়েই দৌড় লাগাল। এক জায়গায় বসে সে কিছুই খেতে পারে না।

তারপর আমরা বসে-বসে গল্প করছি। কৌটোর খাবারটা সব শেষ হয়ে গেছে। হঠাৎ বাইরে একটা হই-হই শব্দ শুনতে পেলাম। কেউ বলছে, 'ধর ধর।' কেউ বলছে, 'গেল গেল।' কেউ বলছে, 'ছাদে, ছাদে উঠতে হবে।'

আমি আর দাদা দৌড়ে ছাদে উঠে গেলাম। গিয়ে দেখি, সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, বুলেট ছাদের কার্নিশ ধরে ঝুলছে। যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। আর তিনতলা থেকে পড়লেই নির্ঘাত মৃত্যু।

দাদা ছাদের পাঁচিলের ওপর অনেকখানি ঝুঁকে কোনওরকমে বুলেটের হাতটা ধরে ফেলল।

টেনে তোলার পর দেখা গেল তার মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গেছে। এর আগেও সে অনেক বিপদে পড়েছে, কিন্তু এতটা হয়নি।

দাদা জিগ্যেস করল, 'কেন ওখানে গিয়েছিলি?'

বুলেট আড়ষ্ট ভাবে বলল, 'বেড়াল।'

ওঃ, এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। যখন যেখানে বেড়াল দেখবে, অমনি তাড়া করে যাবে। বেড়াল দেখলেই ঢিল মারবে, বেড়াল দেখলেই খোঁচাবে। কালীপুজোর সময় একটা বেড়ালের ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে দিয়েছিল।

বেড়ালরাও জেনে গেছে, এই ছেলেটা তাদের শত্রু। সেইজন্য শুধু বুলেটের থালা থেকেই মাছের টুকরো তুলে নেয়। আজকেও 'পাতে' মাখানো টোস্টটা এক কামড় খেয়ে বুলেট এক জায়গায় রেখেছিল, অমনি একটা বেড়াল কোথা থেকে এসে সেটা মুখে

করে পালিয়েছে। সেই বেড়ালটাকে তাড়া করতে গিয়েই বুলেট ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে কার্নিসে পড়ে যায়।

বুলেটকে নিচে এনে বসানো হল। সে বেড়াল তাড়া করতে গিয়ে আরও কতবার বিপদে পড়েছে, সেই গল্প শুরু করলেন মা।

বিশ্বমামা চুপ করে শুনলেন। একটাও কথা বললেন না। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

মা বললেন, 'বিশ্ব, তুই ওকে বুঝিয়ে বল না, ও যেন আর বেড়ালকে তাড়া না করে। বেড়ালও তো ভগবানের জীব। তাকে মারতে নেই। ও যদি বেড়াল দেখলেই না মারে, তা হলে বেড়ালরাও ওর খাবার চুরি করবে না।'

বিশ্বমামা বললেন, 'ও কি আর আমার কথা শুনবে। তোমরা বোঝাও।'

পরের দিন বিশ্বমামা চলে গেলেন হাজারিবাগ।

আমরাও সেখানে বেড়াতে যাব ভেবেছিলাম। বিশ্বমামা চিঠি লিখে জানালেন, তিনি অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছেন এক বছরের জন্য। সেখানে পড়াতে হবে।

তারপর আর অনেকদিন বিশ্বমামার সঙ্গে দেখা নেই।

মাঝে-মাঝে বিদেশ থেকে ফিরছেন বটে, কিন্তু কলকাতায় না থেকে চলে গেছেন হাজারিবাগ। সেখানে তিনি গবেষণা কেন্দ্র বানিয়েছেন।

আগেরবারেরই মতন হঠাৎ আবার একদিন এসে উপস্থিত হলেন আমাদের বাড়িতে। প্রথমেই আমি জিগ্যেস করলাম, 'বিশ্বমামা, সেই চমৎকার খাবারটা এনেছ?'

বিশ্বমামা বললেন, 'সেটার নাম কী ছিল, মনে আছে?' আমি আর দাদা মাথা চুলকোতে লাগলুম। 'কী যেন নামটা? মনে পড়ছে না তো।'

বিশ্বমামা বললেন, 'এবার তো আমি ফ্রান্স থেকে আসিনি। তাই আনা হয়নি। আজ আমি লুচি আর ফুলকপির তরকারি খাব। আর ঝোলা গুড়।'

খেতে-খেতে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'বুলেট নামে সেই ছেলেটা কোথায়? তাকে ডাক।'

'বুলেট তো এখানে নেই। তার দুষ্টুমি কিছুতেই সামলানো যেত না। তাই তাকে হস্টেলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে।'

বিশ্বমামা জিগ্যেস করলেন, 'সে এখনও বেড়ালদের তাড়া করে?'

দাদা বলল, 'ওই রোগটা এখনও সারেনি। বুলেট বেড়াল দেখলে তাড়া করবেই। ঢিল ছুঁড়বে, খোঁচা মারবে। এ জন্য সে একবার আছাড় খেয়ে হাত ভেঙেছে। আর একবার একটা বেড়াল ওকে কামড়ে দিয়েছিল।'

বিশ্বমামা বললেন, 'কাছাকাছি ছুটি নেই? বুলেটকে একবার হাজারিবাগ নিয়ে গেলে হতো!'

বিশ্বমামা বুলেটকে মাত্র একবার-দুবার দেখেছেন। তবু আমাদের বদলে তিনি এবার বুলেটকে নিয়েই কথা বলতে লাগলেন।

কদিন পরেই পুজোর ছুটি পড়ে গেল। আমরা বুলেটকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম হাজারিবাগের দিকে।

যেতে-যেতে বিশ্বমামা বললেন, 'বুলেট, হাজারিবাগে বাঘ থাকে, জানিস তো? বাঘ আর বেড়াল তো প্রায় একই। একটু বড় আর ছোট। বাঘ দেখলেও তাড়া করতে পারবি?'

দাদা বলল, 'বাঘ বুলেটকেই তাড়া করবে। এক গেরাশে খেয়ে ফেলবে।'

বুলেট গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি বাঘকেও ভয় পাই না। বন্দুক দিয়ে গুলি করব।'

বিশ্বমামার গবেষণা কেন্দ্র আর থাকার বাড়ি এ দুটো আলাদা। বাড়িটা দোতলা, সঙ্গে অনেকটা বাগান আছে। সেই বাগানের এক কোণে গবেষণা কেন্দ্র।

বিশ্বমামা বলে দিলেন, 'আমরা ইচ্ছে করলে বাগানে বেড়াতে পারি, জঙ্গলেও যেতে পারি, কিন্তু তাঁর অনুমতি না নিয়ে গবেষণা কেন্দ্রে ঢোকা যাবে না। যখন সময় হবে, তিনি নিজেই আমাদের গবেষণা কেন্দ্রটি দেখাবেন।'

খাওয়া-দাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা। একটা জিপ গাড়ি আছে, তা নিয়ে আমরা জঙ্গলে বেড়াতে যেতে পারি। এখনও বাঘ দেখা যায়নি বটে, কিন্তু অনেক ময়ূর আর হরিণ দেখেছি। আর একটা ভাল্লুক।

বুলেট এখানে যথারীতি একটা বেড়ালকে নিয়ে ব্যস্ত। থাকবার বাড়িটাতে যখন তখন একটা বেড়াল আসে। বেড়ালটাকে ভারি চমৎকার দেখতে। বেশ মোটকা-সোটকা কাবুলি বেড়াল, একেবারে হলদে রং, চারটে পায়ের কাছে যেন কালো মোজা পরা, কপালের ঠিক মাঝখানেও একটা গোল কালো ছাপ, যেন কালো রঙের চাঁদ। বেড়ালটাকে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু আদর করার কি উপায় আছে? সেটাকে দেখলেই বুলেট তাড়া করে যায়, বেড়ালটাও সঙ্গে-সঙ্গে পালায়। দেড় দিনের মধ্যেই বেড়ালটা বুঝে গেল, বুলেট তার শত্রু। সেও ইচ্ছে করেই জ্বালাতন করে বুলেটকে।

বিশ্বমামা বেড়ালটার সঙ্গে বুলেটের এই চোর-পুলিশ খেলা দেখে কিছুই বলেন না, হাসেন শুধু। বাধাও দেন না।

একদিন বুলেট বেড়ালটাকে তাড়া করতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পা মচকাল।

বিশ্বমামা তখন বলেন, 'জানিস বুলেট, আগেকার দিনে লোকে কী করত? বেড়ালকে একেবারে মেরে ফেলতে নেই, তাতে পাপ হয়। সেই জন্য, যারা বেড়াল পছন্দ করত না, তারা বেড়াল পার করে দিত।'

বুলেট জিগ্যেস করল, 'বেড়াল-পার মানে কী?'

বিশ্বমামা বললেন, 'কোনওরকমে ফাঁদ পেতে বেড়ালটাকে ধরে ফেলতে হয়। তারপর একটা থলেতে পুরে মুখটা বেঁধে দিতে হয়। বেড়ালটা আর বেরুতে পারে না। এবার সেই থলেসুদ্ধ বেড়ালটাকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে থলেটার মুখ খুলে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসতে হয়।'

দাদা বলল, 'অনেক সময় মানুষরা বাড়ি ফিরে আসার আগেই সেই বেড়ালটা দৌড়ে বাড়ি পৌঁছে যেত। ওরা দারুণ রাস্তা চেনে।'

বিশ্বমামা বললেন, 'আগেকার দিনে লোকে পায়ে হেঁটে যেত। এখন গাড়ি করে

অনেক দূরে গিয়ে ছেড়ে দিলে কি আর বেড়াল ফিরতে পারবে? বেড়াল কি গাড়ির সমান দৌড়োতে পারবে?'

বুলেট বলে উঠল, 'আমি বেড়াল-পার করব। আমি বেড়াল-পার করব।'

বিশ্বমামা বললেন, 'একটা পরীক্ষা করে দেখলে মন্দ হয় না। যদি একটা বেড়ালকে পাহাড়ের ওপারে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, সত্যি কি ফিরতে পারবে?'

এটা পরীক্ষা করে দেখতে আমরাও রাজি।

বেড়ালটাকে ধরা মোটেই শক্ত হবে না। বুলেট একটা অন্য ঘরে থাকলে বেড়ালটা আমাদের ভয় পায় না। ডাকলে কাছে আসে। একবার আসতেই তাকে ধরে একটু আদর করার পরই ধরে ফেলা হল একটা চটের থলেতে। বেড়ালটা ম্যাও-ম্যাও করে খুব চ্যাঁচাতে লাগল, আমরা সেটাকে নিয়ে দৌড়ে জিপ গাড়িটায় উঠলাম।

বিশ্বমামা অবশ্য গেলেন না।

বুলেটই চেপে ধরে রইল থলিটা। বেড়ালটা মাঝে-মাঝে চ্যাঁচালে সে থাপ্পড় মারে। এখন তো বেড়ালটা আর কামড়াতে পারবে না।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে চলল জিপটা। তারপর ছোট-ছোট পাহাড়। বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। আকাশটা লাল।

প্রায় দশ-বারো মাইল যাওয়ার পর জিপটা একটা ছোট পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে গেল! ড্রাইভার জিগ্যেস করল, 'এই জায়গাটাই ঠিক আছে, কী বলুন।'

পাহাড়টা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। নিচে দেখা যাচ্ছে একটা নদী। বুলেট বলল, 'হ্যাঁ এখানেই।'

থলেটার মুখ খুলে দিতেই বেড়ালটা লাফিয়ে বেরিয়ে এল। বুলেট সেটাকে ঠেলে দিতেই সে গড়াতে লাগল উলটো দিকে। গড়াতে-গড়াতে নেমে গেল অনেকখানি। আর দেখা গেল না। সম্ভবত একেবারে নদীতে গিয়ে পড়বে।

এমন সুন্দর বেড়ালটাকে এরকম বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে আমার খুব খারাপ লাগল। কিন্তু বিশ্বমামা নিজেই তো এই পরীক্ষাটা করতে বলেছেন।

দৌড়ে এসে জিপে উঠলাম। বুলেট ভালো করে জিপটা সার্চ করে দেখে নিল, বেড়ালটা কোনওরকমে জিপে উঠে লুকিয়ে আছে কি না। যদিও সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। আমরা সবাই দেখেছি বেড়ালটা গড়িয়ে পড়ে গেছে!

জিপটা চলছে, আমরা পেছনে মাঝে-মাঝেই দেখছি পেছন ফিরে। না, সে হলদে বেড়ালটা ফিরতে পারবে না।

বাড়িতে ফিরতে-ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বমামা। খুব ব্যস্ত ভাব। জিগ্যেস করলেন, 'ফেলে দিয়েছিস? ফিরতে পারবে না তো?'

আমরা সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'নাঃ, ও আর জীবনে এখানে ফিরতে পারবে না।'

দাদা বলল, 'জঙ্গলে থেকে ও আস্তে-আস্তে বন-বিড়াল হয়ে যাবে।'

বিশ্বমামা বুলেটকে বললেন, 'কী বুলেট মাস্টার, খুশি তো? তোমার এক শত্রু গেছে। এবার আর একটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

তিনি বুলেটকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর দরজাটা বন্ধ করতে-করতে বললেন, 'বুলেট এ ঘরে কিছুক্ষণ একা থাকবে।'

এক মিনিট বাদেই বুলেট বিরাট জোরে ভয়ের চিৎকার করে উঠল।

বাইরে থেকে বিশ্বমামা বললেন, 'কী হয়েছে, বুলেট?'

বুলেট বলল, 'দরজা খুলে দাও! দরজা খুলে দাও! দুটো চোখ জ্বলছে। আমার দিকে এই ধেয়ে আসছে।'

বিশ্বমামা বললেন, 'শুধু চোখ?'

বুলেট বলল, 'অন্ধকার, আগুনের মতন জ্বলছে দুটো চোখ। আমাকে বেরোতে দাও। বিশ্বমামা বাইরে থেকে একটা সুইচ টিপে বললেন, 'অন্ধকার বলেই ভয় পাচ্ছ। এবার দেখো তো! আলো জ্বলছে।

বুলেট আরও চোরে চেঁচিয়ে বলল, 'ভূত! ভূত!'

বিশ্বমামা বললেন, 'তাই নাকি? কীসের ভূত!'

বুলেট বলল, 'বেড়ালের ভূত। বেড়ালটা ফিরে এসেছে। বাঁচাও, বাঁচাও! আমি আর কোনওদিন বেড়াল মারব না।'

বিশ্বমামা দরজাটা খুলে দিতেই দেখা গেল, সেই ঘরের এক কোণে একটা বেড়াল ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করছে।

বেড়ালটাকে দেখে আমাদেরও চক্ষু ছানাবড়া। এ তো সেই হলদে বেড়ালটা। চার পায়ে কালো মোজা, মাথায় কালো চাঁদ।

আমি ঢোঁক গিলে বললাম, 'কী করে ফিরে এল? এ যে অসম্ভব।'

বিশ্বমামা আমার আর দাদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নীলু আর বিলু, তোরাও দেখছিস তো, সেই বেড়ালটা ফিরে এসেছে?'

দুজনেই মাথা নাড়লাম।

বিশ্বমামা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

তারপর বললেন, 'যাক, তাহলে আমার পরীক্ষা সার্থক।'

এখনও বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলাম, 'কীসের পরীক্ষা? বেড়ালটা ফিরল কী করে?'

বিশ্বমামা বললেন, 'ফেরেনি।'

দাদা বলল, 'তাহলে? ভূত হয়ে তো আর আসতে পারে না?'

বিশ্বমামা বললেন, 'বেড়াল-ভূতের কথা কোনওদিন শোনা যায়নি। বেড়ালটা ফিরেও আসেনি। ভূতও হয়নি।'

তারপর সেই বেড়ালটাকে যখন তুলে নিয়ে বললেন, 'এটা আমার সৃষ্টি। ক্লোনিং কাকে বলে জানিস? বিদেশেতে একটা ভেড়ার মতন অবিকল আর একটা ভেড়ার সৃষ্টি করা হয়েছে। এই যমজ তৈরির আগে ভেবেছিলাম, একটা ইঁদুর কিংবা কুকুরের ক্লোনিং করব। তোদের বাড়িতে বুলেটবাবুর কাণ্ড দেখে মনে হল, তাহলে বেড়ালই তৈরি করা যাক। হুবহু একরকম হয় কিনা, সেটা বুলেটের ওপর দিয়েই পরীক্ষা করলাম।'

বুলেট আর কোনও কথা বলছে না।

বিশ্বমামা বললেন, 'আগের বেড়ালটাও মরবেও না, হারিয়েও যাবে না। ওই পাহাড়ের নিচে একজন লোক রেখে দিয়েছি। সে ওটাকে নিয়ে আসবে।'

দাদা জিগ্যেস করলেন, 'বিশ্বমামা, মানুষের ক্লোনিং করা যায়?'

বিশ্বমামা বললেন, 'চেষ্টা করলে অসম্ভব নয় এখন। কিন্তু ভেবে দ্যাখো তো, এই বুলেটের মতন যদি ঠিক আর একটা ছেলে তৈরি করা যায়, কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হবে।

এবার আমরা সবাই হেসে উঠলাম!

বিশ্বমামার গোয়েন্দাগিরি

সকাল বেলা খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে বিশ্বমামা একটা বিরাট হুংকার দিয়ে বললেন। 'হুঁ! আবার বুজরুকি!'

আমি আর বিলুদা ঘরের মেঝেতে বসে সাপ-লুডো খেলছিলুম। আমার ঘুটিটা একেবারে আটানব্বুইয়ের ঘরে এসে একটা বিরাট সাপের মুখে পড়ে গেল।

বিলুদা মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে বিশ্বমামা?' বিশ্বমামা লম্বা নাকের ডগায় একটা আঙুল ছুঁইয়ে বললেন, 'আমাদের এখানে বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই। ঝাড়গ্রামে এক সন্ন্যাসী নাকি যজ্ঞ করে, মন্ত্র পড়ে পরপর দুদিন বৃষ্টি নামিয়েছে। ছিটে ফোঁটা নয়, দারুণ বৃষ্টি।'

বিলুদা কাগজটা নিয়ে জোরে-জোরে পড়তে লাগল। ঝাড়গ্রামের কাছে বিনপুর নামে একটা জায়গায় এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী মেঘদমন যজ্ঞ করেছে। যজ্ঞ শুরু করার আগেই সে সবাইকে বলে দিয়েছিল যে এক ঘণ্টার মধ্যে সে বৃষ্টি নামিয়ে দেবে। অনেক লোক সেখানে জড়ো হয়ে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল। সত্যি-সত্যি হঠাৎ ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সবাইকে ভিজিয়ে দিল। এরকম দুদিন ঘটেছে। বিলুদা বললে, 'নিজস্ব সংবাদদাতা এ খবর পাঠিয়েছে। তা হলে কি এটা মিথ্যে হতে পারে?'

বিশ্বমামা হেসে বললেন, 'খবরের কাগজের সব খবর বুঝি সত্যি হয়? 'খবর' কথাটা কীভাবে তৈরি হয়েছে জানিস? খারাপের খ, বদ লোকের ব, আর রং চড়ানোর র। দেখবি খবরের কাগজের প্রথম পাতায় একটা ভালো খবর থাকে না, সব খারাপ খবর। কোথায় ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে বহু লোক মারা গেছে, কোথায় ডাকাতি হয়েছে, কোথায় দলাদলিতে সরকার ভেঙে যাচ্ছে। এই সবই বড়-বড় করে লেখা হয়। ভালো খবর কিছু থাকে? ভালো লোকদের চেয়ে বদ লোকরাই বেশি পাত্তা পায়। যে যত বেশি টাকা চুরি করে, তার নাম তত বড়-বড় অক্ষরে ছাপা হয়। আর রং চড়ানো, কোথাও সামান্য

কিছু একটা ঘটলেও খবরের কাগজের লোকেরা অনেক রং চড়িয়ে, বাড়িয়ে-বাড়িয়ে লেখে।

বিলুদা বলল, 'কিন্তু বিশ্বমামা, তোমার সম্পর্কেও তো মাঝে-মাঝে খবরের কাগজে লেখা হয়। তোমার আবিষ্কারের খবর। সেটা তো খারাপ খবর না, তুমি বদ লোক নও, রংও চড়ায় না। তাহলে?'

বিশ্বমামা বললেন, 'তা কি প্রথম পাতায় ছাপে? ভেতরের দিকে ছোট-ছোট অক্ষরে, যাতে লোকের চোখে না পড়ে। তাও সাংবাদিকদের যা অভ্যেস একটু-আধটু রং না চড়িয়ে পারে না। একবার একটা কাগজে লিখে দিল, আমি নাকি সাড়ে ছফুট লম্বা। আমি মোটে ছ ফুট এক ইঞ্চি, কতখানি বাড়িয়ে দিল দেখলি?'

আর লুডো খেলা হবে না বুঝতে পেরে আমি জিগ্যেস করলুম, 'বিশ্বমামা মানুষ ইচ্ছে করলে বুঝি বৃষ্টি নামাতে পারে না? তবে যে শুনেছিলুম, আকবরের সভায় যে মস্তবড় গায়ক ছিলেন তানসেন, তিনি নাকি মেঘমল্লার গান গেয়ে বৃষ্টি নামিয়ে দিয়েছিলেন?'

বিশ্বমামা বললেন, 'মানুষ বৃষ্টি নামাতে পারবে না কেন? আমিও পারি। তবে গান গেয়ে কিংবা মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি নামানো যায় না। কারণ মেঘের কান নেই। মেঘ শুনবে কী করে? তানসেন আসলে এত ভালো গান গেয়েছিলেন তা শুনে অনেক লোক কেঁদে ফেলেছিল। সেই চোখের জলের বৃষ্টি নেমে ছিল।'

বিলুদা বলল, 'তুমি বৃষ্টি নামাতে পারো?'

বিশ্বমামা অবহেলার সঙ্গে বলল, 'পারবো না কেন? এটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।'

আমি বিশ্বমামার কাছে গিয়ে বললুম, 'একটু দেখাও না। এইখানে একবার বৃষ্টি নামিয়ে দেখাও! কতদিন বৃষ্টি হয়নি।'

বিশ্বমামা বললেন, 'জানলা দিয়ে দেখো তো, আকাশে মেঘ আছে কি না!'

আমরা দুই ভাই ছুটে গেলুম জানলার কাছে। কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই, আকাশ একেবারে খটখটে।

বিশ্বমামা ভুরু নাচিয়ে বললেন, 'তাহলে তো হবে না। মেঘ থাকলে আগে-আগে বৃষ্টি নামানো যায় যদিও তাতে অনেক ব্যবস্থা লাগে কিন্তু মেঘ না থাকলে বৃষ্টি নামানো মানুষের পক্ষে অসাধ্য। মানুষ একেবারে মেঘ তৈরি করতে পারার ক্ষমতা অর্জন করেনি।'

বিলুদা বললেন, 'এখানে না থাকলেও ঝাড়গ্রামে হয়তো মেঘ করেছে। তাই সাধুটি বৃষ্টি নামাতে পেরেছেন।'

বিশ্বমামা বললেন, 'ঝাড়গ্রামে মেঘ হতে পারে। হঠাৎ বৃষ্টিও নামতে পারে। কিন্তু তাতে সাধুটির কোনও কেরামতি থাকতে পারে না। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে জানিস, 'ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে।' তার মানে জানিস? একটা তালগাছের তলায় একটা কাক বসে ছিল, একজন ফকিব তার শিষ্যদের বললেন, 'আমি মন্ত্র পড়ে

ওই কাকটাকে মেরে ফেলতে পারি। ফকির তো মন্ত্র আউড়িয়েই চলেছে, এমন সময় হঠাৎ ঝড় উঠল, আর তালগাছ থেকে খসে পড়ল একটা পাকা তাল। পড়বি তো পড়, সেটা ঠিক পড়ল কাকেরই মাথায়। তাতে কাক বেচারি মারা গেল। ফকির বললেন, দেখলে আমার কেরামতি। আসলে কিন্তু ঝড় না উঠলে তালও তখন পড়ত না, কাকটাও মরত না। একেই বলে কাকতালীয়।

আমি জিগ্যেস করলুম, 'ঠিক ওই সময়েই ঝড় উঠল কেন?'

বিশ্বমামা বললেন, 'সেদিন হঠাৎ ঝড় উঠেছিল বলেই তো গল্পটা দাঁড়িয়েছে। ওই ফকিরকে যদি বলা যায়, আর একবার মন্ত্র পড়ে ঝড় তোলো তো? সে পারবে? পারবে না। কিছুতেই পারবে না।'

বিলুদা বলল, 'কিন্তু এখানে যে লিখেছে, সাধু যজ্ঞ করে পরপর দুবার বৃষ্টি নামিয়েছে।'

বিশ্বমামা বললেন, 'হুঃ! তা বটে। হ্যাঁরে, তোদের ছোটকাকার দেশের নাম কী রে?'

বিশ্বমামা হঠাৎ আচমকা এমন এক একটা কথা বলে, যার কোনও কারণই বোঝা যায় না। এই সময় হঠাৎ ছোটকাকার দেশের প্রসঙ্গ আসে কী করে?

বিলুদা বললেন, 'ছোটকাকার দেশে তো ভন্টুদা।'

বিশ্বমামা ধমক দিয়ে বললেন, 'ভালো নাম কী? ভন্টুদা বললে কেউ চিনবে?'

আমি মাথা চুলকোতে লাগলুম। তাই তো ভন্টুদার ভালো নামটা কী যেন? মনে পড়ল না।

বিলুদা বললেন, 'প দিয়ে নাম। প্রফুল্ল, প্রশান্ত? না, না, প্রাণগোপাল, না, প্রমথেশ তাও না।'

বিশ্বমামা বললেন, 'প দিয়ে হাজারটা নাম হয়। তোর মায়ের কাছ থেকে জেনে আয়—'

তক্ষুনি আমার মনে পড়ে গেল। ভন্টুদার ভালো নাম প্রিয়দর্শী, প্রিয়দর্শী মুখার্জি।

বিশ্বমামা বললেন, 'ভন্টু এখন ঝাড়গ্রামের এস ডি ও, তাকে ফোন করলেই তো আসল ঘটনা জানা যাবে!'

বিশ্বমামা টেলিফোনের কাকে গিয়ে বললেন, একবারেই লাইনে পাওয়া গেল। খোদ ভন্টুদার সঙ্গেই কথাবার্তা শুরু হল। খানিকক্ষণ কথা বলার পর বিশ্বমামা চেঁচিয়ে উঠলেন, এক গাঁট্টা মারব। তোর কানটা মূলে দেব। তুইও মন্ত্র-তন্ত্রে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিস।

ফোনটা রেখে দিয়ে বিশ্বমামা বললেন, 'ভন্টু নিজের চোখে বৃষ্টি পড়তে দেখেছে। চল তো, ঝাড়গ্রামে গিয়ে ব্যাপারটা তদন্ত করে আসি। যদি মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি নামাতে পারে তাহলে আমার বিজ্ঞান পড়া ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

আমরা লাফিয়ে উঠলুম। আর কিছু না হোক ঝাড়গ্রামে বেড়াতে যাওয়া হবে তো। ভারি সুন্দর জায়গা। কাছাকাছি জঙ্গল আছে, পাহাড় আছে।

বিশ্বমামার পুরোনো গাড়ি, মাঝে-মাঝে রাস্তায় থেমে যায়, তখন আমাদের ঠেলতে

হয়। এবারে সেরকম কিছু হল না, মাঝপথে একটা ধাবায় থেমে চমৎকার গরম-গরম রুটি-মাংস খাওয়া হল।

আমাদের ভন্টুদা ঝাড়গ্রামের এস ডি ও সাহেব। সবাই তাকে খুব খাতির করে। যে-কোনও লোককে জিগ্যেস করলে তার বাংলো দেখিয়ে দেয়। বিলুদা আমায় বললে, 'সাবধান নীলু, এখানে লোকজনের সামনে ভন্টুদা বলে ডাকবি না, বলবি প্রিয়দা, কিংবা ছোড়দা।'

সে-বাংলোয় পৌঁছে বিলুদা নিজেই আগে ভন্টুদা বলে ডেকে বসল। বিশ্বমামা একগাদা লোকের সামনে বললেন, 'এই যে ভন্টু খবর না দিয়েই চলে এলুম তোর এখানে।'

ভন্টুদা অবশ্য আমাদের দেখে খুব খুশি। মস্ত বড় বাংলো থাকবার জায়গার কোনও অসুবিধে নেই।

সন্ধেবেলা বাংলোর বারান্দায় বসে চা খেতে-খেতে শোনা গেল আসল কাহিনি।

সন্তোষ মিত্র নামে এক ভদ্রলোক জার্মানিতে থাকতেন। বছর চারেক আগে এখান থেকে খানিকটা দূরে বিনপুরে অনেকখানি জমি কিনে বসবাস করছেন। একটা ছোট্ট সুন্দর বাড়িও বানিয়েছেন, ফলের বাগান আছে, তাতে লাগিয়েছেন অনেক রকম ফলের গাছ। লোকটির ব্যবহার ভালো, বিনপুরের লোকেরা তাকে পছন্দ করে।

গত বছর এখানে ভালো বৃষ্টি হয়নি। এ বছরও এখনও বৃষ্টির দেখা নেই। সেই জন্য সন্তোষ মিত্র একজন সাধুকে দিয়ে যজ্ঞ করিয়েছেন। এই সাধু অন্য সময়ে থাকেন হিমালয়ে, তাঁর অনেক রকম অলৌকিক ক্ষমতা আছে। যজ্ঞের সময় তিনি মন্ত্র পড়ে সত্যি-সত্যি বৃষ্টি নামিয়েছেন। একবার নয়, দুবার, একবার হলে বলা যেত কাকতালীয়। প্রথমদিন অনেকেই ব্যাপারটা জানত না।। বৃষ্টি নামার পর দলে-দলে লোক ছুটে গেল যজ্ঞ দেখার জন্য। দ্বিতীয় দিন সাধু যজ্ঞে বসার আগে সবাইকে বলে দিলেন, 'কেউ টু শব্দ করবে না। সবাইকে চুপ করে থাকতে হবে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি বৃষ্টি নামিয়ে দেব।'

বিশ্বমামা ভন্টুদাকে জিগ্যেস করলেন, 'তুই ছিলি সেখানে, তুই দেখেছিস?'

ভন্টুদা বললেন, 'হ্যাঁ দেখেছি। নিজের চোখে দেখেছি। অবিশ্বাস করলে কী করে?'

বিশ্বমামা বললেন 'কী দেখলি, ভালো করে বল।'

ভন্টুদা বললেন, 'যজ্ঞের কাছেই আমাকে একটা চেয়ার পেতে বসিয়ে দিল। দাউ-দাউ করে যজ্ঞের আগুন জ্বলছে। তার দুদিকে বসে আছে সন্তোষ মিত্র আর সেই সাধু। সাধুটি আগুনে ঘি ছিটোচ্ছেন আর মন্ত্র পড়ছেন। মাঝে-মাঝে আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ এক ফোঁটা দুফোঁটা করে জল পড়তে লাগল সেই আগুনে। তারপরই একেবারে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। আমাদের দৌড়ে যেতে হল বাড়ির মধ্যে।'

বিশ্বমামা প্রবল জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'হতে পারে না। হতে পারে না। আসলে মেঘ ছিল আগে থেকে।

ভন্টুদা বললেন, 'তা ছিল।'

বাইরে একটা জিপ গাড়ি থামল এই সময়ে। তার থেকে নেমে এলেন একজন অচেনা লোক।

ভণ্টুদা বললেন, 'ওই তো এখানকার পুলিশ সাহেব এসে গেছেন। এঁকে জিগ্যেস করেন। কিন্তু বিশ্বমামা, প্লিজ, ওঁর সামনে আমাকে ভণ্টু বলে ডেকো না।'

পুলিশ সাহেবের নাম দিগবিজয় সরকার। আলাপ পরিচয় হল। তারপর বিশ্বমামা জিগ্যেস করলেন, 'হ্যাঁ মশাই, আপনিও সাধুকে বৃষ্টি নামানো দেখেছেন?'

সরকার সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ দেখলুম তো। আরও অন্তত পাঁচশো লোক দেখেছে। এর মধ্যে জাল-জোচ্চুরি কিছু নেই। সাধু মন্ত্র পড়ল আর বৃষ্টি নামল!'

বিশ্বমামা আবার জোর দিয়ে বললেন, 'এ হতে পারে না।'

সরকার সাহেব বললেন, 'আমিও মন্তর-টন্তর কখনও বিশ্বাস করিনি। কিন্তু সাধুটি সত্যি তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আরও আশ্চর্য কথা কী জানেন, সন্তোষ মিত্রের বাড়ি-বাগান নিয়ে পঁচিশ বিঘে জমি। বৃষ্টি পড়েছে শুধু এ-পঁচিশ বিঘের মধ্যে। অন্য সব জায়গা শুকনো খটখটে।'

ভণ্টুদা বললেন, 'উনি খরচ-পত্র করে যজ্ঞের ব্যবস্থা করেছেন, তাই শুধু নিজের জমিতেই বৃষ্টি নামিয়েছেন।'

বিশ্বমামা পুলিশ সাহেবকে বললেন, 'সে কী? অ্যারেস্ট করা উচিত ছিল।'

পুলিশ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী? অ্যারেস্ট করব কী অপরাধে? নিজের জমিতে বসে কেউ যদি পুজো বা যজ্ঞ করে, সেটা তো দোষের কিছু না।'

বিশ্বমামা বললেন, 'ভণ্টু, ইয়ে থুড়ি, প্রিয়দর্শী। আমরা একবার বিনপুরে ওই বাড়িটা গিয়ে দেখতে পারি?'

ভণ্টুদা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি নিয়ে যেতে পারি। সেই সাধু এখনও রয়েছেন তার সঙ্গেও কথা বলতে পারো। বোধহয় আরও বৃষ্টির জন্য আর একবার যজ্ঞ করবে।'

বিশ্বমামা বললেন, 'ঠিক আছে। আমার অন্য পরিচয় দিবি না। শুধু বলবি, তোর আত্মীয়। এমনিই বেড়াতে এসেছি।'

ভণ্টুদা বললেন, 'ঠিক আছে, আজ তো রাত হয়ে গেছে, কাল সকালে যাওয়া যাবে।'

বিশ্বমামা বললেন, 'সন্তোষ মিত্র জার্মানি ফেরত অথচ সাধুকে দিয়ে যজ্ঞ করায়!'

সরকার সাহেব বললেন, 'আজকাল বিদেশে অনেক সাহেব-মেমও এসবে বিশ্বাস করে। সত্যি মন্ত্রের জোর আছে বটে।'

বিশ্বমামা এরপর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। অন্য সময় বিশ্বমামা কত মজার গল্প বলেন। এখন আর তাতে মন নেই। ভণ্টুদা আর পুলিশ সাহেব, এরা তো মিথ্যে কথা বলবেন না। একজন সাধু মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি নামিয়েছে, এরা নিজের চোখে দেখেছে, তা শুনে বিশ্বমামা কি ঘাবড়ে গেলেন? মন্ত্রের কাছে বিজ্ঞানও হার মানল?

আমরা অন্য গল্প করতে লাগলুম, বিশ্বমামা চুপ।

পরিষ্কার আকাশ। অনেক তারা ফুটে আছে, বাইরের আকাশে তারাগুলোকে বেশি উজ্জ্বল মনে হয়। একটা প্লেন উড়ে গেল, কী সুন্দর দেখাল সেটাকে।

বিশ্বমামা এক সময় জিগ্যেস করলেন, 'মাঝে-মাঝে প্লেনের শব্দ শুনছি। এখান দিয়ে এত প্লেন যায় কোথায়?'

ভন্টুদা বললেন, 'কাছেই তো কলাইকুণ্ডা। যেখানে আমাদের এয়ার ফোর্সের একটা বেস আছে। সেখান থেকে প্লেন ওড়ে, এই শব্দ শোনা আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।'

সরকার সাহেব বললেন, 'আমার বাংলোর পাশেই ট্রেন লাইন। মাঝরাত্রে ট্রেনের শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমার এখনও অভ্যেস হয়নি।'

একসময় খাবারের ডাক পড়ল, দারুণ ব্যবস্থা করেছেন ভন্টুদা, প্রথমে ভাতের সঙ্গে দুরকম মাছ, তারপর গরম-গরম লুচির সঙ্গে মাংস। তিনরকম মিষ্টি।

বিশ্বমামা এত খাদ্যরসিক, আজ কিছুই প্রায় খেলেন না। মিষ্টিগুলো ছুঁলেন না পর্যন্ত। বিশ্বমামার এরকম মুখ আমি কখনও দেখিনি।

পরদিন সকালে ব্রেক ফাস্ট খেয়ে আমরা রওনা দিলুম বিনপুরের দিকে।

বেশি দূর নয়, বড় রাস্তা থেকে খানিকটা ভেতরে ঢুকে সন্তোষ মিত্রের বাড়ি। চারদিকে শুকনো-শুকনো ভাব, এই বাড়ির বাগানে গাছগুলো বৃষ্টির জল খেয়ে বেশ তরতাজা। ফলের গাছগুলো বেশি বড় নয়, কিন্তু এর মধ্যেই অনেক গাছে ফল ধরেছে। কয়েকটা কলাগাছে কলা ফলে আছে।

সন্তোষ মিত্র একজন মাঝবয়েসি অমায়িক ভদ্রলোক। ভন্টুদার সঙ্গে এসেছে বলে আমাদেরও খাতির করলেন খুব। বাড়ির সামনে মস্ত বড় বারান্দা, তাতে অনেক চেয়ার পাতা।

একটু দূরে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় বাঘের চামড়ার আসনে বসে আছেন এক সন্ন্যাসী। মাথায় জটা, মুখ ভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ। তিনি সিগারেট খাচ্ছেন, আর একটা খবরের কাগজ পড়ছেন। কোনও গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীকে সিগারেট টানতে আমি আগে দেখিনি। শুনেছিলাম সন্ন্যাসীরা গাঁজা খায়।

বারান্দায় বসে গল্প করতে-করতে সন্তোষ মিত্র জোর করে আমাদের ডব্‌ল ডিমের ওমলেট খাওয়ালেন। বিশ্বমামা নিজেরটা কিছুতেই খেতে চাইলেন না পরে বিলুদা টপ করে প্লেটটা নিজের কাছে নিয়ে নিলেন।

আমি চুপি-চুপি বিলুদাকে বললুম, 'আমাদের বিশ্বমামাও বৃষ্টি নামাতে পারেন বলেছিলেন। এই সাধুর সঙ্গে বিশ্বমামার একটা কমপিটিশন হলে ভালো হয় না?'

বিলুদা বললেন, 'চুপ। বিশ্বমামা রেগে আছে। এখন কিছু বলতে যাসনি।'

বিশ্বমামা সন্তোষ মিত্রকে জিগ্যেস করলেন, 'এই সাধুজিকে আপনি পেলেন কোথায়?'

সন্তোষ মিত্র বললেন, 'গত বছর আমি হরিদ্বারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আলাপ। কথায়-কথায় বলেছিলাম, ঝাড়গ্রামের কাছে অনেক টাকা খরচ করে মস্ত বাগান করেছি। কিন্তু জলের অভাবে সব শুকিয়ে যাচ্ছে। পরপর দুবছর ভালো বৃষ্টি হয়নি। এদিককার পুকুরও শুকিয়ে যায়, কুয়োতে জল থাকে না। তা শুনে সাধুজি বললেন, এ আবার সমস্যা নাকি? আমি ইচ্ছে করলেই বৃষ্টি নামিয়ে দিতে পারি। তাই ওকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসেছি।'

বিশ্বমামা জিগ্যেস করলেন, 'উনি কি সাহারা মরুভূমিতেও বৃষ্টি নামাতে পারেন?'

সন্তোষ মিত্র তাতে খানিকটা অখুশি হয়ে বললেন, 'জেনে আমার দরকার কী? আমার বাগানে জল পেলেই হল।'

বিশ্বমামা বললেন, 'তা ঠিক! আপনার বাগানটি চমৎকার হয়েছে। আশেপাশে এমন সুন্দর ফলের বাগান কারুর নেই।'

এরপর বিশ্বমামা উঠে গেলেন সাধুটির কাছে।

আমরাও সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালাম।

বিশ্বমামা বললেন, 'নমস্কার সাধুজী। আপনার অলৌকিক ক্ষমতা অনেক শুনেছি।'

সাধু হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন।

বিশ্বমামা আমাদের বললেন, 'প্রণাম কর, প্রণাম কর। অভিনেতা। ভালো অভিনেতাও তো একজন গুণী।'

সাধু এবার কটমট করে তাকালেন বিশ্বমামার দিকে। কড়া গলায় বললেন, 'তুমি বুঝি বিশ্বাস করো না? হাজার খানেক লোক আমার মন্ত্রশক্তি দেখেছে। তোমরা আজকালকার ছেলে, দুপাতা ইংরেজি পড়েই সবজান্তা হয়ে গেছ। ঠাকুর-ফাকুর মানো না, ধর্ম মানো না! সেই জন্যই তো দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। যত্ত সব অকালকুষ্মাণ্ড!'

গালাগালি খেয়েও কিন্তু বিশ্বমামা চটলেন না। হাসিমুখে বললেন, 'রাগ করছেন কেন? সকলকেই কিছু না কিছু অভিনয় করতে হয়, আমিও করি। আচ্ছা সাধুজি, আপনি আকাশে উড়তে পারেন?'

সাধু বললেন, 'কী?'

বিশ্বমামা আবার বললেন, 'আপনার তো অলৌকিক ক্ষমতা আছে, আপনি আকাশে উড়তে পারেন? এখানে বসে মন্ত্র পড়লে তো মেঘেরা শুনতে পাবে না। কখন বৃষ্টি নামাতে হবে তা মেঘেরা বুঝবে কী করে?'

সাধু বললেন, 'আমার আকাশে ওড়ার দরকার হয় না। এখানে বসে মন্ত্র পড়লেই কাজ হয়। পরশু দিনই আবার যজ্ঞ করব তখন দেখতে পাবে।'

বিশ্বমামা বললেন, 'তাহলে এখানে আরও দুদিন থেকে যেতে হয় দেখছি। সাধুজী, আমার সামনে আপনি যদি মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি নামাতে পারেন, তাহলে আমি আমার একটা কান কেটে ফেলব।'

সাধু বললেন, 'তাহলে ধরে নাও, তোমার একটা কান কাটা গেছে। আজ আবার মেঘ জমছে। বৃষ্টি আমি নামাবই।'

এই সময় বাড়ির মধ্য থেকে একজন লোক বেরিয়ে এল। সাদাপ্যান্ট আর সাদা শার্ট পরা। হাতে একটা নীল বর্ডার দেওয়া সাদাটুপি।

কথা থামিয়ে বিশ্বমামা কৌতূহলী হয়ে সেই লোকটির দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর তার দিকে এগিয়ে বললেন, 'নমস্কার, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি।'

সন্তোষ মিত্র বললেন, 'এ আমার মাসতুতো ভাই সুবোধ।'

বিশ্বমামা সুবোধকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি এই বাড়িতে?'

সুবোধের বদলে সন্তোষ মিত্রই আবার বললেন, 'না, মাঝে-মাঝে আসে। ও তো এয়ার ফোর্সের অফিসার। কলাইকুণ্ডার ফাইটার প্লেন চালায়।

বিশ্বমামা বললেন, 'আমারও দেখেই পাইলট মনে হয়েছিল। সুবোধ বাবু, এখন তো যুদ্ধ চলছে না, তবু আপনাকে মাঝে-মাঝেই আকাশে প্লেন ওড়াতে হয়?'

সুবোধ বললেন, 'তা তো হয়ই। ট্রায়াল দিতে হয়। আপনাকে তো চিনলাম না?'

উত্তর না দিয়ে বিশ্বমামা হো-হো হেসে উঠলেন, হাসি তো নয় অট্টহাস্য যাকে বলে।

সন্তোষ, সুবোধ দুজনেই সেই হাসি শুনে হকচকিয়ে গেলেন। ভন্টুদাও এগিয়ে এল কাছে।

বিশ্বমামা হাসি থামিয়ে সুবোধের কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, 'ও সাধুটাধুর কম্ম নয়। আপনিই বৃষ্টি নামাবার আসল ওস্তাদ। সলিড কার্বন-ডাই-অক্সাইড না সিলভার আয়োডাইড?'

সুবোধও এবার মৃদু হেসে বলল, 'আপনি ধরে ফেলেছেন দেখছি।'

বিশ্বমামা বললেন, 'আমি প্রথম থেকেই ভাবছি, আকাশের ওড়ার ব্যবস্থা না থাকলে তো বৃষ্টি নামানো সম্ভব নয়। এইতো একজন জলজ্যান্ত পাইলট পাওয়া গেছে।'

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা বুঝলি? মেঘ মানে কী। খুব ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জলকণা, তাই তো? সেই জলকণাগুলো জমাট বেঁধে বড়-বড় ফোঁটা হয়ে বৃষ্টির মতন পড়ে। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি না হলে বৃষ্টি নামে না। কেউ যদি প্লেনে করে উড়ে গিয়ে সলিড কার্বন-ডাই-অক্সাইড কিংবা সিলভার আয়োডাইড মেঘে ছড়িয়ে দিতে পারে, তা হলেই জলকণাগুলো দানা বেঁধে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়বে। সুবোধবাবু কলাইকুণ্ডা থেকে উড়ে এসে এখানকার আকাশের মেঘে সেই জিনিস ছড়িয়ে দেন।'

ভন্টুদা তবু অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, 'তাহলে, তাহলে সাধুর দরকার কী? সাধু মন্ত্র পড়লেন...'

বিশ্বমামা বললেন, 'শুধু-শুধু এই একটা বাগানে মাঝে-মাঝে বৃষ্টি হবে। অন্য কোথাও হবে না। তাতে লোকের সন্দেহ হবে। সেই জন্যই একজনকে সাধু সাজিয়ে ভড়ং দেখানো দরকার। এখান দিয়ে একটা প্লেন উড়ে গেছে, তা কেউ লক্ষ করেনি। কী সুবোধবাবু, ঠিক বলছি?'

সুবোধ এখনো হাসছে।

বিশ্বমামা বললেন, 'আপনি হাসছেন বটে। কিন্তু ওই সাধুর বদলে আপনাকেই পুলিশের অ্যারেস্ট করা উচিত।'

সুবোধ বললেন, 'কেন কেন কী অভিযোগে?'

বিশ্বমামা বললেন, 'চুরি!'

সুবোধ বললেন, 'চুরি? তার মানে? আমি কার কী চুরি করেছি। সিলভার আয়োডাইড আমি কিনি নিজের পয়সায়। আকাশের মেঘ কারুর সম্পত্তি নয়।'

বিশ্বমামা বললেন, 'অবশ্যই মেঘ কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এই মেঘ থেকে স্বাভাবিক বৃষ্টি হলে আশেপাশে সবার জমিতে বৃষ্টি পড়ত। আপনি শুধু এই বাগানে বৃষ্টি

ফেলে অন্যদের বঞ্চিত করছেন। বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই সন্তোষবাবুর বাগানে বৃষ্টি পড়ার ফলে তাঁর গাছগুলো বেশি বাড়ছে।'

সন্তোষবাবু বললেন, 'আমি জানতাম না এটা একটা অপরাধ। আমি ভেবেছিলাম, এটা একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা।'

বিশ্বমামা বললেন, 'ইচ্ছে মতন কেউ-কেউ তার জমিতে আলাদা ভাবে বৃষ্টি ফেলিয়ে নিলে কিছুদিন পর সারাদেশে মারামারি শুরু হয়ে যাবে। সেই জন্যই ওই পরীক্ষা এখন বন্ধ।'

সুবোধের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি এয়ার ফোর্সের পাইলট। এয়ার ফোর্সের প্লেন এরকম ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করাটাও অপরাধ নয়? জানাজানি হলে আপনার চাকরি যাবে। অবশ্য সেটা জানাবার দায়িত্ব আমার নয়।'

এখানে কী কথাবার্তা হচ্ছে সাধুজী তা শুনতে পাচ্ছে না। তিনি হঠাৎ গম্ভীরভাবে একটা মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন।

বিশ্বমামা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলেছিলাম না ভালো অভিনেতা। ওই সাধুও বোধহয় এই সন্তোষবাবুর এক মাসতুতো ভাই।

বিলুদা বললেন, 'গোঁফ দাড়িগুলো আসল না নকল টান মেরে দেখব।'

ভন্টুদা বললেন, 'না, না, না, দরকার নেই, দরকার নেই।'

বিশ্বমামার চোর ধরা

নীলা বউদির একটা নৌকো চুরি গেছে।

পরপর পাঁচটা নৌকোর মধ্যে ঠিক মাঝখানেরটা অদৃশ্য।

আসল নৌকো নয় অবশ্য। নীলা বউদিরা থাকেন একটা মস্ত বড় বাড়ির দশ তলার ফ্লাটে, সেখানে নৌকো থাকবে কী করে। নৌকো তো হাওয়ায় ভাসে না। কাছাকাছি কোনও নদী বা পুকুরও নেই।

আসলে বিকাশদা আর নীলা বউদি একবার বেড়াতে গিয়েছিলেন অনেক দিনের জন্য। কত জায়গায় ঘুরেছেন, ফেরার সময় অনেক জিনিসও এনেছিলেন। আমার জন্য এমন একটা সুন্দর টি-শার্ট এনেছিলেন যে সেটা পরতেই ইচ্ছে করে না। পরলেই যদি পুরোনো হয়ে যায়!

সেবারই এনেছিলেন পাঁচটা নৌকো। একটা খুব ছোট, তার পরেরটা একটু বড়, তার পরেরটা আরও একটু বড়, এইরকম। কাচের তৈরি, কিন্তু সাধারণ কাচ নয়, বোঝাই যায়, আলো পড়লে ঝকঝক করে। একে নাকি বলে কাট গ্লাস।

বসবার ঘরে একটা আলমারিতে সেটা সাজানো থাকে। আলমারিতে অবশ্য চাবি লাগানো থাকে। কখনও-কখনও নীলা বউদি চাবি লাগাতে ভুলেও যান। হঠাৎ দুদিন আগে দেখা গেল, পাঁচটার মধ্যে একটা নৌকো নেই। চুরি হয়ে গেল?

অথচ বাড়িতে চোর আসেনি।

চোর এলে কি শুধু একটা কাচের নৌকো নেয়? বসবার ঘরের ওই আলমারিতেই তো আরও অনেক জিনিস ছিল। এমনকী একটার বদলে পাঁচটা নৌকোই নিতে পারত!

নৌকোটা এমন কিছু দামি নয়। চোরেরা তো সোনার গয়না আর টাকা পয়সা নিতে আসে। নীলা বউদির দুঃখ, ওই একটা নৌকোর জন্য সেট নষ্ট হয়ে গেছে। সত্যি মাঝখানটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

ওরকম একটা নৌকো তো এদেশে পাওয়াও যাবে না। ওটা প্রাগ নামে শহর থেকে কেনা। এক সঙ্গে পাঁচটাই কিনতে হয়।

নিশ্চয়ই চেনাশুনো কোনও লোকই নিয়েছে।

ফেরিওয়ালা কিংবা একদম অচেনা লোকদের এই বসবার ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাদের জন্য ফ্ল্যাটের দরজার সামনেই একটা ছোট্ট জানলা আছে।

এই ঘরে বসে আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধুরা।

হিসেব করে দেখতে হবে, এই দুদিনের মধ্যে এ ঘরে কে কে এসেছে।

আমি তো এসেছিই। তা বলে কি আমাকে চোর বলা যায়? তা ছাড়া আমি মোটেই অল্পে সন্তুষ্ট নই। আমি নিলে পাঁচটাই নিতুম। তারপর বাড়িতে রাখতে গেলেই ধরা পড়ে যেতুম।

রতনকাকা এসেছিলেন। তিনি উত্তরবঙ্গের একটা চা বাগানের ম্যানেজার। যখনই আসেন, বিরাট সন্দেশের বাক্স আনেন, সিনেমা দেখতে নিয়ে যান। খরচ করেন অনেক টাকা। তিনি চুরি করবেন একটা কাচের খেলনা?

নীলা বউদির ছোট বোন রুমাদি এসেছিল। রুমাদি একটা কলেজে পড়ান। দারুণ মজার-মজার কথা বলেন। নিজের দিদির বাড়ি থেকে কেউ কিছু চুরি করে নাকি? চেয়ে নিলেই পারে।

বিকাশদার দুই বন্ধু তপনদা, মানিকদাও এসেছিলেন পরশু সন্ধেবেলা। তপনদা আর বিকাশদা একসঙ্গে পড়তেন স্কুল থেকে, এখন বড় অফিসার। আর মানিকদা একজন বিজ্ঞানী। এর মধ্যে গতকালই চলে গেছেন জাপানে।

আর কে এসেছিল, আর কে?

নীলা বউদি বললেন, ও হ্যাঁ, তাঁর দিদিমা এসেছিলেন এক নাতিকে নিয়ে। নাতির বয়েস এগারো, সে খুব ছটফটে। তাকে সন্দেহ করা যেতে পারতো, কিন্তু নীলা বউদি সর্বক্ষণ সেখানে বসে ছিলেন। এবং দিদিমা আর নাতি চলে যাওয়ার পরেও পাঁচটা নৌকোই ছিল, নীলা বউদির স্পষ্ট মনে আছে।

আর কে এসেছিল? মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না। তারপর মনে পড়ল। আমারই মাস্টারমশাই জয়ন্তদা। আমাকে বাড়িতে এসে পড়াতেন এক সময়। দুর্গাপুরে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ সেই চাকরি চলে গেছে। জয়ন্তদা এসেছিলেন, বিকাশদার অফিসে

যদি কোনও কাজ পাওয়া যায়। জয়ন্তদার সঙ্গে নীলা বউদিরও অনেকদিনের চেনা, এ বাড়িতে আগেও কয়েকবার এসেছেন। তিনি কী এমন কাজ করতে পারেন?

এঁদের কারুকেই ঠিক সন্দেহ করা যায় না। কিংবা সন্দেহ হলেও মুখ ফুটে বলা যাবে না। প্রমাণ করা যাবে কী করে?

হঠাৎ আমার মনে পড়ল বিশ্বমামার সাহায্য নিলে কেমন হয়?

বিশ্বমামা কিছুদিন ধরে সূর্যের আলো থেকে কী করে খুব সহজে আর কম খরচে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়, তা নিয়ে গবেষণায় মেতে আছেন। ঘন-ঘন যাচ্ছেন বিদেশে।

বিশ্বমামার নাকে একটা বোলতা কামড়েছে। বোলতাটা বোধহয় বিশ্বমামার লম্বা নাকটাকে একটা গাছের ডাল ভেবে বসেছিল। বিশ্বমামা সেটাকে তাড়াতে যেতেই সে কামড়ে দিয়ে পালায়। একটু ভুল হল, বোলতা তো কামড়ায় না, হুল ফোটায়। একেই লম্বা নাক, তাও অনেকটা ফুলে গেছে।

তাঁকে এই কথাটা জানাতেই বিশ্বমামা রেগে গিয়ে বললেন, 'এক চড় খাবি! চোর ধরা কি আমার কাজ? আমি কি পুলিশ?'

আমি বললুম, 'এতই সামান্য জিনিস চুরি হয়েছে যে এর জন্য পুলিশে খবর দেওয়া যায় না। কিন্তু নীলা বউদির খুব মন খারাপ হয়ে আছে।'

বিশ্বমামা বললেন, 'হোক গে মন খারাপ! আমার সময় নষ্ট করবি না, যা পালা!'

অত সহজে কি হাল ছেড়ে দিলে চলে, বিশ্বমামার দুর্বলতার কথা তো আমি জানিই।

তাই বললুম, 'ঠিক আছে, তোমাকে চোর ধরতে হবে না। নীলা বউদি তোমাকে জিগ্যেস করেছেন, তুমি কি আজ দুপুরে একবার যেতে পারবে ওখানে? ডায়মন্ডহারবার থেকে একজন বড়-বড় গলদা চিংড়ি পাঠিয়েছে—'

বাকিটা আর বলতে হল না।

বিশ্বমামা প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, 'গলদা চিংড়ি? নিশ্চয়ই যাব। নারকোল দিয়ে রান্না করতে বলবি। আর যেন কিপ্টেমি করে আমাকে মোটে একটা না দেয়।'

তক্ষুনি আমি বাইরে গিয়ে নীলা বউদিকে টেলিফোন করে বললুম, 'শিগগির বাজার থেকে বড় সাইজের চিংড়ি মাছ আনাও, বিশ্বমামা খাবে। আমিও খাব। বেশি করে আনিও!'

খেতে বসে সেই নৌকো চুরির কথা তো উঠবেই।

বিশ্বমামা বললেন, 'এ তো সাধারণ চোরের কাণ্ড নয়। এদের বলে ক্লিপটোম্যানিয়াক, এরা বড়লোকও হতে পারে। হঠাৎ কোনও একটা জিনিস টপ করে পকেটে পুরে নেয়। এটা এক ধরনের অসুখ। একবার-দুবার ধরা পড়লে তবে সারে।

খাওয়ার পর বিশ্বমামা সেই আলমারিটা ভালো করে দেখলেন।

সবচেয়ে কাছে যে সোফাটা, তাতে বসে পড়ে বললেন, 'এখান থেকে তো হাত বাড়িয়েই টপ করে একটা নৌকো তুলে নেওয়া যায়। এখানে কে বসেছিল, এই দুদিনের মধ্যে?'

নীলা বউদি বললেন, 'অনেকেই তো বসেছে। আলাদা করে কি কিছু বলা যায়?'

ঘরের সঙ্গেই বারান্দা। সেখানে অনেক রকম ফুলের গাছ। কোনওটা রেলিং-

এ জড়ানো, কোনওটা দেয়াল বেয়ে উঠছে, দরজা ছাড়াও দুপাশে দুটো জানলা। ঘরে বসেই সব গাছগুলো দেখা যায়।

বিশ্বমামা বললেন, 'সেই চুরির তো অনেক সাক্ষী আছে দেখছি।'

নীলা বউদি বললেন, 'তার মানে?'

বিশ্বমামা বললেন, 'এই গাছগুলো। ওরা নিশ্চয়ই দেখেছে। গাছের চোখ নেই, তবু ওরা দেখতে পায়। কান নেই তবু ওরা আমাদের সব কথা শোনে।'

নীলা বউদি বললেন, 'তাই নাকি?'

বিশ্বমামা বললেন, 'এটা গাঁজাখুরি কথা নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ হয়ে গেছে। ভালো গান বাজনা শুনলে গাছেরা খুশি হয়। বাজে বিচ্ছিরি চ্যাঁচামেচির গান শুনে ওরা বিরক্ত হয়।'

নীলা বউদি বললেন, 'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু গাছ তো কথা বলতে পারে না। ওরা যদি চোরকে দেখেও থাকে, আমাদের বলবে কী করে।'

বিশ্বমামা বললেন, 'তা ঠিক। হয়তো ওরা কথা বলে, আমরা সেই ভাষা বুঝি না। আমি পরীক্ষা করে দেখতে পারি অবশ্য। এক কাজ করো। এই দুদিনের মধ্যে যারা এসেছিল, তাদের সবাইকে কাল বিকেলে চায়ের নেমন্তন্ন করতে পারবে?'

তক্ষুনি টেলিফোন করা হল।

রুমাদি, রতনকাকা, জয়ন্তদা, তপনদা সবাইকেই পাওয়া গেল। সবাই আসতে রাজি। দিদিমাকে ডাকার দরকার নেই, নাতিকে নিয়ে তিনি চলে যাওয়ার পরেও পাঁচটা নৌকোই ছিল। শুধু মানিকদাকে পাওয়ার উপায় নেই, তিনি চলে গেছেন জাপানে।

মানিকদা যদি নিয়ে থাকেন, তাহলে আর ধরবার উপায় নেই।

আমার কেন যেন জয়ন্তদাকেই সন্দেহ হচ্ছে। তাঁর এখন চাকরি নেই। হয়তো তিনি ভেবেছেন, জিনিসটা খুব দামি।

বিশ্বমামা বললেন, 'সবাইকে একসঙ্গে ঢুকতে দিও না। কায়দা করে একজন-একজন করে ঢোকাবে। আলমারির পাশের সোফাটায় প্রত্যেকেই বসবে একবার করে।'

পরদিন আমি আর বিশ্বমামা এলাম অনেক আগে-আগে।

বিশ্বমামা বারান্দায় গিয়ে কী সব করলেন, আমায় দেখতে দিলেন না।

নিজে উলটো দিকের একটা চেয়ারে বসে পড়ে আমাকে বললেন, 'সবচেয়ে আগে নীলচন্দর। তুমি যাও, দরজার কাছ থেকে এসে এই সোফাটায় বসো।'

আমি আঁতকে উঠে বললুম, 'আমাকে সন্দেহ করছ? আমিই তোমায় ডেকে এনেছি।'

বিশ্বমামা মুচকি হেসে বললেন, 'সবাইকেই সন্দেহ করতে হয়। তুই হয়তো বেশি স্মার্ট হয়ে আমাকে ডেকেছিস। যাতে সবাই ভাবে, তুই নির্দোষ!'

আমি দূর থেকে হেঁটে এসে বসলুম সেই সোফায়।

কয়েক মুহূর্ত পরে বিশ্বমামা বললেন, 'উঠে পড়ো। এবার নীলা গিয়ে বসো।'

আমারই মতন চমকে গিয়ে নীলা বউদি বললেন, 'আমি? নিজের জিনিস নিজে চুরি করব?'

বিশ্বমামা বললেন, 'তুমি যদি ভুল করে সেটাকে অন্য কোনও জায়গায় রেখে থাকো? হয়তো তুমি নিজেই ভুলে গিয়েছ। বসো, বসো, দেরি করো না।'

'এই ভাবে বিকাশদাকেও বসতে হল।'

তারপর এলেন রতনকাকা। আজও তিনি মস্ত বড় এক বাক্স ভর্তি কেক-পেস্ট্রি নিয়ে এসেছেন।

তিনি অবশ্য কিছু না জেনে সোফাটায় বসলেন, একটু পরে বিশ্বমামা বললেন, 'রতনকাকা, আপনি ডানপাশের সোফাটায় ভালো করে বসুন।'

তারপর একে-একে এলেন তপনদা, রুমাদি, জয়ন্তদা।

একমাত্র জয়ন্তদাই বললেন, 'ওই সোফাটায় বসব কেন? আমি এদিকের চেয়ারে বসছি।'

কেমন যেন নার্ভাস দেখাচ্ছে জয়ন্তদাকে।

বিশ্বমামা তার মুখে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'রতনকাকা, আপনি আর চারটে নৌকোও নিয়ে যান।'

রতনকাকা দারুণ চমকে গিয়ে বললেন, 'অ্যাঁ? কী বললে?'

বিশ্বমামা বললেন, 'এই কাচের নৌকো একটা সাজিয়ে রাখলে এমন কিছু মনে হয় না। পরপর পাঁচটা থাকলেই ভালো দেখায়। আপনি এগুলোও নিয়ে যান। নীলা আপত্তি করবে না।'

রতনকাকা চোখ গরম করে বললেন, 'বিশ্ব, তোমার এত সাহস, তুমি আমাকে চোর বললে?'

নীলা বউদির মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আমরাও হতভম্ব। রতনকাকার মতন একজন মানী লোককে চোর বলা খুবই খারাপ ব্যাপার। বিশ্বমামার ভুল হলে কেলেংকারি হবে।

বিশ্বমামা খুব বিনীত ভাবে বললেন, 'রতনকাকা, আমি তো আপনাকে চোর বলিনি একবারও। আমি বলেছি, আপনি বাকি চারটে নৌকো নিয়ে যান।'

রতনকাকা বললেন, 'তার মানে কী হয়?'

বিশ্বমামা বললেন, 'তার মানে কী হয়, তা আমিও জানি, আপনিও জানেন।'

এবার বিশ্বমামা হেসে উঠতেই রতনকাকাও হো হো করে হাসলেন।

পকেট থেকে একটা কাচের নৌকো বার করে বললেন, 'এই দ্যাখো। ভেবেছিলাম, সকলের অজান্তে ওটা টুক করে আলমারিতে রেখে দেব। কিন্তু বিশ্ব, তুমি কী করে বুঝলে বলো তো?'

বিশ্বমামা জানলার কাছের একটা গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওই গাছটা আপনাকে সেদিন দেখেছে। ও আমাকে বলে দিল।'

রতনকাকা অবাকভাবে গাছটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গাছটা দেখেছে? ঠিক আছে। কিন্তু গাছটা তোমাকে বলে দিল মানে? তুমি কি গাছের ভাষা বোঝ?'

বিশ্বমামা বললেন, 'মানুষ এখনও গাছের ভাষা বুঝতে শেখেনি ঠিকই। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, গাছ ভয় পেলে, কিংবা কারুর মিথ্যে কথা শুনলে কিংবা আরও

নানান কারণে ভেতরে-ভেতরে কেঁপে ওঠে। ইলেকট্রোডের সঙ্গে একরকম তার জুড়ে গাছের গায়ে লাগালে সেই কম্পন টের পাওয়া যায়। আমি ওই গাছটার গায়ে সেরকম তার লাগিয়ে রেখেছি, অন্যরা সোফায় বসলে কিছু হল না। আপনি বসার পর গাছটা ঘন-ঘন কেঁপে উঠতে লাগল।

আমি বললুম, 'জয়ন্তদা যে বসল না?'

বিশ্বমামা বললেন, 'তার তো আর দরকার ছিল না। আমি তো আগেই জেনে গেছি। জানলা দিয়ে আমার যন্ত্রটা দেখে নিয়েছি।'

রতনকাকা উঠে গিয়ে আলমারিতে অন্য নৌকোগুলোর মাঝখানে তার হাতের নৌকোটা সাজিয়ে রাখলেন।

নীলা বউদি বললেন, 'রতনকাকা, আপনার যদি পছন্দ হয়, আপনি সব নেবেন?'

রতনকাকা বললেন, 'দূর পাগলি! আমি এগুলো নিয়ে কী করব! আমি বরং বিশ্বকে কিছু পুরস্কার দেব। ঠিক যেন ম্যাজিক! আমি কেন যে লোকের বাড়ি থেকে টুকটাক করে ছোটখাটো জিনিস তুলে নিই, নিজেই বুঝি না। পয়সা দিয়ে তো কিনতেই পারি। তবু, হঠাৎ একটা পকেটে ভরে নিই, পুরে খুব খারাপ লাগে, এটা আমার একটা রোগ। এ রোগের কি চিকিৎসা আছে?'

বিশ্বমামা বললেন, 'দেখবেন, এবার থেকে আপনার এই রোগটা আর হবে না। ধরা পড়লেই সেরে যায়।'

তারপর নীলা বউদির দিকে ফিরে বললেন, 'কী গো, নীলা, চায়ের নেমন্তন্ন করেছ, চা দাও। সিঙ্গাড়া, নিমকি, জিলিপি-টিলিপি আছে তো সঙ্গে?'

বিশ্বমামা ও অহি-নকুল

আমাদের সুন্দরকাকা থাকেন সুন্দরবনে। সুন্দরকাকার আসল নাম কিন্তু সুন্দর নয়, প্রিয়নাথ। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তাঁকে আমরা সুন্দরকাকা বলে ডাকি।

সুন্দরবনটাও কিন্তু মোটেই সুন্দর নয়, বরং ভয়ংকর বলা যেতে পারে। সেখানে জলে বাঘ আর ডাঙায় কুমির। না, না। উলটো হবে, তাই না? জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। অবশ্য, আগেরটাও খুব একটা ভুল নয়। কুমির তো ডাঙায় উঠে আসতেই পারে। আর সুন্দরবনের বাঘও জলে সাঁতার কাটে। নদীর মাঝখানে রাত্তিরবেলা নৌকো বেঁধে রাখলেও বাঘ চুপি-চুপি সাঁতার কেটে এসে মানুষ মুখে তুলে নিয়ে যায়।

এক সময় নাকি সুন্দরী নামে একরকম গাছ অনেক ছিল এই বনে। সেই জন্যই

সুন্দরবন নাম। সে গাছের ডাক নাম সুঁদরি। এখন দেখা যায়, খুব কম। তবু ভয়ংকর বনটার নাম সুন্দরবনই রয়ে গেছে।

আমাদের সুন্দরকাকা চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর সুন্দরবনে একটা বাড়ি বানিয়ে থাকতে শুরু করেছেন। গোসাবা থেকে যেতে হয় সাতজেলিয়া, সেখান থেকেও খানিকটা দূরে কুলপি নামে একটা ছোট্ট গ্রাম, সেখানে অনেকখানি জায়গা-জমি নিয়ে তাঁর বাড়ি।

হঠাৎ তিনি সুন্দরবনে চলে গেলেন কেন?

সেখানকার বাতাস খুব টাটকা, কোনওরকম বায়ুদূষণ নেই, সেই জন্যে। আসলে তাও নয়, তিনি একেবারেই ডিজেল, পেট্রোলের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। তাই ঠিক করলেন, এমন এক জায়গায় শেষ জীবন কাটাবেন, যেখানে গাড়ি, বাস, ট্রাক চলে না। পাহাড়েও গাড়ি চলে, কিন্তু সুন্দরবনে গাড়ি-টাড়ি যাওয়ার উপায় নেই। নৌকো বা লঞ্চ। তাতেও একটু-একটু গন্ধ আছে বটে। কিন্তু নদীর বাতাসে উড়ে যায়। গ্রামে পৌঁছয় না।

সুন্দরমামা তাঁর গ্রামের বাড়িতে এমনি-এমনি বসে থাকেন না অবশ্য। কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তিনি অনেকখানি জমিতে বিট চাষ করেছেন। বিট মানে বিট-গাজরের বিট। তবে একটু অন্যরকম। এগুলোকে বলে রাশিয়ার বিট। এর থেকে অ্যালকোহল তৈরি হয়। তা ওষুধ-পত্র তৈরিতে খুব কাজে লাগে।

আমাদের ভালোই হল, সুন্দরবনে একটা বেড়াতে যাওয়ার জায়গা হল। ট্রেনে চেপে ক্যানিং, সেখান থেকে লঞ্চে চেপে গোসাবা, তারপর সেখান থেকে পায়ে হাঁটা। মাঝখানে দুটো নদী পেরুতে হয় ফেরি নৌকোয়। সন্ধে হলেই গা ছমছম করে। মনে হয়, কোনও ঝাড়ে বাঘ লুকিয়ে বসে আছে।

সেই ভয়টা একেবারে আজগুবিও নয়। মাঝে-মাঝেই তো বাঘ চলে আসে গ্রামের মধ্যে। সুন্দরবনের ভয়ংকর হিংস্র রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

আমরা অবশ্য এ পর্যন্ত একটাও বাঘ দেখিনি।

বিশ্বমামাকে অনেকবার বলেছি কিন্তু তাঁর যাওয়া হয়নি। গত এক বছর ধরে তিনি খুব ঘুরছেন নানান দেশে। সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ তৈরির কাজটা কত সহজে করা যায় সেই গবেষণা নিয়ে তিনি খুব ব্যস্ত।

সেই কাজেই তাকে যেতে হল সুন্দরবন। আমাদের সঙ্গে নয় একদল জাপানি বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে। তাঁরাও ওই গবেষণা করছেন। তাঁরা সুন্দরবন অঞ্চল ঘুরে দেখতে গেলেন, কোথায় নতুন কারখানা বসাবেন। সুন্দরবনে রোদ্দুরের কোনও অভাব নেই। আর বাতাসও পরিষ্কার।

জাপানিদের দলটার সঙ্গে বিশ্বমামা লঞ্চে করেই ঘুরলেন তিনদিন। সেখানেই খাওয়া ও ঘুমের ব্যবস্থা। তারপর জাপানি দলটি বিদায় নিলে বিশ্বমামা লঞ্চ থেকে নেমে পড়ে চলে এলেন সুন্দরকাকার বাড়িতে।

এসেই বিশ্বমামা বললেন, 'উঃ অনেকদিন খুব পরিশ্রম গেছে। জাপানিদের ইংরিজি বোঝাতে গেলে দাঁত ভেঙে যায়। এখানে আর কোনও কাজ নয়। শুধু বিশ্রাম। সুন্দরদা, কী খাওয়াবে বলো?'

বিশ্বমামা কি চিংড়ি মাছ খুব ভালোবাসেন, তা বিশ্বসুদ্ধু সবাই জানে। আমেরিকায় এক বৈজ্ঞানিক তাঁর নামই দিয়েছেন লবস্টার ম্যান।

বিশ্বমামা পৃথিবীর যে কোনও দেশে গেলেই অনেক খোঁজ করেন চিংড়ি মাছ পাওয়া যায় কি না। অনেক দেশের চিংড়ি খেলেও তাঁর মতে বঙ্গোপসাগরের চিংড়ির স্বাদ সবচেয়ে ভালো। আর সুন্দরবনের নদীতে যেসব চিংড়ি পাওয়া যায় তা তো বঙ্গোপসাগর থেকেই আসে।

সুন্দরকাকা রোজই চিংড়ি খাওয়াতে লাগলেন। তার সঙ্গে বড়-বড় কাঁকড়া। এখন ইলিশের সময় নয়।

একদিন বিকেলবেলা বিশ্বমামা বললেন, 'এবারে লঞ্চে ঘুরতে-ঘুরতে দুবার দুটো কুমির দেখেছি জানিস? নদীর চড়ায় উঠে রোদ পোহায়। বেশ লম্বা-লম্বা কুমির। কিন্তু একটাও বাঘ দেখিনি। এখানে বাঘ আসে না?'

সুন্দরকাকা বললেন, 'রক্ষে করো। বাঘ আমার দরকার নেই। ছমাস আগেই একটা বাঘ গ্রামে ঢুকে পড়ে একটা গরু মেরেছে। একটি মেয়েকে মুখে তুলে নিয়ে গেছে। বাঘ দেখতে চাও চিড়িয়াখানায় যাও। জঙ্গলে বাঘ দেখতে চেও না।'

বিশ্বমামা বললেন, 'বাঘ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। ব্যাটারা খুব হিংস্র হয় বটে, কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর। আমার সামনে কোনও বাঘ এসে পড়লেও আমার কোনও ভয় নেই। আমি এবার একটা বন্দুক এনেছি। তাতে ঘুম পাড়ানি বুলেট আছে। বাঘ কাবু হয়ে যাবে।'

সন্ধেবেলা বাড়ি থেকে বেরুনো নিষেধ, তবু বিশ্বমামা আমাকে আর বিলুদাকে বললেন, 'চল, চল, ঘুরে আসি। কোনও ভয় নেই।'

আমরা তিনজনে হাঁটতে লাগলুম নদীর ধার দিয়ে। বিশ্বমামার কাঁধে সেই বন্দুক।

এই সময় চমৎকার হাওয়া দেয়। ওপারের গাছপালা ঝাপসা হয়ে আসে। নদীর ওপর ছোট-ছোট নৌকোগুলোয় মিটমিট করে আলো জ্বলে।

বেশ ভালোই লাগছে। বিশ্বমামা বললেন, 'এখন একটা ছোটখাটো বাঘ এসে পড়লে মন্দ হতো না। ওকে ঘুম পাড়িয়ে কলকাতায় নিয়ে যেতুম।'

হঠাৎ কাছেই একটা বাড়ি থেকে একসঙ্গে তিন চারজনের গলার কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। আমরা কৌতূহলী হয়ে থেমেছি। ও বাড়িতে বাঘ ঢুকেছে নাকি?'

একজন লোক সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে আসছে, তাকে থামিয়ে বিশ্বমামা জিগ্যেস করলেন, 'কী হয়েছে দাদা?'

লোকটি হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'আমাদের লক্ষ্মীমণিকে সাপে কামড়েছে। মাত্র তেরো বছরের মেয়ে।

বিশ্বমামা আঁতকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ? সাপ?'

তারপর আর কোনও কথাটি না বলে উলটো দিকে মারলেন দৌড়। কাঁধে বন্দুক নিয়ে কোনও মানুষকে এত ভয় পেয়ে দৌড়তে দেখা যায়নি?

তখন মনে পড়ে গেল। বিশ্বমামা বাঘ-ভাল্লুক, ভূত-পেতনিকে ভয় পান না। কিন্তু সাপের ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকেন।

বাড়িতে এসে দেখি বিশ্বমামা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে চতুর্দিক দেখছেন।

সুন্দরকাকা বললেন, 'ভয় নেই। দোতলায় সাপ ওঠে না। তবে এখানে বড্ড সাপের উপদ্রব। বাঘের চেয়েও সাপের ভয় বেশি।'

বিশ্বমামা বললেন, 'কী সর্বনাশ! আমার মনেই ছিল না। তাহলে লঞ্চ থেকে আর নামতুমই না।

সুন্দরকাকা বললেন, 'দাসদের বাড়ির একটা মেয়েকে আজ আবার সাপে কামড়েছে! ওই বাড়িটাই অপয়া। এক মাস আগেই তো ও বাড়ির এক বুড়ি পিসি সাপের কামড়ে মরে গেল!'

বিলুদা জিগ্যেস করল, 'এখানে সাপের বিষের চিকিৎসা হয় না?'

সুন্দরকাকা বললে, 'হাসপাতাল যে অনেক দূর। নৌকো করে নিয়ে যেতে হয়। যেতে-যেতেই মরে যায়। তাই কেউ আর নিয়ে যায় না, ওঝা ডাকে।'

বিশ্বমামা ধমক দিয়ে বললেন, 'সুন্দরদা, তুমি সাপের কথা জেনেও সুন্দববনে বাড়ি বানাতে গেলে কেন? দার্জিলিং কালিম্পং-এ তো টাটকা হাওয়া!'

সুন্দরকাকা বললেন, 'ওখানেও গাড়ি চলে, খুব পেট্রলের ধোঁয়া!'

বিলুদা আবার জিগ্যেস করল, 'ওঝারা কোনও সাপে কাটা লোক বাঁচাতে পারে?'

বিশ্বমামা বললেন, 'বাজে কথা! ওঝারা আবার কী করবে? ওরা কিছু পারে না।'

সুন্দরকাকা বললেন, 'সব সময় পারে না। তবে দশজনের মধে তিন-চারজনকে কিন্তু বাঁচিয়ে দেয়।'

বিশ্বমামা বললেন, 'সব সাপের তো বিষ থাকে না। সেইসব নির্বিষ সাপ কামড়ালে তখনই ওঝারা কেরদানি দেখায়।'

একটু পরেই আর একটা দুঃসংবাদ পাওয়া গেল।

এবাড়ির কাজের লোক রঘু এসে বলল, 'তেরো বছরের মেয়েটি এর মধ্যেই মারা গেছে। ওবাড়ির আর একজন বুড়ো লোককে এর মধ্যে সাপে কামড়েছে।'

সবাই ওবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। রঘু বলল, 'ওবাড়িতে মা মনসার অভিশাপ লেগেছে। তাই বিষাক্ত সাপরা এসে সবাইকে শেষ করছে।'

বিশ্বমামা বললেন, 'মা মনসার অভিশাপ না ছাই! নিশ্চয়ই ও বাড়িতে অনেক ইঁদুর আছে। ব্যাঙ আছে। সাপ সেইসব খেতে আসে। সামনে মানুষ দেখলে তাদেরও কামড়ে দেয়।'

বিশ্বমামা নাক দিয়ে বড়-বড় নিশ্বাস টেনে বললেন, 'আমি এখানেও যেন সাপ-সাপ গন্ধ পাচ্ছি!'

সুন্দরকাকা বললেন, 'না, না। আমার বাড়ির চারপাশে নিয়মিত কারবলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দিই।'

বিশ্বমামা বললেন, 'তাতেও খুব লাভ হয় না। সাপ কারবলিক অ্যাসিড ডিঙোতে পারে না ঠিকই। কিন্তু আগে থেকেই যদি বাড়ির আনাচে-কানাচে সাপ ঢুকে থাকে? সেগুলো সব বেরিয়ে আসবে।'

একটুক্ষণ চিন্তা করে বিশ্বমামা বললেন, 'আমার এক পুলিশ বন্ধুকে খবর দিতে হবে!'

বিলুদা বলল, 'পুলিশ এসে সাপ মারবে নাকি? এরকম তো কখনও শুনিনি!'

আমি বললুম, 'বিশ্বমামা, তুমি গত বছর শান্তিনিকেতনে তোমার বন্ধু পিঁপড়েদের ডেকে এনে একটা সাপ মেরেছিলে। এবারেও সেরকম একটা কিছু করো।'

বিশ্বমামা সুন্দরকাকাকে জিগ্যেস করলেন, 'তোমাদের এখানে পিঁপড়ে আছে?'

সুন্দরকাকা বললেন, 'পিঁপড়ে তো পৃথিবীর সব জায়গাতেই থাকে। এখানেও আছে। তবে খুব বেশি নয়! সবসময় দেখা যায় না।'

বিশ্বমামা বললেন, 'সে উপায়টা এখানে খাটবে না। পুলিশ-বন্ধুরই সাহায্য নিতে হবে।'

তিনি পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বার করে কথা বলার জন্য চলে গেলেন বারান্দার এক কোণে।

একটু পরে ফিরে এসে বললেন, 'ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এখানে জাপানি বিজ্ঞানীদের বদলে চিনে বিজ্ঞানীদেরই নিয়ে আসা উচিত। তাহলে ভালো কাজ হবে?'

সুন্দরকাকা জিগ্যেস করলেন, 'কেন? জাপানিদের থেকে চিনেরা বেশি ভালো হবে কেন?'

বিশ্বমামা বললেন, 'চিনেরা সাপের ভয় পায় না। বরং আহ্লাদ করে সাপ ধরে-ধরে খায়!'

তারপরই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই-এই, বারান্দায় ওদিকে ওটা কী নড়ছে দ্যাখো তো।'

সবাই আমরা চমকে উঠলুম। বিশ্বমামা এক দৌড়ে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে।

টর্চ জ্বেলে দেখা গেল, বারান্দার এক দিকে একটা কিছু পড়ে আছে। ঠিক যেন লম্বামতন সাপ। আসলে সেটা একটা সবুজ রঙের ফিতে।

সুন্দরকাকা বললেন, 'একেই বলে রজ্জুতে সর্পভ্রম। বললুম না, দোতলায় সাপ ওঠে না।'

বিশ্বমামার তবু ভয় গেল না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়লেন, দরজা-জানলা সব বন্ধ করে।

পরদিন উঠলেন অনেক দেরি করে। আর একবারও বাড়ির বাইরে যেতে চাইলেন না। মুখখানা বিমর্ষ। গল্প করারও মুড নেই। সারাদিন বই পড়ে কাটালেন।

সন্ধের কাছাকাছি সময় বাড়ির কাছাকাছি নদীর ঘাটে একটা লঞ্চ এসে থামল।

সেই লঞ্চ থেকে নেমে দুজন পুলিশ একটা মস্ত বড় কাঠের বাক্স ধরাধরি করে নিয়ে এলেন এ বাড়িতে।

সুন্দরকাকা জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার? এই বাক্সটায় কী আছে?'

ওপরের বারান্দা থেকে ঝুঁকে বিশ্বমামা বললেন, 'ওতে আছে তোমাদের এখানকার সাপের যম।'

একজন পুলিশ বলল, 'কলকাতা থেকে স্পেশাল লঞ্চে করে আমাদের পাঠানো হয়েছে। আমাদের স্যার বলে দিয়েছেন আজকের মধ্যে পৌঁছতেই হবে।'

বিশ্বমামা জিগ্যেস করলেন, 'কটা পেয়েছেন?'

পুলিশটি বলল, 'ছ'টা স্যার! নিউ মার্কেটের বাজারে এর বেশি ছিল না।'

বাক্সটার মধ্যে কী আছে তা জানার জন্য আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই। বাক্সটার একদিকে কয়েকটা গোল-গোল গর্ত। মনে হয় যেন কয়েকটা বড়-বড় ইঁদুর দৌড়োদৌড়ি করছে তার মধ্যে।

বিশ্বমামার রহস্য

আমার বিশ্বমামা প্রায় সারা বিশ্বেরই মামা।

আমার মা-মাসিরা সাত বোন। তাদের ওই একটিই ভাই। আমরা মাসতুতো ভাই-বোনেরা মিলে উনিশ জন, আমাদের সকলের ওই একমাত্র মামা। আমাদের দেখাদেখি পাড়ার ছেলেমেয়েরাও ওঁকে মামা বলে ডাকে।

বিশ্বমামা প্রায়ই দেশ-বিদেশে বক্তৃতা দিতে যায়। বিদেশিরা ওঁর নামটা ঠিক মতো উচ্চারণই করতে পারে না। তারা বিসওয়া-বিসওয়া বলে। তাই বিশ্বমামা অনেককে বলেন, 'কল্ মী মামা, এটা আমার ডাক নাম।' মামা বলাটা বেশ সোজা। তাই বিশ্বমামা এখন অনেক সাহেব-মেমদেরও মামা বনে গেছে।

বিশ্বমামা বেশ আমুদে মজার মানুষ।

যদিও খুব নামকরা বিজ্ঞানী। দেশ-বিদেশে খুব খাতির। কিন্তু বাড়ির মধ্যে একেবারে ছেলেমানুষের মতন। কাঁচা আম পাতলা-পাতলা করে কেটে নুন দিয়ে খেতে খুব ভালোবাসেন। ফুচকা খেতে ভালোবাসেন। সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে নামবার সময় হঠাৎ বলেন, 'কম্পিটিশান দিবি, কে আগে নামতে পারে? বল্লেই দুদ্দাড় করে দৌড়তে শুরু করেন। দারুণ শক্ত কোনও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে লিখতে উঠে এসে বসেন, 'এই লুডো খেলবি?'

বাইরের লোকরা অবশ্য কেউ এইসব কথা জানে না।

সাধারণত বৈজ্ঞানিকদের দাড়ি থাকে, গোঁফ থাকে, মোটা কাচের চশমা আর মাথায় থাকে টাক। বিশ্বমামার কিন্তু দাড়ি-গোঁফ কিচ্ছু নেই। আজও তার চশমা লাগে না, মাথায় চুলও যথেষ্ট। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। নাকটা একটু বেশি লম্বা। গায়ের রং বেশ ফর্সা বলে ছোটবেলায় ওঁকে অনেকে বলতো, নাকেশ্বর ধপধপে। এখন অবশ্য এই নামটা আর বিশেষ কেউ বলে না। তবে আমরা জানলুম কী করে?

বিশ্বমামা মাঝে-মাঝে খাওয়া-দাওয়া ভুলে গবেষণার কাজে ডুবে থাকলে আমার

মা বলত, 'এই নাকেশ্বর ধপধপে, তোর কি খিদে-তেষ্টা কিছু নেই? একটা কিছু আবিষ্কার কর দেখি, যাতে মানুষের খিদের সমস্যা ঘুচে যায়।'

বিশ্বমামার অনেক গুণ কিন্তু একটা খুব বড় দোষ আছে। কিছুতেই কোনও কথার সোজাসুজি উত্তর দেন না। এক-এক সময় তাতে আমাদের খুব রাগ ধরে।

এই যেমন বিশ্বমামা এক বছরের জন্য কানাডায় গিয়ে ছিলেন, ফিরে এসেছেন কয়েকদিন আগে। আমি জিগ্যেস করলাম, 'বিশ্বমামা তুমি ওখানে নায়েগ্রা ফলস দেখেছ?'

বিশ্বমামা চোখ বড়-বড় করে বলল, 'ওরে বাবা, এবারে কী হয়েছিল জানিস? ওরা আমায় ধরে রাখতে চাইছিল। প্রায় জোর করে।'

আমি বুঝতে না পেরে জানতে চাইলুম, 'ওরা মানে কারা? নায়েগ্রার কাছে কারা তোমায় ধরে রাখতে চেয়েছিল?'

বিশ্বমামা বললেন, 'অ্যাথাবাসস্কা! অ্যাথাবাস্কা! বলে কী, তুমি এইখানে থাকো, মামা, তোমাকে অনেক টাকা পয়সা দেব! বিরাট বাড়ি দেব, নতুন গাড়ি দেব, যা তুমি চাও! এখানে থেকে তুমি ওই কাজটা করো।' আমি বললুম, 'উঁহু, সেটি হচ্ছে না। আমি নিজের দেশে ফিরে এই কাজ করব। আমার দেশের যাতে উপকার হয়। সেটা আমি দেখব না?'

'বোঝ ঠ্যালা! কোথায় নায়েগ্রা জলপ্রপাত আর কোথায় অ্যাথাবাস্কা!'

যাই হোক, নায়েগ্রার কথাটা মুলতুবি রেখে আমি জিগ্যেস করলাম, 'ওই কাজ মানে কী কাজ? কীসে আমাদের দেশের উপকার করে?'

বিশ্বমামা মুচকি হেসে বলল, 'হাজারিবাগে ছোড়দিদের খবর কী রে? ভাবছি, সেখানে একবার বেড়াতে যাব!'

এসব বোঝে কার সাধ্য!

এসব কথা শুনলে মনে হয় খুবই এলোমেলো, কিংবা বিশ্বমামার মাথার গোলমাল আছে, আসলে কিন্তু তা নয়। এইসব কথার মানে বোঝা যায় কয়েকদিন পর।

কানাডা থেকে বিশ্বমামা এবার এক বাক্স ভর্তি পাথর নিয়ে এসেছেন। সেগুলো কিছু দামি পাথর বলে মনে হয় না। এমনি সাধারণ বেলে পাথরের মতন। ছোট, বড় নানান রকমের টুকরো।

অত দূর থেকে বয়ে এনেছেন পাথরগুলো। কিন্তু নিজের ঘরে যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে রেখেছেন। একটা-দুটো কেউ নিয়ে গেলেও যেন ক্ষতি নেই। কিন্তু কেই বা নেবে? কানাডার পাথর বলে আলাদা করে তো কিছু বোঝা যায় না। ওরকম পাথর আমাদের এখানেও কত পাওয়া যায়।

একদিন দুপুরে বিশ্বমামার ঘরে গিয়ে দেখি যে, সব কটা জানলা বন্ধ। অন্ধকার ঘরে আলো জেলে বিশ্বমামা কীসব লিখছেন। একটু উঁকি মেরে দেখলুম, দারুণ কঠিন সব অঙ্ক।

কিন্তু দিনের বেলায় এরকম জানলা বন্ধ রাখার কী মানে হয়? বাইরে বেশি লোকও নেই, বেশ মেঘলা-মেঘলা সুন্দর দিন।

আমি একটা জানলা খুলতে যেতেই বিশ্বমামা চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'খুলিশ না!

খুলিস না! জানলা খুললে বিপদ হতে পারে। দেখছিস না। আমি তিন-চারদিন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি না একদম! ওরা বোধহয় আমাকে খুন করতে চায়!'

আমার পিলে চমকে উঠল খুব! 'কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

কিন্তু বিশ্বমামা এমনভাবে বললেন যেন খুনটা কিছুই না। কেউ যেন সন্দেশ খেতে চায় কিংবা দোলনায় দুলতে চায়।

আমি বললুম, 'কারা তোমাকে খুন করতে চায়! তাহলে তো এক্ষুনি খবব দিতে হবে।'

বিশ্বমামা বললেন, 'ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। এখন কাছাকাছি কী পুজো আছে বল তো? কুমোরটুলিতে এখন কী মূর্তি গড়া হচ্ছে?'

'কুমোরটুলির মূর্তি!'

'তুই এক কাজ করতো, নীলু। তোকে আমি পাঁচশো টাকা দিচ্ছি। কুমোরটুলি থেকে আজই একটা মূর্তি কিনে নিয়ে আয় তো! ও হ্যাঁ শিগগিরই তো বিশ্বকর্মা পুজো। বিশ্বকর্মার মূর্তি হলেই চলবে। শুধু নাকটা একটু বেশ লম্বা করে দিবি! অনেকটা যেন আমার মতন মুখটা দেখতে হয়।'

'তোমার মতন মূর্তি!'

'হ্যাঁ, শিগগির চলে যা। বিলুর তো একটা ভ্যান আছে। সেই গাড়িতে শুইয়ে, ঢাকাঢুকি দিয়ে নিয়ে আসবি, কেউ যেন দেখতে না পায়।'

জোর করে আমার হাতে টাকা গুণে দিয়ে বলল, 'যা, যা, দেরি করিস না। এক্ষুনি চলে যা।'

আমাকে যেতেই হল।

এরপর একটার পর একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটতে লাগছিল।

বিলু আমার মাসতুতো দাদা। সে ভালো গাড়ি চালায়। তার একটা পুরোনো ভ্যান আছে।

বিলুদা জানে, বিশ্বমামা সব সময় রহস্য করে কথা বলে। পরে যাতে বোঝা যায়। আমার কথা শুনে বলল, 'চল, একটা মূর্তি কিনে আনি। তারপর দেখা যাক কী হয়।'

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সাতেক দেরি আছে বটে কিন্তু কুমোরটুলিতে এর মধ্যেও অনেক মূর্তি গড়া হয়ে গেছে। একটু কাঁচা দেখে একটা মূর্তি নিয়ে আমরা কুমোরকে বললুম, নাক-চোখ খানিকটা পালটে দিতে।

সেই মূর্তি এনে রাখা হল বিশ্বমামার ঘরে।

বিশ্বমামা বললেন, 'বাঃ বেশ হয়েছে। এ যে ঠিক আমার মতন। তোরা এখন যা। আমাকে ডিসটার্ব করিস না। রাত্তিরে বারোটার সময় আমার ঘরে আসিস। কাউকে কিছু বলবি না।'

তারপর থেকে আর আমাদের সময় কাটে না। কখন সন্ধে হবে। কখন রাত্তির হবে?

ঠিক বারোটায় বিশ্বমামার ঘরে আসতেই তিনি বললেন, 'এসেছিস! এবার এক কাজ করা যাক। মূর্তিটা টেনে সামনের জানলার কাছে নিয়ে আয় তো।'

আমরা সবাই ধরাধরি করে সেটাকে নিয়ে এলাম জানলার কাছে, মুখটা করা

হল রাস্তার দিকে, তারপর খুলে দেওয়া হল জানলা। এবার মনে হল বিশ্বমামাই যেন জানলা দিয়ে রাস্তা দেখছেন।

বিশ্বমামা বললেন, 'এবার সবাই খাটের নিচে শুয়ে পড়। শুয়ে পড়। একটা মজা দেখতে পাবি।

আমরা শুয়ে রইলাম খাটের নিচে। বিশ্বমামা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আছে। কথা বলাও বারণ। এক-একটা মিনিট কাটছে এক ঘণ্টার মতন।

খানিক বাদেই পর-পর দুটো গুলির শব্দ হল।

মাটির মূর্তিটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল!

বিশ্বমামা বললেন, 'দেখলি-দেখলি ওরা আমায় খুন করতে চায় কিনা?'

বিলুদা আর আমি একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'ওরা কারা, কে তোমায় খুন করতে চায়?'

বিশ্বমামা বললেন, হাজারিবাগ! আমার এক্ষুনি হাজারিবাগ যাওয়া দরকার। রাস্তা এখন ক্লিয়ার। গুলি ছোঁড়ার পর ওরা আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। বিলু, আজ রাত্তিরে তোর গাড়িতে আমায় হাজারিবাগ পৌঁছে দিতে পারবি।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। বিশ্বমামা যখন যা চাইবে, তাতে দেরি করা চলবে না।

বিশ্বমামা নিজের গবেষণার কিছু যন্ত্রপাতি, জরুরি কাগজপত্র আর কানাডার সেই পাথরগুলো গাড়িতে বোঝাই করলেন। হাজারিবাগে কত পাথর আছে, তবু এগুলো নিয়ে যাওয়ার দরকার কী?

কিন্তু জিগ্যেস করে কোনও লাভ নেই। উত্তর পাব না।

গাড়ি চালাতে লাগলেন বিলুদা, তার পাশে আমি। পেছনে বিশ্বমামা।

বিশ্বমামা বারবার পেছনের দিকে তাকাতে লাগলেন। আমাকে বললেন, 'নীলু লক্ষ রাখবি। কেউ আমাদের ফলো করছে কিনা। সেরকম সন্দেহ হলেই পালটাতে হবে!'

এত রাত্তিরে রাস্তা একেবারে ফাঁকা। গাড়ি বিশেষ নেই। কলকাতা ছাড়িয়ে আমরা দিল্লি রোড ধরলাম। কেউ আমাদের ফলো করছে বলে মনে হল না।

বিলুদা এত জোরে গাড়ি চালাল যে তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে আমরা চলে গেলুম বহু দূরে।

তারপর একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। ভোরের কিছুটা বাকি আছে। বিলুদা যদিও আমাকে ঘুমোতে বারণ করেছিল, তবু আমি ঢুলে-ঢুলে পড়ছি মাঝে-মাঝে!

হঠাৎ এক সময় গাড়ির গতি আস্তে হতে-হতে একেবারেই থেমে গেল।

বিলুদা বলে উঠল 'সর্বনাশ!'

পেছন থেকে বিশ্বমামা জিগ্যেস করলেন, 'কী হল?'

বিলুদা বললেন, 'ইস দারুণ ভুল করে ফেলেছি। পেট্রলের হিসেব করতে ভুল হয়ে গেছে। ভেবেছিলুম যা পেট্রল আছে তাতে ধানবাদ পর্যন্ত হয়ে যাবে। ওখান থেকে আবার পেট্রল ভরে নেব। এখন কী হবে? জঙ্গলের মধ্যে জেগে থাকতে হবে। সকাল না হলে তো কিছু করাও যাবে না।'

আমি, ভয় পেয়ে গেলুম খুব। 'জঙ্গলের মধ্যে থেমে থাকবি যদি ডাকতে আসে?'

বিশ্বমামা অবশ্য বললেন, 'নো প্রবলেম! দেখি কী করা যায়। তোরা নেমে পড়। একটু এগিয়ে দ্যাখ, কোনও গাড়িটাড়ি এসে পড়ে কিনা।' ভয়েই আমরা গাড়ি থেকে নেমে গেলাম।

বিশ্বমামা বললেন, 'আর একটু দূরে যা। আমি কী করছি দেখবি না। ডাকলে আসবি।'

মিনিট দশেক বাদেই বিশ্বমামা ডাকল, 'বিলু, নীলু, এদিকে আয়।'

আমরা দৌড়ে এসে দেখি বিশ্বমামা কয়েকটি যন্ত্র রাস্তায় নামিয়ে কী সব করছিলেন, এখন সেগুলো আবার গাড়িতে তুললেন।

বিলুদাকে বলল, 'দ্যাখ তো, গাড়ি এবার স্টার্ট নেয় কিনা?'

বিলু বলল, 'তেল ছাড়া কী করে স্টার্ট নেবে?'

বিশ্বমামা ধমক দিয়ে বললেন, 'দ্যাখ না!'

বিলুদা উঠে চাবি লাগিয়ে ঘোরাতে গাড়িটা জেগে উঠল। বিলুদা দারুণ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে বলল 'একী? একী? তেল এল কী করে?'

গাড়ি স্টার্ট নিলই শুধু না, দেখা যাচ্ছে যে তেলের কাঁটা খানিকটা ওপরে উঠে গেছে। গাড়িতে তেল ভরা হয়েছে! অথচ এক ফোঁটা তেল ছিল না।

বিলুদা বলল, 'বিশ্বমামা, গাড়িতে তেল ভরা হয়ে গেল, এটা কি ম্যাজিক নাকি? তুমি তেল পেলে কোথায় বলতেই হবে।'

বিশ্বমামা মুচকি হেসে বললেন, 'পাথর।'

'আচ্ছা কোনও মানে হয়? এর কোনও মাথামুন্ডু আছে? পেট্রল কোথায় পাওয়া গেল, তার উত্তর কি পাথর হতে পারে?'

বিশ্বমামা চোখ বুঝে ফেলেছেন। আর কিছু বলবেন না।

তিনদিন পরে বোঝা গেল, পাথরটাই উত্তর। কানাডায় কেন অন্য বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বমামাকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। কেন বিশ্বমামা দেশের উপকার করার জন্য ফিরে এলেন, কেন কিছু লোক ওঁকে খুন করতে চেয়েছিল, এমনকী গাড়িতে কী করে পেট্রল এল, এই সবকটা প্রশ্নের উত্তরই পাথর।

বিলুদা বিশ্বমামার ঘরের কিছু কাগজপত্র পড়ে নিজে বুঝেছে, আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

কানাডার অ্যাথাবাস্কা নদীর ধারে প্রচুর পাথর পড়ে থাকে। সেগুলিকে সাধারণ বেলে পাথরের মতো দেখতে হলেও একটা দারুণ বৈশিষ্ট্য আছে। ওগুলো আসলে হচ্ছে অয়েল স্যান্ড বা তৈল শিলা। পেট্রোলিয়ামই কোনওভাবে এইসব পাথরের মধ্যে ঢুকে থাকে। এখন এই পাথর থেকে আবার পেট্রোলিয়াম বের করতে পারলে পৃথিবীর তেলের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের দেশে পেট্রোলের খুব অভাব, আমাদের খুব উপকার হবে।

কী করে ওইসব পাথর থেকে সস্তায় পেট্রল বার করা যায় তা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে। সেই গবেষণায় বিশ্বমামা অনেকটা এগিয়ে গেছেন। আবার আরবের

যেসব দেশে খুব সহজেই পেট্রল পাওয়া যায়, তারা ভাবছে, পাথর থেকে পেট্রল বার করতে পারলে তাদের পেট্রলের দাম কমে যাবে। তাই তারা চাইছে এই গবেষণা বন্ধ করতে। তাদের কেউ খুন করতে চেষ্টা করেছিল বিশ্বমামাকে।

বিশ্বমামা পাথর থেকে তেল বার করার উপায়টা বার করে ফেলেছেন কিন্তু সেটাকে আরও সহজ করা দরকার। তাই নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন হাজারিবাগে বসে। খুব গোপনে। তাঁকে এখন একটুও ডিসটার্ব করা যাবে না।

বিশ্বমামার ম্যাজিক

বিশ্বমামা বললেন, 'আয় তো রে নীলু আর বিলু। তোদের একটা ম্যাজিক দেখাই! কাছে আয়, কাছে আয়। হাত বাড়িয়ে দে!'

আমাদের বিশ্বমামা সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়ান। কখন যে কোথায় থাকেন, তার ঠিক নেই। কখনো হনুলুলু, কখনও ম্যাডাগাস্কার। ওঁর নামের সঙ্গে স্বভাবটা বেশ মিলে গেছে। বিশ্বমামা নিজেই বলেন, 'জানিস, ছোটবেলায় আমি যখন খুব দুষ্টুমি করতাম, তখন বাবা আমাকে বকুনি দিয়ে বলতেন, ছেলে একেবারে বিশ্ববখাটে হয়েছে! দ্যাখ, আমি সত্যি-সত্যি তাই হয়েছি।'

এবারে তিনি গিয়েছিলেন হিমালয়ের কোনও এক দুর্গম অঞ্চলে।

তাতে আমরা বেশ নিরাশই হয়েছিলাম। কারণ বিদেশে গেলে বিশ্বমামা আমাদের জন্যে অনেক রকম চকলেট আর ট্রফি আনেন। প্রত্যেকবার নতুন-নতুন ধরনের। সেই জন্য উনি ফিরলেই আমরা ওঁর চারপাশে লোভে-লোভে ঘুরি। মা বারণ করে দিয়েছেন, কিছুতেই বিশ্বমামার কাছে থেকে কিছু চাওয়া চলবে না, কারণ তা হলে সবাই হ্যাংলা বলবে! আর বিশ্বমামাও এমন, ফেরার পরই যে আমাদের চকলেটগুলো ভাগ করে দেবেন, তা নয়। নিজের কাছে রেখে দেবেন আর এমন ভাব দেখাবেন, যেন কিছুই আনেননি। তারপর দুদিন-তিনদিন পর হঠাৎ সেগুলো বার করবেন।

এবারে যে চকলেট আনেননি, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। হিমালয়ে তো আর চকলেট পাওয়া যায় না।

বিদেশের বদলে হিমালয়ে কেন গিয়েছিলেন, তাও বলা মুশকিল। বিশ্বমামা যে সরাসরি কোনও প্রশ্নের উত্তর দেন না।

বিলুদা জিগ্যেস করেছিল, উনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'ঘাস রং করতে!'

এমন অদ্ভুত কথা কেউ শুনেছে? ঘাস রং করা মানে কী? ঘাসে আবার কেন লোকে রং লাগাতে যাবে?

যাই হোক, বিশ্বমামার ম্যাজিক দেখার জন্য আমি আর বিলুদা কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম।

বিশ্বমামা একটা হাতে মুঠো করে কী যেন ধরে আছেন। সেটা দেখাবার আগে তিনি হঠাৎ আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'হ্যাঁরে, নীলু, তোর ছোটকাকার কিডনিতে পাথর হয়েছিল। অপারেশান করে সত্যি একটা পাথর পাওয়া গিয়েছিল, তাই না?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি দেখেছি। মাঝারি সাইজের একটা গুলির মতন।'

বিশ্বমামা বললেন, 'সেই পাথরটার গন্ধ শুঁকে দেখেছিস?'

আমি বললাম, 'না তো, গন্ধ শুঁকব কেন?'

বিশ্বমামা এবার বিলুদাকে জিগ্যেস করলেন, 'বিলু, ছুঁচো দেখেছিস? ছুঁচোর গায়ে কেন গন্ধ থাকে বল তো!'

বিলুদা বলল, 'তা আমি কী করে জানব?'

বিশ্বমামা বললেন, 'জানিস না। ও, তাহলে আর কী করে হবে!'

বিলুদা বলল, 'ছুঁচোর গায়ে কেন গন্ধ থাকে তা জানি না বলে তুমি আমাদের ম্যাজিক দেখাবে না?'

বিশ্বমামা বললেন, 'হ্যাঁ, দেখাব ম্যাজিক। যদি ধরতে পারিস, তাহলে আজ সন্ধেবেলা চাইনিজ খাওয়াতে নিয়ে যাব। আর যদি না পারিস, তাহলে পাঁচটা করে অঙ্ক কষতে হবে।'

বিশ্বমামা বসে আছেন একটা টেবিলের একধারের চেয়ারে। আমরা টেবিলের অন্যধারে।

তিনি বললেন, 'একে-একে আয়। আগে কে?'

বিলুদা সব ব্যাপারেই আমার ওপর সর্দারি করে। ও তো আগে যাবেই। মুখে কিছু না বলেই আমাকে ঠেলে এগিয়ে গেল।

বিশ্বমামার যে হাতটা মুঠো করা সেটা লুকোলেন টেবিলের তলায়। অন্য হাতটা দিয়ে বিলুদার বাঁ-হাত আর ডান হাত একবার করে টিপে-টিপে দেখলেন। তারপর বললেন, 'ডান হাতটাই ঠিক আছে।'

বিলুদার ডান হাতটা টেবিলের তলায় নিয়ে কী যেন করলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। এবার তোর ডান হাতের তালুর গন্ধ শুঁকে দ্যাখ তো বিলু!'

বিলুদা হাতখানা নাকের কাছে নিয়ে এল। তার মুখখানা কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে গেল। একটা গন্ধ সে পাচ্ছে বটে, কিন্তু চিনতে পারছে না।

বিশ্বমামা বললেন, 'একটা গন্ধ পাচ্ছিস?'

বিলুদা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

বিশ্বমামা বললেন, 'তোর হয়ে গেল। এবার নীলু তুই আয় কাছে।'

আমি পাশে দাঁড়াতেই বিশ্বমামা আমারও দুহাত টিপে দেখলেন। তারপর আমার বাঁ হাত নিয়ে গেলেন টেবিলের তলায়। কী যেন একটা শক্ত মতন জিনিস ঘষে দিলেন আমার হাতের তালুতে।

আমি হাতটা নাকের কাছে নিয়ে এসে গন্ধ শুঁকলাম। আমারও অচেনা লাগল গন্ধটা। কিন্তু বেশ তীব্র গন্ধ।

বিশ্বমামা বললেন, 'ব্যাস হয়ে গেছে! কী ব্যাপারটা হল বুঝলি?'

বিলুদা আপত্তি জানিয়ে বলল, 'এ আবার কী ম্যাজিক? তুমি আমার ডান হাতে কিছু একটা ঘষে দিলে। তাতে গন্ধ মাখানো ছিল, তাই আমার হাতে গন্ধ হয়েছে। এতে বোঝার কী আছে?'

বিশ্বমামা বললেন, 'ওঃ, ছো, আসল কথাটাই বলিনি বুঝি! বিলু, তোর ডান হাতে জিনিসটা ঘষেছি তো? ডান হাতে গন্ধ হতেই পারে। এবার বাঁ-হাতটা শুঁকে দেখ! বাঁ-হাতে তো কিছু ঘষিনি?'

বিলুদা নিজের বাঁ-হাত শুঁকল। আমিও আমার ডান হাত শুঁকলাম। সত্যি তো, অন্য হাতেও গন্ধ এসে গেছে: এ তো সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার।

বিশ্বমামা নিজের বাঁ-হাত তুলে দেখালেন। সে হাতে কিছু নেই। ডান হাতটা মুঠো করা অবস্থায় উঁচু করলেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, 'তোদের একটা হাত ঘষে দিলাম। সেই হাতের গন্ধ এত তাড়াতাড়ি শরীরের মধ্যে দিয়ে অন্য হাতে চলে এল কী করে? এই হল ম্যাজিক। যাঃ, চিন্তা কর গিয়ে! বিকেলের মধ্যে বলতে না পারলে কিন্তু চাইনিজ খাওয়াতে নিয়ে যাব না!'

আমরা দুজন সারা দুপুর ভাবলাম। মাথামুন্ডু কিছুই বোঝা গেল না। বিলুদা আমার ছোড়দির একটা সেন্টের শিশি লুকিয়ে নিয়ে এসে তার থেকে খানিকটা এক কানে মেখে বলল, 'নীলু, আমার অন্য কানটা শুঁকে দ্যাখ তো, গন্ধ এসেছে কি না!'

আমি শুঁকে দেখলাম, 'না। গন্ধটন্ধ কিছু নেই। এক দিকের গন্ধ কি কখনও অন্য দিকে যেতে পারে? বিশ্বমামার হাতে তাহলে কী অত্যাশ্চর্য জিনিসটা ছিল?'

ডাল ঝিঙে পোস্ত আর ইলিশমাছ দিয়ে অনেকখানি ভাত খেয়ে বিশ্বমামা এখন লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছেন। নাক ডাকছে প্রচণ্ড। বিশ্বমামার মতন এত বড় নাক আমি আর কোনও মানুষের দেখিনি। ওর গায়ের রং ফরসা বলে আমরা ওঁর আর একটা নাম দিয়েছি নাকেশ্বর ধপধপে। অত বড় নাক, বেশি জোরে তো ডাকবেই।

বিলুদা বলল, 'কীরে, নীলু, তুই ম্যাজিকটা বুঝতে পারলি না?'

আমি বললাম, 'তুমি পেরেছ?'

বিলুদা বলল, 'এসব ম্যাজিক-ফ্যাজিক ধরে ফেলা তো ছোটদেরই কাজ। মাথা ঘামাস না কেন? চাইনিজ খাবি কী করে?'

'তুমি খেতে পারছ না।'

'এক কাজ করবি নীলু। আমি দেখেছি বিশ্বমামা ওর হাতের সেই জিনিসটা বালিশের নিচে রেখেছে। টপ করে একটু করে বার করে নিয়ে দ্যাখ না।'

'যদি জেগে ওঠে? খুব রেগে যায়?'

'এত নাক ডাকছে, এখন ঘুম ভাঙবেই না।'

'তাহলে তুমি বার করে আনো।'

'এসব ছোটদের কাজ। আমি পাহারা দিচ্ছি। ঘুম ভাঙলেই ওকে অন্য কথা বলে ভোলাব। তুই জিনিসটা নিয়ে আয়!'

আমি খুব আস্তে-আস্তে গিয়ে বালিশের তলায় হাত ঢোকালাম। একটা শক্ত মতন কিছু ঠেকল। বার করে এনে দেখি, সেটা একটা মুর্গির ডিমের মতন জিনিস। ওপরে লোম রয়েছে। কিন্তু এমনই শক্ত যে মনে হয় একটা গোল পাথরকে লোমওয়ালা চামড়া দিয়ে মুড়ে বাঁধানো।

বিলুদা ফিসফিস করে বলল, 'কস্তুরি! কস্তুরি! হরিণের পেটে থাকে।'

কস্তুরির কথা আমিও শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের কবিতাও পড়েছি ঃ 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম, কস্তুরি মৃগ সম!' কিন্তু কস্তুরি বলে যে সত্যিই কিছু আছে তাও জানতাম না, কোনওদিন চোখেও দেখিনি!

বিলুদা বলল, 'রেখে দে ওটাকে, আবার আগের জায়গায় রেখে দে! তাহলে আজ চাইনিজ খাওয়া হচ্ছেই।'

এই সময় বিশ্বমামা জেগে উঠে বসলেন। বিলুদা বলল, 'কস্তুরি! বুঝে গেছি!'

বিশ্বমামা বললেন, 'কস্তুরি? বটে! 'কস্তুরি কাকে বলে জানিস?'

বিলুদা বলল, 'হ্যাঁ জানি। এক ধরনের হরিণের পেটে হয়।'

বিশ্বমামা বললেন, 'বাঃ! কস্তুরি চিনিস দেখছি। হিমালয়ের এক ধরনের হরিণ, যাদের বলে মাস্ক ডিয়ার, তাদের পেটে হয়। জানিস নীলু, তুই যেটা ধরে আছিস, সেটাকে বলতে পারিস, আমাদের দেশের সেরা কস্তুরি। আর হিমালয়ের হরিণদের পেটে কস্তুরি পাথর জন্মাচ্ছে না। আমি এবার সে ব্যবস্থা করে এসেছি।'

বিলুদা বলল, 'সে কী! তুমি এটা করলে কেন? কস্তুরি তো খুব দামি জিনিস!'

বিশ্বমামা হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, 'দামি জিনিস! তাই জন্য লোকে এই বেচারা সুন্দর হরিণগুলোকে মেরে-মেরে শেষ করছে, তারপর পেট কেটে কস্তুরি বার করবে। কেন, ওরা কী দোষ করেছে? মানুষের কিডনিতে যেমন পাথর হয়, ওই হরিণদেরও নাভি-কোষের মতন পাথর জন্মায় আপনা-আপনি। সেই জন্য মানুষ ওদের মারবে? খবরের কাগজে পড়েছিলাম। হিমালয়ে লোকে প্রচুর ওই হরিণ মারছে কস্তুরির লোভে! তা পড়েই আমার গা জ্বলে গেল। মনে-মনে বললাম, দেখাচ্ছি মজা! আমি এমন একটা কেমিক্যাল আবিষ্কার করলাম, যাতে ওই পাথর গলে যায়। সেই পাথর নিয়ে চলে গেলাম হিমালয়ে।'

বিলুদা বলল, 'তুমি তোমার সেই ওষুধ হরিণ ধরে-ধরে ইঞ্জেকশান দিলে নাকি?'

বিশ্বমামা বললেন, 'তা তো আর সম্ভব নয়। গোপনে ঘুরে-ঘুরে দেখলাম, ওই হরিণগুলো ঠিক কোন জায়গায় থাকে, সেই ঘাসের ওপর আমার ওষুধ ছড়িয়ে দিয়েছি বেশ করে। আর কী ধরনের ঘাস খায়, সেই ঘাস খেয়ে কয়েক দিনের মধ্যে ওদের পেটের সব পাথর গলে গেছে। শুধু তাই নয়, এর পর যে বাচ্চা জন্মাবে, তাদেরও কস্তুরি হবে না। শিকারিরা এর পরেও দুতিনটে হরিণ মেরেছিল, পেটে কিছু পায়নি। ওই হরিণ মারা এমনিতেই নিষেধ। এখন সবাই বুঝে যাচ্ছে, কস্তুরির জন্য শুধু-শুধু অত সুন্দর হরিণ মেরেও আর কোনও লাভ হবে না।

আমি বললাম, 'তা হলে আর কস্তুরির গন্ধ কেউ পাবে না?'

বিশ্বমামা বললেন, 'কেন পাবে না? সিভেট নামে এক ধরনের বেড়াল আর মাস্ক র‍্যাট নামে এক ধরনের ইঁদুরের পেটেও ঠিক এই রকম গন্ধওয়ালা পাথর হয়। সত্যি

কথা বলছি, ইঁদুর মারলে আমার কোনও আপত্তি নেই। তা ছাড়া এখন কস্তুরির গন্ধওয়ালা কেমিক্যাল তৈরি হয়, তার নাম সিভেটোন। কিছু-কিছু ওষুধও তৈরি হয় এটা দিয়ে।'

বিলুদা জিগ্যেস করলো, 'তা হলে আজ আমরা কোথায় চাইনিজ খেতে যাচ্ছি?'

বিশ্বমামা বললেন, 'আগে আমার ম্যাজিকটার কী হলো সেটা বল! এখনও তো পারিসনি!'

বিলুদা বলল, 'এ তো খুব সোজা! কস্তুরির খুব তীব্র গন্ধ তুমি এক হাতে মাখিয়ে দিলে, তাই অন্য হাতে গন্ধ পাওয়া গেল।'

বিশ্বমামা হা-হা করে হাসতে-হাসতে বললেন, 'মোটেই না। হলো না। একী তুই বীজ পুঁতলি হাওড়ায় আর গাছ গজালো কলকাতায়' কস্তুরি কেন, পৃথিবীর কোনও গন্ধই এক হাতে লাগালে তারপর সারা দেহ ঘুরে সেটা অন্য হাতে পৌঁছতে পারে না।'

আমি আর বিলুদা পরস্পরের দিকে তাকালাম।—তা হলে?

বিশ্বমামা বললেন, 'বুঝতে পারলি না তো? আমার ডান হাতে ছিল কী, ওই কস্তুরিটা? আর অন্য হাতে? কিছুই না। আমায় যদি কেউ এই ম্যাজিকটা দেখাত, তা হলে আমি সেই ম্যাজিশিয়ানের বাঁ হাতের গন্ধ শুঁকে দেখতাম।'

বিলুদা বলল, 'তার মানে?'

বিশ্বমামা বললেন, 'এই যে কস্তুরিটা দেখছিস, এটাতে আসলে বেশি গন্ধই নেই। এর লাল চামড়া তুলে ফেলে জিনিসটা তুলে ফেলা হয়। তখনই ভালো গন্ধ বেরোয়। ওই জন্য হরিণরা যখন স্নান করে, কিংবা বৃষ্টিতে ভেজে, তখনই নিজের গায়ের গন্ধটা ঠিক-ঠিক পায়। খানিকটা কনসেনট্রেটেড কস্তুরির নির্যাস আমি আমার বাঁ হাতে লাগিয়ে রেখেছিলাম। ওই হাত দিয়ে যা ধরবো তাতেই গন্ধ হবে। ওই হাত দিয়ে আমি তোদের অন্য হাত দুটো ধরেছিলাম, মনে নেই!'

বিলুদা বলল, 'তুমি আমাদের ঠকিয়েছ?'

বিশ্বমামা বললেন, 'ঠকিয়েছি কী রে, এটাই তো ম্যাজিক। তা হলে চাইনিজ খাওয়া হল না। পাঁচখানা করে অঙ্ক কষতে হবে। অঙ্কগুলো যদি রাইট হয়, তখন না হয় চাইনিজ খাওয়ার কথা আবার ভেবে দেখা যাবে।

ম্যাজিশিয়ান বিশ্বমামা

বিশ্বমামা বললেন, ছোটবেলায় একটা ম্যাজিক দেখেছিলাম, বুঝলি! আজও সেটা ভুলতে পারিনি।

আমি বললুম, তুমি মোটে একটা ম্যাজিক দেখেছ? আমরা তো কত ম্যাজিক দেখেছি। পি সি সরকারের জাদুর খেলা দেখেছি অনেকবার।

বিশ্বমামা বললেন, আমিও কম ম্যাজিক দেখিনি। সব তো মনে থাকে না। সব মনে রাখার যোগ্যও নয়। এই একটা ম্যাজিকের কথা মনে খুব দাগ কেটে গিয়েছিল। আমরা তখন উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুর স্ট্রিটে থাকি। মিঃ ফক্স নামে একজন ম্যাজিশিয়ান ছিলেন, কালো রঙের প্যান্ট-কোট আর মাথায় একটা লম্বা টুপি পরতেন। আসলে কিন্তু বাঙালি, এরকম নাম নিয়েছিলেন ইচ্ছে করে। আমাদের ইস্কুলে একবার ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন, অনেক সময় তো বড় রাস্তার মোড়ে দাড়িয়েও হঠাৎ ম্যাজিক দেখাতে শুরু করতেন।

বিলুদা বলল, রাস্তার ম্যাজিশিয়ান? তার মানে তো এলেবেলে!

বিশ্বমামা বললেন, নারে, স্টেজে দাঁড়িয়ে ম্যাজিক দেখানোই বরং অনেক সোজা। সেখানে অনেক যন্ত্রপাতির কারসাজি থাকে। কিন্তু রাস্তায়, সকলের চোখের সামনে খালি হাতে ম্যাজিক দেখানোর কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশি।

বিলুদা বলল, খালি হাতে কেউ ম্যাজিক দেখায় না। আমি শুনেছি, ম্যাজিশিয়ানদের কোটের পকেটে সব সময় কিছু ম্যাজিকের জিনিসপত্র থাকে। ওরা যে তাসের প্যাকেট নিয়ে খেলা দেখায়, সেও তো সাধারণ তাস নয়।

বিশ্বমামা বললেন, তা অবশ্য ঠিকই বলেছিস। তবে ভালো ম্যাজিশিয়ানরা খালি হাতেও কিছু-কিছু খেলা দেখাতে পারে। সেটা হাতের কায়দা। মিঃ ফক্সের তেমন নাম ছিল না, কিন্তু সত্যি ভালো-ভালো ম্যাজিক দেখাতে পারতেন। কাচের গেলাস খেয়ে ফেলতেন, একটা রুমাল ঝেড়ে পায়রা বার করতেন, এক টাকার নোটকে একশো টাকার নোট করে দিতেন চোখের নিমেষে। এগুলো এমন কিছু না। কিন্তু আর একটা যে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন—

বিলুদা বাধা দিয়ে বলল, ম্যাজিকের গল্প শুনতে চাই না। তুমি একটা ম্যাজিক দেখাও।

বিশ্বমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, যাঃ, তবে বলব না! ম্যাজিক দেখতে চাস, আমাকে দেখাতে হবে কেন, চারপাশে তাকালেই তো দেখতে পাবি। এই যে ফোঁটা-ফোঁটা জলে সূর্য কিরণ পড়লে মস্ত বড় একটা রামধনু হয়ে যায় এক-এক সময়, সেটা একটা ম্যাজিক ন'? সেটা হল আকাশের ম্যাজিক। বটগাছের ফল দেখেছিস, এইটুকু একটা মেটে রঙের গুলির মতন, তার মধ্যে থেকে একটা বিশাল বটগাছ হয়, এটা ম্যাজিক বলে মনে হয় না? প্রকৃতির মধ্যে এরকম কত ম্যাজিক আছে।

আমি বিলুদার দিকে তাকিয়ে বললুম, আঃ, চুপ করো না। গল্পটা শুনতে দাও। বিশ্বমামা, তোমার মিস্টার ফক্সের গল্প বলো।

বিশ্বমামা বললেন, শুনবি? মিস্টার ফক্স অনেক ম্যাজিক দেখাতেন, কিন্তু একটা ম্যাজিকই আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। সেটা অবশ্য রাস্তার মোড়ে নয়, স্টেজেই দেখিয়েছিলেন। সেই ম্যাজিকটার নাম 'জাদু গাছ'! প্রথমে তিনি একটা হলদে পাতিলেবু হাতে নিয়ে সবাইকে দেখালেন। তারপর স্টেজের ওপর রাখা একটা টবে সেই লেবুটা আস্তই পুঁতে দিলেন। তারপর টবটার ওপর একটা কালো কাপড় চাপা দিয়ে কোটের পকেট থেকে বার করলেন একটা কাচের শিশি। তিনি বললেন, এর মধ্যে কী আছে

জানেন? এক রকম আশ্চর্য সার, অর্থাৎ ফার্টিলাইজার। পৃথিবীর আর কেউ এই সারের খবর জানে না। এই সার দিলে কী হয় দেখুন! তিনি কালো কাপড়টার মধ্যে হাতে ঢুকিয়ে সেই শিশি থেকে খানিকটা কী যেন ফেলে দিলেন। তারপর কালো কাপড়টা তুলতেই দেখা গেল, সেই টবে একটা পাতি লেবু গাছ গজিয়ে গেছে!

বিলুদা ঠোঁট উলটে বলল, এ আবার হয় নাকি?

আমি বললুম, চুপ!

বিশ্বমামা বললেন, চোখের সামনেই দেখলাম তো! স্টেজে আর কেউ আসেনি। এখানেই শেষ নয়। মিস্টার ফক্স গাছটায় আবার কালো কাপড় ঢাকা দিলেন। আবার শিশি থেকে কিছু ঢাললেন। এরপর কাপড়টা তুলতেই দেখা গেল, সেই গাছটায় পাঁচ-ছটা পাতি লেবু ফলে আছে। সত্যি-সত্যি লেবু, কাগজের নয়! আমরা হাত দিয়ে টিপে-টিপে দেখলাম।

বিলুদা বলল, এ আমি নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করব না।

বিশ্বমামা বললেন, তোরা সবজান্তা হয়ে গেছিস। আমি সত্যি খুব অবাক হয়েছিলাম। আমার তখন এগারো বছর বয়েস। এটুকু বুঝতে শিখেছি যে এক টাকার নোটকে একশো টাকার নোট করে ফেলা নিশ্চয়ই হাতের কারসাজি। এরকম হতে পারে না। যদি সত্যিই সম্ভব হতো, তা হলে মিস্টার ফক্স বড়লোক হয়ে যেতে পারত। তা তো হয়নি, লোকটি বেশ গরিবই ছিল, বুড়ো বয়সে ছেঁড়া কোট গায়ে দিত। কিন্তু ওই গাছ তৈরির ব্যাপারটায় আমার খটকা লেগেছিল। সার দিলে সব গাছই বাড়ে। মিস্টার ফক্স হয়তো এমন কোনও শক্তিশালী সার আবিষ্কার করেছেন, যাতে কয়েক মিনিটে গাছ বড় হয়ে যায়।

বিলুদা বলল, তা হলে তো খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যায় পৃথিবীতে। ধান গাছ পুঁতে ফসলের জন্য আর কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয় না। এক জমিতে একশো-দুশো বার চাষ করা যায় বছরে। আজকে একটা কলাগাছ পুঁতলে কালকেই এক ছড়া পাকা কলা পাওয়া যাবে। কোনও কিছুরই অভাব থাকবে না।

বিশ্বমামা বললেন, আমিও সেইরকম ভেবেছি। মিঃ ফক্স তো পাড়ার লোক, তাঁকে প্রায়ই জিগ্যেস করতাম, ওই গাছের ম্যাজিকটা কি সত্যি? উনি ধমক দিয়ে বলতেন, সত্যি না তো কী! আমি মিথ্যে কিছু দেখাই না, যা ভাগ এখান থেকে। তখন আমি গাছপালা নিয়ে পড়াশুনো করতে লাগলাম। আজ পর্যন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক বলেননি, একদিনে গাছ তৈরি করা যায়। তবে বীজ থেকে গাছ হতে কেন অনেক সময় লাগে, সেটা জেনেছি। তারপর অনেক বছর বাদে, মিস্টার ফক্স বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন, একদিন আমায় ডেকে আসল কথাটা ফাঁস করে দিলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, দ্যাখ, এখন তো আর কেউ আমাকে ম্যাজিক দেখাতে ডাকে না, তাই তোকে বলতে আর বাধা নেই। আসলে তিনটে টবের ব্যাপার। একটা খালি টব, একটাতে লেবুগাছ লাগানো টব, আর একটাতে লেবু গাছে লেবু ফলে আছে। আমার একজন সহকারী সেই টবগুলো বদলে-বদলে দেয়। স্টেজের একটা জায়গায় কাটা রাখতে হয়, স্টেজের নিচে সহকারীটি

লুকিয়ে বসে থাকে। আমি কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে আড়াল করে দাঁড়ালেই সে টব বদলে দেয়।

বিলুদা হাসিমুখে বলল, আমি আগেই ধরেছি! তখনই বলেছি, একদিনের মধ্যে, এমনকী দু-তিন দিনের মধ্যেও ধান থেকে গাছ বেরুনো কিছুতেই সম্ভব নয় কখনো! কেউ দেখেনি!

বিশ্বমামা এবার চোখ বুঁজে বললেন, সম্ভব!

বিলুদা বলল, অ্যাঁ!

বিশ্বমামা বললেন, মিস্টার ফক্সের এ ম্যাজিক আমি ভুলতে পারিনি বলে ওই নিয়ে অনেক গবেষণা করেছি। এখন আমি নিজেই একদিনে বীজ থেকে গাছ তৈরি করে দিতে পারি।

বিলুদা অবিশ্বাসের সুরে বলল, যাঃ! কী বলছ তুমি।

আমি বললুম, বুঝেছি! বুঝেছি! আজ তুমি এক বাটি জলের মধ্যে কতকগুলো ছোলা ভিজিয়ে রাখো। কালই সেই ছোলার মুখ থেকে কল বেরুবে। সেও তো বীজ থেকে গাছ হওয়া।

বিলুদা বলল, ওটা তো ফাঁকিবাজি। ছোলার কল আবার গাছ নাকি?

বিশ্বমামা হাসতে-হাসতে বললেন, নীলুটা প্রায় ধরে ফেলেছিল। ঠিক আছে, ছোলা নয়, অন্য ফলের বীজ থেকে গাছ তৈরি করে দিলে হবে তো? লেবু গাছ, কিংবা আম গাছ?

বিলুদা বলল, আম গাছ তৈরি করে দেখাতে পারো তো বুঝবো, সত্যিই তুমি ম্যাজিক জানো!

বিশ্বমামা বললেন, ঠিক আছে। আমার দুদিন সময় লাগবে। ততদিন মাটি তৈরি করব। এর মধ্যে বাজার থেকে একটা বেশ পাকা দেখে আম জোগাড় করো। আমটা যেন খুঁতো না হয়, একেবারে বোঁটা থেকে ছেঁড়া।

দুদিন বাদে সত্যিই ব্যাপারটা শুরু হল। বিশ্বমামাদেরই বাড়ির পেছনে একটা ছোট্ট বাগান আছে। তার এক কোণে খানিকটা মাটি কাদা-কাদা করা। তার ওপরে একটা কাচের ঢাকনা দেওয়া। সেটা তুলে, পাকা আমটার খোসা খানিকটা ছাড়িয়ে সাবধানে পুঁতে দেওয়া হল মাটিতে।

তারপর বিশ্বমামা বললেন, এবার শুরু হবে, শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই। দেখা যাক, কে জেতে!

বিলুদা বলল, তার মানে?

বিশ্বমামা বললেন, সেটা কাল বুঝিয়ে দেব।

আমি বললুম, কিন্তু বিশ্বমামা, তুমি যে চুপি-চুপি করে এখানে এসে একটা চারা গাছ পুঁতে দিয়ে যাবে না, সেটা কী করে বুঝব?

বিশ্বমামা বললেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার দুটো উপায় আছে। তোরা এখানেই সারাদিন, সারারাত বসে থাক, বসে-বসে পাহারা দে। কিংবা, আমার সঙ্গে-সঙ্গেই সর্বক্ষণ থেকে যা। আমার ওপরেই নজর রাখ।

আমরা দ্বিতীয়টাই বেছে নিলুম।

দপুরবেলা আমরা বিশ্বমামাকে নিয়ে গেলুম একটা সিনেমা দেখাতে। সন্ধের পর চিনে হোটেলে খাওয়া হল। সব বিশ্বমামারই পয়সায় অবশ্য। আমরা পয়সা কোথায় পাব?

খাওয়া-দাওয়া সেরে গঙ্গার ধারে বেড়ালুম খানিকক্ষণ। বিশ্বমামা চেঁচিয়ে গান ধরল। বিশ্বমামার গলায় একেবারে সুর নেই, বড্ড বাজে গান গায়। কিন্তু সে গান শুনেও আহা-আহা করতে হল। সিনেমা দেখিয়েছে, খাইয়েছে, এরপর কি আর গান খারাপ বলা যায়!

বাড়ি ফিরে খানিকক্ষণ গল্প হল, তারপর ঘুম।

ভোর হতে না হতেই বিশ্বমামাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলুম।

বিশ্বমামা চোখ কচলাতে-কচলাতে বললেন, আঃ, কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলি তো? সূর্যের আলো ফুটেছে? ভালো করে রোদ না উঠলে কিছুই হবে না।

আমরা জানলার ধারে বসে রইলুম রোদ্দুরের প্রতীক্ষায়। বিশ্বমামা আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

আটটা বাজার পর নিজেই উঠে পরে বললেন, চল, এবার দেখা যাক।

আমরা প্রায় দৌড়েই গেলুম বাগানে। তাজ্জব ব্যাপার! অবিশ্বাস্য! সত্যিই যেখানে আমটা পোঁতা হয়েছিল, সেখানে দুটি পাতা সমেত একটা আমের চারা ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

বিলুদা অনেকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল।

বিশ্বমামা মুচকি-মুচকি হেসে মাথা দোলাতে-দোলাতে বললেন, দেখলি, দেখলি আমার ম্যাজিক! এখানে কোনও স্টেজ নেই। আমার কোনও সহকারী নেই। খালি হাতের ম্যাজিক।

আমি জিগ্যেস করলুম, এরপর তুমি একদিনের মধ্যে এই গাছে আম ফলাতে পারো?

বিশ্বমামা বললেন, তাতো পারিই। সেটা করা এর চেয়ে সোজা। কিন্তু সেটা আমি করব না। এই পর্যন্তই যথেষ্ট।

বিলুদা এবার বলল, বিশ্বমামা, সত্যি তুমি তাক লাগিয়ে দিলে। এটা ম্যাজিক, আমাদের চোখের ভুল, না বাস্তব!

বিশ্বমামা বললেন, ম্যাজিক, তবে বিজ্ঞানের ম্যাজিক।

বিলুদা বলল, তা হলে আমাদের একটা বুঝিয়ে দাও। তুমি তো আর মিস্টার ফক্স নও!

বিশ্বমামা বললেন, মাটিতে কোনও বীজ পড়লে, সঙ্গে-সঙ্গে, কিংবা দু-চারদিনের মধ্যে তার থেকে গাছ বেরোয় না কেন, তা জানিস? বীজেরা ঘুমোয়। কেন ঘুমোয়? কোন মাটিতে পড়ল, সেখানকার আবহাওয়া কেমন, এসব তো বুঝে নিতে হবে; তাই বীজ কয়েকদিন ঘুমিয়ে নেয়। সব বীজ কিন্তু ঘুমোয় না। নীলু যে কাল ছোলার কল বেরুবার কথা বলেছিল, তার মানে ছোলা, মটর এরা ঘুমোয় না। অধিকাংশ বীজই কিন্তু মাটির মধ্যে কয়েকদিন ঘুমিয়ে থাকে।

আমি বললুম, তুমি সেই ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছ?

বিশ্বমামা বললেন, আমি নিজে ঠিক ভাঙাইনি। ওই যে কাল বললুম, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ! প্রত্যেকে বীজের মধ্যে ডরমিন বলে একটা জিনিস থাকে। এই ডরমিনের জন্যই বীজকে ঘুমোতে হয়। এদিকে বীজ মাটিতে থাকতে-থাকতে আর একটা জিনিস তৈরি হয়, তার নাম অকসিন। এই অকসিন এসে ডরমিনকে কাবু করে ফেলে, তার ফলেই বীজের ঘুম ভাঙে। অকসিন বেশি তৈরি হলেই বীজ থেকে গাছ বেরুতে শুরু করে। আমি এখানকার মাটি এমনভাবে তৈরি করেছি, যাতে প্রচুর অকসিন খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। সেই অকসিন এসে ডরমিনকে কাবু করে ফেলেছে, আর অমনি গাছ বেরিয়েছে।

বিলুদা বলল, ইউরেকা। দারুণ ব্যাপার। বিশ্বমামা, তুমি আর কাউকে বলবে না। এবার আমরা বড়লোক হয়ে যাব।

বিশ্বমামা অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার। তুই হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে পড়লি কেন?

বিলুদা বলল, বাঃ হব না? এরপর আমরা একটা বাগান কিনব। সেখানে রোজ-রোজ আম-জাম-পেয়ারা ফলাব। প্রতিদিন গাছ হবে, প্রতিদিন ফল পাব। রাশি-রাশি ফল। সেইগুলো বিক্রি করলে বড়লোক হতে কদিন লাগবে?

বিশ্বমামা বললেন, একে বলে গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল! এ জিনিস আমি শুধু একবারই করলাম, তোদের দেখাবার জন্য। আর কোনওদিন করব না। প্রকৃতির একটা নিজস্ব নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, তাকে আমি ভাঙতে যাব কেন? কারুকে বড়লোক করবার জন্য আমি বিজ্ঞানচর্চা করি না!

বিলুদা বলল, তুমি নিজেও তো বড়লোক হবে। এত কষ্ট করে তুমি এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করলে, এখন তার ফল ভোগ করবে না?

বিশ্বমামা বললেন, তুই 'গীতা' পড়েছিস?

বিলুদা বলল, গীতা? সে তো খুব খটোমটো বই, পড়তে গেলে দাঁত ভেঙে যায়!

বিশ্বমামা বললেন, কখনো কষ্ট করে পড়ে দেখিস, তা হলে তখন বুঝবি, কেন আমি ফল ভোগ করতে চাই না।

তারপর বিশ্বমামা হাঁটু গেড়ে বসে সেই কচি আমপাতায় খুব যত্ন করে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, এবার তোমরা নিজে-নিজে বড় হও। আমি আর তোমাদের বিরক্ত করব না। তোমাদের মায়ের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়েছি বলে লক্ষ্মীসোনা আমার ওপর রাগ করো না।

বিশ্বমামা এমনভাবে বলতে লাগলেন, যেন চারাগাছটা ওঁর সব কথা বুঝতে পারছে। বুঝে মাথা নাড়ছে একটু-একটু।

বিশ্বমামার হায় হায়

এবার অনেক দিন পর দেশে ফিরছেন বিশ্বমামা। পাঁচ মাস তো হবেই। সাধারণত এত বেশিদিন তিনি বাইরে থাকেন না। পৃথিবীর নানা দেশে বক্তৃতা করতে যান, ফিরে আসেন এক-দেড় মাসের মধ্যে। অন্য দেশে বিশ্বমামা বেশিদিন থাকতে চান না, তার কারণ বাঙালি রান্না ছাড়া অন্য কোনও খাবার তাঁর পছন্দ হয় না। কুমড়ো আর কুচো চিংড়ি দিয়ে পুঁই শাকের চচ্চড়ি তো আর কোনও দেশে পাওয়া যাবে না। পটলের দোরমাই বা অন্য দেশে কে তাঁকে তৈরি করে দেবে? বিশ্বমামা মাংস খান না একেবারেই।

দমদম এয়ারপোর্টে আমরা কয়েকজন বিশ্বমামাকে আনতে গেছি। ওপরের ভিজিটার্স গ্যালারি থেকে দেখলাম, বিশাল বিমানটা আকাশ থেকে নেমে মাটি ছুঁল। একটু বাদে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল যাত্রীরা। কিন্তু বিশ্বমামা কই? কয়েকশো লোক নামল, তবু বিশ্বমামাকে দেখা যাচ্ছে না।

সবাই নেমে যাওয়ার পর সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল একজন লম্বা লোককে।

আমার মাসতুতো দাদা বিলু বলল, ওই দেখ নাকেশ্বর ধপধপে!

বিশ্বমামার আড়ালে আমরা তাঁকে ওই নামে ডাকি। তাঁর সারা শরীরের মধ্যে নাকটাই প্রথম দেখা যায়। এত বড় নাক-ওয়ালা মানুষ বোধহয় আর কেউ দেখেনি। আর ওঁর গায়ের রংটা সাহেবদের মতন।

অন্য যাত্রীদের কাঁধে ঝোলানো মোটোসোটা ব্যাগ, হাতে কতরকম জিনিসপত্র। আর বিশ্বমামার সঙ্গে কিছুই প্রায় নেই। শুধু একহাতে একটা ছোট্ট প্যাকেট। নাকি একটা কার্ড বোর্ডের বাক্স? দশ টাকার সন্দেশ কিনলে যেরকম বাক্স দেয়, সেইরকম।

সেই বাক্সটাকে উঁচু করে ধরে খুব সাবধানে আসছেন বিশ্বমামা।

অন্যবার বিদেশ থেকে তিনি আমাদের জন্য নানারকম চকলেট নিয়ে আসেন আর বড়-বড় প্যাকেট ভর্তি ক্যান্ডি। এবার সেসব কিচ্ছু নেই? অন্য কোনও খাবার এনেছেন? ওইটুকু বাক্সে কী আর খাবার থাকতে পারে?

কাস্টমসের জায়গা পার হতে বিশ্বমামার অনেকটা সময় লাগবে। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত বিশ্বমামা একটা ট্রলিতে সুটকেস নিয়ে বেরুলেন, একহাতে সেই প্যাকেটটা উঁচু করে ধরা।

আমাদের দেখে বিশ্বমামা একগাল হেসে বললেন, কী রে নীলু, বিলু, পিলু তোরা সব কেমন আছিস?

বিলুদা সুটকেসটা তুলে নিয়ে নিজের গাড়িতে রাখল। আমাদের দিকে একবার চোখ টিপে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ সুটকেসটা বিশেষ ভারী নয়। এর আগে একবার কানাডা থেকে বিশ্বমামা এক সুটকেস ভর্তি পাথর এনেছিলেন। সেই সুটকেস বইতে বিলুদার জিভ বেরিয়ে গিয়েছিল।

আমার তক্ষুনি জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করছিল যে বিশ্বমামার হাতের ওই প্যাকেটটায় কী আছে। কিন্তু মা বলে দিয়েছিল, হ্যাংলামি করবি না। বিশ্বকে দেখেই চকলেট চাইবি না। তোরা বড় হয়েছিস, এখন একটু ভদ্রতা সভ্যতা শেখ।

ভদ্রতা রক্ষা করবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত।

কিন্তু গাড়ি চলতে শুরু করতেই পিলু ফস করে বলে উঠল, বিশ্বমামা, তোমার হাতের ওই বাক্সটায় কী আছে?

পিলু এখনও অনেক ছোট, ওর এখনও ভদ্রতা মানবার বয়স হয়নি।

বিশ্বমামা বললেন, আগে বল তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ফসিলের কী সম্পর্ক?

পিলুর মুখ শুকিয়ে গেল, আমি তাকালাম জানলার বাইরে।

বিশ্বমামার স্বভাবই এই, কোনও প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেবেন না। তার বদলে উলটে অন্য একটা প্রশ্ন করে বসবেন। বিদঘুটে প্রশ্ন। হ্যাঁ, বিদঘুটেই তো। ফসিল কাকে বলে তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

বিলুদা জিগ্যেস করল, বিশ্বমামা, তুমি তো এবারে সাহারা মরুভূমিতে ঘুরে আসবে বলেছিলে?

বিশ্বমামা বললেন, আমাদের কাছাকাছি এই পশ্চিম বাংলার মধ্যে কী কী জঙ্গল আছে রে?

এ প্রশ্নের উত্তর গেল।

আমি বললুম, সবচেয়ে কাছে সুন্দরবন।

বিশ্বমামা বললেন, না, ওটা চলবে না। ওখানে অনেক মানুষ থাকে। আর?

আমি বললুম, মেদিনীপুরে আছে কাঁকড়াঝোড়। উত্তরবঙ্গে অনেকগুলি জঙ্গল আছে। চাপরামারি, গরুমারা, হলং।

বিশ্বমামা বললেন, হ্যাঁরে বিলু, তোর পিসেমশাই বেঁচে আছেন?

বিলু বলল, না, তিনি স্বর্গে গেছেন।

বিশ্বমামা আবার জিগ্যেস করলেন, তাঁর বাড়িটায় এখন কে থাকে?

বিলু বলল, সেটা এখন এমনিই খালি পড়ে আছে। অনেকে বলে ওই বাড়িতে নাকি ভূত আছে।

বিশ্বমামা বললেন, গুড। ওইরকমই চাইছিলাম। চল, ওখানে যাব।

বিলু বলল, এক্ষুনি?

বিশ্বমামা বললেন, না, এক্ষুনি তো যাওয়া যাবে না। আজকের দিনটা বাড়িতে থেকে কাল সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

একথা শুনে আমি খুশি হয়ে উঠলুম। কলকাতায় বেশিদিন থাকতে আমার ভালো লাগে না। কাল বাইরে যাওয়া যাবে, একটা কিছু অ্যাডভেঞ্চার হবে।

বিলুদার পিসেমশাই ছিলেন পাগলাটে ধরনের মানুষ। ওঁর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর উনি বর্ধমানের জঙ্গল মহলে কীসব নাকি তন্ত্রসাধনা করতেন। একেবারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি, কাছাকাছি কোনও মানুষ নেই। তবে ওই বাড়িতে নাকি ভূত ছিল।

বিশ্বমামা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছেড়ে হঠাৎ ভূত ধরতে চান নাকি? বিদেশ থেকে এসেই অমনি যেতে চান জঙ্গলে!

বাড়িতে এসে বিশ্বমামা প্রথমেই তাঁর হাতের প্যাকেটটা সাবধানে রাখলেন আলমারির মাথায়।

তাঁর স্যুটকেসের মধ্যে আমাদের জন্য কিছু টফি আর ক্যান্ডি এনেছেন বটে। বেশি না।

ছোট্ট প্যাকেটটায় কী আছে তা যে জিগ্যেস করে তাকেই বিশ্বমামা হেসে বলেন, মনে করো ঘোড়ার ডিম!

পরদিন ভোরবেলা আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বিশ্বমামা অনেক কী যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিলেন। পৌঁছতে লাগল তিন ঘণ্টা। বর্ধমানের এই জঙ্গলটা তত বড় নয়, কিন্তু এক-এক জায়গায় খুব নিবিড়। বিলুদার পিসেমশাইয়ের বাড়িটা প্রায় ভাঙাচুরো অবস্থায় পড়ে আছে। ঘরগুলো ধুলো ভর্তি। আমরা তালা খুলে-খুলে ঢুকতে লাগলুম। এইরকম খালি-ফেলে-রাখা বাড়ির দরজা-জানলাও খুলে নিয়ে যায় চোরেরা। কিন্তু ভূতের ভয়েই বোধহয় চোরেরা এদিকে আসে না।

বিশ্বমামা বললেন, বাঃ! কাছাকাছি অনেক গাছ আছে, তাতেই আমার সুবিধে হবে!

দুটো ঘর সাফ করে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাল ডাল আরও সব রান্নার জিনিসপত্র সঙ্গে আনা হয়েছে। বিলুদা রান্না করতে পারে। আর আনা হয়েছে কয়েকটা কাঁচা আম। কাঁচা আম পাতলা করে কেটে নুন দিয়ে খেতে খুব ভালোবাসেন বিশ্বমামা।

সেইরকম একপ্লেট কাঁচা আম কেটে সাজিয়ে দিয়ে বিলুদা জিগ্যেস করল, বিশ্বমামা, এবার দয়া করে বলবে, তোমার ওই প্যাকেটটাতে কী আছে?

বিশ্বমামা বললেন, ভূতেরা এখানে থাকলেও কোনও ক্ষতি নেই। ভূতদের দাঁত থাকে না, তারা কামড়াতে পারবে না। ভূতেরা সব নিরামিষাশী!

বিলুদা বলল, কথা ঘোরাতে পারবে না। আমরা কেউ ভূত-টুত মানি না। তুমিও ভূত ধরতে আসোনি তা জানি। ওটাতে কী আছে আমাদের বলতেই হবে।

কেন, ঘোড়ার ডিমটা বুঝি পছন্দ হল না?

আমাদের কি ছেলেমানুষ পেয়েছ বিশ্বমামা?

তোরা কেউ ক্যামেরা এনেছিস?

আবার কথা ঘোরাচ্ছ, ঘোড়ার আবার ডিম হয় নাকি?

হয় না। তাই না? সেইজন্যই 'কিচ্ছু নেই' বোঝাতে বাংলায় বলে ঘোড়ার ডিম। আচ্ছা, হাতি ডিম হয়?

সবাই জানে হাতির বাচ্চা হয়!

বাঘ, সিংহ, ঘোড়া, হাতির এদের কারুরই ডিম হয় না!

এবার আমি বিদ্যে ফলাবার জন্য কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম হয় না, বাচ্চা জন্মায়। বললুম।

বিশ্বমামা বললেন, আমি যদি বলি, হাতির চেয়েও বড় কোনও প্রাণীর বাচ্চা হয় না। ডিম হয়?

আমি মাথা চুলকে বললুম, হাতির চেয়ে বড় প্রাণী? তাহলে কি তিমি মাছ?

বিশ্বমামা বললেন, বাগানে চল। আমার যন্ত্রপাতিগুলো সঙ্গে নে।

বিলুদা বলল, সেগুলো গাড়িতে আছে। নামানো হয়নি।

সবাই গেলাম গাড়ির কাছে। সেখান থেকে নামানো হয়নি।

সবাই গেলাম গাড়ির কাছে। সেখান থেকে নামানো হল অনেক জিনিসপত্র। একটা বেশ বড় ধরনের কাচের বাক্স দুহাতে তুলে বিশ্বমামা বললেন, এটা আমার বিশেষ আবিষ্কার, জানিস তো?

একটা কাচের বাক্সকে আবার আবিষ্কার করার কী আছে কে জানে! সেটাকে নিয়ে বিশ্বমামা বাগানের এক জায়গায় বসলেন। বাক্সটার সঙ্গে জুড়ে দিলেন কয়েকটা মোটর, আরও সব কী যেন।

সেই কাচের বাক্সটার একটা দরজা আছে। সেটাকে খুলে বিশ্বমামা রাখলেন তার সেই বহু মূল্যবান প্যাকেটটা।

আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন. এবারে আমি গোবি আর সাহারা মরুভূমিতে কতকগুলি ফসিল দেখতে গিয়েছিলাম জানিস তো।

তারপর পিলুর দিকে ফিরে বললেন, 'বরাসপোরাস টাগারোই' কী জানিস না? এক ধরনের ফসিল। ডাইনোসরের ফসিল। পাওয়া গিয়েছিল গোদাবরী নদীর কাছে। ডাইনোসররা যেমন অতিকায় প্রাণী, সেরকম লেখক-কবিদের মধ্যে অতিকায় মানে সবচেয়ে বড় কে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইংরিজিতে বলে রবীন্দ্রনাথ টেগোর, তার থেকে টাগোরাই! রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে ওই ডাইনোসরের ফসিলের নাম রাখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নামে।

এবার বিশ্বমামা খুব সাবধানে প্যাকেটটা খুললেন। আমরা হুমড়ি খেয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। দেখে কিছুই বোঝা গেল না। অনেকটা লম্বাটে চমচমের মতন একটা জিনিস। শক্তিগড়ের ল্যাংচার মতন। কিন্তু সেটা যে খাওয়ার জিনিস নয়, তা নিশ্চিত।

আমি জিগ্যেস করলাম, এটা কী?

বিশ্বমামা বললেন, এখনও বুঝলি না, নীলু? এটা একটা ডিম

ডিম? যাঃ কী বলছ। ডিম কখনো লম্বা হয়?

কেন হবে না? এটা যে প্রাণীর ডিম, সেটাও যে খুব লম্বা।

কোন প্রাণীর ডিম!

গোবি মরুভূমিতে ডাইনোসরের ফসিল, অর্থাৎ জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল। সেটা দেখে বোঝা গিয়েছিল ওদের ডিম কেমন হয়। তারপর হঠাৎ এবারে সুইজারল্যান্ডে ম্যাটারহর্ন পাহাড়ের বরফের মধ্যে এই ডিমটা আমি আবিষ্কার করেছি! বরফের অনেক

নিচে ছিল, তাই এটা নষ্ট হয়নি। খুব সম্ভবত একটা ফুটিয়ে বাচ্চা বের করা যেতে পারে। এই কাচের বাক্সটা হচ্ছে একটা নতুন ধরনের ইনকিউবেটর। এটার মধ্যে থাকলে শুধু যে ডিম ফোটানো যাবে তাই-ই না, বাচ্চাটাকে অনেক তাড়াতাড়ি বড় করা যাবে।

আমি চোখ বড়-বড় করে বললাম, এটা থেকে ডাইনোসর জন্মাবে? ওরে সর্বনাশ!

বিশ্বমামা বললেন, ভয়ের কী আছে? ডাইনোসর আসলে কী বল তো? খুব বড় সাইজের টিকটিকি! একটা টিকটিকিকে এক হাজার গুণ বড় করে মনে ভাব! টিকটিকি কি মানুষকে কামড়ায়? বেশিরভাগ ডাইনোসরই ঘাসপাতা এইসব নিরামিষ খেত। যেসব জন্তু নিরামিষ খায়, তারা চট করে মানুষকে কামড়ায় না। হাতির কথা ধর, হাতি মানুষকে কক্ষনো কামড়ায় না। মানুষ বেশি বিরক্ত করলে হাতি তাকে শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারে।

আমি বললাম, এখনকার পৃথিবীতে একটা বিরাট ডাইনোসর জন্মাবে, তা কি সম্ভব?

বিশ্বমামা বললেন, সম্ভব কি অসম্ভব তা একটু পরেই বোঝা যাবে।

বিশ্বমামা একবার ইনকিউবেটরটা চালু করে দিলেন। তারপর অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড ঘটতে লাগল।

দশ মিনিট বাদেই ফট করে ডিমটা ফেটে গেল। ফাটার শব্দ হল রীতিমতন। আমরা ঝুঁকে দেখলুম, তার মধ্যে কী একটা কিলবিল করছে।

বিশ্বমামা আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলেন, বেঁচে আছে, বেঁচে আছে!

আধঘণ্টার মধ্যেই সেই জিনিসটা মাথা তুলল। ঠিক টিকটিকির মতনই মাথা।

আরও আধঘণ্টার মধ্যে সেটা আরেকটু বড় হতে টিকটিকির বদলে মনে হল গিরগিটি!

বিশ্বমামা ফিসফিস করে বললেন, ব্রন্টোসরাস। এরা খুব নিরীহ! সারা পৃথিবী চমকে যাবে। এটার জন্য হাওড়া স্টেশনের সাইজের একটা খাঁচা বানাতে হবে।

বিলুদা বলল, আমরা কি চোখের সামনে বিবর্তন দেখব!

বিশ্বমামা বললেন, দেখ না কী হয়!

সেই গিরগিটিটা ক্রমশ বড় হতে লাগল। পিঠের দিকটা উঁচু হয়ে গেল আর লেজটা লম্বা হল অনেকখানি!

এক সময় সেই প্রাণীটার মাথা ঠেকে গেল কাচের বাক্সটা ফাটিয়ে ফেলবে!

পিলু ভয় পেয়ে বলল, ওরে বাবা, আমি পালাচ্ছি!

এরপরই অদ্ভুত একটা ব্যাপার হতে লাগল। সেই প্রাণীটা আর বড় হওয়ার বদলে ছটফট করতে লাগল কাচের বাক্সের মধ্যে। যেন ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। গায়ে যেন কিছু ফুটছে। যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিল কয়েকবার।

বিশ্বমামা ইনকিউবেটরের ইলেকট্রনিক চার্জ বন্ধ করে দিলেন।

প্রাণীটা তবু গড়াগড়ি দিতে-দিতে কুঁকড়ে যেতে লাগল।

পিলু বলল, ছোট হয়ে যাচ্ছে। আবার ছোট হয়ে গেল!

সত্যিই তাই, কুঁকড়ে-মুকড়ে ছোট হতে-হতে সেটা আবার একটা টিকটিকির মতন হয়ে গেল।

বিশ্বমামা হতাশ হয়ে বললেন, বিবর্তনবাদ! বিবর্তনবাদ! এখনকার পৃথিবীতে আর ডাইনোসর জন্মাতে পারবে না! সব ডাইনোসর টিকটিকি হয়ে গেছে।

আমরা এত অবাক হয়ে গেছি যে কেউ আর কথা বলতে পারছি না।

বিশ্বমামা আবার আর্তনাদ করে বললেন, ক্যামেরা আনলি না? ছবি তুলে রাখবি না? অনেকটা বড় হয়েছিল। সবাইকে ছবি তুলে দেখাতাম! হায়, হায়, হায়!

ক্যামেরা ছিল বিলুদার গাড়িতে। কিন্তু আমার সে কথা মনেই পড়েনি। সত্যি একটা টিকটিকির মতন প্রাণী বড় হতে-হতে ডাইনোসরের মতন চেহারা নিচ্ছিল। কেউ কি একথা বিশ্বাস করবে?

ছবি তোলা হল না বলে বিশ্বমামা মাথা চাপড়ে হায়-হায় করতে লাগলেন।

নীল রঙের মানুষ

তখন খুব ভোর। ভালো করে আলো ফোটেনি! একটু-একটু অন্ধকার আর একটু-একটু আলো মিশে একটা শরবতের রং তৈরি হয়েছে। শুধু আকাশের পূর্ব দিকটা সামান্য লালচে। একটু পরেই সূর্য উঠবে।

রণজয় বিশ্বাস নামে একজন যুবক সেই সময় নদীর ঘাটে গিয়েছিল। রণজয় প্রত্যেকদিনই খুব ভোরে ঘুমথেকে ওঠে। তারপর একা-একা নদীতে চলে আসে। তার বাড়ি থেকে নদী প্রায় দু-মাইল দূর। রণজয়ের খুব মাছ ধরার শখ। সে সারাদিন তো মাছ ধরেই, রাত্তির বেলাও নদীতে একটা ছিপ ফেলে রেখে আসে। ভোরবেলা এক একদিন গিয়ে দেখতে পায়, তার বঁড়শিতে একটা মস্তবড় মাছ ধরা পড়ে আছে।

সেদিন রণজয় নদীর দিকে এগোচ্ছে, এমন সময় আকাশে ফট্ করে একটা শব্দ হল। শব্দটা খুব জোর নয়, অনেকটা হাউই বাজি ফাটার শব্দের মতন। রণজয় ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, তার ঠিক মাথার ওপরের আকাশে. অনেক উঁচুতে কী যেন একটা জিনিস ফেটে গিয়ে খুব আলো আর আগুন বেরুচ্ছে। জিনিসটা এত উঁচুতে যে কোনও বাজি অতদূরে উঠতে পারে না। তা ছাড়া এখন তো কোনও পুজো-টুজো নেই, কে আর এখন গ্রামের আকাশে বাজি ফাটাবে!

রণজয় জানে অনেক সময় আকাশে এরোপ্লেনে আগুন ধরে যায়, তারপর সবসুদ্ধু ভেঙে পড়ে। প্রায়ই খবরের কাগজে এরকম খবর থাকে। সেই রকমই একটা কিছু হল নাকি? রণজয় আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

যদিও খুব উঁচুতে, তবু সেই জিনিসটা ঠিক এরোপ্লেন মনে হয় না। একটা বিরাট গোল জিনিস। ফটফট করে শব্দ হচ্ছে আর সেটার এক-একটা টুকরো ভেঙে-ভেঙে ছিটকে

যাচ্ছে। যদি হঠাৎ একটা টুকরো মাথায় এসে পড়ে, সেই ভয়ে রণজয় দৌড়ে তেঁতুল গাছের নীচে দাঁড়াল। তবু সে ওপরের দিকে না তাকিয়ে পারল না।

এরপর সে আর একটা আশ্চর্য জিনিস দেখল। সেই গোল জিনিসটা যখন একেবারে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল, তখন দেখা গেল, সেটা থেকে বেরিয়ে কয়েকজন মানুষ হাওয়ায় ভাসছে। এত দূর থেকে তাদের খুবই ছোট দেখালেও বোঝা যায়, ওগুলো পাখি নয়।

সেই আকাশের জ্বলন্ত টুকরোগুলো ছিটকে কোনটা কোথায় চলে যাচ্ছে তার ঠিক নেই, শুধু একটা টুকরো কামানের গোলার মতন জ্বলতে-জ্বলতে এসে পড়ল নদীতে। অনেকখানি জল ছিটকে উঠল আর জায়গাটা এমন ধোঁয়ায় ভরতি হয়ে গেল যে দু-এক মিনিটের মধ্যে রণজয় চোখে কিছুই দেখতে পেল না। তারপর একটু পরিষ্কার হতেই দৌড়ে গেল নদীর ধারে। দেখল, নদীর মাঝখানে এক জায়গায় জলে খুব ভুড়ভুড়ি কাটছে আর একটা লোক যেন ডুবে যাচ্ছে সেখানে। লোকটার আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু একটা হাত বেরিয়ে আছে জলের বাইরে, সেই হাতে কী যেন একটা গোল মতন জিনিস ধরা। আগুনে পুড়ে যাবার জন্যেই বোধহয় লোকটার হাতের রং মিশমিশে কালো।

রণজয় খুব ভালো সাঁতার জানে। একজন লোক ডুবে যাচ্ছে দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু রণজয় উদ্ধার করতে পারল না লোকটাকে। সাঁতরে নদীর মাঝখানে যাবার আগেই লোকটা ডুবে গেল। নদীটা খুব বড় নয়, কিন্তু জোয়ারের সময় খুব জল থাকে। কাল রাত্রেই জোয়ার এসেছে। রণজয় ডুবে ডুবে অনেক খুঁজল, কিন্তু লোকটির কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। তবে, রণজয় দেখল, সেখানে সাদা রঙের একটা বল ভাসছে। এই বলটাই লোকটার হাতে ধরা ছিল। লোকটা ডুবে গেলেও বলটা ডোবেনি। রণজয় সেটা ধরে ফেলল।

বলটা খুব বড় নয়, অনেকটা ক্রিকেট বলের মতন। চকচকে কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি, ভেতরটা ফাঁপা। জিনিসটা খুব সুন্দর, তাই রণজয় সেটা নিয়ে আবার ফিরে আসতে লাগল তীরের দিকে। একটা লোক তার চোখের সামনে ডুবে গেল, এজন্য তার মন খারাপ লাগল। পুলিসকে বোধহয় খবর দেওয়া উচিত—বড়-বড় জাল ফেলে যদি দেহটা পাওয়া যায়।

রণজয় আবার আকাশের দিকে তাকাল। সেই কয়েকজন এখনো সেখানে ওড়াওড়ি করছে। মোট পাঁচজন। পিঠে প্যারাসুট বাঁধা নেই অথচ লোকগুলো আকাশে পাখির মতন ভাসছে কী করে—এই ভেবে রণজয় আশ্চর্য হচ্ছিল, এমন সময় বহুদূর থেকে আর একটা গোল মতন জিনিস বিদ্যুৎবেগে সেখানে উড়ে এল। তার একটা দরজা খুলে যেতেই সেই পাঁচজন লোক ঢুকে গেল তার মধ্যে। সেটা আবার মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে।

রণজয় খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে ভিজে গায়ে বসে রইল নদীর ঘাটে। কী হয়ে গেল ব্যাপারটা? গোল মতন জিনিসগুলো কী? মানুষ আকাশে ভাসে কী করে? ওরা কোথা থেকে এল, কোথায় চলে গেল? ওদের মধ্যে একজন আবার জলে ডুবে গেল কেন? সব ব্যাপারটাই কি স্বপ্ন?

কিন্তু স্বপ্ন হতে পারে না। রণজয়ের হাতে রয়েছে সেই বলটা। এরকম বল সে আগে কখনো দেখেনি। জিনিসটা লোহার নয়, অ্যালুমিনিয়ামেরও নয়। জিনিসটা এমনই চকচকে যে সেটার দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যেতে চায়। এ-রকম জিনিসের বল রণজয় কখনো দেখেনি। জিনিসটা যে খুব দামি সেটা বুঝতে পেরে রণজয় ঠিক করল, বলটার কথা এখন সে আর কারুকে বলবে না।

রণজয়ের এবার মনে পড়ল তার ছিপটার কথা। সেটা ধরে একটু টান দিতেই বোঝা গেল মাছ আটকেছে। তবে, বেশি বড় মাছ নয়, ছিপটা বেশ হালকা লাগছে। সে এক টান দিতেই মাছটা এসে পাড়ের ওপর পড়ল।

এবার রণজয়ের আরও অবাক হওয়ার পালা। একটা বিরাট বড় কাতলা মাছ, অন্ততঃ চার কেজি হবেই। এত বড় মাছ অথচ এত হালকা লাগল কী করে? ভাগ্যিস সুতো ছিঁড়ে যায়নি। রণজয় দুহাত দিয়ে মাছটা তুলে ধরল। তবু খুব হালকা লাগছে। এত বড় মাছ এত হালকা হয়! যাই হোক, বলটাকে প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে রেখে রণজয় মাছটা নিয়ে বাড়ি ফিরল।

রণজয়ের বাবা একজন চাষি। রণজয় কিছুটা লেখাপড়া শিখলেও সে কোনও চাকরির চেষ্টা না করে বাবার চাষবাসের কাজেই সাহায্য করে। তাছাড়া সে গ্রামের ফুটবল টিমে ফুটবল খেলে। সামনের বছর তার বিয়ে হবার কথা।

রণজয়দের বাড়িটা মাটির তৈরি হলেও দোতলা। একে বলে মাঠকোঠা। বেশ পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে। বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ঢোকার সময় সে মাথায় একটা ধাক্কা খেল। রণজয় বেশ লম্বা হলেও নিজের বাড়ির দরজায় কোনওদিন আগে ধাক্কা খায়নি।

মাছটা উঠোনে ফেলে সে চেঁচিয়ে বলল, মা দেখো, আজ কত বড় একটা মাছ পেয়েছি।

রণজয়ের মা কাছেই ছিলেন, মাছটা দেখে খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন, বাবাঃ, এত বড় মাছ তো অনেকদিন দেখিনি! চার-পাঁচ সের হবে বোধহয়। তোর কাকার বাড়িতে খানিকটা পাঠিয়ে দেব, আর তোর মেসোমশাইয়ের বাড়িতে।

রণজয় বলল, কিন্তু এত বড় দেখতে হলে কী হয়। মাছটা কিন্তু হালকা!

মা মাছটা তোলার চেষ্টা করে বললেন, বলিস কী! হালকা কোথায়! এ তো দারুণ ভারী।

রণজয় অবলীলাক্রমে এক হাতে মাছটা ধরে উঁচু করে বলল, এই যে, দেখছ, কী রকম হালকা?

মা অবাক হয়ে রণজয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মাছটা দেখছেন না, রণজয়ের মুখখানা দেখছেন। তারপর বললেন, তোকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে, একটু বেশি লম্বা দেখাচ্ছে কেন রে?

রণজয় হেসে বলল, আমি কি এক সকালের মধ্যেই লম্বা হয়ে গেলাম নাকি?

মা বললেন, কী জানি বাপু। কী রকম যেন লাগছে। তুই কোথাও পড়ে-টড়ে গিয়েছিলি নাকি? কপালে নীল রং হয়ে গেল কী করে?

রণজয় একটু আগে ধাক্কা খেয়েছে মাথার মাঝখানে। তার কপালে নীল রং হবে কী করে! সে অবিশ্বাস করে কপালে হাত দিল। না, কপালে কোনও ব্যথা-ঠ্যথা নেই তো!

মা বললেন, যা আয়নায় দেখে আয়! অনেকখানি নীল রঙ হয়ে গেছে!

রণজয় উঠে গেল দোতলার ঘরে। আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে দেখল সত্যিই তার কপালে একটা হালকা নীল রঙের ছাপ পড়েছে। শুধু কপালে নয়, তার মুখে আর গলাতেও যেন হালকা নীল রঙের ভাব। সহজে বোঝা যাবে না, কিন্তু রণজয় আয়নার কাছে মুখ এনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আর মায়েরা তো ছেলেদের শরীরের যে-কোনও বদল দেখলেই বুঝতে পারেন।

রণজয় হাত দিয়ে ঘষলো কপালটা। হাতে কোনও রং লাগল না। তা হলে কপালটা নীল হয়ে গেল কী করে?

আর একটা ব্যাপারেও রণজয় খুব অবাক হয়ে গেল। দেয়ালে ঝোলানো আয়নাটার সামনে দাঁড়ালেই সে তার মুখ দেখতে পেয়েছে সব সময়, কিন্তু এখন তাকে ঝুঁকে নিচু হয়ে দেখতে হচ্ছে। আয়নাটা তো ঠিক এক জায়গাতেই আছে। তাহলে সে কি হঠাৎ খানিকটা লম্বা হয়ে গেল? এ আবার কী অদ্ভুত ব্যাপার!

রণজয় পকেট থেকে সেই বলটা বার করল। বলটাকে দেখলেই মনে হয় খুব দামি। জিনিসটা এত চকচকে যেন মনে হয় ওর গা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। তা ছাড়া, মনে হচ্ছে যেন ওটার মধ্যে কিছু একটা শব্দ হচ্ছে। ভালো করে শোনার জন্য রণজয় বলটা কানের কাছে নিয়ে এল। ঘড়ির মতন ঝিক-ঝিক শব্দ হচ্ছে ঠিকই, তবে খুবই আস্তে। তাহলে এটা বল নয়, কিছু একটা যন্ত্র।

সেটা হাতে নিয়ে রণজয় ধপ করে খাটের ওপর বসে পড়ে চিন্তা করতে লাগল। ব্যাপারটা তা হলে কি দাঁড়াল? আকাশ থেকে একটা লোক এই যন্ত্রটা হাতে নিয়ে খসে পড়ল নদীতে। বাকি লোকগুলো হাওয়ায় উড়ছিল, তারপর একটা গোল জিনিস এসে নিয়ে গেল তাদের। এসব কিছুর মানে কী?

সেদিন বিকেলের মধ্যেই রণজয় প্রায় সাত ইঞ্চি বেশি লম্বা হয়ে গেল, আর তার মুখের রঙ হয়ে গেল রীতিমতো নীল। তার বুক, হাত পায়েও নীল-নীল ছোপ। তার বাড়ির সবাই এই ব্যাপার দেখে খুব ভয় পেয়ে গেছে। নিশ্চয়ই কোনও কঠিন অসুখ হয়েছে রণজয়ের। যদিও অসুখের অন্য কোনও চিহ্ন নেই। তার গায়ের জোর হঠাৎ বেড়ে গেছে অসম্ভব। সে একটা লোহার সিন্দুকও এক হাতে তুলতে পারে। সকালবেলায় অত বড় মাছটা ওই জন্যই তার কাছে অত হালকা লেগেছিল।

নীল রঙের মুখ নিয়ে লজ্জায় সেদিন রণজয় আর বাড়ি থেকে বেরুলে না। শুয়ে-শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। সে কি স্বপ্ন দেখছে, না সত্যিই এসব কিছু হয়েছে? কিন্তু বলের মতন যন্ত্রটা যে হাতে রয়েছে, সেটা তো স্বপ্ন নয়! এই বলটার কথা রণজয় কারুকে এখনো বলেইনি। একবার তার মনে হল, এই বলটা নিশ্চয়ই অপয়া, এটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই নিশ্চয়ই আবার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু জিনিসটা এত সুন্দর যে কিছুতেই ফেলতে ইচ্ছে করে না।

রণজয়ের বাবা ডাক্তার ডাকতে চেয়েছিল, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয়নি। ডাক্তার এসে তাকে দেখে গেলেই সবাই জেনে যাবে তার কথা। তার মুখের রং নীল হয়ে গেছে শুনেই সবাই দেখতে আসবে তাকে। সবাই তাকে দেখে যদি হাসে! সে পরে কলকাতায় গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাবে।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে রণজয় সেদিন নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে রইল। যতবার সে আয়নায় মুখ দেখেছে, ততবার মনে হয়েছে, তার মুখখানা বেশি রকম নীল হয়ে যাচ্ছে। তবে লম্বায় আর বাড়েনি। সেই সাত ইঞ্চিতেই থেমে আছে।

বলটাকে সে রেখেছে তার টেবিলের ড্রয়ারে। রাত্তিবেলা চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর রণজয় খাটে শুয়েও শুনতে পাচ্ছে সেটার ঝিক-ঝিক শব্দ। শব্দটা যেন বেড়ে যাচ্ছে মনে হয়।

রণজয় আর একবার উঠে ড্রয়ার খুলে বলটাকে দেখল। এবার আবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। বলটা আপনি-আপনি ঘুরছে আর সেটা থেকে ঝলকে-ঝলকে আলো বেরুচ্ছে। ঠিক যেন কীসের সিগন্যাল দিচ্ছে। সেটাতে হাত দিতে রণজয়ের ভয়-ভয় করতে লাগল। এটা কোনও সাংঘাতিক যন্ত্র নয় তো? কিংবা বোমা-টোমা যদি হয়? আজকাল মানুষ কত রকম যন্ত্র বানাচ্ছে। আমেরিকান আর রাশিয়ানরা মহাশূন্যে কত রকম পরীক্ষা যে চালাচ্ছে, তার ঠিক নেই। সেই রকমই একটা কোনও রকেট ভেঙে পড়েনি তো? কিন্তু এই যন্ত্রটা হাতে নিয়ে যে-লোকটা জলে ডুবে যাচ্ছিল, সে তো সাহেব নয়। তার গায়ের রং কালো ছিল।

হঠাৎ রণজয়ের খেয়াল হল, বোধহয় লোকটা কালো ছিল না, ওর গায়ের রং ছিল নীল। ভোরবেলার পাতলা আলোয় রণজয় ঠিক দেখতে পায়নি। অজানা ভয়ে শিউরে উঠল রণজয়। আলো জ্বেলে আবার মুখটা দেখল। সে এখন পুরোপুরি নীল রঙের মানুষ হয়ে গেছে।

হঠাৎ রাগের চোটে রণজয় বলটা তুলে নিয়ে এক আছাড় মারলো মেঝেতে। কিন্তু ভাঙলো না। একটু তুবড়েও গেল না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, সেটা মাটিতে লাগলেও শব্দ হল না একটুও। রণজয় আরও কয়েকবার বলটা নিয়ে ড্রপ খাওয়ালো। না, এটাতে শব্দ হয় না। এটা সত্যিই একটা অদ্ভুত জিনিস। রণজয় ঠিক করল, এই যন্ত্রটা নিয়ে কোনও বৈজ্ঞানিককে দেখাতে হবে। তাদের গ্রামেরই একটি ছেলের নাম অভিজিৎ কর। সে বিজ্ঞানে খুব ভালো ছাত্র, এখন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা করে। রণজয় কালই তার কাছে সব কথা খুলে বলবে।

কী মনে হল, রণজয় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল বলটা হাতে নিয়ে। নেমে এল নিচে। মাঝ রাত, সবাই এখন ঘুমোচ্ছে। উঠোনে একটা শাবল পড়েছিল, সেটা তুলে নিয়ে চলে এল বাড়ির বাইরে। খানিকটা দূর গিয়ে একটা তাল গাছের নিচে বসে পড়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। বেশ বড় একটা গর্ত খোঁড়ার পর বলটাকে তার মধ্যে রেখে মাটি চাপা দিল। গর্তটাকে ভালো করে বুজিয়ে নিশ্চিন্ত হল রণজয়। মাটিতে কান ঠেকিয়ে সে দেখতে চাইল, শব্দটা আর শোনা যায় কিনা! না, আর কোনও শব্দ নেই।

রণজয় উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলোটা ঝেড়ে বাড়ি ফেরার জন্য যেই পা বাড়িয়েছে অমনি——।

রণজয় বেশ সাহসী ছেলে। ভূতের ভয় পায় না। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে তার দুটো হাত যখন কেউ চেপে ধরল, তখন ভয়ে তার মুখ দিয়ে আঁ-আঁ শব্দ বেরিয়ে এল। দুপাশে তাকিয়ে সে প্রথম কাউকে দেখতে পেল না। তারপর দেখল, দু-তিনজন লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গায়ের রং কুচকুচে কালো কিংবা নীল। তাদের একজন সরু পেনসিলের মতন একটা টর্চ জ্বালল, তারপর মাটি খুঁড়তে লাগল। একটুক্ষণের মধ্যেই সে বার করে ফেলল সেই বলটা। বলটা থেকে তখনো সেইরকম আলোর সিগন্যাল বেরুচ্ছে।

আর দুজন লোক রণজয়কে এমন চেপে ধরে আছে, যেন সে একটা চোর। কিন্তু রণজয় তো কিছু চুরি করেনি। একবার তার ইচ্ছে হল, চেঁচিয়ে গ্রামের লোকদের ডাকে। তারপর ভাবল, দেখাই যাক না, কী হয়।

লোকগুলো তার হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। রণজয় বুঝতে পারল ওরা যাচ্ছে নদীর দিকে। নদীর পাশের ফাঁকা মাঠে একটা বিরাট গোল জিনিস রয়েছে। আগের দিন আকাশে রণজয় এই রকমই একটা গোল জিনিস দেখেছিল। সেই জিনিসটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন বেশ লম্বা মতন নীল রঙের মানুষ। তারও হাতে একটা পেনসিলের মতন আলো। রণজয়ের আর কোনও সন্দেহ রইল না যে এরা এ পৃথিবীর মানুষ নয়।

যে তিনজন লোক রণজয়কে ধরে এনেছিল তারা লম্বা লোকটিকে কিচিরমিচির ভাষায় কী যেন বলল। লম্বা লোকটি বেশ খুশি হয়েছে মনে হল। সে রণজয়ের দিকে ফিরে তার চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল। লোকটা কোনও কথা উচ্চারণ করল না। কিন্তু রণজয়ের মনে হচ্ছে, লোকটা ঠিক কথা বলছে তার সঙ্গে। অর্থাৎ লোকটা মনে-মনে কথা বলছে, রণজয় ঠিক বুঝতে পাচ্ছে।

লোকটা বলছে, হে পৃথিবীর মানুষ, নমস্কার। আপনি যে আমাদের যন্ত্রটা সাবধান করে রেখেছিলেন, সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

রণজয় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লোকটির দিকে।

লোকটি আবার মনে-মনে বলল, হে পৃথিবীর মানুষ, আপনার কোনও ভয় নেই। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

রণজয় এবার জিগ্যেস করল, আপনারা কে?

লোকটি বলল, আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। আপনাদের চন্দ্র সূর্য থেকেও অনেক দূরে সাত নম্বর গ্রহবলয় থেকে।

লোকটি তারপর সেই গোল জিনিসটার একটা দরজা খুলে বলল, আসুন, আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

রণজয় বলল, কেন, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব কেন? আপনাদের জিনিস তো ফেরত পেয়ে গেছেন।

লোকটি বলল, আপনি আর এখানে থেকে কী করবেন? আপনি তো আর পৃথিবীর মানুষ নেই। আপনি তো এখন আমাদেরই একজন হয়ে গেছেন।

রণজয় রেগে গিয়ে বলল, তার মানে?

লোকটি বলল, আপনি রাগ করছেন কেন? আপনি নিজের চেহারা দেখেছেন? আপনার চেহারা বদলে গেছে। আপনি আমাদের যন্ত্রটা ছুঁয়েছিলেন, সেটা থেকে অতি নীল রশ্মি আপনার গায়ে লেগেছে। আপনাকে দেখলে পৃথিবীর মানুষ এখন ভয় পাবে। আপনাকে এখন আর এখানে কেউ আপন করে নেবে না! আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে।

রণজয় বলল, না, আমি যাব না। আমার বাবা-মাকে কিছু না বলে আমি চলে যাব আপনাদের সঙ্গে? তা হয় নাকি?

লোকটি বলল, বাবা মা কি? বাবা মা কাকে বলে?

রণজয় বলল, বাবা-মা কাদের বলে আপনি জানেন না? আপনি কি রকম মানুষ?

লোকটি হাসতে হাসতে বলল, আমি তো মানুষ নই। আমাদের ওখানে বাবা-মা বলে কিছু নেই!

রণজয়ের পাশের একজন লোক এই সময় তাকে ঠেলে সামনের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। রণজয় এক ঝটকা দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, খবরদার! আর আমার কাছে গায়ের জোর দেখাতে আসবেন না।

মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটি কোমর থেকে একটা পিস্তলের মতন অস্ত্র টেনে বার করল। লম্বা লোকটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত তুলে নিষেধ করল তাকে। রণজয়ের চোখে চোখ রেখে বলল, আমাদের সঙ্গে জোর করে লাভ নেই। এই দেখুন।

লোকটি তার হাতের পেনসিলের মতন আলোটা একটা তেঁতুল গাছের দিকে ফিরিয়ে একটা বোতাম টিপল। সেটা থেকে এক ঝলক আগুন বেরিয়ে চোখের নিমেষে পুড়িয়ে দিল অতবড় গাছটা। অর্থাৎ ওই রকমভাবে ওরা রণজয়কেও পুড়িয়ে ফেলতে পারে।

লোকটি আবার বলল, আপনাকে আমরা মারতে চাই না। আমাদের একজন এই পৃথিবীতে জলে ডুবে মারা গেছে, তাই এখান থেকে আমরা একজনকেও নিয়ে যাব, তাতে দোষের তো কিছু নেই। আপনি আপত্তি করছেন কেন? আপনাকে আমরা যত্ন করেই রাখব।

রণজয় তবু জোর দিয়ে বলল, আমি যাব না। আমি কিছুতেই যাব না। যেখানকার লোকেরা বাবা-মা কাকে বলে তাই জানে না, সে রকম অদ্ভুত বিচ্ছিরি জায়গায় আমি কিছুতেই যাব না।

লোকটি বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার জন্য আমরা না হয় বাবা মা তৈরি করে দেব। এমন কিছু শক্ত নয়।

রণজয় বলল, বাবা-মা আবার তৈরি করা যায় নাকি? কী বুদ্ধি আপনার।

এবার দুজন লোক এক সঙ্গে চেপে ধরল রণজয়কে। রণজয় একটা ঘুঁষি মারল

একজনের মুখে। সে ছিটকে যেতেই রণজয় অন্যজনের পেটে ঢুঁ মারল মাথা দিয়ে। এখন যেন তার গায়ে অসুরের মতন শক্তি।

কিন্তু যতই জোর থাক চারজন একসঙ্গে আক্রমণ করায় সে আর পারল না। পড়ে গেল মাটিতে। একজন তার বুকে চেপে বসে নাকের ওপর ঘুঁষি মারতেই সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল তার চোখে!

রণজয় কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। আবার চোখ মেলে দেখল, লোকগুলো তাকে ছ্যাঁচড়াতে-ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাচ্ছে সেই গোল জিনিসটার দিকে। তারপর ধরাধরি করে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। রণজয়ের আর নিস্তার নেই। তাকে চলে যেতে হবে কোন অচেনা অদ্ভুত জায়গায়। এই পৃথিবীকে আর দেখতে পাবে না।

লম্বা লোকটি তখন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, রণজয় শেষ শক্তিতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। লম্বা লোকটিকে এক ধাক্কা দিয়ে সে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। লম্বা লোকটিও নিচে পড়ে গেছে। কিন্তু সে ওঠবার আগেই রণজয় দৌড়াতে শুরু করল নদীর দিকে। হঠাৎ তার মনে পড়েছে, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেই সে একমাত্র বেঁচে যেতে পারে। জলের মধ্যে এদের আগুন অস্ত্র কোনও কাজে লাগবে না। তা ছাড়া এরা বোধহয় সাঁতার জানে না। এদের একজন জলে ডুবে মরেছে।

লম্বা লোকটি রণজয়কে প্রায় ধরে ফেলেছিল, তার আগেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। সে এত ভালো সাঁতার জানে যে এরা জলে নামলেও তাকে ধরতে পারবে না। রণজয় এক ডুব দিয়ে চলে গেল জলের গভীরে। অনেকখানি দূরে গিয়ে সে যখন দম নেবার জন্য আবার মাথা তুলল, দেখতে পেল যে লম্বা লোকটির পাশে অন্য লোকগুলোও এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তারা জলে নামেনি। ওরা বিজ্ঞানে এত বেশি উন্নতি করেছে বটে, তবু জলকে ভয় পায়। হয়তো ওদের গ্রহে এরকম নদীই নেই।

লোকগুলো কিছুক্ষণ সেইখানে অপেক্ষা করে তারপর আবার ফিরে গেল গোল জিনিসটার কাছে। একটু বাদেই সেটা উড়তে-উড়তে চলে এল নদীর ওপরে। রণজয়ের ঠিক মাথার কাছে। রণজয় আবার ডুব দিল। শোঁ-শোঁ করে ডুব সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে লাগল স্রোতের সঙ্গে। আবার মাথা তুলতেই গোল জিনিসটা তেড়ে এল তার দিকে, সেটা থেকে একটা দড়ির ফাঁস ঝুলছে। যেন মাছের মতন রণজয়কে গেঁথে জল থেকে তুলে নেবে। বুক ভরতি নিশ্বাস নিয়ে রণজয় ডুবে গেল অনেক নিচে।

বহুক্ষণ পর্যন্ত চলল এইরকম। রণজয় হাঁপিয়ে গেছে, দম ফুরিয়ে যাচ্ছে, তবু সে হার মানবে না।

ভোরের আলো ফুটে ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে এ লড়াই শেষ হল। গোল জিনিসটা আর অপেক্ষা করল না. সোজা উঠে গেল ওপরের দিকে। কী অসম্ভব তীব্র গতি। প্রায় চোখের নিমেষে মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নিশ্চিন্ত হয়ে রণজয় আস্তে-আস্তে চলে এল তীরের দিকে। ওপরে উঠে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। এত ক্লান্ত যে সে ধপ করে মাটিতে পড়ে গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল।

আকাশ এখন পরিষ্কার। অল্প-অল্প আলো ফুটেছে, তারারা সব বিদায় নিচ্ছে।

ভোরের আকাশ কী সুন্দর দেখায়। অথচ ওই আকাশে কত রকম রহস্য আছে কে জানে। ওই আকাশে বেড়াতে যেতে কার না ইচ্ছে হয়। কিন্তু ওই লোকগুলো তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল এমন একটা জায়গায়, যেখানে নদী নেই। যেখানকার লোক মা-বাবা কাকে বলে জানে না। সেখানকার চেয়ে এই পৃথিবী অনেক ভালো।

তারপর রণজয় তাকাল নিজের হাত পায়ের দিকে। তার সারা শরীর এখন নীল। সে এখন আর মানুষের মতন নয়। কেউ আর তাকে আপন করে নেবে না। হয়তো ছেলেরা তাকে দেখে ঢিল ছুঁড়বে। বাচ্চারা তাকে দেখে ভয় পাবে। রণজয়ের কান্না পেয়ে গেল। একা-একা খানিকক্ষণ কাঁদল সে। তারপর চোখ মুখে ভাবল, আর যে যাই ভাবুক, আমার মা-বাবাও কি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে? না, তা হতেই পারে না।
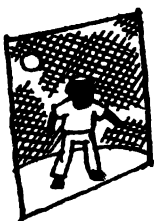
নীল মানুষের কাহিনি

দোতলার বারান্দায় পাপু একা-একাই একটা বল নিয়ে খেলছিল। একবার বলটা রেলিং টপকে পড়ে গলে পেছনের মাঠে।

পেছন দিককার মাঠটায় বড়-বড় ঘাস জন্মে গেছে। মাঠের ওপাশে বড়-বড় গাছের একটা বাগান। সেখানে আম, জাম, লিচু গাছ ছাড়াও অনেকগুলো বাঁশ গাছ আছে। সেই বাঁশবনে নাকি রাত্তিরবেলা শাঁকচুন্নিরা আসে। তারা মাঝ রাত্তিরে নাকি সুরে শিয়ালের মতন গান গায়। এদিকে পাপুর একা যাওয়া নিষেধ।

এখন কেউ দেখছে না বলে পাপু মাঠে নেমে এল বলটা খুঁজতে। কিন্তু বলটাকে দেখতে পেল না। নিশ্চয়ই ঘাসের মধ্যে লুকিয়েছে। বলগুলো মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে লুকিয়ে পড়ে।

বলটা খুঁজতে-খুঁজতে পাপু চলে এল বাগানের কাছে। তারপরই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা বড় জামরুল গাছের পাশে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের বাড়ির দিকে।

পাপু প্রথমে ভেবেছিল নিশ্চয়ই লোকটা চোর। তারপরই মনে হল, চোর নয়, একটা দৈত্য। কিংবা বকরাক্ষস।

লোকটা দৈত্যের মতনই লম্বা, মাথায় বড়-বড় চুল, গায়ের রং একদম নীল। কোনও মানুষের রং ওরকম হয় না। জানলা-দরজা রং করার মতন কেউ যেন ওকে নীল রং মাখিয়ে দিয়েছে সারা গায়ে।

পাপু পেছন ফিরে দৌড়ে পালাতে যেতেই লোকটা তার নাম ধরে ডাকল, পাপু, শোনো—

তাতে পাপু আরও ভয় পেয়ে গেল। দৈত্যটা তার নাম জানল কী করে? নিশ্চয়ই এবার কপাৎ করে খেয়ে ফেলবে।

পাপু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, আমি আর করব না! আমি আর কোনওদিন দুষ্টুমি করব না! আমাকে মেরো না!

লোকটা বলল, না, তোমাকে মারব না। তোমার দিদিকে একবার ডেকে দিতে পারো?

পাপু বলল, এক্ষুনি ডেকে দিচ্ছি! আমাকে ছেড়ে দাও?

লোকটা বলল, আমি তো তোমাকে ধরে রাখিনি। তুমি ভয় পেও না।

পাপু তক্ষুনি বাড়ির দিকে দৌড়ল। ঘাসে পা জড়িয়ে পড়ে গেল একবার। উঠে আবার ছুটল।

বারান্দায় উঠেই পাপুর সাহস ফিরে এল। সে তখন বাগানের দিকে ফিরে দৈত্যটার উদ্দেশে বলল, এক লাথি! দিদিকে ডেকে দেব না, ছাই দেব! ভূত আমায় পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে, করবি আমার কী?

পাপুর দিদি চিত্রা একতলাতেই ছিল। সে বলল, এই পাপু, তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস?

পাপু বলল, দ্যাখো না দিদি, ওইখানে একটা দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে!

চিত্রা হেসে ফেলল। পাপুটা দারুণ গুলবাজ! কত জিনিস যে বানিয়ে-বানিয়ে বলে।

চিত্রা বলল, তুই বুঝি দৈত্যকে লাথি মারছিস?

দিদি, দৈত্যটা তোমাকে ডাকছে!

কেন, আমাকে আবার দৈত্যর কী দরকার পড়ল?

ওই দ্যাখো না, দৈত্য হাতছানি দিচ্ছে! ই-ল্-ল্!

পাপু জিভ ভেঙিয়ে দিল। চিত্রা তখন বারান্দায় এসে পড়াতেই পাপু আবার দারুণ উৎসাহে বলল, ওই দ্যাখো, দেখতে পাচ্ছ, বড় জামরুল গাছটার পাশে—

চিত্রর মনে হল, কে যেন গাছের পাশ থেকে সরে গেল। সে তখন চেঁচিয়ে বলল, কে? কে ওখানে?

সবে মাত্র সন্ধে হয়েছে একটু-একটু। এখনও আকাশের আলো যায়নি। এক্ষুনি কি আর চোর আসতে পারে? চিত্রা সাহস করে নেমে এল মাঠে। আবার জিগ্যেস করল, কে?

পাপু বলল, দিদি, যেও না, সত্যি-সত্যি দৈত্য।

তখন বাগানের মধ্য থেকে কেউ একজন ডাকল, চিত্রা, শোনো—

চিত্রা একেবারে কেঁপে উঠল। কী গম্ভীর গলার আওয়াজ। যেন হাঁড়ির মধ্য থেকে কথা বলছে। কিন্তু কে তার নাম ধরে ডাকছে?

সে আবার বলল, কে ওখানে?

এবার জামরুল গাছের আড়াল থেকে লোকটা বেরিয়ে এল। সেই বিশাল চেহারা আর অদ্ভুত নীল রং দেখে চিত্রা পাপুর থেকেও বেশি ভয় পেয়ে গেল। গলায় আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল প্রায়। কোনওক্রমে বলল, ওমা...ওমা...ও...মা...গো!

পেছন ফিরে দৌড়তে গিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল চিত্রা। বাগান থেকে বেরিয়ে এসে লোকটা বলল, চিত্রা, ভয় পেও না, আমি রণজয়—

দূর থেকে পাপু তখন চ্যাঁচাচ্ছে, ও মা, এসো, বাবা, এসো, ছোটকাকা এসো, দিদিকে দৈত্য ধরে নিয়ে যাচ্ছে—বিরাট দৈত্য!

লোকটা নীচু হয়ে কয়েকবার ডাকল, চিত্রা, চিত্রা—। চিত্রা সত্যিই অজ্ঞান। সে তখন চিত্রাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেল বাগানের মধ্যে।

পাপুর চিৎকারে ছুটে এল চিত্রার মা আর ছোটকাকা। ছোটকাকা এক ধমক দিয়ে বলল, কী পাগলের মতন চ্যাঁচাচ্ছিস?

পাপু লাফাতে-লাফাতে বলল, দিদিকে ধরে নিয়ে গেছে, ওই বাগানের মধ্যে শিগগির...

মা আর ছোটকাকা দুজনই ছুটে গেলেন বাগানের দিকে, ছোটকাকাই আগে-আগে। বাগানের মধ্যেই ঢুকে তিনি দেখলেন, চিত্রা মাটিকে পড়ে আছে, আর কী একটা বিশাল জন্তুর মতন ঝুঁকে আছে তার মুখের কাছে।

সঙ্গে-সঙ্গে ছোটকাকা উলটো দিকে ঘুরে চিৎকার করে উঠল, ওরে বাপরে, গোরিলা, কিংকং—বন্দুক, বন্দুক আনতে হবে!

মা তবু এগিয়ে গেলেন। তিনিও দেখলেন, সত্যিই একটা দৈত্যের মতন মানুষ তার মেয়েকে আবার মাটি থেকে তুলে নিচ্ছে।

তিনি কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, ছেড়ে দাও, আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও!

লোকটা মাকে দেখে বলল, ভয় পাবেন না। আমি রণজয়!

মা তাতেই ভয় পেয়ে গেলেন। হাতজোড় করে বলল, তুমি যেই হও, আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও! তুমি যা চাও, তাই দেব!

চিত্রার জ্ঞান ফিরে এসেছে, সে মা-মা করে ডেকে উঠল। তারপর লোকটার হাতে কামড়ে দিতেই লোকটা ছেড়ে দিল তাকে।

এর মধ্যে ছোটকাকা চ্যাঁচামেচি করে আরও অনেক লোক জুটিয়েছে। লাঠি, দা, শাবল নিয়ে দশ-বারোজন লোক তেড়ে এল বাগানের মধ্যে। দৈত্যের মতন লোকটা দাঁড়িয়েই ছিল। প্রথম একজন তার গায়ে লাঠির বাড়ি মারতেই সে লাঠিখানা কেড়ে নিয়ে দেশলাই কাঠির মতন পট করে ভেঙে ফেলল। তারপর দৌড়তে লাগল পেছন ফিরে। অন্যেরা তাড়া করে গেল—কিন্তু অত বড় লোকটার সঙ্গে দৌড়ে কেউ পারে না! বাগানের পর অনেকটা জলা জায়গা, তারপর জঙ্গল। লোকটা ছপছপ করে জলাভূমির মধ্য দিয়ে দৌড়ে প্রায় চোখের নিমেষে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে। সে পর্যন্ত আর যাওয়ার সাহস হল না কারুর!

নিশানপুর গ্রামে দারুণ একটা উত্তেজনা পড়ে গেল। তারা স্বচক্ষে একটা দৈত্য দেখেছে। কত রকম গল্প তৈরি হতে লাগল তাকে নিয়ে। কেউ বলল, তার মুলোর মতন দাঁত। কেউ বলল, তার চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়। কেউ বলল, ওটা দৈত্য নয়, আসলে একটা গোরিলা। কেউ বলল, যাঃ, ভারতবর্ষে গোরিলা থাকে না, ওটা নিশ্চয়ই শিম্পাঞ্জি

কিংবা ওরাং-ওটাং! কেউ বলল, তা কী করে হবে? ও যে কথা বলতে পারে, বাংলায় কথা বলে! কেউ বলল, তা হলে নিশ্চয়ই কোনও তান্ত্রিক সাধক মরাকে জাগিয়েছে।

চিত্রার মা শুধু বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, ও বলেছিল, ওর নাম রণজয়! কেন বলল, ও কথা? মুখটা সিংহের মতন। অদ্ভুত কোনও জন্তুই হবে। চিত্রা কোনও কথা বলে না, শুধু হেঁচকি তুলে কাঁদে। সে এমন ভয় পেয়েছে যে কিছুতেই সুস্থ হতে পারছে না। পাপু লাফালাফি করে বলে, আমি কিন্তু আগে দেখেছি, আমি সবচেয়ে আগে দেখেছি।

সত্যি, পাপু ঠিক সময় চ্যাঁচামেচি না করলে দৈত্যটা চিত্রাকে ধরেই নিয়ে যেত। খবরের কাগজেও ছাপা হয়ে গেল, নিশানপুর গ্রামে দৈত্যের আবির্ভাব।

দৈত্যটির নাম কিন্তু সত্যিই রণজয়। কিছুদিন আগেও সে মানুষ ছিল।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে রণজয় একটা গাছের নিচে বসে হাঁপাতে লাগল। খিদেতে তার পেটের মধ্যে যেন দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। গত চার পাঁচদিন সে কিছুই প্রায় খায়নি। এই জঙ্গলে ফলমূল প্রায় কিছুই নেই। জন্তু-জানোয়ারও কিছু নেই যে তাদের মেরে মাংস খাওয়া যাবে। শুধু আছে কিছু ইঁদুর আর শেয়াল, তাদের মাংস তো খাওয়া যায় না।! গ্রামের কোনও মানুষ তাকে খাবার দেবে না। লোকেরা তাকে দেখলেই ভয় পায়!

একটুক্ষণ বসার পরই রণজয় ভাবল, এখানে থাকা ঠিক নয়। তাকে জলের কাছে যেতে হবে। তার এখন গায়ে এত জোর যে পৃথিবীর কোনও মানুষ তাকে আর ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু আকাশ থেকে মাঝে-মাঝে মানুষের মতন একরকম প্রাণী আসে তাকে বন্দি করার জন্য। ওই প্রাণীরাই আজ রণজয়ের এই অবস্থা করেছে। ওদের ছোঁয়াতেই রণজয়ের চেহারা বদলে গেছে এরকম। ওরা চায় রণজয়কে তাদের গ্রহে নিয়ে যেতে। ওরা বড়-বড় জাল ফেলে রণজয়কে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে। ওদের হাতে থাকে আগুনের টর্চ লাইট। কিন্তু রণজয় কিছুতেই ধরা দেবে না। সে এই পৃথিবী ছেড়ে যাবে না। ওদের জব্দ করার একমাত্র উপায় জলের মধ্যে নেমে পড়া। ওরা জলকে ভয় পায়।

জঙ্গলের মধ্যেই একটা খাল আছে। কচুরিপানায় ভরা। রণজয় এসে তার ধারে বসে হাত দিয়ে কচুরিপানা সরাতে লাগল। খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করার পর সে জল তুলে মুখটা ধুলো। চামড়ার ওপর জোর দিয়ে হাত ঘষতে লাগল, যদি নীল রং ওঠে। না, কিছুতেই ওঠে না। আকাশে জ্যোৎস্না রয়েছে। আয়নায় মতন জলে রণজয় নিজের মুখের ছায়া দেখল। সত্যিই, কেন লোকেরা তাকে দেখে ভয় পাবে না? এমনকী চিত্রার সঙ্গে এত ভাব ছিল, সেও চিনতে পারল না। সেও ভয় পেয়ে তার হাতে কামড়ে দিয়েছে। রণজয় এখন প্রায় সাড়ে সাত ফিট লম্বা, মুখখানাও সেইরকম প্রকাণ্ড হয়ে গেছে। মহাভারতে আছে, শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রং নাকি নীল ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখে তো কেউ ভয় পেত না।

মাথার ওপরে একটা ঘর্ঘর শব্দ হল। একটা গোল মতন জিনিস ওপর থেকে নেমে আসছে। তার থেকে টর্চ লাইটের মতন একটা সরু আগুনের রেখা এক-একটা গাছের ওপর পড়ছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে পুড়িয়ে দিচ্ছে গাছটাকে। ওরা আবার খুঁজতে এসেছে

রণজয়কে। রণজয় টুপ করে নেমে গেল জলের মধ্যে। কোনও শব্দ না করে নাক পর্যন্ত ডুবে রইল।

গোল জিনিসটা থেকে একটা দরজার মতন খুলে গেল, সেখান থেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। তারপর হাওয়ায় ঠিক পাখির মতন উড়তে-উড়তে নেমে এল নিচে।

এখন ওদের দেখলেই রণজয়ের রাগে গা জ্বলে যায়। দাঁত কিড়মিড় করে। হাতের কাছে ওদের একটাকে পেলে সে খুনই করে ফেলত। সে তো কোনও দোষ করেনি, তবু ওদের জন্য কেন তার এত কষ্ট! কিন্তু রণজয় ওদের কাছাকাছি যেতে সাহস পায় না। ওদের কাছে নানারকম অদ্ভুত যন্ত্রপাতি আছে।

ওরা যেন কুকুরের মতন গন্ধ শুঁকতে পারে। ঠিক যে রাস্তা দিয়ে রণজয় এসেছিল, সেই রাস্তা ধরে লোকটা হেঁটে এসে খালের ধারে দাঁড়াল। যদিও সে কোনও শব্দ উচ্চারণ করলে না, তবু রণজয় স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে যে সে বলছে, নীলমানুষ, লুকিয়ে থেকো না, আমাদের সঙ্গে চলে এসো। এখানে তুমি বাঁচতে পারবে না। আমাদের সঙ্গে এসো!

রণজয় কোনও উত্তর দিল না। সে যে এখানে আছে সেটা বুঝতে না দিয়ে ডুবে গেল জলের মধ্যে। ডুব সাঁতার কেটে চলে গেল অনেকখানি।

একটু বাদে লোকটা আবার উড়তে-উড়তে উঠে গেল ওপরে। রণজয়ের খুব ইচ্ছে করেছিল লোকটার গায়ে জলের ছিটে দেয়। ওরা যখন জলকে এত ভয় পায়, তখন নিশ্চয়ই জলের ছোঁয়া লাগলে কুঁকড়ে যাবে। কিন্তু এবার আর তা করা গেল না।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে রণজয় আবার ওপরে উঠে এল। কিছু খাবার জোগাড় করতেই হবে। কোনও দিন সে চুরি-ডাকাতি করেনি, এবার বাধ্য হয়েই তা করতে হবে, উপায় কী!

আবার হাঁটতে শুরু করল সে। জঙ্গলের অন্য পাশ দিয়ে একটা বড় রাস্তা গেছে। সেখানে রাত্তিরবেলা অনেক লরি যায়। ইচ্ছে করলেই সে জোর করে একটা লরি থামাতে পারে। কিন্তু লরিতে তো আর খাবার পাওয়া যাবে না।

অন্ধকাব গাঢ় হওয়ার পর সে আবার একটা গ্রামে ঢুকে পড়ল। চুপি- চুপি এক-একটা বাড়ির জানলা দিয়ে উঁকি দেয়। কোনও-কোনও বাড়িতে সে দেখতে পায়, লোকেরা খেতে বসেছে। তার জিভে জল আসে। ভিখিরিরাও এই সময় চাইলে কিছু খাবাব পেত। কিন্তু তাকে তো কেউ ভিক্ষে দেবে না।

একটা বাড়ির উঠোনে একটা গাছে হলদে-হলদে কী যেন ফল ফলে আছে। সে ভাবল পেয়ারা। পট-পট করে কয়েকটা ছিঁড়ে নিয়ে দেখল, পেয়ারা তো নয়, পাতিলেবু। খালি পেটে কেউ লেবু খায় নাকি! তবু খিদের চোটে সই লেবুগুলোই নোখ দিয়ে চিরে রস চুষে-চুষে খেতে লাগল। একটু নুন থাকলে তবু ভালো হতো। দাঁত টকে গেল একেবারে!

আর একটা বাড়ির পেছনে মস্ত বড় খাঁচায় অনেকগুলো মুরগি রয়েছে। একটা মুরগি চুরি করে নিলে বেশ হয়, কোনওরকমে আগুন জ্বেলে ঝলসে খাওয়া যায়।

এরকম চিন্তায় রণজয় নিজেই অবাক হয়ে গেল। সে কলেজে পড়াশুনো করেছে। এখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ বলতে পারে। কদিন আগেও সে ছিল অন্য যে-কোনও

ছেলের মতন। এখন চেহারাটা বড় হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে কি সত্যি দৈত্য হয়ে যাচ্ছে নাকি? কোনওদিন মানুষ ধরে-ধরে খাবে? না, না, এরকম করলে হবে না। তাকে মানুষই থাকতে হবে।

কিন্তু খাবার তো জুটছে না। রণজয় নিজের বাড়িতেও আর ফিরে যাবে না। তার বাবাই তাকে দেখে ভয়ের চোটে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরেই পেয়েই বলেছিলেন, দূর হ, দূর হয়ে যা! ভূত হয়ে কেন জ্বালাতে এসেছিস আমাদের! সে যতই বলেছিল, আমি ভূত নয়, কেউ বিশ্বাস করে না। তার গলার আওয়াজও বদলে গেছে।

ঘুরতে-ঘুরতে রণজয় দেখল, একটা বাড়ির দরজার বাইরে থেকে তালাবন্ধ। ভেতরটা অন্ধকার। রণজয় তালাটা ধরে একটু চাপ দিতেই মট করে তালাটা ভেঙে গেল। দরজা ঠেলে সে মাথা নীচু করে ভেতরে ঢুকল। বাড়ির সামনে একটা বড় উঠোন, চারদিকে দেয়াল-ঘেরা। রণজয় সেটার ভেতরে ঢুকতেই একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে তাড়া করে এল। কুকুরটা কাছে আসতেই রণজয় সেটার চা'র পা ধরে ছুঁড়ে দিল পাঁচিলের বাইরে। বাইরে পড়েই কুকুরটা কেঁই-কেঁই করতে-করতে দূরে পালিয়ে গেল খুব ভয় পেয়ে।

বাড়িতে আর কোনও মানুষজন নেই। রণজয় খুঁজতে লাগল রান্নাঘর। রান্নাঘরে খাবারদাবার কিছু নেই। কয়েকটা আলু আর পেঁয়াজ রয়েছে একটা ঝুড়িতে। আর কয়েকটা হাঁড়ি-কুঁড়ি ঘেঁটে চাল আর ডালও পাওয়া গেল। রণজয় ঠিক করল সে রান্না করেই খাবে। উনুনের পাশে দেশলাই রয়েছে। রণজয় খানিকটা চেষ্টা করে।

রান্না-টান্না সে কখনো করেনি। কিন্তু খিচুড়ি তো সবাই রাঁধতে পারে। একটা হাঁড়িতে অনেকখানি জল নিয়ে তার মধ্যে বেশ খানিকটা করে চাল আর ডাল ঢেলে দিল। এবার তো আপনা-আপনি খিচুড়ি হয়ে যাবে। কয়েকটা আলু আর পেঁয়াজও ছেড়ে দিল তার মধ্যে। নুনও আছে, দিব্যি খাওয়া জমবে।

সবসুদ্ধু উনুনে চাপিয়ে দিয়ে রণজয় ব্যগ্র হয়ে বসে রইল। কতক্ষণে রান্না হবে? সে আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছে না। প্রতিটি মিনিট মনে হচ্ছে এক ঘণ্টা। সামনে বসে থাকলে আরও বেশি খিদে পায়। সে রান্নাঘর ছেড়ে উঠে এল। অন্য একটা ঘরে এসে শুয়ে পড়ল খাটের ওপর। উঃ কতদিন পর সে খাট বিছানায় শুচ্ছে! ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। খিচুড়ি যদি পুড়ে যায়! তা ছাড়া খিচুড়ি খেয়েই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। বাড়ির লোকেরা যেকোনও সময় ফিরে আসতে পারে। ভোরের আলো ফুটবার আগেই তাকে পালাতে হবে জঙ্গলে।

রণজয় একটুক্ষণ মাত্র শুয়েছিল, তারপরেই খুটখাট শব্দ হল বাইরে। এই রে, বাড়ির লোকরা ফিবে এসেছে! রণজয় বাইরে বেরিয়ে পাঁচিল টপকে পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু খিচুড়ি খাওয়া হবে না। বাড়ির লোকেরা রান্নাঘরে আপনাআপনি খিচুড়ি রান্না হতে দেখে কী অবাক হবে!

ফিস-ফিস করে কারা যেন কথা বলছে। রণজয় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। সরু একটা টর্চের আলো পড়ল ঘরের মধ্যে! এই রে, অন্য গ্রহের অধিবাসীরা কি এখানেও রণজয়কে খুঁজতে এসেছে নাকি? রণজয় ঠিক করল, তা হলে দরজার খিলটা খুলে নিয়ে ওদের মধ্যে মাথা ফাটিয়ে দেবে। কিছুতেই ধরা দেবে না সে।

দুটো লোক ঘরের মধ্যে ঢুকল। অন্য গ্রহের লোক নয়, তারা মানুষ। দেখলেই বোঝা যায়, এ বাড়ির লোক নয়, চুরি করতে এসেছে।

মাঝখানের আর একটা দরজা খোলা ছিল, রণজয় সেটা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে। লোক দুটো সারা ঘরে আলো ফেলে দেখে নিল আগে। তারপর দেয়াল-আলমারির তালা ভাঙতে লাগল।

বাড়িটা খুব একটা বড়লোক কারুর নয়। সাধারণ বাড়ি। চোর দুটো তাদেরই সর্বনাশ করেতে এসেছে। আগে চোরের কথা শুনলে রণজয়ের ভয় করত, এখন মজা লাগছে খুব।

আলমারি থেকে কী যেন ঝনঝন করে নীচে পড়ল। চোর দুটো খুব ফিসফাস করে যাচ্ছে।

খানিকটা বাদে একটা চোর এদিকে উঠে এল। মাঝখানের দরজাটার পাশ দিয়ে যেতেই রণজয় লম্বা হাত বাড়িয়ে চোরটার ঘাড় ধরে তুলে নিয়ে এল। সে কোনওরকম শব্দ করার আগেই রণজয় চেপে ধরল তার মুখ। এ ঘরেও বিছানা পাতা ছিল, একটা বালিশের তোয়ালে দিয়ে ওর মুখটা বেঁধে ফেলল। তারপর চাদর দিয়ে হাত-পা বাঁধল ভালো করে। এবার সে লোকটাকে কাঁধে নিয়ে পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এল উঠোনে। বাইরে চাঁদের আলোয় রণজয়ের চেহারা দেখে চোরটার যেন ভয়ে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু কোনও শব্দ করতে পারছে না। তাকে মাটিতে শুইয়ে রেখে রণজয় আবার ফিরে এল ভেতরে।

বাকি চোরটা মন দিয়ে চুরি করে যাচ্ছে। আলমারি থেকে অনেকগুলো স্টীলের থালাবাসন থলিতে ভরেছে। একটা ছোট লোহার বাক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এখন। সেটা কিছুতেই খুলতে পারছে না।

রণজয় ঠিক চোরটার পেছনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। চোরটা তার বাটালি, ছোট হাতুড়ি, একটা করাত রেখেছিল পাশে। রণজয় টুকটাক্ করে এক-একটা সরিয়ে নিচ্ছে। লোকটা করাতটা খোঁজার জন্য পাশে হাত দিয়ে পেল না। খুব অবাক হয়ে বলল, আরেঃ! তারপর হাতুড়িটাও পেল না। তখন ফিসফিস করে ডাকল, এই হেবো, হেবো! তুই হাতুড়ি আর করাত নিয়েছিস?

কোনও সাড়া নেই।

চোরটা আবার ডাকল, এই হেবো, হেবো! কোথায় গেলি!

রণজয় চোরটার মাথার চুল ধরে পেছন থেকে একটু টান দিল। লোকটা উঃ বলে পেছন ফিরে তাকাল।

এই চোরটা কিন্তু আগের চোরটার থেকে অনেক বেশি সাহসী। গায়ে জোরও বেশি। রণজয়কে দেখেই তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল। রণজয় তার ঘাড়টা চেপে ধরে বলল, কোথায় যাচ্ছ চাঁদু?

চোরটা সঙ্গে-সঙ্গে কোমর থেকে একটা ছুরি বার করে সোজা বসিয়ে দিল রণজয়ের বুকে। রণজয় পেছন দিকে উলটে পড়ে গেল। বুক থেকে রক্ত বেরুচ্ছে ফোয়ারার মতন।

রণজয়ের মনে হল, এবার সে মরে যাচ্ছে। ভাবল, যাক, ভালোই হল। এরকম ভাবে দৈত্য হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী? কিন্তু মরার আগে খিচুড়িটা খাওয়া হল না?

একটু বাদে সে আবার ভাবল, কই, মারলাম না তো এখন! ব্যথাও করছে না। চোরটা উঠে দাঁড়িয়ে টর্চ ফেলে আছে তার দিকে। রণজয় একটানে ছুরিটা তুলে ফেলল। তারপর সে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখল। তার বুক থেকে যে রক্ত বেরিয়ে ছিল, সেটা জমে গেছে এরই মধ্যে। রবারের মতন শক্ত। রক্তের ফোয়ারাগুলো কতকগুলো নীল রবারের সুতোর মতন ঝুলছে তার বুক থেকে। রণজয় পটপট করে টেনে-টেনে সেগুলো ছিঁড়তে লাগল।

লোকটা এবার ভয় পেয়েছে। টর্চ খসে পড়ল হাত থেকে। আঁ—আঁ করে চেঁচিয়ে উঠল। পালাবারও শক্তি নেই।

রণজয় উঠে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দু-হাতে শূন্যে তুলে ছুড়ে ফেলল ঘরের মেঝেতে। আবার সেইভাবে তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর একবার ওই রকম ছুড়লে লোকটার একটাও হাড় আস্ত থাকবে না। রণজয় এই চোরটারও মুখ, হাত-পা বাঁধল। বাইরে উঠোনে এনে রাখল অন্য চোরটার পাশে।

তারপরই রণজয় ছুটে গেল রান্নাঘরে। খিচুড়ি পুড়ে গেছে নাকি? না, পোড়েনি, সবেমাত্র ফুটে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি হাঁড়িটা উনুন থেকে নামিয়ে ফেলল। আর থালা-টালায় ঢালা হল না. হাঁড়ি থেকেই সেই গরম-গরম খিচুড়ি খেয়ে ফেলল সবটা। নিজের হাতের রান্না তো, অপূর্ব স্বাদ লাগল। পেট ভর্তি হওয়ায় বেশ তৃপ্তি করে ঢেঁকুর তুলল একবার।

বাইরে বেরিয়ে এসে চোর দুটোকে একটা সরলরেখার মতন লম্বা করে সজিয়ে দিল উঠোনে। বাড়ির লোকজন ফিরে এলেই যাতে দেখতে পায়। চোর দুটো এক-একবার রণজয়ের দিকে তাকাচ্ছে আর ভয়ে চোখ বুজছে।

এবাঁর রণজয়কে যেতে হবে। বাড়ির লোকরা ফিরে এসে চোর দুটোর কাছে নিশ্চয়ই একটা সাঙ্ঘাতিক গল্প শুনবে। সবাই ভাববে, এক দৈত্য এসে ওদের বন্দি করে গেছে। নিজেকে দৈত্য ভাবতে খুব খারাপ লাগে রণজয়ের। সে যদি মানুষের উপকার করে এখন থেকে, তাহলেও কি তাকে দৈত্য ভাববে মানুষ?

আবার বাড়ির মধ্যে ফিরে গিয়ে খুঁজে-খুঁজে রণজয় কাগজ আর পেন্সিল জোগাড় করল। তারপর একটা চিঠি লিখল ঃ

মহাশয়, আমি আপনার বাড়িতে খিচুড়ি খেয়েছি বটে, কিন্তু তার বদলে এই চোর দুটোকে ধরে দিয়েছি। আমি হঠাৎ এই সময় না এলে, এরা আপনার সবকিছু নিয়ে পালাত। সুতরাং, আশা করি, আপনার খানিকটা চাল আর ডাল খরচ হওয়ার জন্য দুঃখিত হবেন না। ইতি নীল মানুষ।

চিঠিটা চোর দুটোর পাশেই একটা ইঁটে চাপা দিয়ে রাখল রণজয়। আপনমনেই বলল, দেখা যাক, এর পরেও ওরা আমাকে দৈত্য ভাবে কিনা।

তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। যদিও সে জন্তু নয়, তবু এখন তাকে আবার জঙ্গলে ফিরে যেতে হবে।

নীল মানুষের সংসার

রঘু সরদার আগে ছিল ডাকাত, পরে সে পুলিশের ভয়ে সাধু সেজেছিল, এখন সে হয়েছে রান্নার ঠাকুর। সে গুটুলি আর নীল মানুষের জন্য রোজ ভাত-ডাল রান্না করে।

রঘু সরদারের মনে বড় দুঃখ। সে এখনও বড় হয়নি, তার গায়ে জোর আছে, তবু তাকে কিনা জঙ্গলের মধ্যে বন্দি থেকে এরকম একটা ছোট কাজ করতে হয়! যখন সে ডাকাতের সরদার ছিল তখন তার দলের দশ-বারো জন লোক তার হুকুম শুনত, গ্রামের লোক তার নাম শুনে ভয়ে কাঁপত। মাঝ রাত্তিরে মশাল নিয়ে রে-রে-রে-রে করে গ্রামের কোনও বাড়িতে চড়াও হলে সে বাড়ির লোক টাকা-পয়সা, গয়না-গাঁটি সব ফেলে দিত তার পায়ের কাছে। কত আনন্দ ছিল তাতে।

সাধু সেজে থাকার সময়ও কম আনন্দ ছিল না। দলের তিনজন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তার নাম বলে দেওয়ায় কিছুদিনের জন্য তাকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়। অন্য গ্রামে এসে শ্মশানের ধারে সাধু সেজে বসলে গ্রামের মানুষ বেশ ভক্তি করে, পুলিশেও বিরক্ত করে না। সাধু-সাজা অবস্থায় রঘু সরদারের খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালোই জুটছিল, ভক্তদের হুকুম করলে তার পা টিপে দিত। এখন কিনা ওই বেঁটে বাঁটকুল গুটুলিটার হুকুম শুনতে হয় তাকে! এমনকী গুটুলির পা-ও টিপে দিতে হয় মাঝে-মাঝে।

এখান থেকে পালাবারও কোনও উপায় নেই। রঘু সরদার বুঝতে পেরেছে যে পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়লে ওই আট ফুট লম্বা নীল মানুষ শুধু তাকে তুলে একটা আছাড় দিলেই সব শেষ। রঘু সরদারের এখনও ধারণা, নীল মানুষ ঠিক মানুষ নয়, ব্রহ্মদৈত্য জাতীয়ই কিছু হবে। ওরকম বিশাল চেহারার কোনও মানুষ কী হতে পারে! গায়ের রং আবার গাঢ় নীল রঙের। তবে নীল মানুষের স্বভাবটা তেমন হিংস্র নয়, বেশির ভাগ সময়েই শুয়ে-বসে আলস্য করে আর হাসি-ঠাট্টা করে কথা বলে। বরং ওই মাত্র তিন ফুট চেহারার গুটুলিটাই পাজি, ওর গাঁটে-গাঁটে বুদ্ধি। নীল মানুষ ওর বুদ্ধিতেই চলে। ওই গুটলিই ঠিক করেছে যে রঘু সরদারকে পুরো এক বছর জঙ্গলে থেকে ওদের সেবা করতে হবে। তারপর যদি সে নাক-কান মুলে প্রতিজ্ঞা করে যে আর কোনও দিন ডাকাতি করবে না, কিংবা সাধু সেজে লোককে ঠকাবে না, তা হলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

রঘু সরদার মনে-মনে উপায় খোঁজে, কী করে ওই গুটুলিটাকে জব্দ করা যায়!

সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রঘু সরদার ঝরনার পাশে বাসন মাজতে বসল। এটাও তাকে করতে হয়। এই সময়টায় তার সবচেয়ে বেশি রাগে গা জ্বলে যায়। সে

ছিল কিনা একজন নামকরা ডাকাত সরদার। তাকে এখন মেয়েদের মতন বাসন মাজতে হচ্ছে!

সে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, নীল মানুষ একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছে আর গুটুলি একটু দূরে বসে একখানা বই পড়ছে। গুটুলি প্রায়ই একা-একা শহরে যায়, আর নানান জিনিসপত্তর জোগাড় করে আনে।

বই থেকে মুখ তুলে গুটুলি বলল, বড্ড পান খেতে ইচ্ছে করছে। কতদিন পান খাইনি। রঘু, কয়েক খিলি পান এনে দাও তো!

রঘু সরদার বলল, পান? এই জঙ্গলের মধ্যে আমি পান কোথায় পাব?

গুটুলি বলল, জঙ্গলের মধ্যে পান পাওয়া যাবে না, জানি। কিন্তু বাঁদিকে এই টিলার পাশ দিয়ে মাইল তিনেক হেঁটে গেলেই একটা বড় রাস্তা পাবে। একটা হাইওয়ে। সেখানে একটা পেট্রল পাম্পের পাশেই একটা পান-বিড়ির দোকান আছে। সেখান থেকে নিয়ে এসো!

রঘু সরদার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি একলা পান আনতে যাব?

গুটুলি তার দিকে একটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, হ্যাঁ, যাও, পান নিয়ে এসো। বেশি দেরি করো না যেন!

রঘু সরদারের ভুরু কপালের অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। সে ব্যাপারটা বুঝতেই পারছে না। তাকে একলা-একলা পাঠানো হচ্ছে জঙ্গলের বাইরে? সেইখানে হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি, ট্রাক চলে। কোনও একটা ট্রাকে উঠে তো সে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে পারে। গুটুলি কি তাকে লোভ দেখাচ্ছে?

একটা হ্যান্ড ব্যাগে রঘু সরদারের কিছু লুকোনো টাকা ও কয়েকটা জামা-কাপড় রয়েছে। রঘু সরদার একবার সেদিকে তাকাল। ওই ব্যাগটার মায়া ত্যাগ করতে হবে।

মেঘের গর্জনের মতন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে নীল মানুষ। সে সহজে জাগবে না মনে হয়।

রঘু সরদার বলল, ঠিক আছে, তা হলে পান নিয়ে আসি!

গুটুলি বলল, বেশি দেরি করো না, কেমন? আর হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি দামোদর বলে কারুকে চেনো?

রঘু সরদার বলল, দামোদর? কোন দামোদর?

গুটুলি বলল, তোমারি মতন ডাকাতি-টাকাতি করে!

রঘু সরদার জিগ্যেস করল, তার কি বাঁ-হাতের দুটো আঙুল কাটা? কথা বলতে-বলতে হঠাৎ তোতলা হয়ে যায়?

ঠিক ধরেছ। সেই দামোদরই বটে!

সে তো এক সময় আমার দলেই ছিল। পরে নিজের আলাদা দল খুলেছে শুনেছি। তাকে তুমি চিনলে কী করে?

চেনা হয়েছিল এক সময়। তুমি যে দোকানে পান কিনতে যাচ্ছ, দামোদরই এখন সেই দোকানের মালিক।

এঃ, ব্যাটা ডাকাতি ছেড়ে এখন পানওয়ালা সেজেছে!

ডাকাতি ছাড়েনি! তুমি যেমন পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য কিছুদিন সাধু সেজেছিলে, ওই দামোদরও তেমনি পানওয়ালা সেজেছে! তুমি ওই দামোদরকে এখানে ডেকে আনতে পারবে?

এখানে?

হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। এটুকু একটা মানুষ, যাকে রঘু সরদার টিপে মেরে ফেলতে পারে, সে কি না বসে-বসে হুকুম চালিয়ে যাচ্ছে! ব্রহ্মদৈত্যটাকে ও কী করে বশ করল কে জানে!

রঘু সরদার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খানিকটা হেঁটে তারপর দৌড়তে শুরু করল। মাঝে-মাঝে সে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখছে নীল মানুষ তাকে তাড়া করে আসছে কি না! না, সেরকম কোনও চিহ্ন নেই। বন একেবারে নিস্তব্ধ।

ছুটতে-ছুটতে সে ভাবতে লাগল, বড় রাস্তায় পৌঁছে সে কী করবে? দামোদরের সঙ্গে দেখা করবে? কী দরকার? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। সোজা একটা গাড়িতে উঠে পালিয়ে যাওয়াই তো ভালো।

হাতে একটা কোনও অস্ত্র নেই, সঙ্গে কোনও টাকাপয়সা নেই, শুধুমাত্র একটা টাকা সম্বল। তবু রঘু সরদার ঠিক করল এবারে সে পালাবেই।

সে বড় রাস্তায় পৌঁছে গেল বিনা বাধায়। পেট্রল পাম্পটাও চোখে পড়ল। তার পাশে একটা পানের দোকান আছে ঠিকই। রঘু সরদার আড়াল থেকে দেখল, আঙুল-কাটা দামোদর সেখানে বসে আছে ঠিকই। তার পাশে একজন বসে আছে। তার নাম ন্যাড়া গুলগুলি। ওর রোগা ছোট্টখাট্টো চেহারা, কিন্তু দারুণ ছুরি চালায়, চোখের নিমেষে যে-কোনও লোকের পেট ফাঁসিয়ে দিতে পারে। ওরা দু-জনে যখন জাঁকিয়ে বসেছে, তখন নিশ্চয়ই বড় কোনও মতলব আছে।

রঘু সরদারের একবার লোভ হল দামোদরের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে। আট-দশজন লোক জুটিয়ে যদি একটা দল গড়া যায়, তা হলে ওই লম্বা নীল মানুষটা আর বাঁটকুল গুটুলিটাকে ভয় কী! ওদের কাছে তো ছুরি-বন্দুক নেই!

কিন্তু নীল মানুষের চেহারাটা মনে পড়তেই তার বুক কেঁপে উঠল। ও যদি ব্রহ্মদৈত্য হয় তা হলে তো গুলি-গোলাও হজম করে ফেলবে! নীল মানুষটা একদিন গুটুলিকে কী যেন সব বলছিল, পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহের কথা। ও কি সেখান থেকে এসেছে নাকি? তা হলে বাংলায় কথা বলে কী করে?

দরকার নেই বাবা, এ তল্লাট থেকে একেবারে চম্পট দেওয়াই ভালো।

রঘু সরদার পেট্রল পাম্পটার কাছাকাছি একটা গাছের আড়াল লুকিয়ে রইল। এ রাস্তা দিয়ে বাস চলে না। কিন্তু অন্য কোনও গাড়ি পেট্রল পাম্পে থামলেই সে তাতে উঠে পড়বে।

আধঘণ্টা পরে একটা অ্যাম্বাসেডর গাড়ি এসে থামল। তাতে দু-জন মহিলা, দু-জন বাচ্চা আর দু-জন পুরুষ মানুষ। রঘু সরদার বিরক্তিতে মুখটা কোঁচকাল। এ গাড়িতে তাকে নেবে না।

দুটো ট্রাক ঝড়ের বেগে চলে গেল। থামলই না। আর একটা গাড়ি থামল, তাতে

শুধু ড্রাইভার আর পিছনের সীটে একজন মোটা মতন লোক। এবারে রঘু সরদার গাড়িটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে কাঁচুমাচু মুখে বলল, ভাই, খুব জরুরি দরকার, বাড়ি থেকে অসুখের খবর এসেছে, আমাকে সামনের শহরটাতে একটু পৌঁছে দেবে?

ড্রাইভার কিছু না বলে মালিকের দিকে তাকাল।

মালিক খেঁকিয়ে উঠে বলল, না, না। ওসব হবে না, এখানে হবে না!

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিতেই মালিক আবার বলতে লাগল, ডাকাতের মতন চেহারা, ওসব লোককে একদম বিশ্বাস নেই। রাস্তা থেকে অচেনা লোক কক্ষনো তুলবে না!

রঘু সরদার অস্থির হয়ে উঠল। মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার দেরি দেখে যদি নীল মানুষ তার খোঁজে ধেয়ে আসে। তবে এই কদিনে একটা ব্যাপার সে বুঝেছে, সন্ধের আগে ওই নীল মানুষটা জঙ্গল ছেড়ে বেরুতে চায় না।

এদিকে বিকেলের আলো পড়ে আসছে, সন্ধের আর দেরি নেই।

আরও আধ ঘণ্টা পরে একটা ট্রাক এসে থামতেই রঘু সরদার অনেক কাকুতি-মিনতি করে তাতে উঠে পড়ল। ট্রাক ড্রাইভার বলল, দশ টাকা দিতে হবে। রঘু সরদারের কাছে টাকা না থাকলেও সে বলে উঠল, দেব, নিশ্চয়ই দেব। আগে আমাকে পৌঁছে দাও —।

মিনিট দশেক যেতে না যেতেই ট্রাকের গতি কমে এল। রঘু সরদার জিগ্যেস করল, কী হল, থামলে কেন ভাই? আমার যে খুব জরুরি দরকার। ট্রাক ড্রাইভার উত্তর দিল, সামনে পথ বন্ধ।

রাস্তাটা সেখানে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরে গেছে। একদিকে ঘন জঙ্গল, আর একদিকে খাদের মতন। চার-পাঁচখানা গাড়ি থেমে আছে সেখানে। এইসব কটা গাড়িকেই রঘু সরদার আগে চলে আসতে দেখেছে। সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে জটলা করছে এক জায়গায়। সামনে রাস্তার ওপরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই পড়ে আছে। সেটা না সরালে কোনও গাড়িই যেতে পারবে না। অতবড় পাথরটা সরানো যাবেই বা কী করে!

অন্ধকার হয়ে এসেছে, পাশের জঙ্গলে জোনাকি জ্বলছে। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, তার ফাঁক দিয়ে একটু-একটু করে বেরিয়ে আসছে চাঁদের আলো। জায়গাটা ভারি সুন্দর, কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়েও রঘু সরদারের বুক ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। কোনওরকমে একটা শহরে পৌঁছতে পারলেই সে বেঁচে যেত। ব্রহ্মদৈত্যই হোক আর যাই হোক, শহরে তাদের জারিজুরি খাটবে না।

পাথরটা সবাই মিলে ঠেলে সরানো যায় না?

এমনসময় পাশের জঙ্গল থেকে সরু গলায় একটা গান শোনা গেল, 'কে বিদেশি মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজায় বনে!'

সে গান শুনেই রঘু সরদারের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার উপক্রম। সবাইকে ঠেলে সে দৌড় লাগাল সামনের দিকে। বড় পাথরের চাঁইটার ওপরে উঠে লাফিয়ে পার হতে যেতেই জঙ্গল থেকে একটা লম্বা হাত বেরিয়ে এল। তার কাঁধটা ধরে বেড়াল ছানার

মতন শূন্যে তুলে সেই হাতটা তাকে নিয়ে গেল। অন্য একটা হাত পাথরটাকে ঠেলে গড়িয়ে দিল পাশের খাদে।

এমন চোখের নিমেষে ঘটনাটা ঘটল যে অন্য লোকেরা ভাবল যে রঘু সরদারও বোধহয় পাথরটার সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে।

নীল মানুষ রঘু সরদারকে জঙ্গলের মধ্যে নামিয়ে দিল গুটুলির পায়ের কাছে। গুটুলি এখন মুখে দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে অন্য রকম সেজে আছে। সে কোমরে হাত দিয়ে, চোখ পাকিয়ে বলল, রঘু আমার পান কোথায়?

নীল মানুষ বলল, এটা তোমার কীরকম ব্যবহার বলো তো, রঘু সরদার? দুপুরবেলা ভাত খাওয়ার পর পান খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, আর এখন সন্ধে হয়ে গেল, তবু তুমি পান নিয়ে এলে না! এখানে কী করছিলে?

রঘু সরদারের মুখে আর কথা নেই। সে বুঝতে পারল তার শেষ নিশ্বাস ঘনিয়ে এসেছে!

গুটুলি আবার বলল, কী হল, আমার পান দাও!

রঘু সরদার এবারে বলে ফেলল, পানের দোকান বন্ধ ছিল। তাই আমি শহরে যাচ্ছিলুম পান আনতে!

তাই শুনে গুটুলি হি-হি করে হেসে উঠল আর নীল মানুষ হেসে উঠল হা-হা করে।

তারপর নীল মানুষ বলল, এসো একটা জিনিস দেখবে এসো!

আবার সে রঘু সরদারের কাঁধ ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। গুটুলিকে তুলে নিল অন্য হাতে। অনেকখানি জঙ্গল পেরিয়ে এসে সে এক জায়গায় থেমে বলল, ওই দ্যাখো। দোকান সমেত পানওয়ালাকে আমরা নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে।

এখন অনেকটা জ্যোৎস্না উঠেছে, তাতে দেখা গেল দুটো গাছের সঙ্গে লতাপাতা দিয়ে বাঁধা রয়েছে দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি। কাছেই পড়ে আছে একটা ছুরি।

পা দিয়ে সেই ছুরিটা ঠেলে দিয়ে নীল মানুষ বলল, এটা দিয়ে ওদের বাঁধন কেটে দাও! ছুরিটা কোথা থেকে এল জানো? ওই ন্যাড়াটা ওই ছুরি দিয়ে আমার পেট ফাঁসাতে এসেছিল! ভোঁতা ছুরি, আমার পেটে ঢুকলই না!

ন্যাড়া গুলগুলি বলতে লাগল, ভূ-ভূ-ভূ-ভূ-ভূত!

আর তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসতে লাগল।

ছুরিটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল রঘু সরদার। প্রায় এক বিঘৎ লম্বা ওই ছুরি দিয়ে মানুষের মুন্ডু কেটে ফেলা যায়, আর সেই ছুরি নীল মানুষের পেটে ঢোকেনি!

নীল মানুষ আবার বলল, ওদের বাঁধন খুলে দাও, আর পান সাজাতে বলো।

রঘু সরদার ওদের বাঁধন কেটে দিতেই ন্যাড়া গুলগুলি ধপাস করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আর দামোদর কাঁপতে লাগল থরথর করে।

রঘু সরদার বলল, ওরে দামোদর, বাঁচতে চাস তো পান সেজে দে। ওরা যা বলছে কর!

পান সাজার জিনিসপত্তর সব এনে রাখা ছিল, দামোদর সেইরকম কাঁপতে-কাঁপতেই দু-খিলি পান সাজাল।

নীল মানুষ বলল, এক খিলি পানে আমার কী হবে? আমার একসঙ্গে দশটা পান চাই। শিগগির!

তখন আবার পান সাজা হল। তাড়াতাড়ির জন্য রঘু সরদারও সাহায্য করার জন্য হাত লাগাল।

দুই ডাকাতে মিলে পান সাজছে!

এই বলেই খিল-খিল করে হেসে উঠল গুটুলি। নীল মানুষ বলল, এখন বেশ শান্ত-শিষ্ট দেখাচ্ছে, না?

এক সঙ্গে দশটা পান মুখে পুরে নীল মানুষ একটা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলল। তারপর সে রঘু সরদারের দিকে ফিরে বলল, এবারে একটা ঘটনা শোনো! মনে করো, একজন ছোটখাটো চেহারার মানুষ, খুব নিরীহ, কারুর সাতেপাঁচে থাকে না, সে একটা দোকানে চাকরি করে। বেশ দিন কেটে যাচ্ছিল তার। তারপর একজন দুষ্টু লোক সেই দোকানে ডাকাতি করার ষড়যন্ত্র করল। তারপর ডাকাতি করলও ঠিক, কিন্তু সব দোষ চাপিয়ে দিল ওই ছোটখাটো চেহারার নিরীহ লোকটির ওপর। তার ফলে সে মারধোর খেল, তার চাকরিও চলে গেল। এখন এটা খুব অন্যায় কি না বলো? তুমি ডাকাতি করতে চাও করো। কিন্তু একজন নিরীহ লোকের কাঁধে দোষ চাপাবে কেন? কী, এটা অন্যায় নয়?

রঘু সরদার বলল, হ্যাঁ, অন্যায়, খুব অন্যায়।

নীল মানুষ দামোদরের দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, তুমি কী বলো?

দামোদরও সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা খুব অন্যায়। পরের ওপর দোষ চাপানো মোটেই উচিত নয়।

নীল মানুষ বলল, বাঃ-বাঃ, এই তো চাই। তোমাদের দুজনেরই তো বেশ ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান আছে দেখছি!

গুটুলি এবারে একটানে মুখের নকল দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেলে বলল, ওহে দামোদর, আমায় চিনতে পারো? আমিই রঘুনাথপুরের এক মুদিখানায় চাকরি করতুম, আর তুমি সেই দোকানে ডাকাতি করেছিলে!

দামোদর চোখ কপালে তুলে বলল, অ্যাঁ? অ্যাঁ? ওরে বাপরে, আমার মহা অন্যায় হয়ে গেছে। আমায় তুমি মাপ করো বামুন ঠাকুর। তোমার পায়ে পড়ি!

গুটুলি চোখ পাকিয়ে বলল, আমি বামুন ঠাকুর নই, আর তোমাকে মাপও করব না! অন্যায় করলে তার শাস্তি পেতে হয় জানো না?

নীল মানুষ বলল, ওহে রঘু সরদার; তুমি আমাদের লোক। তোমার ওপরেই শাস্তির ভার দিলুম। ওকে কী শাস্তি দেওয়া যায় বলো তো?

রঘু সরদার নীল মানুষকে খুশি করবার জন্য বলল, মাটিতে গর্ত করে ওকে বুক পর্যন্ত পুঁতে রাখা উচিত। আর ওই ন্যাড়া গুলগুলিটা আপনাকে ছুরি মারতে এসেছিল, ওকেও ওই শাস্তিই দিতে হবে!

নীল মানুষ বলল, ওরে বাবা, এত কঠিন শাস্তি!

গুটুলি বলল, আর রঘু সরদার তুমি যে কথার খেলাপ করে পালাবার চেষ্টা

করেছিলে, তা হলে তোমার কী শাস্তি হবে? তুমি যাতে আর পালাতে না পারো, সেই জন্য তোমাকেও মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখা উচিত!

নীল মানুষ হা-হা করে হেসে উঠল, তারপর বলল, তার চেয়ে বরং এক কাজ করা যাক। ওরা তিনজনেই তিনজনকে শাস্তি দিক।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের মাথায় আটটা করে গাঁট্টা মারুক। নাও, রঘু সরদার,তুমিই শুরু করো!

ন্যাড়া গুলগুলির এর মধ্যে জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে উবু হয়ে জুল-জুল করে তাকিয়ে সব কথা শুনছিল। সে তাড়াতাড়ি মাথায় হাত চাপা দিয়ে বলল, ওরে বাবারে, আমার মাথা ন্যাড়া, গাঁট্টা মারলে আমার বেশি লাগবে! এটা অন্যায়!

নীল মানুষ বলল, ঠিক আছে, তা হলে গাঁট্টার বদলে থাপ্পড় চলুক।

ন্যাড়া গুলগুলি বলল, আমার গায়ে জোর কম। আমি জোরে থাপ্পড় মারতে পারব না, আমি চিমটি কাটব!

নীল মানুষ বলল, ঠিক আছে, তাই সই!

তারপর শুরু হল এক মজার ব্যাপার। এ ওকে থাপ্পড় মারে আর ও একে চিমটি কাটে। লেগে গেল চ্যাঁচামেচি, ঝটাপটি। নীল মানুষ আর গুটুলি হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগল!

খানিকবাদে যখন প্রায় রক্তারক্তি শুরু হওয়ার উপক্রম তখন নীল মানুষ হেঁকে বলল, ব্যাস, ব্যাস, যথেষ্ট হয়েছে। নইলে কিন্তু এবারে আমি শুরু করব!

অমনি সব চুপ।

গুটুলি বলল, রঘু সরদার যে মাটি খোঁড়ার কথা বলছিল, সেটা কিন্তু মন্দ নয়! এই জঙ্গলে বড় জলের কষ্ট। গ্রীষ্মকালে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারেরাও জলের কষ্ট পায়। ওরা তিনজন এখানকার মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে একটা পুকুর তৈরি করুক না। আমি খন্তা-শাবল এনে দেব!

নীল মানুষ বলল, ভালো আইডিয়া। পুকুরটা পুরোপুরি খোঁড়া হয়ে গেলে আমি সেটার নাম রাখব রঘু-দামোদর-গুলগুলি!

দামোদর বলল, আমরা তিনজনে মিলে একটা পুকুর কাটব? তাতে যে এক বছর লেগে যাবে!

গুটুলি বলল, পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তো অন্তত পাঁচ বছর জেল খাটতে। তার চেয়ে এখানে এক বছর তো বেশ সস্তায় হয়ে গেল। জেলখানার থেকে এখানে ভালো খাবার পাবে! তোমরা নিজেরাই তো রান্না করবে।

নীল মানুষ বলল, খাবারের কথায় মনে পড়ে গেল। বড্ড খিদে পেয়েছে যে? ও রঘু সরদার, আজ কী-কী খাওয়াবে? যাও, যাও, উনুনে আগুন দাও!

গুটুলি বলল, দামোদর, পান সাজো!

ন্যাড়া গুলগুলি জিগ্যেস করল, আর আমি কী করব?

গুটুলি বলল, তুমি মাছ-তরকারি কুটবে। তোমার তো ছুরির হাত ভালো!

নীল মানুষ হাসতে-হাসতে বলল, আমাদের সংসারটা দিব্যি বড় হয়ে গেল, কী বলো!

নীল মানুষের মন খারাপ
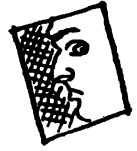
গভীর জঙ্গল, এখানে মানুষ প্রায় আসেই না, দু-একজন কাঠুরে বা শিকারি দৈবাৎ এসে পড়লেও ভূতের ভয়ে পালিয়ে যায়। লোকের মুখে মুখে রটে গেছে যে ওই জঙ্গলে ভূত আছে। কেউ-কেউ বলে, ভূত নয়, ব্রহ্মদৈত্য।

এই জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে একটা হাইওয়ে গেছে। সেখান দিয়ে ট্রাক যায়, অন্য গাড়ি যায়। কিন্তু কোনও গাড়ি কখনো থামে না এই জায়গায়। বিশেষত একটা পাহাড়ের গা দিয়ে যখন যেতে হয়, তখন ড্রাইভাররা রামনাম জপ করে। পাহাড়ের আড়াল থেকে দিনে দুপুরেও একটা প্রকাণ্ড ভূতকে মুখ বাড়াতে নাকি দেখেছে কেউ-কেউ।

সেই ভূত আসলে নীল মানুষ।

জঙ্গলের মধ্যে সংসার পেতে নীল মানুষ এমনিতে বেশ ভালোই আছে। তার ছোট্ট বন্ধু গুটুলি নানারকম মজার কথা বলে। তাদের সেবা করবার জন্য রয়েছে তিন-তিনটে কাজের লোক। রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি। এরা কুটনো কোটে, রান্না করে, বাসন মাজে, পা টিপে দেয়। ওই তিনজনকে দিয়ে গুটুলি আবার একটা পুকুরও কাটাচ্ছে। ওরা খন্তা শাবল নিয়ে রোজ সকালে কয়েক ঘণ্টা করে পুকুর খোঁড়ার কাজ করে। কাছে দাঁড়িয়ে গুটুলি খবরদারি করে ওদের ওপর।

রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি আগে ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত। এখন তারা নীল মানুষের চেয়ে গুটুলিকেও কম ভয় পায় না। গুটুলির গাঁটে-গাঁটে বুদ্ধি; এর মধ্যে ওরা পাঁচবার পালাবার চেষ্টা করেছে। পাঁচবারই গুটুলির বুদ্ধিতে ধরা পড়ে গেছে। প্রত্যেকবার ধরা পড়লেই ওদের শাস্তির মেয়াদ বেড়ে যায়।

সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে, তবু এক একদিন নীল মানুষ ছটফট করে ওঠে। মাটিতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে সে কান্না-কান্না গলায় বলে, গুটুলি গুটুলি, ও গুটুলি! আমার কিছু ভালো লাগছে না।

গুটুলি ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করে, কেন, তোমার কী হল, শরীর খারাপ লাগছে?

নীলমানুষ একটা ঝড়ের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর দিল, আমার তো কখনো শরীর খারাপ হয় না! গুটুলি জিগ্যেস করল, কেন তোমার মন খারাপ লাগছে? নতুন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে?

নীলমানুষ বলল, ধুৎ! খাওয়ার কথা কে বলছে! দিনের পর দিন জঙ্গলে পড়ে থাকতে কারুর ভালো লাগে?

গুটুলি বলল, আমার তো খুব ভালো লাগে। আমি এত বেঁটে বলে শহরে গেলেই লোকে আমাকে ঠাট্টা করে, মাথায় চাঁটি মারে, আমার জিনিসপত্র কেড়ে নেয়। তার চেয়ে এই জঙ্গলই বেশ ভালো!

নীলমানুষ বলল, বেঁটে বলে তোমায় দেখে সবাই ঠাট্টা করে, আর এত লম্বা বলে আমায় দেখে সবাই ভয় পায়। কিন্তু আমি তো লেখাপড়া শিখেছি। আমার ইচ্ছে করে শহরে গিয়ে থিয়েটার দেখতে, গান শুনতে, লোকজনের সঙ্গে মিশতে।

গুটুলি বলল, সে আর তুমি এজন্মে পারবে না। তুমি তো শুধু লম্বা নও, তুমি যে তালগাছ। তুমি এখনও রোজ-রোজ লম্বা হচ্ছ। তোমায় আমি প্রথম যেরকম দেখেছিলুম, তার চেয়েও তুমি এখন বেশি লম্বা হয়ে গেছ। মাপলে বোধহয় দশ ফুটেরও বেশি হবে। তার ওপরে তোমার গায়ের রং একেবারে আকাশের মতন নীল, এমনকী তোমার জিভটা পর্যন্ত নীল তোমায় দেখলে তো মানুষ ভয় পাবেই।

আমি যদি শহরে গিয়ে সবার সামনে হাত জোড় করে বলি, ওগো যদিও আমার শরীরটা এত লম্বা আর গায়ের রংটা অন্যরকম কিন্তু আমি তোমাদের মতনই সাধারণ মানুষ। আমি কারুর ক্ষতি করতে চাই না।

তোমার কথা শোনবার আগেই সবাই ভয়ে পালাবে।

কিংবা শুনলেও বুঝতে পারবে না। তোমার গলার আওয়াজটা যে এখন জয়ঢাকের মতন হয়ে গেছে। আমিই শুধু বুঝতে পারি।

যদি ফিসফিস করে বলি? হাঁটু গেড়ে বসে সবার কাছে ক্ষমা চাই?

তা হলে ওরা তোমাকে বেঁধে চিড়িয়াখানা ভরে দেবে!

কেন?

তোমাকে আর কেউ মানুষ বলে মানবে না! ভাববে অন্য কোনও জন্তু!

নীল মানুষ পাশ ফিরে হু-হু করে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল, ওহো হো, কেন আমায় মানুষ বলে মানবে না? আমি মানুষ, মানুষ! ওহো হো, কতদিন ফুটবল খেলা দেখিনি। কতদিন ফুটবল খেলিনি! একসময় আমি ফুটবল খেলতে কী ভালোই না বাসতাম!

নীল মানুষের দুচোখ দিয়ে কলের জলের মতন গলগল করে কান্না ঝরতে লাগল।

গুটুলি একটা গামছা দিয়ে তার চোখ মুছে দিতে-দিতে বলল, আহা, কেঁদো না, কেঁদো না! লক্ষ্মী ছেলে, তোমার জন্য আমি ফুটবল এনে দেব। তুমি এইখানেই ফুটবল খেলবে।

নীল মানুষ ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, কার সঙ্গে খেলব? একা-একা বুঝি ফুটবল খেলা যায়!

ওই রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি খেলবে তোমার সঙ্গে।

দূর দূর, ওরা তো ছিল ডাকাত, ওরা ফুটবল খেলার কী জানে?

একেবারে জন্ম থেকেই তো ডাকাতি শুরু করেনি। ছোটবেলায় ফুটবল খেলেছে নিশ্চয়ই।

যারা ছোটবেলায় ফুটবল খেলে, তারা বড় হয়ে কখনো ডাকাত হয় না। ফুটবল খেললে মন ভালো হয়ে যায়।

ওদের ডেকে জিগ্যেসই করা যাক না, ওরা ফুটবল খেলা জানে কি না!

ডাকা হল রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলিকে। ওরা জল-কাদা মাখা হাত-পা নিয়ে লাইন করে দাঁড়াল সামনে।

নীল মানুষ শুয়েই আছে মাটিতে। গুটুলি একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে জিগ্যেস করলে, অ্যাই, তোরা কেউ ফুটবল খেলা জানিস?

হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল তিন ডাকাত। এ ওর মুখের দিকে তাকাল। হ্যাঁ কিংবা না কোন উত্তরটা দিলে ভালো হবে, তাই-ই বুঝতে পারছে না।

ন্যাড়া গুলগুলি ফস করে বলে ফেলল, হ্যাঁ। আমি অনেক ফুটবল খেলেছি। এ গ্রামে ও গ্রামে খেলতে গেছি। কত গোল দিয়েছি!

গুটুলি চোখ পাকিয়ে বলল, তা হলে লোকের পেটে ছুরি মারতে শিখলি কখন?

ন্যাড়া গুলগুলি লজ্জা পেয়ে কান চুলকে বলল, সে আমাকে অন্য একজন গুরু শিখিয়েছিল। কিন্তু ফুটবল খেলা আমি ভালোই জানি!

দামোদরই বা কম যাবে কেন। সে ঠোঁট উলটে বলল, ফুটবল মানে ওই গোল গোল বলে লাথি মারা তো? সে আমি অনেক লাথিয়েছি।

রঘু ওদের চেয়ে আর একটু বড় ডাকাত। সে বলল, ওবা আর কী খেলেছে। আমি আমাদের গ্রামে খেলুড়ে দলের সর্দার ছিলাম। আমার দলকে খেলার জন্য কত জায়গা থেকে ডেকে নিয়ে যেত। সে অবশ্য গোঁপ দাড়ি ওঠবার আগের কথা।

গুটুলি বলল, আর গোঁপ-দাড়ি গজাবার পর থেকেই বুঝি ডাকাতি শুরু করলি!

রঘু লজ্জা পেয়ে জিভ কেটে বলল, বাববার ওই কথা বলে লজ্জা দাও কেন গুটুলি দাদা! সেসব তো এখন ছেড়ে দিয়েছি।

গুটুলি বলল, ছেড়ে দিয়েছিস, না সুযোগ পাস না। যাক গে, যা এখন পুকুর কাটতে যা। এই নিয়ে পরে আবার কথা হবে!

ওরা চলে যাওয়ার পর গুটুলি নীল মানুষকে বলল, তা হলে দেখলে তো? ওরা তিনজনেই একসময় খেলেছে বলল। আমি আজই বল জোগাড় করছি। তুমি খেলাব মাঠটা ঠিক করবে বলো। ওঠ, ওঠ, ওবকম মন খারাপ কবে শুয়ে থাকতে নেই।

পাহাড়ের একপাশে খানিকটা ঢালু জাযগা। প্রায় সমতলই বলা যায, মাঝে-মাঝে কয়েকটা ছোটোখাটো গাছ রয়েছে। সেই জাযগাটা পছন্দ হল দুজনেরই। নীল মানুষ পটপট করে গাছগুলো উপড়ে ফেলল। শুধু মাঠের দু-ধারে ছোট গাছ রইল। সেই দুটো হবে গোল পোস্ট।

গুটুলি বলল. আজ রাতেই আমি বল জোগাড় করে আনছি। কাল খেলা হবে। আজ ভালো কবে খেয়েদেয়ে ঘুমোও, মন খারাপ করে থেকো না। মন খাবাপ থাকলে ভালো করে খেলা যায় না।

বিকেলের দিকে রঘু আর দামোদরকে নিযে গুটুলি চলে গেল শহরে।

যাওয়ার পথে গুটুলি বলল, এই, তোরা আবার যেন পালাবার চেষ্টা করিস না। তাহলে এবার কিন্তু ধরে এনে কান কেটে দেব!

দামোদর বলল, আরে ছি, ছি, এখন পুকুর কাটা বন্ধ রেখে ফুটবল খেলতে বলছ, এখন কেউ পালায়? খেলাটা কত আমোদের জিনিস!

রঘু বলল, এক হিসেবে জঙ্গলে আটকে রেখে তুমি আমাদের উপকারই করেছ,

গুটুলি দাদা। বছর খানেক এখানে থাকলে পুলিশ আমাদের কথা ভুলে যাবে। তখন নিশ্চিন্তে ফেরা যাবে, কী বলো?

জঙ্গল থেকে ওরা একটা হরিণ মেরে এনেছিল, শহরে এসে সেই মাংস বিক্রি করে যা টাকা পাওয়া গেল, তাতে ফুটবল কেনা হল, আরও চা-বিস্কুট, নুন-মশলা, অন্য খাবার-দাবার কেনা হল।

খেলা আরম্ভ হল পরের দিন সকালে। বেশ সুন্দর রোদ উঠেছে, বেশি জোর হাওয়া নেই, ফুটবল খেলার পক্ষে বেশ ভালো দিন। একদিকে নীল মানুষ, আর একদিকে তিন ডাকাত।

গুটুলি হল রেফারি। সে একটা হুইশলও কিনে এনেছে।

ন্যাড়া গুলগুলি কিছুতেই সামনে আসতে চায় না, সে দামোদরের পেছনে লুকোচ্ছে। দামোদর তাকে বলছে, এই ঠেলছিস কেন, আমাকে ঠেলছিস কেন? রঘু বুক ফুলিয়ে বলল, তোরা সোজা হয়ে দাঁড়া, আগে থেকেই ভয় পাচ্ছিস কেন?

মাঝখানে বলটা রেখে গুটুলি হুইশল বাজাতেই তিন ডাকাত পিছিয়ে গেল অনেকটা। তারা নীল মানুষের কাছাকাছি গিয়ে বলে পা ছোঁয়াতে সাহস পায়নি!

গুটুলি ধমক দিয়ে বলল, ও কী হচ্ছে। মন দিয়ে খেলবি সবাই।

নীল মানুষ বলে একটা শট লাগাল।

অমনি সেটা চোখের নিমেষে প্রায় আকাশে উড়ে চলে গেল পাহাড় পেরিয়ে!

তিন ডাকাত হাঁ করে ওপরের দিকে চেয়ে রইল। নীল মানুষ বলল, যাঃ, ও কী হল? বলটা চলে গেল।

গুটুলি বলল, তাতে চিন্তার কিছু নেই। আমি আরও বল এনে রেখেছি। চিন্তার কিছু নেই। তবে, নীল মানুষ, একটু আস্তে খেলো। ফুটবল খেলাটা তো আর গায়ের জোরের ব্যাপার নয়। একটু আস্তে।

আর একটা বল সে রঘুদের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, এইবার তোমাদের দিক থেকে মারো!

রঘু বলল, দামোদর, তুই মারবি নাকি?

দামোদর বলল, ন্যাড়া গুলগুলিকে দাও। ও ভালো খেলে বলেছিল।

ন্যাড়া গুলগুলি বলল, আবার বল ওই দৈত্যের গায়ে লাগলে যদি সে চটে যায়? ও সবের মধ্যে আমি নেই।

দামোদর রঘুকে বলল, ওস্তাদ, তুমি আমাদের সর্দার, প্রথম বলটা তুমিই মারো।

রঘু বলল, তোরা সব ভীতুর ডিম। দ্যাখ আমি কেমন মারতে পারি। এটা হচ্ছে খেলা।

সাধারণ মানুষের তুলনায় রঘুর গায়ে বেশ জোর। সে কষে একটা ফ্রি কিক ঝাড়ল বলটাকে, সেটাও বেশ অনেক উঁচুতে উঠল।

নীল মানুষ খুশি হয়ে বলল, বাঃ বাঃ, এই তো চাই।

সে লাফিয়ে হেড করতে গেল বলটাকে। তার মাথায় লেগেই বলটা ফটাস করে ফেটে গেল।

নীল মানুষ বলল, ওই যাঃ, কী হল?

গুটুলি বলল, তাতে কিছু হয়নি, তাতে কিছু হয়নি। আরও বল আছে। কিন্তু তোমার আবার লাফিয়ে হেড করার কী দরকার ছিল, বলটা তো এমনিই এসে তোমার মাথায় লাগত!

আর একটা বল সে ছুড়ে দিয়ে বলল, এবারে একটু আস্তে মারো, নিচু করে মারো!

নীল মানুষ বলল, এবারে খুব আস্তে, আলতো করে মারব। এই দ্যাখো।

বলটা সে নিচু করে মারল ঠিকই, সেটা এসে লাগল রঘুর পেটে, কিন্তু তাতে বলটা থামল না। রঘু বলটা সমেত উড়ে গিয়ে ধাক্কা খেল পেছনের গোল পোস্ট গাছটায়। সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান।

দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলিও মাটিতে শুয়ে পড়ে চ্যাচাতে লাগল, ওরে বাবারে, আমরা আর খেলব না, আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা পুকুর কাটব, ফুটবল খেলতে পারব না। ওরে বাবা রে...

নীল মানুষ গুটুলির দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, এটা আমার গোল হয়েছে না হয়নি?

গুটুলি তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, তুমি বড্ড ফাউল করো! আর খেলা হবে না। দেখি রঘু বেচারার কী হল!

আর খেলা হবে না? আর খেলা হবে না বলতে-বলতে নীল মানুষ হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। তারপর মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে কাঁদতে- কাঁদতে বলতে লাগল, খেলা হল না, খেলা হল না আমার! কিছু ভালো লাগে না!

রঘুর মাথায় জল ঢেলে তার জ্ঞান ফেরানো হল। তারপর তিন ডাকাতই দৌড়ে খেলার মাঠ ছেড়ে পুকুর কাটতে চলে গেল স্বেচ্ছায়।

সেই থেকে নীল মানুষের আরও মন খারাপ হয়ে গেল। সে কিছু খেতেও চায় না, কারুর সঙ্গে কথাও বলে না। শুধু গাছতলায় শুয়ে-শুয়ে কাঁদে।

গুটুলি তিন ডাকাতকে ধমক দিয়ে বলল, ছি, ছি, ছি, তোরা কী বল তো! তোরা কি মানুষ! ছেলেটা একটু ফুটবল খেলতে চেয়েছিল, তোরা তাও খেলতে পারলি না? এই মুরোদ নিয়ে তোরা ডাকাত হয়েছিলি?

রঘু আর দামোদর লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল। ন্যাড়া গুলগুলি হাতজোড় করে বলল, দাদা, আর যা করতে বলো সব পারব, কিন্তু ওই খেলার কথা উচ্চারণ করো না। বাবারে, এখনও আমার বুক কাঁপছে!

পরপর দুদিন নীল মানুষ কিছু না খেয়ে রইল আর কাঁদল। গুটুলির কোনও কথাও সে শোনে না।

গুটুলি দেখল এইরকম ভাবে আর কয়েকদিন চললে তো মহাবিপদ হবে। না খেয়ে নীল মানুষ খুব দুর্বল হয়ে যাবে আর সেই সুযোগে রঘু-দামোদরেরা যদি পালাবার চেষ্টা করে, তখন আর তাদের আটকানো যাবে না। এমনকী ওরা তখন নীল মানুষকে মেরে ফেলারও ব্যবস্থা করতে পারে।

সে তখন নীল মানুষের কানের কাছে মুখ এনে বলল, তোমার নিজের খেলা তো হল না। কিন্তু তুমি ফুটবল খেলা দেখবে বলেছিলে, চলো, আমরা শহরে ফুটবল খেলা দেখতে যাব! শহরে যাব!

নীল মানুষ বলল, আমি শহরে গেলে আর কেউ খেলবে? সবাই তো ভয়ে পালাবে!

গুটলি বলল, সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি যদি তোমায় ফুটবল খেলা দেখাতে না পারি, তা হলে আমার নামে তুমি কুকুর পুষো। আমি আর কোনওদিন তোমার কাছে মুখ দেখাতে আসব না! এখন ওঠো। উঠে চাট্টি খেয়ে নাও তো লক্ষ্মীটি!

নীল মানুষ তখন ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠল। নদীতে গিয়ে স্নান করল। তারপর দুদিনের খাওয়া একসঙ্গে খেয়ে মেঘ গর্জনের মতন একটা ঢেঁকুর তুলে বলল, আঃ! এবার দশ খিলি পান দাও তো।

তিন ডাকাত সঙ্গে-সঙ্গে পান সাজতে বসল।

কিন্তু কী করে যে নীল মানুষকে ফুটবল খেলা দেখানো হবে তা আর গুটুলির মাথায় আসে না। যে শহরটায় তারা জিনিসপত্তর কেনাকাটি করতে যায় সেখানে মাঝে-মাঝে ফুটবল খেলা হয় বটে। বাইরের টিমও খেলতে আসে। কিন্তু ফুটবল খেলা তো আর রাত্তিরে হয় না। দিনের আলো থাকতে থাকতেই শেষ হয়ে যায়। দিনের আলোয় নীল মানুষকে নিয়ে সেই শহরে যাওয়ার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। নীল মানুষকে দেখলেই সবাই বাড়িঘর ছেড়ে পালাবে।

একদিন যায়, দুদিন যায়, তিন দিন যায়। নীল মানুষ রোজই জিগ্যেস করে, কী গো গুটুলি, আমার ফুটবল খেলা দেখার কী হল?

গুটুলি হাত তুলে বলে, হবে, হবে, ঠিকই হবে, আমাকে একটু সময় দাও!

জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে যে হাই-ওয়েটা গেছে, গুটুলি প্রায় সেই রাস্তাটার কাছে গিয়ে একটা পাথরের আড়ালে বসে থাকে। কত রকম গাড়ি যায়, সে লক্ষ করে। ট্রাক, মোটর, গাড়ি, বাস। কতরকম মানুষ। কেউ এই জায়গাটায় থামে না।

একদিন সকালে একটা ট্রাকে করে একদল ছেলে যাচ্ছে। হঠাৎ তারা দেখল রাস্তার মাঝখানে একটা বড় পাথরের চাঁই। ট্রাকটা আর যেতে পারবে না, ছেলের দল হৈ হৈ করে উঠল। গতকাল বিকেলে তারা এই পথ দিয়ে গেছে, তখন এরকম কোনও পাথর ছিল না। তারা ড্রাইভারকে বলল, ব্যাক কর। ব্যাক করো। গাড়ি ঘোরাও। এটা ভূতের জায়গা!

ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে দেখল, পেছন দিকে রাস্তায় এখন ওইরকম আব একটা পাথর। সেদিকেও যাবার উপায় নেই।

ছেলেরা তখন ট্রাক থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে সবাই মিলে পাথর ঠেলে সরাবার চেষ্টা করল।

তখন একটা হুইশ্‌ল বেজে উঠল। রেফারির পোশাকে একটা ফুটবল বগলে নিয়ে গুটুলি হাজির হল সেখানে। এক হাত তুলে হাসি মুখে সে বলল, ওহে ছেলের দল, আজ তোমাদের এখানে নেমন্তন্ন। তোমরা তো শহরে ফুটবল খেলতে গিয়েছিলে, এবারে আমাদের টিমের সঙ্গে একটা ম্যাচ খেলে যাও।

কয়েকটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, ভূত! ভূত! এই তো সেই ভূত!

কয়েকটা ছেলে বলল, দূর, এ তো একটা বাঁটকুল। এ ভূত হলেও একে আমরা পরোয়া করি না।

গুটলি বলল, ভূত-টুঁত কিছু নেই। তোমরা এই জঙ্গলের মধ্যে এসে একটা ম্যাচ খেলবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া করবে। ফিরে এসে দেখবে রাস্তা পরিষ্কার! এসো, ভয় পাচ্ছ কেন?

ওই ছেলেদের যে ক্যাপ্টেন, সে বলল, খেলার ব্যাপারে আমাদের কেউ চ্যালেঞ্জ জানালে মোটেই ভয় পাই না! চুনী গোস্বামী, পি. কে. ব্যানার্জি হলেও লড়ে যেতে রাজি আছি। তোমাদের কেমন টিম, বলো তো দেখি।

রাস্তা ছেড়ে ওরা ঢুকে এল বনের দিকে। গুটুলি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল খেলার মাঠে।

ক্যাপ্টেন বলল, কই, তোমাদের খেলোয়াড় কোথায়?

গুটুলি আর একটা হুইশল বাজাতেই বেরিয়ে এল রঘু দামোদর, আর ন্যাড়া গুলগুলি। তারা পরেছে হাফ-প্যান্ট আর গেঞ্জি। আর মার্চ করে গিয়ে দাঁড়াল মাঠের এক দিকে।

এদিকের ক্যাপ্টেন অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, এই তোমাদের টিম আর খেলোয়াড় কই?

গুটুলি বলল, আগে এই টিমকেই হারাও তো দেখি, তারপর আমার অন্য টিম বার করব?

ক্যাপ্টেন বলল, তুমি কে হে বাপু? এই জঙ্গলের মধ্যে শুধু আমাদের আটকিয়ে এখানে নিয়ে এলে? আমাদের ক্লাবের নাম ইলেভেন বুলেটস। আমরা এই জেলার চ্যাম্পিয়ান! এই তিনটে লোকের সঙ্গে আমরা কী খেলব? এ তো ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ।

ওদিক থেকে রঘু সর্দার বলল, ওহে, খুব যে বড়-বড় কথা বলছ খেলেই দ্যাখো না কটা গোল দিতে পারো।

ক্যাপ্টেন বলল, এগারো মিনিটে বাইশটা গোল দেব, দেখবে।

বলটা মাঠের মাঝখানে ছুড়ে দিতেই ক্যাপ্টেন একাই বলটা নিয়ে ড্রিবল করতে-করতে, রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলিকে তিনটে ল্যাং মেরে শুইয়ে দিয়ে ওপাশের গাছটার গায়ে বলটা ঠেকিয়ে বলল, এই নাও এক গোল!

অমনি কোথায় যেন ধুপ-ধাপ শব্দ হল?

ক্যাপ্টেন চমকে উঠে বলল, ওকী? ও কীসের শব্দ!

গুটুলি বলল, ও কিছু না, ও কিছু না, আমাদের একজন সাপোর্টার হাততালি দিচ্ছে!

ক্যাপ্টেনের মুখখানা হাঁ হয়ে গেল, সে বলল, ওই আওয়াজ, ওই তোমাদের সাপোর্টারের হাততালি? কোথায় তোমাদের সেই সাপোর্টার?

গুটুলি বলল, ও নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। নাও-নাও, আবার খেলা শুরু করো।

ক্যাপ্টেন ফিরে এসে আর একজনকে বলল, নে, এবার তুই গোল দিয়ে আয়!

দ্বিতীয় গোলটা অবশ্য তত সহজ হল না। দামোদর-রঘু-ন্যাড়া গুলগুলি যথেষ্ট ফাইট দিল, এমনকী ন্যাড়া গুলগুলি বলটা পায়ে নিয়ে এদের দিকে অনেকটা এগিয়েও এসেছিল, কিন্তু হঠাৎ মেঘের ডাকের মতন বাঃ বাঃ, শব্দ শুনেই সে এমন চমকে গেল যে বল বেরিয়ে গেল তার পা থেকে। এবারেও তারা গোল খেল।

এইরকম ভাবে পরপর এগারোটা গোল খাওয়ার পর এদিককার ক্যাপ্টেন বলল, গোল খেয়ে পেট ভরেছে, না আরও চাও?

রঘু সর্দার বলল, আর চাই না। যথেষ্ট হয়েছে। কী বলো গুটুলিদা?

গুটুলি বলল, হ্যাঁ, এবারে তোমরা সরে যাও। এবারে আমাদের আর একজন খেলোয়াড় আসবে। তোমরা তার সঙ্গে একটু খেলে দ্যাখো তো বাপু!

গুটুলি আবার হুইশল বাজাতেই গাছপালার আড়াল থেকে এক লাফে এসে হাজির হল নীল মানুষ। তার মাপের তো কোনও প্যান্ট হয় না। তাই সে একটা ধুতি মালকোছা মেরে পরেছে। আর খালি গায়ে সে এসেই হাতজোড় করে বলল, বেশি জোরে বল মারব না। খুব আস্তে-আস্তে, কোনও ভয় নেই!

কিন্তু তার কথা কে শুনবে। ওদিককার এগারো জন খেলোয়াড়ই অজ্ঞান।

নীল মানুষ বলল, এ কী হল? আর খেলা হবে না? ওদের গোল শোধ দেওয়া হবে না?

গুটুলি এক ডজন ফুটবল নিয়ে এসে বলল, খেলা দেখার শখ ছিল, সে শখ তো মিটেছে! এ নাও, এবারে একটা-একটা করে মারো, ওদের গোল শোধ দাও।

পরপর বারোখানা বলে কিক কষিয়ে ওপারে পাঠিয়ে নীল মানুষ হাসি মুখে বলল, শোধ দেওয়ার পরেও একখানা বেশি!

গুটুলি বলল, যথেষ্ট হয়েছে। এবারে তুমি রাস্তার ওপরের পাথর দুটো সরিয়ে দিয়ে এসো। আমি এই ছেলেগুলোর জলখাবারের ব্যবস্থা করি।

নীল মানুষ খুশি মনে লাফাতে-লাফাতে চলে গেল রাস্তার দিকে।

নীল মানুষের খেলা

বাবা-মা'র সঙ্গে গাড়ি করে বেড়াতে যাচ্ছে হাসি আর খুশি। ওরা দুই বোন যমজ। এখন বারো বছর বয়েস, কিন্তু হুবহু একরকম দেখতে। একই রকম টানা-টানা চোখ আর কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। দুজন সমান লম্বা, এক চুলও কম-বেশি নয়। একমাত্র মা ছাড়া কেউ ওদের আলাদা করে চিনতে পারে না, এমনকী বাবাও মাঝে-মাঝে গুলিয়ে ফেলেন।

দুজনে দুরঙের ফ্রক পরে আছে। হাসি হলুদ আর খুশি গোলাপি। দুজনের স্বভাবেও অবশ্য একটা তফাত আছে যা অনেকে টের পায় না।

হাসি যখন-তখন অবাক হয়, যে কোনও নতুন জিনিস দেখলেই চোখ বড়-বড় করে তাকায়। আর খুশি ঠোঁট উলটে বলে, এ আর এমন কী!

নামের সঙ্গে ওদের স্বভাব ঠিক মেলে না। হাসি যত না হাসে, তার চেয়ে ভয় পায় বেশি। আর খুশিকে খুশি করা খুব শক্ত।

ছোট-ছোট পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। বাবা চালাচ্ছেন গাড়ি, পাশে বসে আছে হলুদ ফ্রক পরা হাসি। আর পিছনের সিটে, মায়ের পাশে গোলাপি ফ্রক পরা খুশি। মা ঘুমিয়ে পড়ছেন মাঝে- মাঝে।

হঠাৎ হাসি চেঁচিয়ে উঠল, বাবা, ও কে? ওই লোকটা কে?

বাবা বললেন, কোথায় কে?

হাসি বলল, ওই যে জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা নীল রঙের মানুষ!

বাবা বললেন, ধ্যাৎ! ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি? নীল রঙের মানুষ! আবার হয় না কি?

হাসি বলল, আকাশের মতন নীল।

খুশি বলল, পেনের কালি বেশি পড়ে গেলে যেরকম ধ্যাবড়া হয় সেইরকম নীল।

হাসি বলল, লোকটা প্রকাণ্ড লম্বা!

খুশি বলল, এমন কিছু লম্বা নয়। ছোটকাকার চেয়ে খানিকটা বেশি! ধ্যাড়েঙ্গা মতন!

বাবা গাড়িতে ব্রেক কষে বললেন, তোরা কী বলছিস রে?

সত্যি ওইরকম একটা মানুষ দেখেছিস নাকি?

মা-এর মধ্যে জেগে উঠে ভয় পেয়ে বললেন, গাড়ি থামালে কেন? পালাও, পালাও, নির্ঘাৎ ডাকাত।

খুশি বলল, ডাকাত না ছাই! হাতে বন্দুক-টন্দুক কিছু নেই!

বাবা ড্যাসবোর্ড বোর্ড থেকে একটা রিভলভার বার করলেন।

বেশি দূর যেতে হলে তিনি সঙ্গে অস্ত্র রাখেন। তিনি সহজে ভয় পান না!

তিনি বললেন, দিনের বেলায় আবার ডাকাত আসবে নাকি? একবার নীল মানুষটাকে তো দেখতে হয়। মেয়েরা বলছে যখন।

রাস্তাটা ফাঁকা। অন্য গাড়ি বিশেষ নেই। বাবা গাড়িটাকে ব্যাক করে নিয়ে এলেন অনেকখানি। একটা ফুলভর্তি বড় শিমুল গাছের কাছে আসতেই হাসি বলে উঠল, এইখানে দেখেছি!

বাবা ও মা দুজনেই সেদিকে তাকালেন। তারপর বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন।

শিমুল গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে একজন বেঁটে মানুষ, সাড়ে তিনফুটের বেশি নয়। মনে হয় যেন বাচ্চা ছেলে, কিন্তু মুখটা বাচ্চাদের মতন নয়, গোঁফ আছে। তার গায়ের রং নীল নয় মোটেই, সাধারণ মানুষের মতন।

বাবা বললেন, তোরা বুঝি আমার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করছিলি।

হাসি প্রতিবাদ করে বলে উঠল, না, না, আমি সত্যি দেখেছি এই গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নীল রঙের একটা প্রকাণ্ড লম্বা মানুষ।

গম্ভীরভাবে বলল, লম্বা লোকটা বেঁটে হয়ে গেছে আর গায়ের নীল রং মুছে ফেলেছে।

বাবা গাড়িটাকে আবার স্টার্ট দিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার, ইঞ্জিন ঝাঁ ঝাঁ শব্দ করে উঠলেও গাড়ি একটুও এগোলো না।

এই সময় গাছতলা থেকে রাস্তার মাঝখানে এসে গুটুলি ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে বলল, গাড়ি যাবে না, যাবে না।

বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, কী হল? গাড়ি চলছে না কেন?

গুটুলি হাততালি দিতে-দিতে বলল, যাবে না, যাবে না! আপনারা এখানে নেমে পড়ুন।

বাবা ধমক দিয়ে বললেন, কেন, আমরা এখানে নামব কেন?

গুটুলি ধমকে একটুও ভয় না পেয়ে হেসে বলল, নামুন না!

আপনাদের সঙ্গে একটু গল্প করব!

হাসি বলল, গল্প শুনব, ওর গল্প শুনব!

খুশি বলল, ও আবার কী গল্প বলবে! পচা গল্প?

বাবা আরও জোর ধমক দিয়ে গুটুলিকে বললেন, আমাদের এখন গল্প শোনার সময় নেই। সরে যাও।

গুটুলি বলল, তাহলে আপনাদের গাড়ি পিছু হটবে!

সত্যিই তাই, ম্যাজিকের মতন, গাড়িটা ওর কথার পেছন দিকে চলতে লাগল!

মা পেছন ফিরে তাকিয়েই ওরে বাবারে বলে আর্ত চিৎকার করেই অজ্ঞান।

বাবা দেখলেন, একটা বিশাল লম্বা নীল রঙের মানুষ ঝুঁকে পড়ে গাড়িটা পেছন দিকে টানছে!

হাসি বলল, দৈত্য! দৈত্য!

খুশি বলল, মোটেই দৈত্য নয়। একটা ধ্যাড়েঙ্গা লোক!

বাবা ভয় পেলেন না বটে, কিন্তু তাঁর কপালে ঘাম জমে গেল। রিভলভারটা হাতে নিয়ে কী করবেন ভেবে পেলেন না।

গাড়িটা এবার থেমে গেল।

বাবা সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে নেমে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি কে? আমি এক্ষুনি গুলি করব!

নীল মানুষটি হাতের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, আমার নাম রণজয়। আপনি আমার দিকে রিভলভার তুলে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? আমি তো আপনাদের কোনও ক্ষতি করিনি!

বাবা দারুণ অবাক হয়ে বললেন, তুমি, তুমি বাঙালি?

রণজয় বলল, আপনার বাংলা কথা শুনে উত্তরে বাংলা কথা বললাম, তাতেও বুঝতে পারলেন না?

খুশি ঠোঁট উলটে বলল, অনেক অবাঙালিরাও বাংলা বলতে পারে। আমাদের বাড়ির সামনে যে পানওয়ালা, সে তো বিহারী, সেও সুন্দর বাংলা বলে।

বাবা জিগ্যেস করলেন, তোমার এরকম বিকট চেহারা হল কী করে?

গুটুলি এবার কাছে এগিয়ে এসে চোখ পাকিয়ে বলল, খবরদার, আমার বন্ধুকে বিকট বলবেন না! কোনও-কোনও মানুষ কি লম্বা হয় না? গিনেস বুক অফ রেকর্ডে আছে, পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা লোকটি আট ফুট চার ইঞ্চি।

রণজয় বলল, আমি তার চেয়ে মোটে একটুখানি বেশি। ন-ফুট দু-ইঞ্চি।

বাবা জিগ্যেস করলেন, তুমি গায়ে এরকম নীল রং মেখেছ কেন? সঙ সেজেছ?

রণজয় তার একটা হাত গাড়ির জানলায় রেখে খুশিকে বলল, তুমি দেখো তো খুকি, এটা পাকা রং, না আমি রং মেখে সঙ সেজেছি?

অতবড় হাতের পাঞ্জাখানা এত কাছে দেখে খুশি অবাক হয়ে বলে উঠল, হি-ই-ই! এত বড়? আর সত্যি-সত্যি নীল!

হাসি খিলখিল করে হেসে উঠল। খুশি সহজে অবাক হয় না, আজ সে সত্যিকারের অবাক হয়েছে।

খুশি তার বোনকে বলল, তোরও তো মুখে সহজে হাসি ফোটে না। এখন হাসছিস যে বড়!

হাসি বলল, আমি ভয় পাইনি!

রণজয় খুশিকে বলল, খুকি চিমটি কেটে দ্যাখো না, রং ওঠে কি না!

খুশি তার হাতে একটা রাম চিমটি কেটে বলল, আমাকে খুকি বলবে না। আমি মোটেই খুকি নই, আমার নাম খুশি!

মা এই সময় জ্ঞান ফিরে ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, কী হল? কোথায় গেল? চোখে ভুল দেখেছি!

তারপরেই আবার রণজয়কে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, ডাকাত! ডাকাত! মেয়ে দুটোকে বাঁচাও! ওগো, তুমি গুলি করে মারছ না কেন?

বাবা রিভলভারটা পকেটে পুরে ফেলেছেন। তিনিও হাসছেন!

রণজয় বলল, বউদি, ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি রণজয়। আমি মোটেই ডাকাত নই!

হাসি বলে উঠল, কী মজা! কী মজা! এত বড় একটা লোক মাকে বউদি বলেছে!

মা বললেন, সত্যিই আমাকে বউদি বলে ডাকল নাকি রে?

বাবা বললেন, ওহে রণজয়, তুমি নীল মানুষ হলে কী করে?

রণজয় বলল, একটা অন্য গ্রহে গিয়েছিলাম, তাই গায়ের রংটা বদলে গেল।

খুশি ভুরু তুলে জিগ্যেস করল, অন্য গ্রহে? সত্যি?

হাসি হাসতে-হাসতে বোনকে বলল, তুই আবার অবাক হয়েছিস?

গুটুলি বলল, মোটে একটা গ্রহে যায়নি! অনেকগুলো ঘুরে এসেছে। সেই গল্প শুনতে চাও?

দুই বোন একসঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ শুনব। হ্যাঁ শুনব!

বাবা বললেন, তা কী করে হবে? আমাদের রাঁচি পৌঁছতে হবে সন্ধের আগে।

এর মধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গেছে! বরং ক্যামেরাটা বার কর, নীল মানুষের একটা ছবি তুলে নে!

খুশির কাছে ক্যামেরা। সে নেমে এসে খচাখচ করে দু-তিনটে ছবি তুলে নিল নীল মানুষের। রণজয় বেশ পোজ দিয়ে দাঁড়াল।

গুটুলি বলল, কী স্বার্থপর! আমার ছবি তুলল না।

বাবা বললেন, তাই তো, তাই তো! খুশি ওরও ছবি তোল!

এই সময় দূর থেকে আর একটা জিপ আসছে দেখা গেল। সেদিকে তাকিয়ে রণজয় বলল, হুকুম সিং-এর দল মনে হচ্ছে, গুটুলি লুকিয়ে পড়!

চোখের নিমেষে রণজয় আর গুটুলি ঢুকে গেল জঙ্গলে।

বাবা বললেন, কী ব্যাপার, ওরা পালাল কেন?

জিপটা কাছে এগিয়ে আসছে।

বাবা বললেন, খুশি উঠে পড়। আমরা এগোই।

ওদের গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে একটুখানি যেতে না যেতেই জিপটা খুব জোরে এসে আটকে দিল ওদের রাস্তা। রাইফেল নিয়ে দুটো লোক নেমে পড়ে বলল, বাঁচতে চাও তো থামো!

বাবা দেখলেন, এদের রাইফেলের সঙ্গে রিভলভার দিয়ে যুদ্ধ করা যাবে না।

তিনি বললেন, তোমরা কী চাও?

একজন রাইফেলধারী বলল, হুকুম সিং-এর হুকুম? এই রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে খাজনা দিতে হবে! সঙ্গে টাকা-কড়ি, গয়নাগাঁটি যা আছে দিয়ে দাও!

বাবা বললেন, তোমরা ডাকাতি করতে এসেছ? জানো, আমি একজন সরকারি অফিসার?

রাইফেলধারী বলল, চুপ! বেশি বকবক করবি না! বাঁচতে চাস তো, যা আছে সব দিয়ে দে। নইলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!

খুশি বলল, এই, আমার বাবাকে তুই তুই বলছ কেন?

অন্য রাইফেলধারী বলল, বাঃ বাঃ! এই ফুটফুটে দুটোকেও ধরে নিয়ে যাব?

বাবা হতাশভাবে এদিক-ওদিক তাকালেন। লম্বা নীল মানুষটাও ডাকাত দেখে ভয়ে পালাল। কাপুরুষ!

জিপ গাড়ির ড্রাইভার নেমে এসে বলল, কই দেখি গয়না-টয়না কী কী আছে? সঙ্গে খাবারদাবারও আছে নাকি!

ঠিক এই সময় জঙ্গলের ভেতর থেকে দুটো দড়ির ফাঁস উড়ে এসে রাইফেলধারী দুজনের গলায় লাগল। তারপর তাতে টান পড়তেই লোক দুটো ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। গলায় ফাঁস লেগে প্রায় দম বন্ধ অবস্থায় তারা গোঁ গোঁ করতে লাগল।

জঙ্গল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল গুটুলি। রাইফেল দুটো কেড়ে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে সেদিকে বলল, এবার ফাঁস আলগা করে দাও! না হলে মরে যাবে।

ফাঁস আলগা হয়ে যেতেই লোক দুটো আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। জিপ গাড়ির ড্রাইভারটা এই কাণ্ড দেখে ভয়ে-ভয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই গুটুলি প্রায় শূন্যে লাফিয়ে উঠে তার মুখে একটা লাথি কষাল!

ওইটুকু মানুষ এমন ক্যারাটের প্যাঁচ জানে হাসি তার দেখে খুশি হেসে ফেলল ঝরঝর করে।

এবার নীল মানুষ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোক দুটোকে জিগ্যেস করল, এই, তোদের সর্দার হুকুম সিং কোথায়?

নীল মানুষের বজ্রের মতন গলার আওয়াজ শুনে ওরা কেঁপে উঠলেও মুখে কিছু বলল না।

নীল মানুষ তখন বাবার দিকে ফিরে বলল, এই হুকুম সিং-এর দলবল এই রাস্তার যাত্রীদের বড্ড জ্বালাতন করে। কিন্তু সেই লোকটা এত ভীতু যে নিজে কখনো আসে না। দেখতে পেলে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে দেব!

খুশি বলল, নীল মানুষ, ওরা আমার বাবাকে অপমান করেছে। ওদেরও শিক্ষা দাও তো!

নীল মানুষ হেসে বলল, আমায় কিছু করতে হবে না। গুটুলি দিয়ে দেবে!

সেই লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, এই তোরা তো তিনজন আছিস? একা-একা কে গুটুলির সঙ্গে লড়তে পারবি খালি হাতে?

জিপ গাড়ির ড্রাইভারটা একটা লাথি খেয়ে শুয়ে পড়েছে। আর উঠল না। অন্য লোকদুটো বলল, আমরা মাপ চাইছি। আমাদের ছেড়ে দাও। আমাদের দোষ নেই হুকুম সিং পাঠিয়েছে!

নীল মানুষ বলল, যেই ধরা পড়ে গেলি, অমনি মাপ চাইছিস! আমি আর গুটুলি না থাকলে এঁদের কাছ থেকে সর্বকিছু কেড়ে নিতিস না? এখন লড়বি না মানে, লড়তেই হবে!

একজনের চুলের মুঠি ধরে উঁচু করে সে ফেলেছিল গুটুলির সামনে। গুটুলি আদর করার মতন তার দুই গালে ছোট-ছোট চড় মারতে লাগল। তারপর একখানা রাম চড় মেরে ফেলে দিল চিৎ করে।

অন্য লোকটি বলল, ঠিক আছে, আমি লড়ব।

সে গুটুলির দিকে একটা ঘুঁষি ছুড়তেই সে ফুড়ুৎ করে সরে গেল। তারপর লোকটা যতই মারতে যায়, গুটুলিকে ছুঁতেই পারে না।

নীল মানুষ হাততালি দিয়ে বলছে, বা বা, লড়ে যাও! লড়ে যাও।

এবার গুটুলি এক লাফে লোকটার পেছন দিক দিয়ে ওর ঘাড়ে চড়ে বসল। দুহাতে চেপে ধরল লোকটার চোখ। সে আর কিছুতেই গুটুলিকে ফেলতে পারে না। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, ছেড়ে দাও, আমি হেরে গেছি।

নীল মানুষ বলল, হেরেছ তো? বেশ! এবার ঘোড়া খেলা হবে। তুমি ঘোড়া হও, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ো, গুটুলি তোমার পিঠে চাপবে।

লোকটা আর প্রতিবাদ করার সাহস পেল না। গুটুলি তার পিঠে চেপে বলল, এই ঘোড়া, হ্যাট-হ্যাট!

অন্য লোক জ্বলজ্বল করে চেয়ে দেখছে!

নীল মানুষ তাকে বলল, কী হে, আমি তোমার পিঠে চাপব নাকি?

সেই লোকটা অমনি নীল মানুষের পায়ের কাছে পড়ে গিয়ে বলল, দয়া করুন। আপনি চাপলে আমি চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাব।

হাসি আর খুশি এত বেশি হাসছে যে থামতেই পারছে না! এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে।

বাবা একসময় বললেন, যথেষ্ট হয়েছে, এবার আমাদের যেতে হবে নীল মানুষ, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব? তুমি আমাদের প্রাণে বাঁচিয়েছ তো বটেই, টাকা-কড়িও বাঁচিয়েছ। তা ছাড়া আমার এই মেয়ে দুটি, ওদের নাম হাসি আর খুশি হলেও ওদের আমি একসঙ্গে এত হাসতে দেখিনি কখনও।

নীল মানুষ বলল, জঙ্গলে তো আমাদের সময় কাটে না। তাই মাঝে-মাঝে আমরা এরকম খেলা করি।

গুটুলি কাছে এসে বলল, শুধু নীল মানুষকে ধন্যবাদ দিলেন, বা! আমি বুঝি কিছু করিনি? আমার ছবিও তোলা হল না।

বাবা বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তুমিও অনেক কিছু করেছ। ছোট্ট চেহারা হলেও তোমার অনেক শক্তি। খুশি, ওর ছবি তোল।

নীল মানুষ এবার গুটুলিকে তুলে নিল নিজের কাঁধে। গুটুলি দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসল। ক্যামেরার দিকে চেয়ে সে গান গেয়ে উঠল :

আমরা দুটি ভাই
লোককে তাক লাগাই
টাকা-পয়সা কিচ্ছু চাই না।
শুধু মজা চাই।

নীল মানুষের পরাজয়

ওদিকে দারুণ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হল হঠাৎ। শীতকাল, এ সময় এরকম বাদলা হওয়ার কথা নয়। রণজয় আর গুটুলির ঘুম ভেঙে গেল। পাহাড়ের গায়ে একটা ছোটমতন গুহাকে ওরা বড় করে নিয়েছে, সেটাই এখন ওদের বাড়ি। রণজয় অন্য জায়গা থেকে একটা বড় পাথর এনে গুহার মুখটা আড়াল করে রেখেছে, বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না।

ঝড়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর গুটুলি প্রথমে উঠে এসে বাইরে একটু উঁকি মারল। মড়-মড় করে গাছ ভাঙার শব্দ হচ্ছে, বাতাসেও একটা গোঁ-গোঁ শব্দ। এরকম ঝড়-বৃষ্টি গুটুলি সাতজন্মে দেখেনি। সে ভয় পেয়ে ভেতরে ছুটে এসে রণজয়কে ডাকল।

রণজয়ের ঘুম ভেঙে গেলেও সে সহজে উঠতে চায় না। বেশ শীত পড়েছে, সে কম্বলটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বলল, বৃষ্টি পড়ছে তাতে ভয়ের কী আছে? আমাদের গুহার মধ্যে তো আর জল ঢুকবে না!

গুটুলি বলল, কীরকম ভয়ংকর একটা শব্দ হচ্ছে। বাইরে এসে একবার শুনে দ্যাখ! মনে হচ্ছে যেন মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে। যদি সারা পৃথিবী ভেসে যায়!

রণজয় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, হেঃ, পৃথিবী ভাসলেই হল আর কী! এখন ঘুমোও। সকালে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

এই সময় বাইরে যেন একসঙ্গে একশোটা কামান দাগার শব্দ হল। গুটুলি রণজয়ের হাত চেপে ধরে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, ও কী! পাহাড় ভেঙে পড়ছে!

রণজয় হেসে বলল, এত ভয় কীসের গুটুলি ভায়া? বাজের আওয়াজ শোনোনি কখনো?

এত জোরে বাজ পড়ে কখনো?

আমরা গুহার মধ্যে রয়েছি তো, তাই আওয়াজটা বেশি মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, চল দেখি বাইরে। রঘু কোথায়?

রঘু কাঁদছে!

রণজয়কে এবারে উঠতেই হল। গুহাটা অনেকখানি লম্বা, ভেতরে দু-তিনটে ঘরের মতন খোপ-খোপ। তারই একটা খোপে ওদের রান্নাঘর, সেইখানেই থাকে রঘু। শীতের জন্য সেই ঘরটায় আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে।

রণজয় আর গুটুলি সেই ঘরে এসে দেখল, রঘু দেয়ালে পিঠ দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে আর বলছে, আজ শেষ হয়ে গেলুম! আজ আকাশ ভেঙে পড়বে, পাহাড় ভেঙে পড়বে, আর কোনওদিন বাড়ির লোকদের দেখতে পাব না গো!

রণজয় বলল, দেশের কী অবস্থা! ডাকাতগুলো পর্যন্ত এত ভীতু হয়? এই রঘু, চল, আমার সঙ্গে বাইরে চল, একটু বৃষ্টিতে ভিজে আসি!

এই সময় মেঝেটা একটু কেঁপে উঠল আর বাইরে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ হল।

গুটুলি দারুণ ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, ভূমিকম্প শুরু হয়েছে! মহাপ্রলয়!

রণজয় এবারে খুব দ্রুত গুটুলি আর রঘুকে দুহাতে তুলে নিয়ে ছুটে চলে এল বাইরে। ভূমিকম্প হলে গুহার মধ্যে থাকা সত্যিই বিপজ্জনক। বাইরে বৃষ্টি একেবারে চাবুকের মতন। একের পর এক গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ হচ্ছে। কাছেই একটা ছোট পুকুর আছে, তার পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। রঘু আর গুটুলিকে দুটি বেড়ালছানার মতন দু-বগলে নিয়ে রণজয় ছুটল সেদিকে।

পুকুরটার ধারে পৌঁছতেই হঠাৎ খুব জোরে একটা বিদ্যুৎচমকে চতুর্দিক সাদা হয়ে গেল। রণজয় মুখ তুলে আকাশটা দেখবার চেষ্টা করেও পারল না। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

রণজয়ের যখন জ্ঞান ফিরল, তখন ঝড়-বৃষ্টির কোনও চিহ্ন নেই। দিনের আলো ফুটে গেছে। রণজয় ধড়মড় করে উঠে বসল। কী হয়েছিল কাল রাত্তিরে? ভূমিকম্পে

চৌচির হয়নি, পাহাড়ও ভেঙে পড়েনি, তবু শুধু বিদ্যুৎচমকে সে অজ্ঞান হয়ে গেল কেন? তার মাথায় কি বাজ পড়েছিল? মাথায় বাজ পড়লে কি কেউ বাঁচে?

রণজয় নিজের দুগালে চড় মারল কয়েকটা। ব্যথা লাগছে তো। তা হলে সে মরেনি। গুটুলি আর রঘু তার দুপাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। পুকুর থেকে আঁজলা করে জল এনে রণজয় ছিটিয়ে দিল ওদের মুখে। একটু বাদেই ওদেরও জ্ঞান ফিরল।

রঘু চোখ মেলেই বলল, আমি কি মরে গেছি?

গুটুলি বলল, আমার কী হয়েছিল?

রণজয় বলল, ঝড়ে শুধু কয়েকটা গাছ ভেঙে পড়েছে, আর কিছুই হয়নি। সামান্য একটু মাটি কেঁপেছিল। রঘু যা, উনুনে আগুন দে। চা আর রুটি বানা, আমার খিদে পেয়েছে!

রঘু আবার কাঁদতে শুরু করে দিল ভেউ-ভেউ করে।

রণজয় অবাক হয়ে বলল, আরে, এ ডাকাতটা দেখছি বাচ্চাদেরও অধম হয়ে গেছে। এই, তোর এখন আবার কান্নার কী হল?

রঘু বলল, আমি দোষ করেছি বটে, তা বলে কি কোনওদিন ছুটি পাব না?

গুটুলি বলল, কতগুলো ডাকাতি করেছিলি মনে নেই? তোকে যদি পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতুম, তা হলে সারাজীবন জেলে পচতে হতো!

রঘু বলল, রোজ-রোজ রান্না করার চেয়ে জেলে থাকাও ভালো!

রণজয় ধমক দিয়ে বলল, যা, আগে চা-টা তৈরি কর। আমরা গুহায় আসছি একটু বাদে।

রঘু চলে যাওয়ার পর গুটুলি বলল, ওস্তাদ, দ্যাখো, আকাশ এখন একেবারে পরিষ্কার। গতকাল বিকেলেও এরকম পরিষ্কার ছিল। তবু রাত্তিরে ওরকম ঝড়-বৃষ্টি হল কী করে? আমরাই বা অজ্ঞান হয়ে গেলুম কেন?

রণজয় বলল, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে...

সে কথা শেষ করার আগেই পেছনে শোনা গেল মানুষের পায়ের শব্দ। ওরা পেছন ফিরতেই দেখল, দুটি কিশোরী মেয়ে পুকুরটার দিকে আসছে।

মেয়ে দুটিকে একেবারে হুবহু একরকম দেখতে। দুজনেরই বয়েস হবে তেরো-চোদ্দ, মাথায় লম্বা চুল, একজন একটা লাল রঙের, অন্যজন একটা হলদে ফ্রক পরা। দুজনেরই কাঁধে ঝোলা-ব্যাগ। দুজনেরই পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা জুতো।

ওরা যেমন মেয়েদুটিকে দেখে অবাক হয়েছে, তেমনি মেয়ে দুটিও ওদের দেখে অবাক ভাবে থমকে দাঁড়াল। রণজয় প্রায় আট ফুট লম্বা, গায়ের রং আকাশের মতন নীল, আর গুটুলিকে দেখতে একটি বাচ্চা ছেলের মতন হলেও তার নাকের নিচে পুরুষ্টু গোঁফ!

রণজয় আর গুটুলিকে দেখার পর মেয়ে দুটি একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

রণজয়ের গলার আওয়াজ বাজখাঁই ধরনের, নতুন লোকরা শুনলে চমকে যায়। তাই সে গুটুলির চোখের দিকে তাকিয়ে একটা ইঙ্গিত করলে।

গুটুলি জিগ্যেস করল, এই, তোমরা কারা গো? এই বনে কী করে এলে?

হাসি থামিয়ে লাল রঙের ফ্রক পরা মেয়েটি তার ঝোলা থেকে একটা ছোট্ট টেপ রেকর্ডার বার করে কানের কাছে এনে কী যেন শুনল। তারপর সেটা অন্য মেয়েটির হাতে দিয়ে সে বলল, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি!

গুটুলি বলল, তোমরা এখানে বেড়াতে এসেছ? কোথা থেকে এলে? কীসে করে এলে? তোমাদের সঙ্গে আর কে আছে?

হলদে ফ্রক পরা মেয়েটি এবার অন্য মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ও আমার সঙ্গে আছে, আমি ওর সঙ্গে আছি। আর কেউ নেই।

তোমরা এই জঙ্গলের মধ্যে এলে কী করে! তোমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে?

লাল ফ্রক এবার হলদে ফ্রকের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের গাড়ি কি খারাপ হয়ে গেছে? কী জানি! আমরা বেড়াতে এসেছি।

এই জঙ্গলে তোমরা দুটি মেয়ে বেড়াতে এসেছ, সঙ্গে কেউ নেই, এ তো বড় আশ্চর্যের কথা।

হলদে ফ্রক বলল, বেড়াতে আসা বুঝি আশ্চর্যের কথা? তোমরা এখানে কী করছ, তোমরা বেড়াতে আসোনি?

রণজয় যতদূর সম্ভব আস্তে ফিসফিস করে গুটুলিকে বলল, সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কী জানিস, এই মেয়ে দুটো আমায় দেখে ভয় পেল না কেন? এই প্রথম দেখছি, কেউ আমায় দেখে ভয়ে কাঁপছে না। মেয়ে দুটো তো মনে হচ্ছে, ক্লাস এইট-নাইনে পড়ে! আমাদের দেখে হাসতে শুরু করল?

গুটুলি বলল, খুব পাকা মেয়ে। একা-একা বেড়াতে এসেছে!

তারপর সে গলা তুলে ওদের বলল, না, আমরা এখানে বেড়াতে আসিনি। আমরা এখানে থাকি!

হলদে ফ্রক ও লাল ফ্রক চোখাচোখি করল একবার, তারপর লাল ফ্রক বলল, তোমরা জঙ্গলে থাকো? তোমরা কী জন্তু?

এইবারে রণজয় প্রচণ্ড জোরে হুংকার দিয়ে বলল, অ্যাঁ, কী বললে? আমরা জন্তু?

রঘু ডাকাতের মতন লোকও প্রথমবার রণজয়ের এইরকম হুংকার শুনে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিল। মেয়ে দুটি আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর তারা পুকুরের ধারে এসে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

গুটুলি রেগে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, এই খুকি, আমাদের জন্তু বললে যে? আবার হাসছ?

দুটি মেয়েই প্রত্যেকবার কথা বলার আগে নিজেরা চোখাচোখি করে কী যেন বলে নেয়। এবারে হলদে ফ্রক বলল, ভুল বলেছি বুঝি? তোমরা বললে কি না তোমরা জঙ্গলে থাকো, তাই আমরা ভাবলাম, জঙ্গলে তো জন্তুরাই থাকে।

গুটুলি বলল, জঙ্গলে মানুষও থাকে। কিন্তু তোমাদের বয়েসি মেয়েরা জঙ্গলে একা-একা আসে না। এখানে অনেক রকম বিপদ হতে পারে।

লাল ফ্রক বলল, আমরা একলা আসিনি তো, দুজনে এসেছি। এখানে কীরকম বিপদ হয়?

গুটুলি বলল, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার থাকে, অনেক চোর-ডাকাতও লুকিয়ে থাকে জঙ্গলে।

হলদে ফ্রক বলল, তোমরাই বুঝি চোর-ডাকাত? তোমরা আমাদের বিপদে ফেলবে?

গুটুলি বলল, আচ্ছা মুশকিল তো, এই মেয়ে দুটো কিছু বোঝে না। আমরা চোর-ডাকাত হলে কি তোমাদের আগে থেকে সাবধান করে দিতুম?

রণজয় বলল, আহা রে, মেয়ে দুটি সত্যি বড় সরল। ওরা বেড়াতে এসেছে, খুশি মতন বেড়িয়ে নিক। আমরা ওদের পাহারা দেব।

মেয়ে দুটি আঁজলা করে পুকুর থেকে খানিকটা জল তুলে সেই জলের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর সেই জলে জিভ ঠেকাল।

গুটুলি চেঁচিয়ে বলল, ওই পুকুরের জল খেও না। কাছেই একটা ঝরনা আছে, সেই ঝরনার জল ভালো।

ওরা সেই কথায় তেমন আমল দিল না। চুমুক দিয়ে জলটুকু খেয়ে নিয়ে একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে-কী যেন বলল।

পুকুরের ধারে ছোট-ছোট ঘাসফুল ফুটে আছে। ওদের একজন একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তাতেও জিভ ঠেকাল। অন্যজন আর একটা ফুল তুলে খেয়ে নিল টপ করে।

রণজয় বলল, আহারে, ওরা বোধহয় রাস্তা হারিয়ে বনের মধ্যে চলে এসেছে। খুব খিদে পেয়েছে ওদের। এই গুটুলি, ওদের ডাক না। ওরা আমাদের সঙ্গে জলখাবার খেতে পারে।

গুটুলি জিগ্যেস করল, ওগো, ও মেয়ে। তোমাদের নাম কী?

লাল ফ্রক পরা মেয়েটি বলল, নাম? আমাদের নাম? হ্যাঁ, আমাদের একটা করে নাম আছে। আমার নাম রুমুনা আর ওর নাম ঝুমুনা। এইবার বলো তো, তোমাদের নাম কী?

গুটুলি বলল, আমাকে সবাই গুটুলি বলে ডাকে। আর এই যে আমার বন্ধুকে দেখছ, এর নাম রণজয়, কিন্তু ওকে সবাই বলে নীল মানুষ।

ঝুমুনা জিগ্যেস করল, তোমরা একজন এত ছোট, আর একজন এত বড় কেন?

এই সময় দূর থেকে রঘু চেঁচিয়ে বলল, চা, চা রেডি! বাবুদের কি পুকুর পাড়ে চা দিতে হবে, না এইখানে আসা হবে?

রণজয় বলল, রঘু, এইখানে চা আর খাবার-টাবার নিয়ে আয়!

গুটুলি বলল, ওগো রুমুনা-ঝুমুনা, তোমরা আমাদের সঙ্গে চা খাবে এসো।

রুমুনা-ঝুমুনা পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল। তারপর রুমুনা বলল, না, আমরা এখন ওই দিকে বেড়াতে যাব!

তারা দুজনে নেমে পড়ল পুকুরে। তারপর পাশাপাশি দুটি হাঁসের মতন নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে-কাটতে চলে গেল ওপারে। তারপর নেচে-নেচে গা থেকে জল ঝরাতে লাগল।

পুকুরের ওই ধারে একটা বন-তুলসীর ঝোপ। মেয়ে দুটি সেখান থেকে টপাটপ ফুল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেতে লাগল।

রণজয় বলল, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওদের। ওরা কি মেয়ে, না প্রজাপতি?

গুটুলি চোখ গোল-গোল করে বলল, ওরা জুতো পরে জলে নেমে গেল, জুতো পরে সাঁতার কাটল। এ কী গুন্ডা মেয়েরে বাবা! ওরা আবার ফুল খায়!

রণজয় বলল, অনেকে কুমড়ো ফুল আর বকফুল ভাজা খায়। আমরা ওই ফুল খেয়ে দেখিনি, হয়তো ভালোই লাগবে!

এই সময় রঘু একটা থালায় করে চায়ের কাপ আর রুটি নিয়ে এল। থালাটা নামিয়ে রেখে সে গোমড়া মুখে জিগ্যেস করল, তোমরা কি পাখির ডিমের ওমলেট খাবে?

গুটুলি বলল, সে আবার কী? পাখির ডিমের ওমলেট মানে?

রঘু বলল, কালকের ঝড়ে অনেকগুলো গাছ ভেঙে পড়েছে তো। আমাদের গুহার সামনে ওরকম দুটো গাছে দেখলুম যে বেশ কয়েকটা পাখির বাসা। তার থেকে আমি আট-দশটা ডিম কুড়িয়ে রেখেছি।

রণজয় বলল ধুৎ! পাখির ডিম আবার কেউ খায় নাকি? ডিমগুলো যেখানে পেয়েছিস, সেখানে রেখে আয়। তবে একটা ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। অনেকদিন মুরগির ডিম খাওয়া হয়নি। এই জঙ্গলে আমি কয়েকবার বন-মুরগির ডাক শুনেছি। দেখতে হবে তো ওরা কোথায় ডিম পাড়ে।

গুটুলি বলল, মেয়ে দুটো গেল কোথায়?

মেয়ে দুটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। তারা ঢুকে পড়েছে পেছন দিকের জঙ্গলে।

গুটুলি মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, এটা কিন্তু বেশ চিন্তার বিষয়। এখান থেকে গাড়ির রাস্তা অন্তত দশ-বারো মাইল দূরে। সেখান থেকে মেয়ে দুটো কি এত সকালে হেঁটে চলে এল? কিংবা, কাল রাত্তিরে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ওরা এই জঙ্গলেই কাটিয়েছে? ওদের সঙ্গে কোনও পুরুষ মানুষ নেই কেন?

রঘু বলল, মেয়ে? কোথায় মেয়ে? তোমাদের ভয়ে এই জঙ্গলে ভূত-পেতনি ছাড়া আর কোনও মানুষ ঢুকবে না!

রণজয় বলল, রঘু, চাল আর ডাল আছে তো? দুপুরে ভালো করে খিচুড়ি বানা। বৃষ্টি পড়লেই আমার খিচুড়ির জন্য মন কেমন করে। গুটুলি আর আমি ততক্ষণ দেখে আসি, মেয়ে দুটো কী করছে!

রঘু বলল, সত্যি দুটো মেয়ে এসেছে নাকি; আমি তাদের দেখতে যাব না? রান্না না হয় পরে হবে!

রণজয় আঙুল তুলে ধমক দিয়ে বলল, যা, নিজের কাজ কর গিয়ে!

গুটুলি বলল, রঘু, আবার যদি পালাবার চেষ্টা করিস, তা হলে এবার কিন্তু তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব!

রণজয় গুটুলিকে তুলে নিল কাঁধের ওপর। তারপর লম্বা-লম্বা পা ফেলে পুকুরের ধার ঘুরে পেছন দিকের জঙ্গলটায় ঢুকে পড়ল।

একটু খুঁজতেই দেখতে পাওয়া গেল মেয়ে দুটিকে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একটা

ফাঁকা জায়গায় মুখোমুখি বসে আছে রুমুনা আর ঝুমুনা, তাদের মাঝখানে দুটো ছাই রঙের খরগোশ। মেয়ে দুটি হাততালি দিচ্ছে আর খরগোশ দুটো নাচছে।

গুটুলি বলল, বুনো খরগোশ ওদের কাছে পোষ মেনেছে, এ কী অদ্ভুত ব্যাপার?

রুমুনা গুনগুন করে একটা গান শুরু করল, ঝুমুনা তার ঝোলা থেকে একটা ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগল।

গুটুলিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে রণজয় বলল, তুই ওই দিকটায় দাঁড়া। খরগোশ দুটো ধরতে হবে। খিচুড়ির সঙ্গে খরগোশের রোস্ট খুব ভালো জমবে।

রণজয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে গান থামিয়ে রুমুনা বলল, নীল মানুষ, এই জিনিস দুটোর নাম কী?

রণজয় বলল, জিনিস মানে? এ দুটো তো খরগোশ। তোমরা খরগোশ চেনো না? তোমরা কোন দেশের মেয়ে?

গুটুলি বলল, এরা আসলে মেয়ে কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে।

রণজয় বলল, ওগো রুমুনা, ঝুমুনা, আজ দুপুরে আমাদের গুহায় তোমাদের নেমন্তন্ন। খিচুড়ি আর খরগোশের রোস্ট।

খরগোশ দুটো নাচ থামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পালাচ্ছে না। রণজয় হাত বাড়িয়ে খরগোশ দুটোকে ধরতে যেতেই রুমুনা বলল, এই, ওদের ধরবে না!

রণজয়ের হাত দুটো সঙ্গে-সঙ্গে অবশ হয়ে গেল। তার থেকেও শক্তিশালী যেন কেউ চেপে ধরল তার হাত। সে প্রচণ্ড চেষ্টা করেও তার হাত দুটো নামাতে পারল না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রণজয় বলল, এইবার বুঝেছি। প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল...তোমরা দুজন অন্য গ্রহ থেকে এসেছ, তাই না?

ঝুমুনা খরগোশ দুটোর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, এই, যাঃ, যাঃ। তোরা খেলতে যা!

খরগোশ দুটো এবার তিন লাফে পালিয়ে গেল পাশের ঝোপে।

রুমুনা বলল, আমরা তো অন্য গ্রহ থেকে আসিনি। আমরা অনেক দূরে থাকি, রাত্তিরবেলা তোমরা যে ছায়াপথ দেখতে পাও, সেইখানে। ছুটির সময় আমরা বেড়াতে যাই। আমরা দুজনেই তো ফুল নিয়ে পড়াশুনো করি, তাই তোমাদের এখানে ফুল চোখে দেখতে এসেছি। তোমাদের এই ছোট্ট জায়গাটায় অনেক রকম ফুল ফোটে।

ঝুমুনা বলল, আমরা নিজের মনে বেড়াব, তোমরা তোমাদের কাজ করতে যাও না!

রণজয় বলল, কাল রাত্তিরে একটা মহাকাশযান তোমাদের এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে, ঠিক কিনা? সেই জন্যই হঠাৎ ওরকম ঝড়-বৃষ্টি আর ভূমিকম্প হল। বেশ বড় স্পেসশিপ মনে হচ্ছে। তোমরা সঙ্গে অদৃশ্য বডিগার্ড নিয়ে এসেছ বুঝি?

রুমুনা বলল, বডি গার্ড আবার কী? কেন, আমরা নিজেরা বুঝি বেড়াতে পারি না?

রণজয় বলল, আমার হাত দুটো কে চেপে ধরে আছে? ছেড়ে দিতে বলো!

মেয়ে দুটি একথা শুনে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল। খুব মিষ্টি তাদের হাসির শব্দ। ঝরনার কুলুকুলু শব্দের মতন।

ঝুমুনা বলল, তোমার হাত আবার কে ধরে থাকবে? আমরা তো কারুকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি হাত দুটো ওরকম উঁচু করে আছ কেন, নিচে নামাও!

রণজয়ের হাত দুটো আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে তাকাল গুটুলির দিকে। গুটুলির মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গেছে। সে ফিসফিস করে বলল, ওস্তাদ, এই মেয়ে দুটোর চোখ একেবারে সবুজ। ভেতরে যেন আলো জ্বলছে। এরা কি সত্যিকারের মেয়ে?

রণজয় বলল, সেটাও একটা কথা বটে। ওগো রুমুনা-ঝুমুনা, তোমরা কি সত্যিকারের মেয়ে? নাকি তোমাদের চেহারা অন্যরকম, ইচ্ছে করে পৃথিবীর মেয়েদের রূপ ধরেছ?

রুমুনা বলল, আমরা আমাদের মতন, আমরা হঠাৎ পৃথিবীর মেয়ে সাজতে যাব কেন? তোমরা বাপু এখন যাও, আমাদের অনেক কাজ আছে। তোমাদের পৃথিবীর সবরকম ফুল আমাদের একটু-একটু খেয়ে দেখতে হবে। ওই যে ওই বড় গাছটায় ফুল ফুটে আছে, ওগুলো কী ফুল?

রণজয় বলল, ও তো শালগাছের ফুল। অত উঁচু থেকে তোমরা পাড়বে কী করে? দাঁড়াও, আমি পেড়ে দিচ্ছি।

রণজয় উঠে দাঁড়াবার আগেই ঝুমুনা তরতর করে সেই গাছে উঠে গেল। ঠিক গাছ বেয়ে ওঠা নয়, জুতো পরা অবস্থাতেই সে যেন হেঁটে উঠে গেল গাছটার ডগায়। খানিকটা ফুল পেড়ে এনে নিজে একটু খেয়ে দেখল, বাকিটা দিল রুমুনাকে।

রণজয় বলল, হুঁ, বুঝলুম, মাধ্যাকর্ষণে তোমাদের আটকাতে পারে না। তা শোনো রুমুনা আর ঝুমুনা, এই পৃথিবীর মানুষ তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু আমি মহাশূন্যের অন্য অনেক গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে এসেছি। আমি নীল মানুষের গ্রহে গেছি, অর্দৃশ্য মানুষদের গ্রহ দেখেছি, তারপর যেখানে মানুষখেকো রাক্ষুসে গাছ আছে...তোমরা ঠিক কী উদ্দেশ্যে এসেছ বলো তো? শুধু ফুল খেতে? আমাদের পৃথিবীর কোনও ক্ষতি করতে আসনি তো?

রুমুনা বলল, কী বিচ্ছিরি কথা! আমরা তোমাদের ক্ষতি করব কেন? আমরা বেড়াতে এসেছি, আজ রাত্তিরেই আবার ফিরে যাব।

বাঃ, তা হলে তো তোমরা আমাদের অতিথি। আজ দুপুরে খিচুড়ি খেতে চলো আমাদের সঙ্গে। আচ্ছা আমি যে খরগোশ দুটো ধরার চেষ্টা করলুম, তোমরা বাধা দিলে কেন?

বলছি তো, তোমরা আমাদের বিরক্ত কোরো না। আমাদের ইচ্ছেমতন বেড়াতে দাও। তোমরা অন্য জায়গায় যাও।

আমাকে এরকম বকে-বকে কথা বলছ? জানো, তোমার বয়েসি ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখেই কত ভয় পায়!

যারা ভয় পায়, তুমি তাদের ভয় দেখাওগে! আমরা ভয় পেতে একদম ভালোবাসি না।

গুটুলি বলল, ওস্তাদ, চলো কেটে পড়ি। ওদের চোখের দিকে তাকালেই আমার বুক কাঁপে!

রণজয় বলল, সে কীরে, দুটো পুঁচকে মেয়েকে দেখে আমরা ভয় পেয়ে পালাব? তা হলে দ্যাখ—

রণজয় দুহাতে রুমুনা আর ঝুমুনাকে তুলে নিয়েই ছুঁড়ে দিল শূন্যে, তারপর তাদের হাত বদল করে আবার লুফে নিয়ে বলল, এবার? কেমন লাগল?

রুমুনা বলল, আমাদের মাটিতে নামিয়ে দাও!

ঝুমুনা মুচকি হেসে বলল, এটা আবার একটা খেলা নাকি? তোমরা অন্য একটা খেলা দেখবে?

মাটিতে দাঁড়িয়ে ঝুমুনা এক আঙুলের ছোঁয়া দিয়ে গুটুলি আর রণজয়কে শুধু ঘুরিয়ে দিল একবার। সঙ্গে-সঙ্গে ওরা দুজন দুটো দু-সাইজের লাটুর মতন বনবন করে ঘুরতে লাগল।

রণজয় চেঁচিয়ে বলল, থামাও, থামাও, আমাদের থামিয়ে দাও!

রুমুনা আর ঝুমুনা হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল মাটিতে।

দূরে হঠাৎ অনেক লোকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কারা যেন এইদিকেই আসছে।

রুমুনা-ঝুমুনা এবার হাসি থামিয়ে উঠে বসল। ওদের মধ্যে একজন থামিয়ে দিল রণজয় আর গুটুলিকে।

রণজয় বলল, এবারে তোমাদের আর একটা খেলা দেখাই?

হুড়মুড় করে গাছপালা ভেদ করে বেরিয়ে এল কয়েকজন পুলিশ। সবার হাতে বন্দুক। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে রঘু।

রঘু হাত তুলে বলল, ওই দেখুন স্যার, ওই সেই দৈত্যটা। খুব সাবধান, ওকে পালাতে দেবেন না। এই দৈত্যটাই এদিককার সব ডাকাতি করে। আর ওই যে বেঁটে বাঁটকুলটা, ওইটা মহাশয়তান। এদের চিড়িয়াখানায় বন্ধ করে রাখুন স্যার।

বণজয়ের বিশাল চেহারা দেখে পুলিশদের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। শুধু ওদের মধ্যে যে ইন্সপেকটর, সে রিভলভার উঁচিয়ে বলল, হ্যান্ডস্ আপ! দৈত্য কোথায়, এ তো একটা লম্বা লোক। গায়ে নীল রং মেখেছে। গীনেস বুক অফ রেকর্ডসে এর চেয়েও লম্বা লোক আছে।

রঘু বলল, না, স্যার, ও সত্যি দৈত্য। ওর গায়ে গুলি লাগলেও বোধহয় মরবে না। ওই বেঁটে গুটুলিটাকে আগে ধরুন!

ইন্সপেকটর বলল, এই মেয়ে দুটি কোথা থেকে এল?

রঘু বলল, দৈত্যটাই নিশ্চয়ই ওদের ধরে এনেছে, স্যার।

ইন্সপেকটর রুমুনা আর ঝুমুনাকে জিগ্যেস করল, তোমরা কে মা? তোমরা কোথা থেকে এসেছ?

রুমুনা মিষ্টি হেসে বলল, আমরা বেড়াতে এসেছি। তোমরা কে? তোমরা বুঝি চোর-ডাকাত?

ইন্সপেকটর শব্দ করে হেসে উঠল। তারপর রণজয়কে বলল, চল, চল ব্যাটা?

একজন পুলিশ গুটুলির ঠিক মাথার কাছে বন্দুক তাক করে আছে। রণজয় বুঝতে পারল, সে একটু এগোবার চেষ্টা করলেই ওরা আগে গুটুলিকে গুলি করবে। বিশ্বাসঘাতক রঘু ওদের আগেই বলে দিয়েছে যে সে গুটুলিকে কতটা ভালোবাসে।

সে রুমুনা আর ঝুমুনার দিকে তাকিয়ে বলল, ওরা আমাদের ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। তা হলে যাই? আর খেলা হল না!

ইন্সপেকটর বলল, এই মেয়ে দুটিকেও যেতে হবে থানায়। চলো তো মা, কোনও ভয় নেই, আমাদের সঙ্গে চলো!

রুমুনা বলল, না, আমরা যাব না। আমরা বেড়াতে এসেছি!

রণজয় বলল, তোমাদের যদি ওরা জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায়, আমি তোমাদের বাঁচাব। দেখবে?

সে রুমনা আর ঝুমুনাকে দুহাতে তুলে নিয়ে খুব উঁচুতে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, যাও! তোমরা তোমাদের দেশে চলে যাও!

রুমুনা আর ঝুমুনা ঠিক দুটো পাখির মতন উড়তে লাগল বনের মাথায়। পুলিশরা হাঁ করে ওপরের দিকে চেয়ে রইল। সেই সুযোগে রণজয় একজন পুলিশের বন্দুকটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই ইন্সপেকটরটি চালিয়ে দিল তার বুকে একটা গুলি! রণজয় বসে পড়ল মাটিতে।

রুমুনা আর ঝুমুনা ওপরে উড়তে-উড়তে একজন আর একজনকে বলল, ওই লম্বা লোকটা মোটে একটাই খেলা জানে। আয়, ওদের আমি অন্য একটা খেলা দেখাই!

ঝুমুনা বলল, পরে যে লোকগুলো এল, ওদের মুছে ফেললে কেমন হয়?

রুমুনা বলল, ওরা আমাদের জোর করে নিয়ে যেতে চাইছিল, ওরা লোক ভালো না। ওরাই বোধহয় চোর-ডাকাত! ওদের ঘুম পাড়িয়ে দি?

ঝুমুনা আর রুমুনা উড়তে-উড়তে একটা সুন্দর গান ধরল। ঠিক যেন বাঁশির মতন আওয়াজ বেরুল তাদের গলা দিয়ে। সেই গান শুনে এক-একজন পুলিশ ধুপধাপ করে পড়ে যেতে লাগল মাটিতে। সবাই অজ্ঞান। এমনকী গাছের পাখিরাও ঘুমিয়ে পড়ল।

রুমুনা আর ঝুমুনা নিচে নেমে এসে রণজয় আর গুটুলির হাত ধরে আবার উড়ান দিল। বনের মধ্যে ছাড়িয়ে, অনেক-অনেক ওপরে, প্রায় মেঘের কাছে চলে এল ওরা। রণজয়ের বুকে গুলি লেগেছে, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে, কিন্তু তার প্রাণ আছে। রুমুনা আঙুলে করে তার মুখের একটু থুতু রণজয়ের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতেই তার রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

চোখে ফুঁ দিয়ে ওদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনল ঝুমুনা। তারপর বলল, এবারে মেঘের পিঠে বসিয়ে দেব তোমাদের। ভাসতে-ভাসতে চলে যাবে সমুদ্রে। এই খেলাটা তোমরা জানো?

রণজয় বলল, না, জানি না। লক্ষ্মী দুই মেয়ে, তোমাদের কাছে আমি হেরে গেছি। হেরে গিয়েও আনন্দ হচ্ছে!

নীল মানুষের বন্ধু

রণজয়ের জন্য দর্জি এসেছে। তার নতুন প্যান্ট তৈরি হবে। বাগানের আম বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা পেয়েছেন বাবা। ছেলে ফিরে আসায় তিনি এত খুশি হয়েছেন যে বলে দিয়েছেন, যত টাকা লাগে লাগুক, রণজয়ের জন্য তিনখানা করে প্যান্ট শার্ট শিগগিরই তৈরি করতে হবে।

দর্জিকে ডেকে আনা হয়েছে বাড়িতে। রণজয়কে প্রথম দেখেই সে হাত-পা ছড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল!

মাথায় জলটল দিয়ে তার জ্ঞান ফেরানো হল বটে, তবু সে চোখ ফ্যালফ্যাল করে বলতে লাগল, কী দেখলাম! ও কে? অসুর, না দৈত্য!

রণজয়ের দাদা সঞ্জয় বলল, আরে ছি ছি ছি, তুমি এত সহজে অজ্ঞান হয়ে গেলে? বইটই পড়ো না কিছু? মানুষ বুঝি লম্বা হতে পারে না? পৃথিবীর কত জায়গায় কত লম্বা লোক থাকে। গিনেস বুক অফ রেকর্ডস নামে একটা বই আছে। তাতে সাড়ে আট ফুট লম্বা মানুষের ছবি আছে। আমার ভাই তো মাত্র আট ফুট পাঁচ ইঞ্চি!

দর্জি বলল, মানুষ? ও সত্যি মানুষ?

সঞ্জয় বলল, হ্যাঁ, ও আমার ভাই রণজয়। হঠাৎ লম্বা হয়ে গেছে। বেশি লম্বা হয়ে গেছে!

দর্জি বলল, তা বলে একেবারে তালগাছের মতন লম্বা? ওর গায়ের রং নীল কেন? একেবারে কলমের কালির মতন নীল?

সঞ্জয় বলল, একটা অসুখে ওরকম নীল হয়ে গেছে। অসুখ করলে অনেকের গায়ের রং কালো হয়ে যায় না?

দর্জি তবু ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। সে বলল, রং কালো হয় শুনেছি, কিন্তু নীল রং হয় তা কখনো শুনিনি! দুর্গাপুজোর সময় মহিষাসুরের মূর্তিটাই তো নীল রঙের হয় দেখি!

সঞ্জয় বলল, কেন, শুধু মহিষাসুরের রং নীল কেন? শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রং নীল নয়? শ্রীরামচন্দ্রের?

এ কথা বলেই সঞ্জয় কপালে হাত জুড়ে নমস্কার করে বলল, ওঁরা অবশ্য এমনিই নীল!

দর্জিটি বলল, দাদা, সত্যি করে বলুন তো, কাছে গেলে আমায় কামড়ে-টামড়ে দেবে না তো? তুলে আছাড় মারবে না?

সঞ্জয় হেসে বলল, আরে না না! আমার ভাইটি খুব নিরীহ। অতবড় চেহারা হলে কী হয়, আসলে এখনও শিশুই রয়ে গেছে। চলো, চলো, তোমার ভয় নেই কিছু।

বাড়ির ভেতরের দিকে উঠোনে একটা তোয়ালে শুধু কোমরে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে রণজয়। এতদিন সে বনে-জঙ্গলে থাকত, জামা-কাপড় সব ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। তার খালি গা, বুকেটুকে একটাও লোম নেই। সমস্ত শরীরটা নীল পাথরের মূর্তির মতন। যারা রণজয়কে চেনে না, তারা দেখলে তো ভয় পাবেই!

একটা লম্বা টুল আনা হল। তার ওপর দাঁড়িয়ে দর্জি মাপ নিতে লাগল। তার হাতে দুটো এখনও থরথর করে কাঁপছে, রণজয়ের মুখের দিকে সে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না।

রণজয় মুচকি হেসে ফিসফিস করে বলতে লাগল, ভয় নেই! ভয় নেই!

কোনওরকমে রণজয়ের মাপ নেওয়া শেষ হল।

তখন রণজয় বলল, এবার আমাব বন্ধুর জামা প্যান্টের মাপ নাও।

উঠোনের এক কোণে নীল ডাউন হয়ে বসে গুটুলি একটা পেয়ারা খাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে দর্জির চোখ আবার কপালে উঠল। সে বলল, ওরে বাবা, এ আবার কী? এত ছোট মানুষ? এও কি অসুখের ওপর ছোট হয়ে গেছে না কি?

গুটুলি তেজের সঙ্গে বলল, না. আমার অসুখটসুখ হয়নি। তা ছাড়া আমি মোটেও ছোট মানুষ না। আমি একটু বেঁটে, এই যা! ছোট মানুষ আর বেঁটে মানুষ কি এক?

দর্জি এবার ফিক করে হেসে ফেলে বলল, এইটুকু মানুষের গলার আওয়াজ তো কম নয়! ঠিক যেন একটা সানাই!

গুটুলির কাছে এসে ফিতে খুলে দর্জি বলল, এই, নড়াচড়া করবি না, চুপ করে দাঁড়া।

গুটুলি আবার ধমকের সুরে বলল, আপনি আমাকে তুই-তুই বলছেন কেন? আমি কি বাচ্চা ছেলে নাকি?

দর্জি তবু হাসতে লাগল।

মাপ নেওয়া শেষ করে দর্জি চলে যাওয়ার পর সঞ্জয় বলল, মজার ব্যাপারটা দেখলে? রণজয়কে দেখে দর্জি ভয়ে ভিরমি খেয়েছিল। আর গুটুলিকে দেখেই হাসতে লাগল!

রণজয় বলল, গুটুলির চেহারাটা ছোট্টখাটো হলে কী হবে, ওর বুদ্ধি কারুর চেয়ে কম নয়।

এর পর এক মুচিকে ডেকে বানান হল ওদের দুজনের জুতো।

অনেকদিন পর নতুন জামা-প্যান্ট-জুতো পরে, সেজেগুজে রণজয় গুটুলিকে নিয়ে বেরুল রাস্তায়।

গ্রামের অনেক লোকই এখন রণজয়ের কথা জেনে গেছে। ভয়টাও এখন ভেঙেছে। রণজয় কারুর কোনও ক্ষতি করে না। কোনও গাছটাছও ভাঙে না। কিন্তু গুটুলিকে দেখে সবাই মজা পায়। বাচ্চা ছেলেরা গুটুলিকে ঘিরে ধরে হাততালি দিতে-দিতে বলে, এই বাঁটকুল! এই বাঁটকুল! কেউ-কেউ তার গায়ে ঢিল ছোঁড়ে।

রণজয় ঘুরে দাঁড়ালেই অবশ্য সবাই চোঁ-চোঁ দৌড় মারে।

গুটুলিকে নিয়ে রণজয় নদীর ধারে এসে বসল। সন্ধে হয়ে এসেছে। এখানে আর কোনও মানুষজন নেই।

রণজয় আস্তে-আস্তে বলল, জানিস গুটুলি, অনেকদিন আগে এইরকম এক সময়ে আমি নদীর ধারে মাছ ধরতে এসেছিলাম। হঠাৎ এক সময় আকাশ থেকে একটা সাদা বল খসে পড়ল। সেই বলকে আমি ধরতে গেলাম। তারপর থেকেই আমাব এই অবস্থা। চেহারাটাও লম্বা হতে লাগল আর গায়ের রংটাও বদলে গেল।

রণজয় নিজের কাহিনি বলে যাচ্ছে, গুটুলি কোনও সাড়াশব্দ করছে না।

এক সময় হঠাৎ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনে রণজয় চমকে মুখ ফেরাল।

গুটুলির থুঁতনিতে একটা আঙুল ছুঁইয়ে সে বলল, এ কী, তুই কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে?

গুটুলি তবু কান্না থামাচ্ছে না।

রণজয় আবার কাতরভাবে জিগ্যেস করল, তোর কী হয়েছে? বাড়ির জন্য কষ্ট হচ্ছে?

গুটুলি কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, আমার কোনও বাড়িই নেই!

রণজয় জিগ্যেস করল, তা হলে কীসের কষ্ট হচ্ছে? নতুন জুতোয় পায়ে ফোস্কা পড়েছে?

গুটুলি বলল, না, সে সব কিছু না। আমার কষ্ট হচ্ছে অন্য কারণে। বন্ধু, এবার তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে!

রণজয় বলল, সেকী! আমায় ছেড়ে যাবি কেন? আমার বাড়িই তো তোর বাড়ি। আমার মা তোকে ভালোবাসে। আমার দাদাও তোকে পছন্দ করে।

গুটুলি বলল, সে জন্যও নয়। তুমি লম্বা, আমি বেঁটে। তোমাকে দেখে লোকে ভয় পায়, আমাকে দেখে লোকে হাসে। কেউ আমার মাথায় চাঁটি মারে, কেউ ঢিল ছোঁড়ে। যখন বনে-জঙ্গলে ছিলাম, তখন বেশ ছিলাম। লোকজনের মাঝখানে থাকলে কেউ আমাকে গ্রাহ্য করবে না। তোমার পাশে থাকলে আমাকে আরও বেশি বেঁটে দেখায়! নাঃ, আমি চলেই যাব!

রণজয় বলল, তুই আমার একমাত্র বন্ধু। তুই চলে গেলে আমি থাকব কী করে? না, না, গুটুলি, তোকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না!

গুটুলি মাটিতে চাপড় মারতে-মারতে বলল, আমি লম্বা হতে চাই। আমি লম্বা হতে চাই! আমি তোমার মতন লম্বা হতে চাই!

রণজয় বলল, লম্বা হওয়ার অনেক জ্বালা রে, গুটুলি! দ্যাখ না, আমি ইচ্ছেমতন চলাফেরা করতে পারি না। কেউ আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না!

গুটুলি বলল, আর বেঁটে হওয়ার কী জ্বালা, তা তো তুমি বুঝবে না! এর থেকে লম্বা হওয়া অনেক ভালো। তোমার সেই সাদা বলটা কোথায়? সেটা জোগাড় করে আনো। আমি লম্বা হব!

রণজয় বলল, সেটা কোথায় পাব রে! মহাকাশের লোকেরা সেটা তো আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

গুটুলি বলল, ওসব জানি না। লম্বা না হলে আমি আর এখানে থাকতে চাই না। আমি আর বেঁচেও থাকতে চাই না।

রণজয় আলতো করে গুটুলির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলল, অমন করিস না। মরার কথা বলতে নেই। ঠিক আছে, তুই লম্বা হতে চাস তো! দেখা যাক, কী ব্যবস্থা করা যায়। আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরে থাক।

পরদিন ওরা গেল শহরের দিকে। ট্রেনে চেপে এল, কিন্তু কোনও অসুবিধে হল না। অনেকেই অবাক হয়ে তাকাচ্ছে বটে, রণজয়কে দেখে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে। কিন্তু ভয়ে চোখ উলটে ফেলছে না।

শহরের রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে রণজয় বলল, কী আশ্চর্য ব্যাপার বল তো গুটুলি! আগে আমাকে দেখলেই লোকে ভয়ে পালাত। এখন তো সেরকম কিছু হচ্ছে না। হঠাৎ সব বদলে গেল কী করে?

গুটুলি বলল, কারণটা বুঝলে না? আগে যখন তুমি জঙ্গল থেকে বেরুতে, তখন তোমার খালি গা, জামা ছিল না। ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা ধুতি জড়ানো। আর মাথার চুলও আঁচড়াতে না। সবাই তাই মনে করত জঙ্গলের দৈত্য-দানব। এখন তোমার ভদ্দরলোকের মতন নতুন পোশাক। আজকাল পোশাক দেখেই তো সবাই মানুষ চেনে!

রণজয় বলল, হায় রে, মানুষ দেখে চেনা যায় না। পোশাক দেখে ভদ্দরলোকদের চিনতে হয়। তা হলে তো দর্জিদেরই জয়!

গুটুলি বলল, তবু দ্যাখ, তোমাকে দেখে কেউ হাসছে না। আমায় দেখে হাসছে। এ পৃথিবীতে লম্বাদেরই জয়।

তুই আমার সমান লম্বা হতে চাস, গুটুলি?

না, না, তোমার সমান নয়। ছোট ছেলেরা আমাকে দেখে ভয় পাক, তাও আমি চাই না। এই ধরো, মাঝামাঝি। তোমার শরীর থেকে খানিকটা কমিয়ে যদি আমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেত!

ওঃ, তা হলে কী ভালোই হতো! তুই আর আমি সমান-সমান! আচ্ছা, সামনে ওটা কী দেখা যাচ্ছে, চল তো যাই!

গুটুলি সামনে তাকিয়ে দেখল।

রাস্তার ওপারে একটা পার্ক। তার একদিকটা টিন দিয়ে ঘেরা। সেখানে গেটের ওপর সাইনবোর্ডে লেখা : নবীন ব্যায়ামাগার।

তার তলায় আবার ছোট-ছোট অক্ষরে লেখা : শরীর মজবুত করতে হলে এখানে যোগ দিন!

গুটুলি আর রণজয় রাস্তা পার হয়ে সেই গেট ঠেলে ঢুকল।

দুপুরবেলা সেখানে আর লোকজন কেউ নেই, শুধু ব্যায়ামাগারের ম্যানেজার একা হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে ওঠবোস করে যাচ্ছেন।

রণজয় কোনও ভূমিকা না করেই বলল, আপনারা এখানে শরীর মজবুত করে দেন। আপনারা বেঁটে লোককে লম্বা করে দিতে পারেন?

ম্যানেজার মশাই বসা অবস্থায় রণজয়ের পা থেকে দেখতে লাগলেন। পেট-বুক-

গলা পর্যন্ত চোখ বোলাতে-বোলাতে তাঁর মুখখানা অনেকটা হাঁ হয়ে গেল। তিনি বললেন, অ্যাঁ? অ্যাঁ? আরও লম্বা? আপনি আরও লম্বা হতে চান?

রণজয় হেসে বলল, না, আমি না। এই যে আমার বন্ধু। এর কথা বলছি।

রণজয়ের আড়ালে গুটুলিকে আগে দেখতে পাননি ম্যানেজার মশাই। এবার তিনি ভালো করে দেখে নাক কুঁচকে বললেন, ধুৎ! ধুৎ! ধুৎ!

রণজয় বলল, এ কী, আপনি তিনবার ধুৎ বললেন কেন?

ম্যানেজার মশাই বললেন, আমি এক-একটা কথা তিনবার-তিনবার-তিনবার বলি!

রণজয় বলল, আপনি একবারই বা ধুৎ বলবেন কেন?

ম্যানেজার মশাই বললেন, ওইটুকু বেঁটে বাঁটকুল কখনো লম্বা-লম্বা-লম্বা হয়? কোনও আশা নেই, আশা নেই, আশা নেই!

রণজয় বলল, সে কী মশাই? বেঁটে লোকরা কোনওদিন লম্বা হতে পারে না?

ম্যানেজার মশাই বললেন, ধুৎ! ধুৎ! ধুৎ! তা কখনো হয়! তবে আপনারা প্রফেসর হংসধ্বজের কাছে গিয়ে দেখতে পারেন। সে ওসব কী যেন করে শুনেছি!

রণজয় জিগ্যেস করল, ঠিক আছে। প্রফেসর হংসধ্বজের ঠিকানা?

ম্যানেজার মশাই ঘরে ঢুকে একটা কার্ড নিয়ে এসে বললেন, এই নাও, এই নাও, এই নাও! যাও, যাও, যাও!

রণজয়ও তিনবার বলল, যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি!

কার্ডখানাতে লেখা, প্রফেসর হংসধ্বজ রায়। যে-কোনও সমস্যা, চলে আসুন!

ঠিকানাটা খুব দূরে নয়।

রণজয় বলল, চল রে, আজই একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। হংসধ্বজের নামটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

সেটা একটা সিনেমা হলের মতন বাড়ি। দুদিকে দুটো গেট। মাঝখানে দেওয়ালে নানা বয়সের অনেক নারী-পুরুষের ছবি। বেঁটে, মোটা, রোগা, লম্বা।

বাড়িটার সামনে এসে রণজয় বলল, এবার তুই আগে যা গুটুলি। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।

ভেতরের অফিস ঘরে প্রফেসর হংসধ্বজ রায় টেবিলে বসে লেখালেখি করছিল। গুটুলি তার কাছে গিয়ে বলল, এই যে শুনুন!

হংসধ্বজ এক পলক গুটুলির দিকে তাকিয়ে বলল, যা, যা, এখন বিরক্ত করিস না। কাজ করছি!

গুটুলি বলল, আপনার সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে!

হংসধ্বজ ড্রয়ার খুলে একটা লজেন্স বার করে গুটুলির হাতে দিয়ে বললেন, এই নে, যা পালা।

গুটুলি রাগ করে লজেন্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, আপনি কি আমাকে বাচ্চা ছেলে পেয়েছেন নাকি? আমার বয়েস একুশ।

হংসধ্বজ এবার দারুণ ধমক দিয়ে বলল, আ মলো যা! তোর বয়েস কত আমি কি তা জানতে চেয়েছি? জেনে আমার লাভ কী? কেন আমায় বিরক্ত করছিস!

গুটুলি বলল, আমি একটা কাজের কথা বলতে এসেছি!

হংসধ্বজ বলল, আমি কোনও কাজের কথা শুনতে চাই না।

গুটুলি এবার বাইরের দরজার কাছে এসে হাঁক দিল, বন্ধু, তুমি এবার ভেতরে এসো!

রণজয় ধপধপ করে পায়ের শব্দ করতে-করতে ভেতরে আসতেই হংসধ্বজ চমকে তাকাল। চ্যাঁচাতে গিয়েও গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। অজ্ঞান হয়ে সে চেয়ারসুদ্ধু উলটে পড়ে গেল!

গুটুলি বলল, দেখলে তো বন্ধু, বেঁটে লোকদের কেউ গ্রাহ্য করে না। আমাকে বকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, আর তোমাকে দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেল!

টেবিলের ওপর এক গেলাস জল রাখা ছিল। সেটা মাথায় ঢেলে দিতেই হংসধ্বজ চোখ মেলে তাকাল।

রণজয় বলল, ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই! আমরা কাজের কথা বলতে এসেছি!

হংসধ্বজ এবার দুজনকে দেখল ভালো করে। তারপর উঠে বসে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, তোমরা কাজ চাও! এক্ষুনি কাজ দিতে পারি। দু-হাজার টাকা করে মাইনে পাবে।

রণজয় অবাক হয়ে বলল, কাজ মানে চাকরি? আপনি আমাদের চাকরি দিতে চাইছেন? কী চাকরি?

হংসধ্বজ বলল, খুব সোজা কাজ। আমার বাড়ির দু-দিকের দরজায় তোমরা দুজনে দাঁড়িয়ে থাকবে। একজনের গায়ে লেখা থাকবে 'আগে', আর একজনের গায়ে লেখা থাকবে 'পরে'।

রণজয় জিগ্যেস করল, তার মানে?

হংসধ্বজ বলল, আমার এটা একটা নার্সিংহোম। এখানে লোকে চিকিৎসা করতে আসে তো। বেঁটে লোকটির গায়ে লেখা থাকবে 'আগে', তার মানে আমার এখানে চিকিৎসা করাবার আগের অবস্থা। আর আর একজন 'পরে'। তার মানে, চিকিৎসার পরের অবস্থা।

রণজয় বলল, আপনার এখানে বেঁটে লোককে লম্বা করা যায়?

হংসধ্বজ বলল, হ্যাঁ, কেন যাবে না! সব করা যায়!

রণজয় বলল, বাঃ বাঃ বাঃ! চমৎকার! তা হলে তো কোনও চিন্তাই নেই। আপনি আমার এই বন্ধুটিকে লম্বা করে দিন তো! তারপর আমরা আপনার সব কথা শুনব।

হংসধ্বজ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, তোমার মাথা খারাপ? এই বেঁটে বক্কেশ্বরকে কি কেউ লম্বা করতে পারে?

গুটুলি ফুঁসে উঠে বলল, খবরদার!

রণজয়ও হুংকার দিয়ে বলল, আপনি আমার বন্ধুকে অপমান করছেন কেন? এই না বললেন, বেঁটে লোককে আপনি লম্বা করে দিতে পারেন?

হংসধ্বজ বলল, সে বলেছি, বলেছি বেশ করেছি। আমার যা খুশি আমি তাই বলব!

গুটুলি অমনি ছুটে গিয়ে হংসধ্বজের একটা হাত ঘ্যাঁচ করে কামড়ে দিল।

হংসধ্বজ আঁতকে উঠে বলল, এ কী?

গুটুলি বলল, আমাকে অপমান করেছ কেন? আমারও যা খুশি তাই করব?

হংসধ্বজ এবার ভয়ে চুপসে গিয়ে রণজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমিও কামড়ে দেবে নাকি? তা হলে আর আমি বাঁচব না! অ্যাঁ? সত্যি-সত্যি আর বাঁচব না!

রণজয় ঘাড় ধরে হংসধ্বজকে উঁচুতে তুলে নিল। তারপর বলল, আমি সবসময় কামড়াই না। তবে, আমারও যা ইচ্ছে তাই করব।

হংসধ্বজ পা দোলাতে-দোলাতে বলল, নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও আমার ঘাড়ে ব্যথা, আরও ব্যথা হয়ে যাবে।

রণজয় তাকে মাটিতে নামাবার পর সে বলল, আসল ব্যাপার কী জানো, রোগা লোকেরা মোটা হয়ে গেলে একটু বেঁটে দেখায় আর মোটা লোকেরা খুব রোগা হয়ে গেলে খানিকটা লম্বা মনে হয়। আজকাল রোগা-মোটা করার অনেক জায়গা আছে, তাই আমি রোগা-লম্বা করার কথা বলি। আসল বেঁটেকে লম্বা করা আমার সাধ্য নয়। তবে তোমরা একটা কাজ করতে পারো! তোমরা মেঘধ্বজ আচার্যের কাছে যাও।

গুটুলি জিগ্যেস করল, সে আবার কে?

হংসধ্বজ বলল, সে একজন জাদুকর আর বৈজ্ঞানিক। সে অনেক কিছু পারে। সে তোমাদের মনোবাঞ্ছা ঠিক পূর্ণ করে দেবে।

গুটুলি ধমক দিয়ে বলল, আবার শক্ত-শক্ত কথা বলছ। ওই কথাটার মানে কী?

রণজয় বলল, চল, চল, এ কথাটার মানে আমি জানি!

হংসধ্বজের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে রণজয়েরা চলে এল মেঘধ্বজ আচার্যের বাড়িতে।

এ বাড়িটার সামনের দিকটা ভাঙাচুরো, বন-জঙ্গলে ভর্তি। কিন্তু ভেতরে পরপর তিনখানা ঘর লাল, নীল আর সবুজ রং করা।

রণজয়রা প্রথমে লাল রঙের ঘরটার দরজায় ধাক্কা দিল।

একজন বুড়ো মতন লোক শুধু মাথাটা বার করে জিগ্যেস করলেন, কী চাই?

রণজয় বলল, আমরা মেঘধ্বজ আচার্যের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বৃদ্ধটির মাথাভর্তি চুল, মুখভর্তি দাড়ি, চোখে রুপোলি ফ্রেমের চশমা।

রণজয়কে দেখে তিনি একটুও অবাক না হয়ে বললেন, বা বা বা বা! এইরকম একজনকেই তো খুঁজছিলাম। তুমি কি কলসির দৈত্য না কি হে?

রণজয় বলল, আজ্ঞে না। আমি মানুষ!

বৃদ্ধ বললেন, তুমি মানুষ? তবে তো আরও চমৎকার। তুমি আমার জন্য একটু মরতে পারবে?

রণজয় গুটুলির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, একটুখানি মরা মানে কী রে?

বৃদ্ধ বললেন, তুমি দড়াম করে মরে যাও না। তারপর তোমার শরীরটা আমি কাঁটাছেঁড়া করব। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করব। দেখব, দৈত্যদের সঙ্গে মানুষদের কী তফাৎ! দৈত্য বলে সত্যিই কিছু ছিল কিনা।

রণজয় বলল, আজ্ঞে, এই সামান্য কারণে তো আমি মরতে রাজি নই। আমার আরও বেশ কিছুদিন বাঁচার ইচ্ছে আছে!

বৃদ্ধ তাতে যেন বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, তবে ওই দৈত্যের মতন চেহারা নিয়ে আমার কাছে এসেছ কেন?

রণজয় বলল, শুনেছি, আপনি মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন। তাই আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি।

বৃদ্ধ বললেন, বটে? তোমাদের মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ করব কেন শুনি? তাতে আমার কী লাভ হবে? আমার বুদ্ধি সময়ের দাম নেই?

রণজয় বলল, আমাদের মনোবাঞ্ছা যদি পূর্ণ হয়, তা হলে আপনাকে আমরা নিশ্চয়ই কিছু দেব। আপনি কী চান বলুন!

বৃদ্ধ মুখ ভেংচে বললেন, ইস! আবার বলে কী চান! তুমি আমার জন্য সামান্য মরতেও রাজি হলে না! আচ্ছা, আগে শুনি তোমাদের মনোবাঞ্ছা কী!

রণজয় হাত কচলে বলল, আজ্ঞে দেখুন, আমার এই বন্ধুটির উচ্চতা খুব কম। তাই নিয়ে ওর মনে খুব দুঃখ। আপনি ওকে লম্বা করে দিতে পারেন?

বৃদ্ধ এবার গুটুলিকে দেখে খুকখুক করে হেসে বললেন, কেন, বেশ তো চেহারাটা। লম্বা হয়ে কী হবে?

গুটুলি জিগ্যেস করল, আপনি লম্বা করে দিতে পারেন কি না, আগে সেটা ঠিক করে বলুন।

বৃদ্ধ দুদিকে ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, পারি। তা পারি! কিন্তু একটা মুশকিল আছে। পৃথিবীটা একটা নিয়মে চলে জানো তো? একটা বেঁটে লোক হঠাৎ লম্বা হয়ে গেলে আর একজন লম্বা লোককে বেঁটে হতে হবে! তোমার বদলে তা হলে কে বেঁটে হবে বলো?

রণজয় আগ্রহের সঙ্গে বলল, আমি! আমি!

বৃদ্ধ বললেন, তুমি? ইস, এত বোকা তুমি? একখানি লম্বা চেহারা কেউ নষ্ট করে?

রণজয় বলল, আমি এতটা লম্বা-ধ্যাড়েঙ্গা থাকতে চাই না!

বৃদ্ধটি বললেন, বেশ, হবে এসো!

বৃদ্ধটি এবার তাদের নিয়ে গেলেন নীল ঘরে। সে ঘরটা অনেক রকম যন্ত্রপাতিতে ভর্তি। বৃদ্ধটি কয়েকটা প্লাগ লাগিয়ে দিলেন ওদের দুজনের গায়ে! তারপর একটা মেশিনের বোতাম টিপতেই গোঁ-গোঁ শব্দ হতে লাগল।

রণজয় শুধু একটু সুড়সুড়ির মতন বোধ করল, আর কিছু টের পেল না। গুটুলি থরথর করে কাঁপছে।

একটু পরে বৃদ্ধটি আনন্দে হাততালি দিতে-দিতে বললেন, বাঃ বাঃ! ঠিক হয়েছে! আমি আর তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না।

রণজয় জিজ্ঞেস করল, তার মানে?

বৃদ্ধ বললেন, এই সহজ কথাটার মানেও বুঝতে পারলে না? তোমরা অদৃশ্য হয়ে গেছ। তোমাদের আর কেউ দেখতে পাবে না।

রণজয় নিজের গায়ে চোখ বুলিয়ে বলল, কই, আমি তো আমাকে দেখতে পাচ্ছি!

বৃদ্ধ বললেন, তা তো পাবেই। অদৃশ্য হলেও নিজেকে দেখা যায়।

রণজয় বলল, আমি গুটুলিকেও দেখতে পাচ্ছি।

গুটুলি বলল, আমিও তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।

বৃদ্ধ বললেন, অদৃশ্য লোকেরা নিজেদের দেখতে পায় না কে বলল? একজন ভূত কি অন্য ভূতকে দেখতে পায় না? অন্য মানুষ আর দেখতে পাবে না তোমাদের।

রণজয় বলল, কিন্তু আমরা তো অদৃশ্য হতে চাইনি। এ কী করলেন?

বৃদ্ধ বললেন, আহা হা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বেঁটে কিংবা লম্বা কি আর এমনি-এমনি হওয়া যায়? আগে অদৃশ্য হতে হয়। এরপর তোমরা একজন বেঁটে আর একজন লম্বা হবে! চলো, এবার পাশের ঘরে।

বৃদ্ধর কথামতন ওরা দুজন চলে এল সবুজ ঘরে।

বৃদ্ধ এবার একটা পিচকিরি দিয়ে খানিকটা গন্ধ-জল ছিটিয়ে দিলেন ওদের গায়ে। আপনমনে হাসলেন ফিকফিক করে। ঘরটা অন্ধকার করে দিলেন সব আলো নিভিয়ে।

তারপর জিগ্যেস করলেন, এখনও ভেবে দ্যাখো, যে বেঁটে আছ, সে লম্বা হতে চাও? লম্বা যে, সে বেঁটে হতে চাও?

গুটুলি আর রণজয় দুজনেই একসঙ্গে বলল, হ্যাঁ, চাই!

বৃদ্ধ বললেন, তা হলে এবারে পেছনের দেয়ালের দিকে দ্যাখো।

আবার আলো জ্বলতেই ওরা পেছন ফিরে দেখল, দেয়ালের গায়ে দুটো বিরাট গোল মতন আয়না। তাতে ফুটে উঠল দুটো বিকট মুখ!

গুটুলি দেখল, তার মুখখানা বিরাট লম্বা হয়ে গেছে। কান দুটো টেনিস র‍্যাকেটের মতন, নাকের ফুটো দুটো রাস্তার গর্তের মতন!

আর রণজয় দেখল, তার শরীরটা চেপ্টে একেবারে ছোট্ট হয়ে গেছে। মুখখানা একটা বাচ্চা কচ্ছপের মতন। নাক আর কান দেখাই যায় না!

গুটুলি চেঁচিয়ে বলল, ওরে বাবা, আমি এত লম্বা হতে চাই না!

রণজয় বলল, আমি এত বেঁটে হতে চাই না!

দুজনে এই কথা বলে চিৎকার করতে লাগল। আর হাততালি দিয়ে হাসতে লাগলেন বৃদ্ধ।

একটু পরে বৃদ্ধ জিগ্যেস করলেন, তবে, তোমরা কী চাও?

ওরা দুজনেই বলল, আগের মতন করে দিন। আগের মতন করে দিন!

বৃদ্ধ আবার আলো নিভিয়ে দিলেন। দরজা খুলে দিয়ে বললেন, যাও, বাড়ি যাও! শুধু-শুধু আমাকে এত খাটালে। আমার বাড়ির সামনে অনেক ভাঙা ইট আর জঞ্জাল জমে আছে। কাল এসে সাফ করে দিয়ে যেও!

রণজয় বলল, নিশ্চয়ই দেব! কিন্তু কী ব্যাপারটা হল বলুন তো? আমরা দুজনেই

বদলাবদলি হয়ে গিয়েছিলাম! গুটুলি খুব লম্বা আর আমি অত বেঁটে! আবার ঠিক জায়গায় ফিরে এসেছি?

বৃদ্ধ বললেন, কনভেক্স আর কনকেভ!

রণজয় অবাক হয়ে বলল, তার মানে?

বৃদ্ধ বললেন, যাও যাও, বাড়ি যাও, আমাকে আর বেশি খাটিও না! বাড়িতে ডিকশনারি আছে? মানে দেখে নিও!

তারপর তিনি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন!

নীল মানুষ ও ছোট্ট বন্ধু

কেন যে মা ওকে জন্ম থেকেই আদর করে গুটুলি বলে ডাকত? সেই নামটাই ওর কাল হল।

গুটুলির বয়েস বাড়লেও তার শরীরটা আর বাড়ে না। তার যখন সাত বছর বয়েস তখন তাকে দেখতে চার বছরের ছেলের মতন। দশ বছর বয়েসে দেখাত সাত বছরের ছেলের মতন। চোদ্দো বছর বয়েসে তাকে সবাই মনে করত দশ বছরের ছেলে। তারপর যখন তার কুড়ি বছর বয়েস হয়ে গেল তখনও তার চেহারা দশ বছরেব ছেলের মতোই রয়ে গেল। সবাই বলল, গুটলি আর বাড়বে না। তার চেহারা ওইখানেই থেমে থাকবে।

গুটুলির বুদ্ধি কিন্তু ঠিকই বেড়েছে। এমনকী কুড়ি বছর বয়েসের সাধারণ ছেলেদের চেয়েও তার বুদ্ধি অনেক বেশি। সে মুখে-মুখে শক্ত অঙ্ক কষে দিতে পারে। মানুষের মুখ দেখেই গুটুলি বলে দিতে পারে সে সত্যি কথা বলছে না মিথ্যে কথা। সে সাঁতার জানে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে প্যাডেল করে সাইকেল চালাতে পারে। ইংরিজি কাগজ পড়ে খেলার খবর বুঝতে পারে, তবু কেউ তাকে পুরোপুরি মানুষ হিসেবে স্বীকার করে নিতে চায় না।

তার একটা ভালো নামও আছে, তার পুরো নাম পরেশচন্দ্র মাইতি। কিন্তু ও নামটা কেউ মনে রাখে না। লোকেরা তাকে গুটুলি, গুটগুটে, গুলগুলিয়া এইসব যা ইচ্ছে নামে ডাকে। পাড়ার ছেলেরা যখন-তখন চাঁটি মারে তার মাথায়। ইস্কুলে উঁচু ক্লাসে ওঠার পর অন্য ছেলেরা তাকে এমন জ্বালাতন-পোড়াতন করত যে সে ইস্কুলে পড়াই ছেড়ে দিল।

এমনকী গুটুলির ছোট ভাই বীরেশ, যার বয়েস ষোলো বছর, সেও তাকে দাদা বলে মানতে চায় না; যখন-তখন হুকুম করে।

গ্রামের ছেলেদের অত্যাচারে গুটুলি এক-এক সময়ে কেঁদে ফেললেও কেউ তাকে দয়া করে না, সবাই হাসতে শুরু করে তখন। কাঁদলে নাকি তার চেহারাটা আরও মজার দেখায়। সবাই তাকে আরও কাঁদাবার চেষ্টা করে।

এখন আর গুটুলি কাঁদে না। মনে-মনে সকলের ওপর তার বিষম রাগ। গায়ের জোরে পারবে না জেনেও এক-একদিন সে বড়সড় কোনও ছেলের দিকে রাগ করে তেড়ে যায়, পেটে ঘুষি মারে। তাতেও সবাই হাসতে- হাসতে বলে, বামন খেপেছে! বামন খেপেছে! তারপরে দু-তিন জন মিলে গুটুলিকে চ্যাংদোলা করে তুলে জলে ফেলে দেয়।

গুটুলি একা-একা কোনও জায়গায় বসে মনে-মনে বলে, একদিন সব প্রতিশোধ নেব! একটা কোনও মন্ত্র পেয়ে আমার এমন গায়ের জোর হয়ে যাবে যে সবাই আমার কাছে মাথা নিচু করে থাকবে। তখন সবাই বুঝবি!

গুটুলিকে খুব ভালোবাসে তার মা। গুটুলিকে কেউ মারধোর করলে বা খোঁচালে মা তাড়াতাড়ি এসে তাকে ঘরে নিয়ে যায়। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলে, না-রে লক্ষ্মীসোনা, কাঁদিস না! তুই একদিন ঠিক বড় হয়ে উঠবি। চেহারায় না হোস গুণে বড় হবি অন্যদের থেকে। তখন আর তোর কোনও দুঃখ থাকবে না।

গুটুলির যখন একুশ বছর বয়েস, তখন মাত্র দু-দিনের অসুখে ভুগে তার মায়ের মৃত্যু হল। ছোটবেলা থেকেই গুটুলি তার বাবাকে দেখেনি। পৃথিবীতে তাকে ভালোবাসার আর কেউ রইল না।

গুটুলি অঙ্ক আর হিসেবপত্তর ভালো জানে বলে পাশের গ্রামের একটা মুদিখানায় সে চাকরি পেল। এই কাজে তো গায়ের জোর লাগে না, বসে-বসে জিনিস-পত্র মাপা আর ঠিকঠাক দামের হিসেবপত্তর বুঝে নেওয়া। প্রথম-প্রথম নতুন লোকেরা তাকে ছেলেমানুষ ভেবে ঠকাবার চেষ্টা করত, কিন্তু সর্ষের তেলের কিলো আঠারো টাকা হলে দেড়শো গ্রামের দাম কত হয় তা গুটুলি এক মুহূর্তে বলে দিতে পারে। দু-টাকা বাষট্টি পয়সার জিনিস কিনলে কুড়ি টাকার নোটে কত ফেরত দিতে হবে তা গুনতে তার একটুও ভুল হয় না।

দোকানের মালিক গুটুলির কাজে বেশ খুশিই ছিল। ওই দোকান ঘরেই গুটুলি রাত্তিরে শোয়, মালিকের বাড়ি থেকে তার জন্য দুবেলা খাবার আসে।

এইরকম ভাবে কয়েক মাস বেশ চলছিল। কিন্তু এই সুখও গুটুলির ভাগ্যে বেশিদিন সইল না।

একদিন দোকানের মালিক জিনিসপত্র কিনতে শহরে গেছে। গুটুলি একাই দোকান চালাচ্ছে। সন্ধেবেলা দামোদর নামে একটা লম্বা মতন লোক এসে গুটুলিকে হাতছানি দিয়ে দোকানের বাইরে ডেকে বলল, এই বিটলে, পাঁচটা টাকা রোজগার করতে চাস?

গুটুলি বলল, আমার নাম বিটলে নয়। আমি কারুর টাকাও চাই না!

দামোদর বলল, ও ভুল হয়েছে, তোর নাম গুটলে তাই না?

গুটুলি বলল, আমার নাম পরেশচন্দ্র মাইতি।

দামোদর বলল, ভাগ! এইটুকু চেহারার অতবড় নাম? যা বলছি তাই শোন!

খবর পেয়েছি, আজ আর তোর ওই দোকানের মালিক শহর থেকে ফিরবে না। মাঝরাত্তিরে তুই দোকানের দরজা ভেতর থেকে খুলে দিবি। সেজন্য তুই পাঁচ টাকা পাবি।

গুটুলি মানুষ দেখলেই চিনতে পারে। সেই জন্য সে আগে থেকেই জানে যে ওই দামোদর একটা চোর কিংবা ডাকাত। এর হাত থেকে বাঁচবার একটা উপায় করতে হবে।

সে বলল, দরজার অনেক উঁচুতে তালা। সেখানে আমার হাত যায় না। আমি কী করে দরজা খুলব?

দামোদর বলল, মালিক না থাকলে তালা লাগায় হারাধন। তারপর চাবি থাকে তোর কাছে। সে খবর আমরা রাখি। তুই হারাধনকে বলবি তোর হিসি পেয়েছে, বাইরে যেতে হবে। ওকে চাবি দিয়ে বলবি তালা খুলে দিতে। তারপর আমরা যা করবার করব!

গুটুলি বলল, তারপর মালিক এসে যখন আমাকে জিগ্যেস করবে যে তালা খোলার চাবি দিল কে?

দামোদর বলল, আমরা তোর হাত-পা বেঁধে রেখে যাব। তা হলে তোর নামে দোষ পড়বে না। সব দোষ পড়বে হারাধনের নামে, বুঝলি? মনে থাকে যেন। ঠিক রাত্তির সাড়ে বারোটায়।

গুটুলি আর কিছু না বলে দোকানে ফিরে এল। হারাধন নামে আর যে একজন এই দোকানে কাজ করে, সে বোকা-সোকা মানুষ। সেও এই দোকানে শোয়। মালিকের বাড়ি থেকে সেই গুটুলির জন্য খাবার এনে দেয়।

সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর গুটুলি বলল, হারধনদা, আজ রাত্তিরটা খুব সাবধানে থেকো। সারারাত কিছুতেই দরজা খুলবে না। কেউ এসে দরজায় খুটখাট করলেই আমরা দুজনে মিলে খুব চ্যাঁচাব, যাতে পাড়ার সব লোক ছুটে আসে। দুজনকেই জেগে থাকতে হবে।

এই কথা বলল বটে, কিন্তু একটু পরেই ঘুমে টেনে এল গুটুলির চোখ। সে কিছু বুঝবার আগেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

গুটুলির ঘুম ভাঙল অনেক লোকের গোলমালে। ধড়মড় করে উঠে বসেই সে দেখল সকাল হয়ে গেছে। দোকান একেবারে ফাঁকা, সব কিছু চুরি হয়ে গেছে। এক পাশে পড়ে আছে হারাধন, তার হাত-পা মুখ বাঁধা। দোকানের সামনে অনেক লোক ভিড় করে আছে।

গুটুলির খাবারের মধ্যে যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। হারাধনকে যতটা বোকা-সোকা সে ভেবেছিল, ততটা সে নয়। মানুষ চেনা অত সোজা নয়।

গুটুলির কথা কেউ বিশ্বাস করল না। সবাই ভাবল, গুটুলিই চোরদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দরজা খুলে দিয়েছে। দোকানের মালিক ফিরে এসে ধপাধপ করে মারতে লাগল তাকে। কেউ বলল পুলিসে দাও! কেউ বলল বেঁটের গাঁটে-গাঁটে শয়তানি বুদ্ধি!

শেষ পর্যন্ত পুলিশে দেওয়া হল না বটে কিন্তু দোকানের মালিক তাড়িয়ে দিল তাকে গ্রাম থেকে।

গ্রামের বাইরে একটা তালগাছের নিচে দাঁড়িয়ে গুটুলি প্রতিজ্ঞা করল, একদিন সে ফিরে এসে প্রতিশোধ নেবে। ওই দামোদর, হারাধন, দোকানের মালিক কারুকে ছাড়বে না!

২

মনের দুঃখে বনে চলে গেল গুটুলি।

তা বনে যাওয়াও কি সোজা? জনমানবহীন সেরকম ঘন জঙ্গলও তো আজকাল বেশি নেই। নিজের গ্রাম আর পাশের দু-তিনখানা গ্রাম ছাড়া আর কোথাও কখনো সে যায়নি। তবু গুটুলি ঠিক করেছিল সে আর কোনওদিন নিজের গ্রামে ফিরে যাবে না। মানুষের হাতে অপমান আর অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে বনে গিয়ে বাঘ-সিংহের পেটে যাওয়া ভালো।

গ্রামের বাইরে মাঠের শেষে যেখানে আকাশ এসে মিশেছে সেই দিকে হাঁটতে শুরু করে দিল সে। একটার পর একটা মাঠ পেরিয়ে যায় তবু আকাশ কাছে আসে না।

মাঠ পেরিয়ে গ্রাম আসে, কিন্তু গুটুলি কোনও গ্রামে ঢোকে না। সে আর কোনও মানুষকে বিশ্বাস করে না। তার চেহারা ছোট, তার গায়ে জোর নেই বলে কেউ তাকে গ্রাহ্য করে না! কিন্তু তার বুদ্ধি আছে।

বনে গিয়ে গুটুলি তপস্যা করবে। আগেকার দিনে মুনি-ঋষিরা তপস্যার জোরে দেবতাদের কাছ থেকে কত রকমের বর পেয়েছে। একালেও বা সেরকম হবে না কেন? গুটুলি এমন কঠোর তপস্যা করবে যে কোনও-না-কোনও দেবতাকে আসতেই হবে। সে লম্বা হওয়ার বর চাইবে।

ঠিক মতন খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, গুটুলি হাঁটতেই লাগল। সে পরে ছিল একটা খাকি হাফ-প্যান্ট আর কলার দেওয়া নীল গেঞ্জি। প্যান্টটা ছিঁড়ে ফ্যালাফ্যালা হয়ে, ধুলো-কাদা মেখে গেঞ্জিটা এমন হল যে রং চেনাই যায় না। খুব তেষ্টা পেলে সে নদীর জল খায়, খিদে পেলে কবে সে ভালো-ভালো খাবার খেয়েছে সেসব চিন্তা করতে-করতে তেঁতুল গাছের পাতা চিবিয়ে-চিবিয়ে খায়।

এইভাবে কতদিন কেটে গেল কে জানে। এক সময় গুটুলি একটা জঙ্গল দেখতে পেল। প্রথমে জঙ্গলটা পাতলা-পাতলা, এখানে-ওখানে কয়েকটা করে গাছ। কাছাকাছি কিছু লোকের বাড়ি-ঘরও আছে। কিন্তু যতই সে ভেতরে ঢুকতে লাগল ততই জঙ্গলটা খুব গভীর। গুটুলি আরও ভেতরে যেতে চায়, যেখানে কোনও মানুষজন যায় না।

দিনের বেলা জঙ্গলে প্রায় কোনও সাড়া শব্দ থাকে না। সন্ধের পরই জঙ্গল যেন জেগে ওঠে। ডাকতে থাকে অসংখ্য ঝিঁঝি পোকা। শুকনো পাতার ওপর খসখস, সরসর শব্দ হয়। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে মাঝে-মাঝে দেখা যায় আলোর ফুটকি, সেগুলি জোনাকি না বাঘ-ভাল্লুকের চোখে তা বোঝায় উপায় নেই।

গুটুলি খুব একটা ভয় পেল না। সে তো জানেই বনে অনেক বিপদ আছে। কিন্তু বনে অপমান নেই।

অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজে-আন্দাজে একটা গাছ খুঁজে নিয়ে গুটুলি সেই গাছ বেয়ে উঠে গেল ওপরের একটা মোটা ডালে। তারপর সেখানে বসে রইল। প্রথম রাতটা এইভাবে কাটুক, তারপর কাল সকালের আলোয় বনটা ভালো করে দেখে নিতে হবে। একটা নিরাপদ থাকার জায়গা পাওয়া যাবেই। খিদেয় তার পেট জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু গুটুলি ভাবল জঙ্গলে কত রকম ফলের গাছ থাকে, কাল দিনের বেলা কিছু না কিছু জুটে যাবেই।

মাঝে-মাঝে গাছের তলায় কী সব জন্তু যেন দৌড়ে যাচ্ছে। খরগোশ, হরিণ কিংবা চিতাবাঘও হতে পারে। একবার ধপ-ধপ শব্দ করে কী যেন হেঁটে গেল। হাতি নাকি? আওয়াজটা ঠিক মানুষের হাঁটার মতন। কিন্তু মানুষ হাঁটলে তো অত জোর শব্দ হয় না!

একবার গুটুলির উরুর ওপর কী যেন একটা ঠান্ডা লাগল। তারপর ফোঁস-ফোঁস শব্দ। নিশ্চয়ই সাপ। গুটুলি জানে সাপকে বিরক্ত না করলে সাপ সহজে কামড়ায় না। সে নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল। সাপটা চলে গেল তার গায়ের ওপর দিয়ে।

রাত শেষ হয়ে যেই ভোরের আলো ফুটল, অমনি বদলে গেল সবকিছু। দিনের আলোয় বনের মধ্যে একটুও ভয় থাকে না। কতরকম ফুল ফুটছে, কত পাখি ডাকছে। পাখিগুলো যে এদিক থেকে ওদিকে উড়ে যাচ্ছে তার মধ্যেই যেন কত আনন্দ।

গুটুলি গাছ থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা জায়গা ঘুরে দেখল। এক জায়গায় অনেকগুলো জাম গাছ। সেই সব গাছ একেবারে কালোজামে ভরে আছে। সেই কালোজাম খেয়েই পেট ভরিয়ে ফেলল সে। তারপরেই দেখল আর কয়েকটা বাতাবি লেবুর গাছ। গুটুলি ভাবল, থাক, ওগুলো বিকেলে খাওয়া যাবে।

এই জঙ্গলের মধ্যে ছোট-ছোট পাহাড়ও আছে। এক জায়গায় পাশাপাশি দুটো ছোট-ছোট টিলা, নরম ঘাসে ঢাকা। একটা টিলার গায়ে একটা গুহার মতন রয়েছে। ওখানে অনায়াসে রাত্তিরে থাকা যাবে। জায়গাটা গুটুলির বেশ পছন্দ হল।

এইবার আসল কাজ শুরু করতে হবে। একটা গাছের তলায় সে বসল গুছিয়ে। সামনেই অন্য টিলাটার মাথায় সূর্য উঠেছে। হাওয়া দিচ্ছে মিষ্টি-মিষ্টি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে গুটুলির এত ভালো আর কোনওদিন লাগেনি।

হাতজোড় করে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, হে ঠাকুর, দেখা দাও! আমি মন্ত্র জানি না! কী করে তপস্যা করতে হয় জানি না। তবু একবার দেখা দাও! আমি বেশি কিছু চাইব না, শুধু একটাই জিনিস চাইব...

এই কথাগুলোই সে বলতে লাগল বারবার। এক সময় তার চোখ বুজে এল। তবু কথাগুলো বলে যেতে লাগল ঠিকই।

হঠাৎ একসময় কে যেন প্রচণ্ড গর্জনে বলে উঠল, এই!

ভয়ে একেবারে কেঁপে উঠল গুটুলি। কে চ্যাঁচাল। মানুষেরই গলার মতন, কিন্তু মানুষের গলা কি এত জোর হতে পারে? ঠিক যেন বাজ পড়ল আকাশ থেকে।

গুটুলি দেখল তার সামনে একটা বিরাট মানুষের ছায়া। আর ও মুখ তুলে দেখল, টিলার মাথায় প্রকান্ড বড় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন আকাশ থেকে নেমেছে। মানুষটির গায়ের রং একেবারে ঘন নীল।

তা হলে গুটুলির ডাক শুনে এত তাড়াতাড়ি স্বর্গ থেকে নেমে এল কোনও দেবতা! কিন্তু দেখলে যেন দেবতার বদলে দৈত্য বলেই মনে হয়। খালি গা, বুকে বড়-বড় লোম, মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা।

সেই প্রকাণ্ড মানুষটি কয়েকটা লাফ দিয়ে চলে এল একেবারে গুটুলির সামনে। মাথাটা নুইয়ে গুটুলির দিকে অবাক ভাবে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, কী রে, তুই এইটুকুনি বাচ্চা ছেলে! একা-একা এই জঙ্গলে কী করছিস?

গুটুলি বলল, আমি বাচ্চা ছেলে নই, আমার বয়েস একুশ বছর! প্রভু, আমি আপনার দয়া চাইতেই এখানে এসেছি!

প্রকাণ্ড লোকটি বলল, আমার কাছ থেকে দয়া চাইতে এসেছিস? তুই কী করে জানলি আমি এখানে থাকি?

প্রভু, আমি যে জানি, মন দিয়ে ডাকলে দেবতারা আকাশ থেকে নেমে আসে।

দৈত্যটা বাতাস কাঁপিয়ে হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, আমি প্রভুটভু কেউ নই। আমি তোদেরই মতন একজন মানুষ। আমার নাম রণজয়।

গুটুলি তবু হাতজোড় করে বলল, কেন আমার সঙ্গে ছলনা করছেন, প্রভু? আমি জানি আপনি আকাশ থেকে এসেছেন। আগে তো কখনো আমি দেবতা দেখিনি। আপনার গায়ের রং নীল। রামায়ণ বইতে আমি শ্রীরামচন্দ্রের গায়ের রং-ও নীল দেখেছি। ক্যালেন্ডারে শ্রীকৃষ্ণেরও গায়ে রং নীল থাকে। প্রভু, আমি শুধু আপনার কাছে একটা বর চাইব।

লোকে যেমন পুতুল নিয়ে আদর করে সেইরকম ভাবে প্রকাণ্ড লোকটি এক হাতে গুটুলিকে তুলে নিয়ে এল মুখের কাছে। তারপর বলল, এবারে তোকে এক কামড়ে খেয়ে ফেলি?

গুটুলি বলল, যদি ইচ্ছে হয় তো তাই করুন। বর না পেলে আমি এমনিই তো আর ফিরে যাব না ঠিক করেছি!

প্রকাণ্ড মানুষটি বলল, আশ্চর্য! সবাই আমায় দেখলে ভয়ে পালায়। এত কাছাকাছি এলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আর এই ছোট্ট মানুষটি একটুও ভয় পাচ্ছে না। তুই কী বর চাইতে এসেছিস এই জঙ্গলে।

গুটুলি বলল, প্রভু, আপনি শুধু আমাকে লম্বা হওয়ার বর দিন। একুশ বছরের লোকেরা যত বড় হয় তার চেয়েও বেশি লম্বা করে দিন।

মোষের মতন ফোঁস শব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীল মানুষটি বলল, হায়রে, লম্বা হওয়ার যে কী দুঃখ তা তো তুই জানিস না! আমার কাহিনি শুনবি? আমার নাম রণজয়। আমারও বয়েস এখন একুশ। অনেকদিন আগে আকাশ থেকে একটা গোল জিনিস খসে পড়েছিল, সেটা ছোঁয়ার ফলেই আমার এই অবস্থা। তারপর থেকেই গায়ের রং নীল হয়ে যায়, আর আমার শরীরটা বাড়তে থাকে। বেড়ে-বেড়ে এতখানি হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রায় ডবল। আরও কত লম্বা হব কে জানে! এই চেহারার জন্য আমি মানুষের সামনে যেতে পারি না। আমার মা-বাবাও আমায় চিনতে পারে না! ওঃ, লম্বা হওয়ার কী কষ্ট তুই কি বুঝবি!

লম্বা নীল মানুষ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

আর তাই দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল গুটুলি।

কান্না থামিয়ে নীল মানুষ বলল, এ কী, হাসছিস কেন?

গুটুলি বলল, হাসব না? কী অদ্ভুত মিল আমাদের দুজনের। আমি বেঁটে বলে সবাই আমায় অত্যাচার করে, তাই আমি সব ছেড়ে জঙ্গলে চলে এসেছি। আর আপনি লম্বা বলে আপনার এত দুঃখ, আপনাকে দেখলে লোকে ভয় পায়। আপনি মানুষের কাছে যেতে ইচ্ছে করলেও যেতে পারেন না।

ঠিক বলেছিস। তুই খুব ভালো ছেলে রে! তুই এই জঙ্গলে থাকবি আমার কাছে?

জঙ্গল ছাড়া আর তো কোনও জায়গায় আমার থাকার জায়গা নেই।

সেই ভালো, আজ থেকে আমরা দুজনে বন্ধু হলাম। গুটুলি বলল, আমি যা পারিনি, তুমি তা পারবে। তুমি যা পারোনি আমি তা পারব! এতদিন আমার একজনও বন্ধু ছিল না। জঙ্গলে দেবতা খুঁজতে এসে পেয়ে গেলুম বন্ধু।

৩

কয়েকদিন পরে জঙ্গল থেকে আবার বেরিয়ে এল গুটুলি।

এখন সে পরে আছে সন্ন্যাসীদের মতন গেরুয়া কাপড়, মাথায় পাগড়ি, এক হাতে একটা কমণ্ডলু আর অন্য হাতে ত্রিশূল। জঙ্গলের মধ্যে অনেক কালের একটা ভাঙা শিব মন্দির আছে, সেইখানে এইসব জিনিস পেয়েছে।

মাঠ-ঘাট পেরিয়ে সে একটা বড় গ্রামে ঢুকল। এখন তার মুখ চোখের চেহারাটাই অন্য রকম। সে আর মানুষজনদের ভয় পায় না। সন্ন্যাসী দেখলে গ্রামের মানুষ এখন বেশ খাতির করে, তা সে সন্ন্যাসী বেঁটে হোক বা লম্বা হোক, রোগা কিংবা মোটা যাই হোক।

বোম্‌ ভোলানাথ। জয় শঙ্কর। এইসব বলতে-বলতে গুটুলি সেই গ্রামের শ্মশান ঘাটে একটা গাছতলায় গিয়ে বসল।

সেই শ্মশানে আগে থেকেই আর একজন সাধু ছিল। তার বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা, মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথায় জটা, চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে। তার সামনে বসে আছে দু-তিনজন ভক্ত!

বড় সাধু খানিকক্ষণ এই বাচ্চা সাধুকে আড়চোখে দেখল। তারপর এক সময় হুঙ্কার দিয়ে বলল, অ্যাই, তুই আমার জায়গায় কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলি রে? তুই কার চ্যালা?

গুটুলি একটুও ভয় না পেয়ে বেশ তেজের সঙ্গে বলল, আমি বোম ভোলানাথের চ্যালা!

বড় সাধু বলল, হুঃ! নাক টিপলে দুধ বেরোয়, এর মধ্যে ভেক ধরেছিস? ভালো চাস তো এদিকে আয়, আমার পা টিপে দে!

গুটুলি গম্ভীর ভাবে বলল, আমি তোমার থেকে বয়েসে বড়! একবার বলেছ বলেছ আর দ্বিতীয়বার ওরকম কথা বলো না!

বড় সাধু বলল, অ্যাঁ! কী বললি?

গুটুলি বলল, কানে ভালো শুনতে পাও না বুঝি? বললুম যে আমি তোমার থেকে বয়েসে অনেক বড়। আমার নাম দীর্ঘাচার্য। আমার বয়েস তিনশো তিন বছর।

গুটুলির উচ্চতা মোটে সাড়ে তিন ফুট আর তাকে দেখতে দেশ বছরের ছেলে মতন। তার মুখে এই কথা শুনে বড় সাধুর সামনে বসে থাকা ভক্ত কজন ফিক-ফিক করে হাসতে লাগল।

বড় সাধু রেগে গিয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু এই সময় এক দল লোক হইহই করে একটা মরা নিয়ে এল। তার পেছনে-পেছনে আর এক দল লোক এল কাঁদতে-কাঁদতে। সুতরাং দুই সাধুতে তখন আর কোনও কথা হল না।

গুটুলি চোখ বুঝে ব্যোম শঙ্কর, ব্যোম ভোলানাথ বলতে লাগল আবার।

গ্রামে রটে গেল যে শ্মশানে একটা বাচ্চা সাধু এসেছে, সে বড় সাধুর মুখে-মুখে কথা বলে। চোখও খোলে না, কারুর সঙ্গে কথাও বলে না। তা দেখে লোকের ভক্তি বেড়ে গেল। কেউ বলল, সাধুর মুখ দিয়ে জ্যোতি বেরুচ্ছে—কেউ বলল, হ্যাঁ, দেখলেই বোঝা যায়, এ সাধুর বয়েস তিনশো বছরের বেশি।

সন্ধের পর শ্মশান খালি হয়ে গেল। ভূতের ভয়ে রাত্তিরের দিকে এদিকে কেউ আসে না। অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর বড় সাধু কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালল। গুটুলি তখন চক্ষু বুজে আছে।

বড় সাধু তার কাছে এসে বলল, আর ভড়ং করতে হবে না। এইবার বল দেখি, তুই কে? বাড়ি থেকে বাপ-মা-র ওপর রাগ করে পালিয়ে এসেছিস, তাই না?

গুটুলি বলল, আমার বাবা-মা কেউ নেই। তিনশো তিন বছর আগে আমার জন্ম। একশো বছর অন্তর-অন্তর আমার চেহারা ছোট হয়ে যায়, আবার বাড়ে। আবার ছোট হয় আবার বাড়ে। এবার বুঝলে?

বড় সাধু বলল, আমার কাছেও বুজরুকি, অ্যাঁ?

বলেই সে গুটুলির ঘাড় ধরে মাটি থেকে টেনে তুলল। তারপর বলল, আমি আসলে কে জানিস? আমার নাম রঘু সরদার। আমার নাম শুনলে পঞ্চাশটা গ্রামেরও লোক এখন ভয়ে কাঁপে। শোন, আমার সেবা-যত্ন করলে এখানে থাকতে পারবি। নইলে তোর টুঁটি-টিপে নদীর জলে ফেলে দেব।

গুটুলি বলল, ঠিক আছে, তোমার সেবা-যত্ন করব। যত চাও! আগে নদীতে স্নান সেরে আসি, কিছু খেয়ে-টেয়ে নিই। তবে একটা কথা বলে রাখি। কারুর চেহার ছোট হলেই তাকে মেরে ফেলার ভয় দেখাতে নেই!

বড় সাধু ছেড়ে দিতেই গুটুলি নদীর ধারে নেমে গেল। তারপর চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে গান ধরল, কে বিদেশি মন-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজায় বনে!

রাত ঘোর হওয়ার পর সেখানে এসে হাজির হল নীল মানুষ। গুটুলির গান শুনে নদীর ধারে পৌঁছে বলল, কী বন্ধু? সব ঠিকঠাক আছে তো?

গুটুলি বলল, বন্ধু, আমাকে তোমার কাঁধে তুলে নাও।

নীল মানুষ ঝুঁকে পড়ে গুটুলিকে তুলে নিল কাঁধে। গুটুলি দু-দিকে পা ঝুলিয়ে বসল। তারপর বলল, এবারে চলো তো বন্ধু, যেখানে আগুন জ্বলছে!

বড় সাধু ধুনির আগুনে হাঁড়ি চড়িয়ে ভাত রান্না করছিল, মাটির ওপর ধপ-ধপ করে আওয়াজ হতে সে চমকে মুখ তুলে তাকাল।

গুটুলি বলল, এই যে সাধুজী, পা টেপাবে বলছিলে, কই পা বার করো।

ধুনির আগুনের অস্পষ্ট আলোয় বড় সাধুর প্রথমে মনে হল বাচ্চা সাধুটা যেন তাল-গাছের মতো লম্বা হয়ে গেছে। তারপর সে দেখল কলাগাছের মতন দুটো পা, তাতে আবাব নীল রং।

বড় সাধু আঁতকে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বাবারে! ব্রহ্মদৈত্য এসেছে রে! মরে গেলাম রে!

তাই শুনে নীল মানুষ হাসি চাপতে পারল না। তার হাসিতে গম-গম করে উঠল জায়গাটা।

বড় সাধু উঠে এক লাফ মেরে দৌড়লো অন্ধকারের মধ্যে আর চিৎকার করতে লাগল, বাঁচাও! বাঁচাও! ভূত, ব্রহ্মদৈত্য!

নীল মানুষ লম্বা হাত বাড়িয়ে খপ করে তাকে ধরে ফেলে বলল যাচ্ছ কোথায়?

গুটুলি বলল, তোমার সেবা করতে এসেছি, তুমি ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছ?

দুরকম গলায় আওয়াজ শুনে বড় সাধু আরও ভয় পেয়ে বলতে লাগল, মরে গেলাম! মরে গেলাম! মরে গেলাম!

গুটুলি নীল মানুষের গা বেয়ে সরসর করে নেমে এল নিচে। তারপর ধমক দিয়ে বলল, আঃ, বড্ড চ্যাঁচাচ্ছ! এবাবে চুপ করো! নইলে সত্যি গলা টিপে দেব!

চিৎকার থামিয়ে বড় সাধু একবার গুটুলিকে আর একবার নীল মানুষকে দেখতে লাগল। তার মুখখানা হাঁ হয়ে গেছে।

নীল মানুষ বলল, তুমি সাধু-মানুষ হয়ে এত ভয় পাচ্ছ কেন? তোমাদের তো ভূত-প্রেত দেখেও ভয় পাওয়ার কথা নয়!

বড় সাধু হাতজোড় করে বলল, আমায় ক্ষমা করে দাও! আমায় তোমরা প্রাণে মেরো না! আমি আসল সাধু নই। আমার নাম রঘু সরদার।

গুটুলি বলল, তুমি সাধু নও! তোমার আসল নাম রঘু সরদার, তার মানে তুমি কীসের সরদার?

রঘু সরদার বলল, আগে আমার ডাকাত দল ছিল। কিছুদিন হল পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য আমি সাধু সেজে আছি!

গুটুলি বলল, প্রথমেই যে এরকম একজনকে পেয়ে যাব তা আশাই করিনি! বন্ধু, এবারে একে নিয়ে কী করা যায় বলো তো!

নীল মানুষ বলল, ওর হাড়গোড় ভেঙে দ কাে দিতে পারি। কিংবা ওর পা দুটো গাছের ডালে বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে দিতে পারি। কিংবা ওকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে বাঘের সামনে ফেলে দিতে পারি। কিংবা ওকে ক্ষমা করে দিতে পারি! তুমি কোনটা চাও?

রঘু সরদার নীল মানুষের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, ওগো ব্রহ্মদৈত্য, আমায় ক্ষমা করে দাও! আমি আর কোনও দিন চুরি-ডাকাতি করব না!

নীল মানুষ বলল, আমার পায়ে ধরলে হবে না। আমার বন্ধুর পায়ে ধরতে হবে!

রঘু সরদার তক্ষুনি পেছন ফিরে গুটুলির পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর বলতে লাগল, ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও!

গুটুলি খানিকটা সরে গিয়ে বলল, আঃ, আজ বড্ড আনন্দ হল। এর আগে কেউ আমার কাছে ক্ষমা চায়নি। ওহে রঘু সরদার, ওঠো, তোমায় ক্ষমা করে দিলুম।

নীল মানুষ বলল, সেই ভালো! কী সুন্দর ভাতের গন্ধ আসছে! কোথায় যেন ভাত রান্না হচ্ছে।

ধুনির আগুনে রঘু সরদারের চাপানো হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। সেইদিকে তাকিয়ে গুটুলি বলল, সত্যি কতদিন ভাত খাইনি, ফল-টল খেতে-খেতে মুখে অরুচি ধরে গেছে। ওহে রঘু সরদার, তোমায় যে ক্ষমা করে দেওয়া হল, তার বদলে আমাদের ভাত খাওয়াও!

রঘু সরদার বলল, নিশ্চয়ই! ভাত, আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ, কাঁচা লঙ্কা...ঘিও আছে। তোমার এই ব্রহ্মদৈত্য কি ঘি খায়?

নীল মানুষ হাসতে-হাসতে বলল, আমি সব খাই। আগে মানুষের মাংস খেতাম, এখন শুধু সেটা ছেড়ে দিয়েছি।

রঘু সরদার রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গুটুলি আর নীল মানুষ পাশাপাশি বসল আগুনের ধারে।

গুটুলি রঘু সরদারকে বলল, আমরা দুই বন্ধু প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমাদের মতন বদমাশ লোকদের ক্ষমা চাওয়াব। তুমি হলে এক নম্বর!

সেই একলা নীল মানুষ

[রণজয় নামে একটি ছেলে তাদের গ্রামের নদীতে একদিন সকালবেলা একটা গোল ধাতুর বল ভাসতে দেখে। সেটা সে ছোঁয়ার পর থেকেই তার চেহারার বদল হতে থাকে। তার গায়ের রং হয়ে যায় কলমের কালির মতন নীল আর সে লম্বা হতে-হতে প্রায় সাড়ে সাত ফুট হয়ে যায়। তখন গ্রামের সব লোক, এমনকী তার মা-বাবাও তাকে দৈত্য ভেবে ভয় পায়। কিন্তু তার মনটা রয়ে গেছে ঠিক আগেরই মতন। এরপর তাকে একদিন ধরে নিয়ে যায় অন্য গ্রহের নীল মানুষরা। সেই অদ্ভুত গ্রহে কিছুদিন থাকবার পর সে একদিন কোনও ক্রমে সেখান থেকে পালায়। কিন্তু রণজয় রকেট চালাতে জানে না, ওই রকেট চালাচ্ছিল একটা পুতুল-মেয়ে। রণজয় আর একটা গ্রহ দেখে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। কিন্তু সেটা আরও বিপজ্জনক। সেখান থেকেও সে অতি কষ্টে পালিয়ে আবার রকেটে চেপে বসেছে।.কিন্তু পুতুল-মেয়েটিরও দম ফুরিয়ে গেছে। এখন চলন্ত রকেটে রণজয় একদম একা। তারপর—।]

রণজয় মেয়ে-পুতুলটিকে দু-একবার উলটেপালটে দেখল। তার ধারণা, স্প্রিং-এর পুতুলের মতন এরও নিশ্চয়ই গায়ে কোথাও চাবিটাবি আছে। দম দিয়ে দিলেই আবার চলবে। কিন্তু এ তো সাধারণ পুতুল নয়, এ হচ্ছে রোবো। দারুণ সূক্ষ্ম এর যন্ত্রপাতি। ওকে ঠিক করার সাধ্য রণজয়ের নেই।

শুয়ে থাকা পুতুলটিকে অবিকল একটা মেয়েরই মতন দেখতে। ওর জন্য খুব দুঃখ হল রণজয়ের। পুতুলটি কথা বলতে পারত না বটে কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে তাকাত, হাসত আর মাঝে-মাঝে ওর গা থেকে টুং-টাং শব্দ হত, তবু মনে হত, একজন কেউ সঙ্গে আছে।

কিন্তু এখন রণজয় একদম একা।

রকেটটা কত মাইল গতিতে যাচ্ছে রণজয় জানে না। মহাকাশে মহাশূন্যে কোথাও কিছু দেখা দেয় না। মাঝে-মাঝে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তখন রণজয়ের ভয় হয় যে হঠাৎ কোনও গ্রহতে ধাক্কা লাগলে একেবারে সবসুদ্ধু ছাতু হয়ে যাবে। কিন্তু রণজয়ের কিছু করবারও তো নেই। সে দু-একবার রকেটটার নানান বোতাম টিপে দেখেছে, কিন্তু তাতে ডাইনে বাঁয়ে বেঁকে না। এই রকেটটা যেন সোজাই চলতে জানে শুধু।

অন্ধকার কেটে গিয়ে মাঝে-মাঝে আলোর মধ্যেও এসে পড়ে রকেটটা। আমরা যে আলো চিনি, শুধু সেই আলো নয়, কত রকমের অদ্ভুত আলো। কমলা-বেগুনি-নীল-সবুজ রঙের আলো।

মাঝে-মাঝে খুব দূরে একটা কোনও জ্বলজ্বলে নক্ষত্র বা উল্কাও সে দেখতে পায়, কিন্তু সেদিকে সে তো ইচ্ছে করলেও যেতে পারবে না।

রকেটটাই বা এরকমভাবে কতদিন চলবে? এক সময় নিশ্চয়ই জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে। তখন কী হবে? রণজয় আর ভাবতে পারে না।

রণজয়ের খিদে পেয়েছে। বেঁচে থাকতে হলে তো কিছু খেতে হবেই।

রণর্জয় চালকের আসন ছেড়ে উঠে সারা রকেটটা ঘুরে দেখতে গেল।

রকেটটা বেশ ছোট। ইঞ্জিনের যন্ত্রপাতিই বেশি। তা ছাড়া আছে একটি মাত্র ঘর, আর একটা বাথরুম। খাবার জিনিস রাখবার কোনও ব্যবস্থাই নেই।

তখন রণজয়ের মনে পড়ল এটা আকাশে-ওড়া পরীক্ষার রকেট। মানুষ নেবার কথা নয়। সারি-সারি এরকম অনেক-অনেক ছোট রকেট সাজানো ছিল নীল মানুষদের গ্রহে, প্রত্যেকটিতেই একটা করে পুতুল-মেয়ে। রণজয় সেই রকমই একটা রকেট চুরি করে পালিয়েছে।

আকাশে-ওড়া পরীক্ষার রকেট বলেই এতে কোনও খাবার রাখা নেই। রোবো পুতুলগুলোর আরও কম। তাহলে জ্বালানিও তো বেশি থাকবার কথা নয়, তবু রকেটটা দিনের পর দিন চলছে কী করে?

কিন্তু মানুষ, সব সময়ই বাঁচতে চায়। রণজয় ভাবল, না খেয়েও তো মানুষ অনেকদিন বাঁচতে পারে। শহীদ যতীন দাস জেলখানার মধ্যে বাষট্টি দিন না তেষট্টি দিন যেন অনশনে ছিলেন। তার মধ্যে একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটে যাবে। তবে রণজয় কি অতদিন পারবে? এর মধ্যেই তার পেটে খিদের আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে।

কিছুই করবার নেই বলে রণজয় নিরাশভাবে চোখ বুজে বসে রইল। একটু বাদেই ঘুম এসে গেল তার।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে জানে না, হঠাৎ একটা কর্কশ শব্দে তার ঘুম ভাঙতেই সে চমকে লাফিয়ে উঠল।

কোথা থেকে এল আওয়াজ। এই মহাশূন্যে তো কোনওরকম শব্দ নেই। এমনকী রকেটের শব্দও ভেতরে বসে শোনা যায় না। চারদিকের স্বচ্ছ কাচের জানলায় রণজয় ঘুরে-ঘুরে দেখে এল। কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু অসীম শূন্য। তবে এ জায়গাটা অন্ধকার নয়, পাতলা নীল আলো ছড়িয়ে আছে।

তখন রণজয় ভাবল, তাহলে নিশ্চয়ই সে স্বপ্ন দেখেছে। এই কথা ভাবতে না ভাবতেই আবার সে শুনতে পেল সেইরকম শব্দ। দুর্বোধ্য ভাষায় কে যেন তাকে ধমকে কিছু বলছে।

এবারে সে লক্ষ করল, ইঞ্জিন ঘরের ওপর দিকে একটা জাল ঢাকা দেওয়া গোল গর্ত। আওয়াজটা আসছে সেখান থেকে। ওটা নিশ্চয়ই খবর পাঠাবার যন্ত্র। বহু দূর থেকে কেউ তাকে ডাকছে?

কিন্তু একটা অক্ষরও যে বোঝবার উপায় নেই। এমনকী মানুষের গলার আওয়াজ কিনা তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। টিয়াপাখি মানুষের মতন কথা বলতে শিখলে যেমন হয়, অনেকটা যেন সেইরকম শোনাচ্ছে।

বসবার জায়গাটার ওপর দাঁড়াতেই রণজয়ের মুখ সেই গোল গর্তটার কাছে পৌঁছে গেল।

সে বাংলাতেই চেঁচিয়ে বলল, তোমরা কে? কোথা থেকে কথা বলছ? আমি তোমাদের কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

নিশ্চয়ই রণজয়ের কথা ওরা শুনতে পেয়েছে, কেন না তক্ষুনি আরও এক গাদা ক্যাঁকো-ম্যাকো-ট্যাঁকো ধরনের শব্দ ভেসে এল।

রণজয় বলল, আমি পৃথিবীর মানুষ। আমি শুধু বাংলা ভাষা জানি। আর একটু একটু ইংরিজি। তোমরা কী পৃথিবীর নাম শুনেছ?

আবার ভেসে এল সেই ক্যাঁকো-ম্যাকো-ট্যাঁকো।

রণজয় বলল, দূর ছাই! এদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই।

তখন সেও ওদের নকল করে ক্যাঁকোম্যাকো-ট্যাঁকো ধরনের শব্দ করতে লাগল।

তাতেই ওদিককার শব্দ থেমে গেল হঠাৎ।

তারপর অনেকক্ষণ আবার চুপচাপ। রণজয় গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল, কারা এরকম ভাবে কথা বলছিল তার সঙ্গে। কত দূরে তারা আছে। জানলার দিকেও সে চোখ রেখেছে, যদি কিছু দেখা যায়।

যদি রণজয়ের মন ভালো থাকত, যদি খাবার-দাবারের কোনও অভাব না থাকত, যদি বাড়ি ফিরে যাবার সবরকম সুবিধে থাকত, তাহলে এইরকম সময়ে বাইরের দৃশ্য দেখতেও খুব ভালো লাগত তার।

খুব নরম নীল আলো ছড়িয়ে আছে বাইরে। তার মধ্যে এখন কোথা থেকে উড়ে

আসছে কমলা রঙের থোকা-থোকা মেঘ। দূরে দেখা যাচ্ছে দুটো তারা, ঠিক হীরের মতন ঝকঝকে।

সেই তারা দুটো ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। আরও একটু বাদে বোঝা গেল, সে দুটো তারা নয়, 'দুটো উজ্জ্বল রকেট।

রণজয়ের মনে হল, ওরা নিশ্চয়ই তাকে তাড়া করে আসছে। ওরাই তা হলে ক্যাঁকে-ম্যাকো-ট্যাকো করেছিল।

রণজয় মরিয়া হয়ে এলোপাথাড়ি ভাবে বোতাম টিপতে লাগল। যদি রকেটের মুখ অন্য দিকে ঘোরানো যায়। কিন্তু কোনই লাভ হল না। কমপিউটারে বারবার লাল আলো জ্বলতে লাগল।

ওই রকেটে কীরকমের প্রাণী আছে কে জানে? হয়ত তারা খুবই হিংস্র। লড়াই করবার মতন কোনও অস্ত্রও নেই রণজয়ের কাছে। বাবা-মা তার নাম রেখেছিলেন রণজয়, কিন্তু এরকম যুদ্ধে সে কী করে জিতবে!

রকেট দুটো আর একটু সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেল রণজয়ের রকেটের কাছে। ওদের রকেট অনেক বড়। ওদের দুটো চলে গেল দু-পাশে। তারপর চলতে লাগল সমান গতিতে।

রণজয় ভাবল, ওরা কি তাকে বন্দি করবে, না দূর থেকে একটা অস্ত্র ছুঁড়ে পুরো রকেটটাই ধ্বংস করে দেবে। চলন্ত রকেট থেকে তাকে বন্দি করবে কী করে? কাছাকাছি এলেই তো ধাক্কা লাগবে।

তারপর রণজয় দেখল, ডান দিকের রকেটটা থেকে একটা সুতো ছুটে আসছে তার দিকে। ঠিক গুলিসুতোর মতন পাতলা, আসছে একেবারে সোজা। সেই সুতোটা তার রকেটে লাগতেই তার রকেটের গতি কমতে লাগল। একটু বাদে একদমই থেমে গেল।

রণজয় যাকে পাতলা গুলিসুতো ভেবেছে, তা আসলে চুম্বক-আলো। এই চুম্বক-আলো দিয়ে যেকোনও গতিশীল জিনিসকে থামিয়ে দেওয়া যায়। এই চুম্বক-আলোর ব্যবহার পৃথিবীর মানুষ জানে না।

তারপর লাটাই গুটিয়ে যেরকম ঘুড়ি নামান হয়, সেইরকম ভাবেই সেই আলোর সুতো টেনে-টেনে রণজয়ের রকেটটা কাছে নিয়ে গেল ওরা।

এখন ওদের হাতে ধরা দেবার বদলে আর একটাই মাত্র পথ খোলা আছে। রকেটের দরজা খুলে রণজয় মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ঝাঁপানো মাত্রই অবশ্য সে মরে গিয়ে তার শরীরটা একটা শক্ত পাথরের টুকরোর মতন হয়ে যাবে। সেই অবস্থায় অনন্তকাল ধরে ঘুরবে।

দেখাই যাক না কী হয়, এই ভেবে রণজয় দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে।

দরজা কিন্তু তক্ষুনি খুলল না। রণজয়ের রকেটটা পুরোই ঢুকে গেল অন্য রকেটটার পেটের মধ্যে। একটা বিরাট তিমি মাছ যেমন অন্য মাছ খেয়ে ফেলে, সেইরকম বড় রকেটটা খেয়ে ফেলল ছোট রকেটটাকে। তারপর আপনা-আপনিই দরজা খুলে গেল।

মাত্র সাত জন প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। তাদের মানুষ বলা যায়, না-

ও বলা যায়। উচ্চতায় তারা তিন-চার ফুট মাত্র, তাদের পা-গুলো খুব সরু-সরু, পায়ের পাতা নেই বললেই চলে, পাখির মতন শুধু পাঁচটা আঙুল রয়েছে। শরীরও রোগা, হাতগুলো ছোট-ছোট কিন্তু হাতের মুঠো বেশ বড়। মুখগুলো মানুষের মতন হলেও চোখগুলো অস্বাভাবিক বড়। কারুরই মাথায় চুল নেই। সবাই পরে আছে অয়েল ক্লথের মতন জিনিসের চকচকে পোশাক। প্রত্যেকের হাতে একটা করে পিচকিরির মতন অস্ত্র।

কেউ কিছু কথা বলার আগেই ওদের একজন পিচকিরি থেকে খানিকটা আলো ছুঁড়ল, তাতেই ইলেকট্রিক শক্ খাবার মতন যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠল রণজয়। তার মাথা ঠুকে গেল নিজেরই রকেটের ছাদে।

রণজয় বুঝল, ওরা প্রথমেই তাকে জানিয়ে দিতে চায়, ওদের কাছে কীরকম অস্ত্র আছে। কিংবা এটা খুবই সাধারণ। এর চেয়েও অনেক ভয়ংকর কিছু আছে ওদের কাছে।

সে হাত দুটো সামনে এগিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে এক-পা-এক- পা করে নেমে এল নিচে।

তখন আর দুজন কাকুম-সাকুম-মাকুম ট্যাকো-ম্যাকো বলে বকুনি দিয়ে আবার আলো ছুঁড়ল রণজয়ের দিকে।

রণজয় এবার যন্ত্রণায় ডিগ্‌বাজি খেতে লাগল। মনে হল যেন তার শরীরের সমস্ত হাড় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। এরপর সবাই মিলে একসঙ্গে আলো ছুঁড়লে রণজয় সঙ্গে -সঙ্গে মরে যাবে।

রণজয় ছেলেটি আসলে খুব গোঁয়ার। খুব রেগে গেলে তার আর ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকে না। আর এইটুকু-এইটুকু বাচ্চা-বাচ্চা বেঁটে-বেঁটে মানুষরা তাকে কষ্ট দেবে, এই অপমান সহ্য করে বেঁচে থেকে লাভ কী! তবু ওরা জানুক, পৃথিবীর মানুষ বীরের মতন লড়াই করে মরতে জানে।

উঠে দাঁড়িয়েই সে একসঙ্গে লাথি আর ঘুঁষি চালাল। তিন-চারজন তাতেই ধরাশায়ী হয়ে গেল একেবারে। যদিও রণজয়ের মতন অত বড় চেহারার মানুষের হাতে মার খেয়েও তারা মরে গেল না কিন্তু। কোনও ব্যথার শব্দও করল না। অন্য কজন রণজয়ের পিচকিরির আলো ছোঁড়ার চেষ্টা করতেই লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে লাগল রণজয়। সে নিজেও দুটো পিচকিরি কেড়ে নিয়ে ওদের দিকে আলো ছুঁড়ছে আর লাথিও চালাচ্ছে। এক-একবার রণজয়ের গায়েও লেগে যাচ্ছে সেই আলো। কিন্তু সে অনবরত লাফাচ্ছে বলে পুরোটা লাগছে না।

এইরকম লড়াই চলল বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু খুদে মানুষরা কেউ মরছে না। এমনকী রণজয় ওদের এক একজনকে চ্যাংদোলা করে তুলে প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে মারছে দেয়ালে, তবু ওদের মাথা ভাঙছে না, শরীরের কোথাও কেটে রক্তও পড়ছে না।

রণজয় বুঝতে পারল, এই লড়াইতে তাকেই হেরে যেতে হবে। এর মধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

এই সময় সেই রকেটের অন্য দিকের একটা দরজা খুলে গেল। তারপর শোনা গেল একটা তীব্র বাঁশির সুর। একই রকমের কয়েকজন খুদে মানুষ এসে ঢুকল প্রথমে। কিন্তু কে যে বাঁশি বাজাচ্ছে তা বোঝা গেল না। এরা অন্য রকেটটা থেকে এসে পড়েছে বুঝতে পেরে রণজয় লড়াই থামিয়ে থমকে দাঁড়াল। আর কোনও আশা নেই!

সেই দ্বিতীয় দলের পেছনে-পেছনে এল একটি মেয়ে, সে এদের চেয়ে অনেক লম্বা। প্রায় মানুষের কাছাকাছি, তবে এরও চোখ অস্বাভাবিক বড়।

তার হাতে কোনও বাঁশি নেই, সে মুখ দিয়ে একটা শব্দ করছে, সেটাই বাঁশির মতন শোনাচ্ছে।

রণজয়কে দেখে সে অস্বাভাবিক চমকে উঠল। তার বড় চোখ দুটি আরও বিস্ফারিত হয়ে গেল। সেটা ভয়ে না রাগে তা বুঝতে পারল না রণজয়।

সে খুব দ্রুত চিন্তা করল, এই মেয়েটি নিশ্চয়ই এদের রানি। পিঁপড়েদের দলে যেমন একজন করে রানি থাকে, তার চেহারা অনেক বড় হয়, এদেরও নিশ্চয়ই সেইরকম।

বাঁশির শব্দ থামিয়ে মেয়েটি অন্যরকম একটা অদ্ভুত চিৎকার করতেই খুদে মানুষরা সবাই বসে পড়ল মাটিতে। অস্ত্র পাশে নামিয়ে রাখল।

মেয়েটিও মাটিতে বসে পড়ে খুব মিষ্টি গলায় কী যেন বলল রণজয়কে। কিন্তু সে এক বর্ণও বুঝল না।

রণজয় এক হাত নেড়ে জানাল সে ওদের ভাষা জানে না।

রণজয়ের হাত নাড়া দেখেই মেয়েটি মেঝেতে মাথা ঠেকাল, তার দেখাদেখি অন্য আর সবাই। তারপর সেই রানি মাথা তুলে তার একজন অনুচরকে কী যেন হুকুম করল।

সেই খুদে মানুষটি ছুটে গেল রকেটের ভেতরের দিকে। দুটো রুপোলি গোল বল নিয়ে ফিরে এল। একটা দিল তাদের রানির হাতে। আর একটা নিয়ে এল রণজয়ের দিকে।

রণজয় প্রথমে বলটা নিতে দ্বিধা করল। একবার অন্য গ্রহের একটা বল ছুঁয়েই তো তার এই অবস্থা। আবার এই বলটা ছুঁলে কী হয় কে জানে? যদি তার চেহারা এই মজার খুদে মানুষদের মতন হয়ে যায়? না, না, তা সে কিছুতেই চায় না।

সে হাত নেড়ে বলল, চাই না, চাই না!

তখন ওদের রানি সেই বলটা মুখের কাছে নিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলল, হে নীলদেবতা, আপনি এই জিনিসটা মুখের কাছে ধরলেই আপনার ভাষা আমরা বুঝতে পারব, আপনিও আমাদের ভাষা বুঝতে পারবেন।

বাংলা কথা শুনে এমনই চমকে গেল রণজয় যে সে আর কোনও দ্বিধা না করেই টপ করে তুলে নিল বলটা। কতকাল পরে সে বাংলা শুনল। কী অদ্ভুত যন্ত্র বানিয়েছে এরা। এর থেকে শব্দতরঙ্গ বেরিয়ে অন্য লোকের গায়ে ধাক্কা মারলেই তা সঙ্গে-সঙ্গে অনুবাদ হয়ে যাচ্ছে।

রণজয় বলল, আপনারা কে? আমাকে বন্দি করতে চান কেন?

আশ্চর্য, রণজয় কিন্তু নিজের বাংলা কথাটা শুনতে পেল না। সেটা হয়ে গেল ওদের ভাষা।

রানি বলল, আপনাকে বন্দি করব? সে কী? আপনি তো আমাদের দেবতা। আপনার দেখা যে আজ পেয়েছি, সে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

রণজয় বলল, আমি দেবতা? না, না, তোমাদের ভুল হয়েছে। আমি পৃথিবী গ্রহের সামান্য একজন মানুষ!

রানি বলল, কেন আমাদের ছলনা করছেন প্রভু? আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে আছে, একদিন আমরা এই মহাশূন্যে আমাদের দেবতাকে খুঁজে পাব। তিনি উচ্চতায় আমাদের দ্বিগুণ। তাঁর গায়ের রং মহাশূন্যের মতো নীল, তাঁর মাথায় চুল আছে। তাঁর দেখা পেলে আমরা হব এখানকার গ্রহমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ জাতি। চলুন প্রভু, আমাদের গ্রহে চলুন, আপনাকে আমরা সব কিছু দিয়ে সেবা করব।

রানির কথা শেষ হওয়া মাত্রই সব খুদে মানুষরা হইহই করে উঠে রণজয়কে ঘিরে নাচতে লাগল।

রণজয়ের একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা। কোথায় সে এক্ষুনি মরতে বসেছিল, তার বদলে হয়ে গেল দেবতা? যা বাবাঃ! সবাই তাকে অনেক রকম খাবার এনে দিল আর তাকে ঘিরে-ঘিরে কী সব গান গাইতে লাগল।

এইরকম ভাবে কতক্ষণ কাটল কে জানে? রণজয় এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর রানি তার কাছে এসে বলল, হে দেবতা, দেখুন, ওই আমাদের গ্রহ।

রণজয় জানলা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখল, এদের গ্রহটি বেশ সুন্দর। অসংখ্য পাহাড় দেখা যায় আর হাল্‌কা কমলা রঙের মেঘ। গাছপালা অবশ্য চোখে পড়ল না।

রণজয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পৃথিবীতে তো আর ফেরা হবে না। তা হলে এই অচেনা গ্রহেই দেবতা কিংবা রাজা সেজে থাকা যাক। খাতির-যত্ন তো পাওয়া যাবে।

কিন্তু এই সুখভোগ রণজয়ের ভাগ্যে সইল না।

খুদে মানুষদের গ্রহে নেমে সে সবে মাত্র কয়েক পা হেঁটেছে, অমনি তার দম আটকে আসতে লাগল। যেন সে এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। এখানকার বাতাস দারুণ ভারী।

বিদ্যুৎ চমকের মতন তার মনে পড়ল, এই গ্রহে গাছ নেই। এই গ্রহের হাওয়া মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। যতই দৈত্যের মতন চেহারা হোক, সে আসলে মানুষ, অক্সিজেন ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না।

হাঁপাতে-হাঁপাতে সে রানিকে বলল, আমাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে। আমার গ্রহ থেকে একটা যন্ত্র না আনলে আমি শ্বাস নিতে পারব না। তোমার কয়েকজন লোককে দাও আমার সঙ্গে। আমি রকেটে করে ঘুরে আসছি। আমার জন্য চিন্তা করো না, সময় হলে আমি ঠিক ফিরে আসব।

আর সময় নষ্ট করার উপায় নেই, রণজয় টলতে-টলতে উঠে পড়ল রকেটে। রানি তক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দিল।

খুদে মানুষরা যদিও পৃথিবীর নামও শোনেনি, তবে সূর্য নামে একটা ছোট্ট তারার কথা তারা জানে। সেই হিসেবে খুঁজে-খুঁজে ওরা একদিন পৌঁছাল পৃথিবীতে। সন্ধের দিকে একটা পৃথিবীতে নামল রকেট।

রণজয় ভাবছে, এখন এই খুদে মানুষদের সে কী বলবে? তার পক্ষে তো আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, ওখানে ও একদিনও বাঁচবে না। এরা তাকে দেবতা ভেবেছে, কিন্তু সে দেবতার মতন অমর তো নয়।

সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে গেল।

খুদে মানুষরা রণজয়ের সঙ্গে রকেট থেকে নামতেই ছটফট করতে শুরু করে দিল। পৃথিবীর বাতাস আবার তাদের একেবারেই সহ্য হয় না। ঠিক কাটা পাঁঠার মতন ধড়ফড় করতে লাগল তারা মাটিতে পড়ে।

রণজয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ওদের কোলে করে-করে তুলে দিল রকেটে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল. তোমরা চলে যাও। আমার সময় হলে আমি যাব। তোমাদের ভালো হোক!

তারপর রকেটটা উড়ে যেতেই রণজয় পৃথিবীর প্রতি প্রণাম জানিয়ে কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলল, মা, তুমিই আমার সবচেয়ে ভালো। তোমায় ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না!
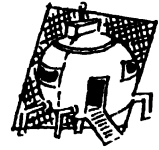
ভূতের দেশে নীল মানুষ

সেই রণজয়ের কথা মনে আছে? অন্য গ্রহের মানুষের ছোঁয়ায় যার গায়ের রং একেবারে নীল হয়ে যায় আর সে লম্বাও হয়ে যায় অনেকখানি। তখন তার বাবা-মা আর বন্ধুরা কেউ তাকে দেখে চিনতে পারত না, সবাই তাকে মনে করত একটা নীল রঙের দৈত্য। তারপর রণজয় বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকত, তবু একদিন অন্য গ্রহের নীল মানুষরা জোর করে ধরে নিয়ে গেল তাকে। সেখানে সেই গ্রহে কোনও গাছপালা নেই, জল নেই, কোনও মানুষের মাথায় চুল নেই, ভুরুও নেই। তারা থাকে মাটির নিচে শহর বানিয়ে। সেইসব মানুষেরা খরগোশ কিংবা গিনিপিগের মতন রণজয়ের শরীরটা কেটেকুটে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু রণজয়ের গায়ের জোর ওদের চেয়ে অনেক বেশি। সে কোনওরকমে সেই লোকগুলোর হাত ছাড়িয়ে একটা রকেট চুরি করে পালিয়েছিল।

সেই রকেটটা চালাচ্ছিল একটা মেয়ে। সে কিন্তু সত্যিকারের মেয়ে নয়। মেয়ের মতন চেহারার একটা যন্ত্র-পুতুল, অর্থাৎ রোবো। সেই মেয়ে পুতুলটি কোনও কথা বোঝে না, শুধু হাসে আর তার গা দিয়ে টুং-টাং শব্দ বেরোয়। রণজয় তো রকেট চালাতে জানে না, সে মেয়ে পুতুলটিকে অনেক কাকুতি-মিনতি করল তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু পুতুলটা কিছুই বোঝে না। তখন রণজয় রাগের চোটে রকেটের সব ক'টা সুইচ টিপে দিল এলোমেলো ভাবে। মহাশূন্যে রকেটটা ছুটতে লাগল উল্কার বেগে। তারপর রকেটটা যখন একটা সবুজ রঙের গ্রহের খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে, তখন রণজয় মনে করল, ওই তো পৃথিবী। সে আর প্রাণের মায়া না করে লাফ দিল সেই রকেট থেকে।

তবু রণজয় মরল না। সে এসে পড়ল কতকগুলো নরম গাছপালার ওপরে। তার হাত পাও ভাঙেনি। সবুজ রঙের গাছ দেখে রণজয় ভাবল, সে সত্যিই আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। সেইজন্য সে আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু রণজয় আসলে পৃথিবীতে ফেরেনি। সে এসেছে অন্য একটা অজানা গ্রহে, এবার শোনাচ্ছি তার পরের কাহিনি।

অনেক ডালপালা ছড়ানো একটা মস্ত বড় গাছের নিচে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল রণজয়। আবার কোন নতুন বিপদের মধ্যে পড়ল, তা বোঝবার চেষ্টা করল। এটা আবার কোন অদ্ভুত জায়গা? তবে একটা খুব বড় কথা, এখানকার বাতাসে নিশ্বাস নিতে তার কোনও কষ্ট হচ্ছে না।

কিছু প্রজাপতি ছাড়া আর কোনও জীবন্ত প্রাণী এ পর্যন্ত তার চোখে পড়েনি। প্রজাপতিগুলোও অদ্ভুত। দু-একটা উড়তে-উড়তে এসে তার গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে, আর সঙ্গে -সঙ্গে ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে একেবারে। যেন খুব পাতলা কাচের তৈরি। কিন্তু কাঁচের প্রজাপতি কি ইচ্ছে মতন ওড়াউড়ি করতে পারে? সে নিজে থেকেই একটাকে ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু ছোঁয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভেঙে গেল, ধুলো হয়ে গেল একেবারে। আশ্চর্য! অথচ প্রজাপতিগুলোকে দেখতে ভারি সুন্দর।

যতদূর দেখা যায়, শুধু জঙ্গল। সব গাছই বেশ বড়-বড়। তবে কোনও গাছেই ফুল বা কোনও রকম ফল দেখতে পেল না রণজয়। তার খুব খিদেও পেয়েছে, জল তেষ্টাও পেয়েছে। এখানে কি মানুষের খাদ্য কিছু পাওয়া যাবে? তবে গাছ যখন আছে তখন জল আছে নিশ্চয়ই!

রণজয় উঠে পড়ে হাঁটতে লাগল। আরও একটা ব্যাপার দেখে তার প্রথমেই খটকা লেগেছিল। যে-কোনও জঙ্গলেই মাটিতে অনেক শুকনো পাতা পড়ে থাকে। এই জঙ্গলের মাটি একেবারে পরিষ্কার। এত গাছ অথচ একটাও পাতা পড়ে না মাটিতে; এখানকার মাটিও খুব সূক্ষ্ম বালির মতন।

হাঁটতে-হাঁটতে জঙ্গলটা পার হয়ে রণজয় একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছল। তারপরই দেখতে পেল একটা নদী।

নদীটা বেশ চওড়া, তার ওপারে আর একটা জঙ্গল। ওদিকের জঙ্গলটা অন্যরকম। এদিকের জঙ্গলে যেমন নানা রকমের গাছ, কিন্তু নদীর ওপারের জঙ্গলে সব গাছ একরকম। প্রত্যেকটি গাছই বেশ মোটা আর লম্বা, আর তাদের প্রত্যেকের ঠিক দুটি করে ডাল। ঠিক যেন দুটো হাতওয়ালা গাছ।

রণজয় নদীর জলের কাছে নেমে এল। জল বেশ পরিষ্কার। ছোট ছোট রঙীন মাছও দেখতে পেল কিছু। রণজয় হাঁটু পর্যন্ত জলে নেমে চিন্তা করতে লাগল একটু। সে খুবই ভালো সাঁতার জানে, এই নদীর জল যতই গভীর হোক সে পার হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এই নদীতে কুমিরের মতন কোনও হিংস্র জানোয়ার আছে কিনা তা কী করে জানা যাবে? তারপর সে ভাবল, দেখাই যাক না, কী হয়?

রণজয় নদীটা সাঁতরে চলে এল এপারে। কিছুই হল না। কিন্তু এদিকে এসে তার খুব লাভ হল প্রথমে। সে দেখল নদীর পারের বালিতে কয়েকটা গর্ত, একটা গর্তের

মুখের কাছে একটা গোল ডিম। রণজয় দেখেই চিনতে পারল, ওগুলো কচ্ছপের ডিম। সে গ্রামের ছেলে, সে এসব চেনে। তাহলে এই নদীতে কচ্ছপ আছে। গর্তগুলোর মধ্যে হাত দিয়ে রণজয় দশ বারোটা ডিম পেয়ে গেল, তারপর সেগুলো ভেঙে কাঁচাই খেয়ে ফেলল। তাতে খিদে মিটল খানিকটা। এর পর নদীর জল পান করে তার প্রাণ ঠান্ডা হল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সে শুনতে পেল একটা গর্জন। চমকে তাকিয়ে দেখল একটা হলুদ রঙের প্রাণী ছুটে বেরিয়ে আসছে জঙ্গল থেকে। এক পলক তাকিয়েই রণজয় বুঝল সেটা বাঘের মতনই একটা প্রাণী, বাঘের চেয়ে অনেক বড়। আর মুখের সামনে দিয়ে বুনো শুয়োরের মতন দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে। রণজয় আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। বাঘের সঙ্গে দৌড়ে পারা যাবে না। জলে ডুব সাঁতার দিয়ে যদি বাঁচা যায়।

বাঘের মতন প্রাণীটা কিন্তু রণজয়কে গ্রাহ্যও করল না। সে নিজেই খুব ভয় পেয়েছে মনে হল। কেউ যেন তাকে তাড়া করে আসছে। দাঁতাল বাঘটাও ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, খুব তাড়াতাড়ি নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠল।

রণজয় বুক জলে দাঁড়িয়ে দেখল, ওপারে গিয়ে দাঁতাল বাঘটা আর দৌড়তে পারল না, বালির ওপর ধপ্ করে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল। ও যেন খুবই আহত, এক্ষুনি মরে যাবে।

বিস্ময়ে রণজয়ের চোখ যেন একেবারে কপালে উঠে গেল। এরকম হিংস্র বাঘও ভয় পায় কাকে? কে ওকে আঘাত করেছে? ওর চেয়েও কোনও বড় আরও ভয়াবহ প্রাণী আছে এখানে? কিন্তু কিছু তো ওকে তাড়া করে এল না! জঙ্গলের মধ্যে কোনও শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

রণজয়ের কাছে নদীটাই সবচেয়ে নিরাপদ মনে হল। সে সাঁতরাতে শুরু করল নদীর মাঝখান দিয়ে। বাঘটাকে মরতে দেখে তার গা ছমছম করছে।

রণজয় সাঁতার কাটতে ভালোবাসে। সে তরতর করে অনেক দূরে চলে যেতে লাগল। প্রায় এক ঘণ্টা সাঁতরে সে খানিকটা ক্লান্ত হয়ে আবার পারে উঠে এল বিশ্রাম করবার জন্য।

বালির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তেই সে আকাশে খুব জোরে গোঁ-গোঁ শব্দ শুনতে পেল। তারপরই দেখল, একটা গোল মতন রকেট তীব্র জোরে উড়ে যাচ্ছে। এই রকেটটা চড়েই তো রণজয় এসেছিল! রকেটটা এই গ্রহটাকে কেন্দ্রে করে ঘুরছে। রণজয় হাত তুলে চেঁচিয়ে ডাকল, এই, এই! কিন্তু ততক্ষণে রকেটটা আবার মিলিয়ে গেছে। তাছাড়া তার ডাক তো কেউ শুনতে পাবে না, রকেটটা চালাচ্ছে তো একটা মেয়ে-পুতুল!

রণজয় তাকিয়ে দেখল, নদীর এপারেও সেই দুটি ডালওয়ালা গাছের জঙ্গল। এই গাছগুলোকে দেখলেই যেন কেমন লাগে। সব গাছের ঠিক দুটো করে ডাল কেন?

রণজয়ের ভীষণ একা লাগল। মানুষের মতন কোনও প্রাণী এই গ্রহে সে এ পর্যন্ত দেখেনি। তাহলে সেরকম কিছু নেই বোধহয়। শুধু জঙ্গল আর কিছু জন্তু-জানোয়ার! এইখানে তাকে সারা জীবন থাকতে হবে? এখান থেকে চলে যাওয়ার তো কোনও উপায়

নেই। দূর থেকে সবুজ গাছপালা দেখে সে এই গ্রহটাকে পৃথিবী বলে ভুল করেছিল। তার ধারণা ছিল, মহাবিশ্বের আর কোনও গ্রহে সবুজ গাছপালা নেই।

খুব চড়া রোদে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। নদীর ধারে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়? গাছের ছায়ায় গিয়ে বসবার জন্য সে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল।

তারপরই একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হল।

রণজয় কিছু বোঝবার আগেই সে দেখল যে সে মাটি থেকে শূন্যে উঠে যাচ্ছে। একটা গাছের ডাল তাকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল অনেক দূরে, সে গিয়ে পড়ল আর একটা গাছের ওপর। সেই গাছটাও ছুঁড়ে দিল তাকে। এবারও সে মাটিতে পড়ল না, অন্য একটা গাছ ঠিক যেন হাত বাড়িয়ে ধরে নিল। গাছগুলো লোফালুফি খেলতে লাগল তাকে নিয়ে।

এই গাছগুলো শুধু যে জীবন্ত তাই নয়, এরা ইচ্ছে মতন ডালপালা নাড়তে পারে। রণজয় একেবারে অসহায়, সে কোনও গাছের ডাল আঁকড়ে ধরবার আগেই গাছেরা তাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে ওপরে। আর কিছুক্ষণ এমন ভাবে চললে সে অজ্ঞান হয়ে যাবে, তার প্রাণটাও থাকবে না।

একবার একটা গাছের ডাল ফস্‌কে গেল, তাকে ঠিক ধরতে পারল না। রণজয় পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে-সঙ্গে সে খুব জোরে গড়াতে লাগল। অন্য গাছের ডালগুলো নিচু হয়ে তাকে ধরবার চেষ্টা করল খুব, কিন্তু তার আগেই রণজয় গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে এল জঙ্গলের বাইরে। আবার নদীর ধারে এসে সে হাঁপাতে লাগল। দারুণ ভয়ের সঙ্গে সে চেয়ে রইল জঙ্গলটার দিকে। বাবারে, কী সাঙ্ঘাতিক গাছ! তবু ভাগ্য ভালো যে গাছগুলো চলাফেরা করতে পারে না।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর রণজয় আবার উঠে নদীটার ধার ঘেঁষে হাঁটতে লাগল। কোনওরকম বিপদ দেখলেই সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে! এর মধ্যে আবার তার খিদেও পেয়ে গেছে, কিন্তু আর কচ্ছপের ডিম তার চোখে পড়ছে না।

জঙ্গলটা এক জায়গায় শেষ হয়ে গেল, তারপর ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে চোখ বড়-বড় হয়ে গেল রণজয়ের। মাঠের মধ্যে পর-পর কয়েকটা বাড়ি। নীল মানুষদের গ্রহে যেমন দেখেছিল, এখানকার বাড়িও সেইরকম গোল-গোল ধরনের।

বাড়ি যখন আছে, তখন মানুষের মতন প্রাণীও আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তারা কীরকম মানুষ হবে? যদি হিংস্র হয়? রণজয় একা, তার কাছে কোনও অস্ত্রও নেই। তবু রণজয় এক-পা এক-পা করে এগোল।

একটা বাড়ির খুব কাছে গিয়ে দেখল, বাড়িটা শুধু পাথরের তৈরি। সামনে খানিকটা জায়গা বাগানের মতন, কিন্তু সেখানে একটাও গাছ নেই, এমনকী ঘাসও নেই। একটু দূরে একটা পুকুর, তার ঘাট চমৎকার পাথর দিয়ে বাঁধান। প্রথমেই বাড়ির মধ্যে না ঢুকে সে সেই ঘাটে গিয়ে বসল।

একটু পরে তার মনে হল, ঘাটের কাছে পুকুরের জল নড়ছে। তারপর জলে ঝাপুস-ঝুপুস শব্দ হতে লাগল, ঠিক যেন মনে হল কয়েকজন একসঙ্গে স্নান করতে নেমেছে। কিন্তু কারুকেই দেখা যাচ্ছে না।

রণজয়ের সমস্ত শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেল ভয়ে। সে উঠে দাঁড়াতেই শুনতে পেল মেয়েলি গলার আওয়াজ। ওই জলের কাছেই। তবু কারুকে দেখা যাচ্ছে না, কথাগুলোর মানেও বোঝা যাচ্ছে না।

রণজয় এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে যেতে লাগল। ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। এখন দুপুরবেলা, সে মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে অথচ তাদের দেখতে পাচ্ছে না, এর মানে কী?

তারপরই তার ঠিক কানের কাছে কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে জিগ্যেস করল, কিম কিলা সুলি?

রণজয় সঙ্গে-সঙ্গে পাশ ফিরে দেখল, কেউ নেই!

সে জিগ্যেস করল, কে? কে কথা বলছে?

আবার সেই অদ্ভুত প্রশ্ন : কিম কিলা সুলি?

প্রাণের ভয়ে এক দৌড় মারল রণজয়। আর কিছু না ভেবে পেয়ে ঢুকে পড়ল পাথরের বাড়িটার মধ্যে।

বাড়িটার একতলায় একটা মস্ত হলঘরের মতন, এক পাশ দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। দোতলায় চারটে গোল ঘর। আলমারি, চেয়ার, টেবিল, খাট, বিছানা সবই আছে ঘরগুলোতে, কিন্তু মানুষজন কেউ নেই। দেখলে মনে হয়, অনেকদিন এসব ঘরে কোনও মানুষ থাকেনি!

বাড়িটাতে খাবারের জিনিস কিছুই নেই।

একটু পরে রণজয় আবার বাইরে বেরিয়ে এল। বিকেল হয়ে এসেছে। রোদের তেজ অনেক কম। কিছু দূরে আর একটা বাড়ি দেখে রণজয় ছুটে গেল সেদিকে, যদি সেখানে কিছু খাবার পাওয়া যায়।

সে বাড়িটারও দরজা খোলা। ভেতরটা একই রকম। অনেক জিনিসপত্র আছে, কিন্তু কোনও জীবিত প্রাণী নেই।

পরপর কয়েকটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখে এল রণজয়। সব ঠিক একই রকম অবস্থা। রূপকথায় যেমন মৃত্যুপুরীর কথা পড়েছে রণজয়। এ যেন ঠিক তাই। এখানে একসময় মানুষের মতন প্রাণী ছিল, এখন নেই।

ক্লান্ত হয়ে রণজয় একটা বাড়ির দরজার সামনে যেই বসেছে, অমনি কানের কাছে কে আবার বলে উঠল, কিম কিলা সুলি?

রণজয় ভয় পেল, কিন্তু তার আর পালাবার শক্তি নেই।

এবার একসঙ্গে তিন চারটে গলায় নানারকম কথা শোনা গেল। কিন্তু কোনওটারই মানে বুঝতে পারল না সে।

রণজয় তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে হাত জোড় করে বলল, আপনারা কে? কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? আমি আপনাদের দেখতেও পাচ্ছি না, কথাও বুঝতে পারছি না।

এবার একটা গলার আওয়াজ শোনা গেল, খুম বুলি কুলু?

রণজয় বলল, এটা কী ভাষা? আপনারা দেখা দিচ্ছেন না কেন?

ঠিক যেন কেউ ঠাস্ করে একটা চড় কষাল রণজয়ের গালে।

রাগে মরিয়া হয়ে রণজয় সামনের দিকে ঘুষি চালাল, কিন্তু কোনও কিছুই তার হাতে লাগল না।

অদৃশ্য হাতের আরও দু-একটা চড় খেয়ে রণজয় বুঝল, ভূতের সঙ্গে মারামারি করে সে কিছুতেই পারবে না। প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে দৌড়াল অন্ধের মতন।

কিন্তু রণজয় বেশি দূর যেতে পারল না। হঠাৎ যেন একটা ঝড় উঠল। সেই ঝড়ের ধাক্কায় রণজয় পড়ে গেল মাটিতে। আকাশে মেঘ নেই। তবু এ কেমন অদ্ভুত ঝড়!

উঠে দাঁড়াতে গিয়েও রণজয় ঠিক মতন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, ঝড়ের হাওয়া তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে একদিকে। মাঝে-মাঝে আছাড় খেতে-খেতে ঝড়ের ঠেলায় শেষ পর্যন্ত সে ধাক্কা খেয়ে থামল একটা বড় বাড়ির দরজার কাছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন বেঁটে মতন মানুষ।

তাকে দেখেই রণজয় আবার আঁতকে উঠল। তার মানুষের মতনই চোখ, মুখ, নাক আছে বটে, কিন্তু সারা শরীরে জেব্রার মতন ডোরাকাটা। বেশ বড়-বড় লোমও আছে গা-হাত-পা জুড়ে। শুধু একটা চামড়ার হাফপ্যান্ট পরা, আর কোনও পোশাক নেই।

লোকটি মোটা গলায় জিগ্যেস করল, কিলি উলা নাসু নাসু?

কোনও উত্তর না দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল রণজয়। সে প্রথমেই দেখে নিয়েছে, ওই জেব্রার মতন ডোরাকাটা মানুষটার হাতে কোনও অস্ত্র নেই, তাকে চট করে মেরে ফেলতে পারবে না।

লোকটা সামনের দিকে চেয়ে কাকে যেন জিগ্যেস করল, মিসি নিসি কিলি?

হাওয়া থেকে অদৃশ্য গলা উত্তর দিল, খুলু বুলা খুলু—।

রণজয় শুয়ে পড়ল মাটিতে। আর সে সহ্য করতে পারছে না। তার বুকের মধ্যে দুম্ দুম্ শব্দ হচ্ছে।

ডোরাকাটা চেহারার লোকটা রণজয়ের পাশে বসে আবার সেই দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করল।

রণজয় চেঁচিয়ে বলল. আমি তোমাদের ভাষা জানি না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না! এটা কী ভূতের দেশ? সবাই অদৃশ্য, তুমি কি জ্যান্ত ভূত?

লোকটা রণজয়ের একটা হাত ধরল খুব আলতো ভাবে। রণজয় বাধা দিল না। এখন তার গায়ে যা জোর আছে, তাতে এই লোকটাকে সে তুলে আছাড় দিতে পারে। তার আগে দেখাই যাক না ও কী করতে চায়?

ডাক্তাররা যেমন নাড়ি দেখে, সেইভাবে লোকটা রণজয়ের বাঁ হাত ধরে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, ডিম্‌সি জুমিলি জুমিলি। তুমি কে?

লোকটির মুখে এতক্ষণে বাংলা শুনে রণজয় ধড়মড় করে উঠে বসল আবার। সে কানে ঠিক শুনেছে তো? লোকটা বাংলায় কথা বলছে সত্যি?

লোকটি আবার জিগ্যেস করল, তুমি কে?

রণজয় বলল, আমি একজন মানুষ!

লোকটি বলল, মানুষ কাকে বলে?

রণজয় বলল, পৃথিবী গ্রহের অধিবাসীদের নাম মানুষ।

লোকটি বলল, পৃথিবী গ্রহ কোথায়?

রণজয় বলল, পৃথিবী গ্রহ কোথায়, সেটা কী করে বোঝাব? এটা কোন জায়গা, তাও আমি জানি না। তুমি...তুমি কি সূর্যের নাম শুনেছ? সূর্যের এক সন্তানের নাম পৃথিবী।

লোকটি বলল, সূর্য কাকে বলে আমি জানি না।

রণজয় বলল, তুমি সূর্য জানো না, পৃথিবী জানো না, তবে আমার ভাষায় কথা বলছ কী করে?

লোকটি বলল, তোমার গা ছুঁয়ে আমি তোমার ভাষায় কথা বলছি। পৃথিবীর প্রাণী বুঝি তোমার মতন এত লম্বা হয়? আর এরকম নীল রঙের গা হয়?

রণজয় বলল, না। আমার এই চেহারা অন্য গ্রহের প্রাণীরা করে দিয়েছে। তারা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আমি পালিয়ে এসেছি।

লোকটি বলল, তুমি ভুল জায়গায় এসেছ। এখানে তুমি বাঁচতে পারবে না।

রণজয় জিগ্যেস করল, আমায় তোমরা মেরে ফেলবে? কিন্তু আমি তো তোমাদের সঙ্গে কোনও শত্রুতা করিনি। অদৃশ্য থেকে যারা কথা বলছে, তারা কারা?

লোকটি বলল, তুমি উঠে এসো আমার সঙ্গে। তোমায় একটা জিনিস দেখাচ্ছি।

রণজয় বলল, আমি ভীষণ ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত। আগে আমায় কিছু খাবার দিতে পারো?

লোকটি বলল, সেই তো মুশকিল। আমাদের এখানে কোনও খাবার নেই।

রণজয় বলল, কোনও খাবার নেই? তাহলে তুমি বেঁচে আছ কী করে?

লোকটি বলল, সেই জিনিসটাই তো তোমাকে দেখাতে চাইছিলাম। শোনো, এই যে আমাকে দেখছ, এরকম চেহারার শুধু আমিই একা এই গ্রহে আছি। তাও আর বেশিক্ষণ নেই। খাবারের অভাবে আমাদের সবার শরীর বাদ চলে যাচ্ছে। এই গ্রহের গাছেদের সঙ্গে আমাদের লড়াই চলছে।

রণজয় জিগ্যেস করল, গাছের সঙ্গে লড়াই? সে আবার কী?

লোকটি বলল, হ্যাঁ। কিছুদিন আগে একটা জ্বলন্ত উল্কা এসে পড়েছিল এই গ্রহে। তার প্রভাবে এখানকার গাছগুলো হঠাৎ খুব হিংস্র হয়ে গেছে। তারা ইচ্ছে মতন ডালপালা নাড়াতে পারে। কোনও গাছ এখন আর মরে না। একটা ডাল ভেঙে দিলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আর একটা ডাল গজিয়ে যায়। আমরা এতকাল ধরে গাছ কেটেছি বলে এখন গাছগুলো আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। আমাদের কাছাকাছি পেলেই গাছ আছড়ে আছড়ে আমাদের মেরে ফেলে। বাঘ, সিংহ, হরিণের মতন যত জন্তু বনে ছিল, গাছগুলো তাদেরও মেরে ফেলছে। আমরা গাছগুলোর সঙ্গে অনেক লড়াই করেও পারিনি, আমরা হেরে গেছি। ওরা এই গ্রহ থেকে সমস্ত প্রাণীকে শেষ করে দিতে চায়।

রণজয় বলল, কুড়ুল দিয়ে গাছ কেটে ফেলা যায় না?

লোকটি বলল, এই গ্রহে এখন আর তা যায় না। কেটে ফেললেই সেখানে নতুন গাছ গজায় বললাম যে! গাছ লতাপাতা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। কিন্তু মানুষ ছাড়াও গাছ বাঁচতে পারে! খাদ্যের অভাবে আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি!

রণজয় বলল, কিন্তু নদীতে তো মাছ আর কচ্ছপ আছে দেখলাম। তোমরা ওগুলো খাও না?

লোকটি বলল, মাছ আর কচ্ছপ খেয়ে বেশিদিন বাঁচা যায় না। সেইজন্য আমরা একটা অন্য উপায় বার করেছি।

রণজয় জিজ্ঞেস করল, এই যে অদৃশ্য থেকে কথা বলছে, ওরা কারা?

লোকটি বলল, ওদের আগে আমারই মতন চেহারা ছিল। খাদ্যের অভাবে এখন আমরা শরীরটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, শুধু প্রাণটা রাখছি। শরীর না থাকলে খাবারেরও প্রয়োজন হয় না। আর শুধু প্রাণটা অদৃশ্য হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়ালে গাছও আর আমাদের ধরতে পারে না। এসো, দেখবে এসো—

লোকটি রণজয়ের হাত ধরে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে মস্ত বড় একটা হলঘরের মধ্যে সারি-সারি খাট পাতা। প্রত্যেকটি খাটে ওইরকম জেব্রার মতন ডোরাকাটা চেহারার একজন করে মানুষ শুয়ে আছে। একটু কাছে গিয়ে রণজয় দেখল, সেই মানুষগুলোর অনেকের চেহারা কাচের মতন স্বচ্ছ হয়ে গেছে, কারুর অর্ধেকটা কাচের মতন। সবাই ঘুমন্ত।

রণজয়ের সঙ্গের লোকটি বলল, এদের একরকম অ্যাসিড মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। শরীরটা আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাবে। তারপর প্রাণটা বাতাসে ঘুরে বেড়াবে। এই আমাদের একমাত্র বেঁচে থাকার উপায়। আমিই শেষ, একটু পরে আমিও অ্যাসিড মেখে শুয়ে পড়ব।

রণজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

লোকটি বলল, নীল রঙের মানুষ, তুমি ভুল জায়গায় এসে পড়েছ। এখানে তোমারও বাঁচার উপায় নেই। তুমি আমাদের মতন শরীরটাকে বাদ দিয়ে অদৃশ্য হতে চাও? তাহলে তোমাকেও অ্যাসিড মাখিয়ে শুইয়ে দিতে পারি।

রণজয় চিৎকার করে বলল, না!

লোকটি বলল, তা ছাড়া তোমার আর বাঁচবার কোনও রাস্তা নেই! এক সময় আমাদের এখানেও কত সুখের সংসার ছিল, ছেলেমেয়েরা খেলা করত বনের মধ্যে, এখন সব শেষ! এসো, তুমিও আমাদের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে থাকবে!

রণজয় বলল না! আমি শরীর বাদ দিয়ে বাঁচতে চাই না!

ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রণজয় বাইরে বেরিয়ে এল। যেমন করেই হোক, তাকে নদীর ধারে পৌঁছতেই হবে। নদীর মাছ আর কচ্ছপের ডিম খেয়ে যে-কটা দিন বাঁচতে পারা যায় সেই চেষ্টাই করতে হবে। কখনো বাঁচার আশা ছাড়তে নেই।

নদীর ধারে পৌঁছল বটে রণজয়, কিন্তু কচ্ছপের ডিমও খুঁজে পেল না আর খালি হাতে মাছও ধরা যায় না। খানিকটা জল খেয়ে রণজয় বালির ওপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে-শুয়ে সে ভাবল, প্রথমে যে জঙ্গলটার ওপর এসে সে পড়েছিল, সেখানকার গাছগুলো কিন্তু তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেনি। কিছু কিছু গাছ কি এখনও ভালো আছে? সেই জায়গাটা খুঁজে পেলে বোধহয় আরও কিছুদিন বাঁচা যাবে।

আস্তে-আস্তে সন্ধে হয়ে গেল। চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল রণজয়। এক সময় একটা প্রকাণ্ড শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। চারদিকে একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। তার মধ্যে আকাশ চিরে ছুটে যাচ্ছে একটা গোল আলোর বল। রণজয় বুঝতে পারল, এটা সেই রকেটটা, আর একবার ঘুরে এসেছে। রণজয় করুণ চোখে সেটার দিকে চেয়ে রইল। ইস্। রকেটটা যদি একবার এখানে নামত—

সত্যিই কিন্তু রকেটটা আস্তে-আস্তে নামতে লাগল। রণজয়ের প্রথমে মনে হল, সেটা বুঝি নদীর বুকে পড়বে। কিন্তু তা হল না, রকেটটা এসে নামল জঙ্গলের ধারে। রণজয় সঙ্গে-সঙ্গে ছুটল সেই দিকে। ওই জঙ্গলের গাছগুলো যে ভয়াবহ, সে কথা ভুলে গেল রণজয়।

যে রকেটের দরজা খুলে সে লাফিয়েছিল, দরজাটা সেরকম খোলাই আছে। রণজয় হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে দেখল, সুইচবোর্ডের কাছে চুপ করে বসে আছে পুতুল-মেয়েটি। রণজয় তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ওগো পুতুল-মেয়ে, শিগগির এখান থেকে চল! এ গ্রহটা অতি ভয়ঙ্কর।

পুতুল-মেয়ে যে কথা বলে না, তা রণজয় জানে। কিন্তু আগে রণজয় দেখেছে যে পুতুল-মেয়েদের কিছু জিগ্যেস করলেই তারা হাসে আর তাদের গা থেকে টুং-টাং শব্দ হয়। এবার সেরকম কিছুই হল না। রণজয় দু-তিনবার কথা বলল, পুতুল-মেয়েটিকে ধরে ঝাঁকুনি দিল। তবু সে কোনও সাড়াশব্দ করল না। তখন রণজয় বুঝতে পারল, পুতুলটার ভেতরের যন্ত্র খারাপ হয়ে গেছে, তাই রকেট চালাবার ক্ষমতা ওর আর নেই।

পরের মুহূর্তেই একটা ঝাঁকুনি লেগে রকেটটা শূন্যে উঠে গেল।

রণজয় প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। রকেটটা খানিকটা উঠে আবার নেমে এল নিচে। আবার কেউ সেটাকে ছুঁড়ে দিল ওপরে।

এইরকম কয়েকবার হতেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। হিংস্র গাছগুলো রকেটটাকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে। ঠিক যেন একটা বল। যে কোনও সময় ওরা এটাকে মাটিতে আছড়ে ফেলবে। ক্রমশই তারা এত জোরে জোরে ছুঁড়ছে যে রণজয় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

রণজয় পাগলের মতন সুইচগুলো টিপতে লাগল। কোনটাতে কী কাজ হয় সে জানে না। কিন্তু রকেটটা চালাতে না পারলে তার বাঁচবার আর কোনও আশা নেই। সব ক'টা সুইচ টিপে দেবার পর রকেটটা থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ হতে লাগল। তারপরই গাছগুলো থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল ওপরে।

রণজয় বিরাট জোরে একটা নিশ্বাস ফেলল।

একটু পরেই সে রকেটের জানলা দিয়ে দেখল, সেই ভয়ঙ্কর গ্রহ থেকে অনেক ওপরে উঠে এসেছে। গাছগুলোকে তখনও দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ওরা হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছে রকেটটাকে।

তারপর আর কিছুই দেখা গেল না। আকাশের মহাশূন্যে রকেটটা ছুটে যেতে লাগল উল্কার চেয়েও বেশি জোরে।
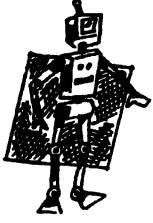
দেওয়ালের সেই ছবি

বাবা অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হন ঠিক সাড়ে ন'টায়। একদিনও তাঁর দেরি করার উপায় নেই। কারণ বাবা দেরি করলেই টুবলুরও দেরি হয়ে যাবে। অফিস যাওয়ার পথে বাবা টুবলুকে ইস্কুলে নামিয়ে দিয়ে যান।

এমনিতে বাবার খুব ভুলো-মন। প্রায়ই বেরুবার সময় কিছু না কিছু নিতে ভুল করেন। নিচে নেমে গিয়ে মনে পড়ে অফিসের দেরাজের চাবি নেননি, কিংবা পকেটে রুমাল নেই, কিংবা চশমাটা রেখে এসেছেন বাথরুমে। একদিন বড় রাস্তার মোড়ে মিনিবাসে উঠতে গিয়ে মনে পড়েছিল, মানি ব্যাগটাই আনেননি, পকেটে একটা পয়সাও নেই। বাসে উঠে পড়লে কী হতো? ভাড়া দিতে পারতেন না।

একটা ব্যাপারে কিন্তু বাবার কখনও ভুল হয় না। বেরুবার আগে দেওয়ালের একটা ছবির সামনে দাঁড়ান। চোখ বুঁজে প্রণাম করেন। সেই অবস্থায়য দাঁড়িয়ে থাকেন প্রায় এক মিনিট।

ওই ছবিটা বাবার, বাবার। অর্থাৎ টুবলুর ঠাকুরদার। ঠাকুরদা তো সে বলে না, টুবলু বলে দাদু। মজার ব্যাপার এই, ছবিতে ওই দাদুকে বাবার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট দেখায়। এ পাড়াতেই টুবলুর বন্ধু বাপির দাদুকে সে কতবার দেখেছে। খুব বুড়ো লোক, মাথায় পাকা চুল, দাঁত নেই, ফোকলা মুখে যখন কথা বলেন, সব বোঝাই যায় না। সব দাদুরাই বুড়ো লোক হয়, শুধু টুবলুর দাদুই বাবার চেয়েও ছোট, বড় মামার চেয়েও ছোট। বাবার কিছু-কিছু চুল পেকেছে, চোখে চশমা। আর ছবির দাদুর মাথায় সব চুল কাঁচা, চোখে চশমা নেই, মনে হয় যেন ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়েস।

টুবলু অবশ্য দাদুকে কখনও দেখেনি। তিনি মারা গেছেন টুবলুর জন্মের অনেক আগে। সেই সময় বাবারই নাকি বয়েস ছিল মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর।

বাড়িতে একটা পুরোনো অ্যালবাম আছে। তাতে দাদুর আরও কম বয়েসের ছবি আছে। একটা ছবিতে দাদু জার্সি পরে পায়ে একটা ফুটবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মনে হয় চোদ্দ বছরের খোকনদার সমান। দাদু নাকি ভালো ফুটবল খেলতেন। ওই অ্যালবামে বাবারও কম বয়সের কয়েকটা ছবি আছে। তা দেখে টুবলু বাবাকে চিনতেই পারে না। বাবা আর মা-ও যে একসময় বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ছিল। একথা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। টুবলুও একদিন বাবার মতন বড় হয়ে যাবে, তখন তার চেহারাটা কীরকম হবে? ওইরকম চশমা পরা, গোঁফওয়ালা? টুবলু একদিন খানিকটা দাড়িতে কালো রং মাখিয়ে

গোঁফ বানিয়ে নাকে লাগিয়েছিল। বাবার চশমাটা পরে নিয়েছিল। তারপর আয়নায় মুখ দেখল, তবু তাকে তো বাবার মতন দেখাচ্ছে না।

টুবলুর দাদু মারা গিয়েছিলেন জেলখানার মধ্যে। জেলের গার্ডরা তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। কিন্তু তাঁকে আগে বন্দি করে রেখেছিল কেন?

বাবার এক বন্ধু দিলীপকাকু মাঝে-মাঝে বাড়িতে আসেন। তিনিও দাদুর ছবিকে প্রণাম করেন। আর বছরে একদিন সেই ছবিতে একটা সাদা ফুলের মালা পরিয়ে দেন।

আজ সেই দিন। দিলীপকাকু মালা পরিয়ে দিচ্ছেন। বাবা খালি পায়ে দাঁড়িয়ে প্রণাম করছেন হাত জোড় করে।

তারপর দিলীপকাকু টুবলুকে বললেন, এই ছবিটায় আমি মালা দিই কেন জানিস? আমি যেমন তোর বাবার বন্ধু, তেমনি আমার বাবাও তোর দাদুর বন্ধু ছিলেন। তোর দাদু না থাকলে আমার জন্মই হতো না। আমার এই পৃথিবীটা দেখাই হতো না।

টুবলু ঠিক বুঝতে পারল না কথাগুলো।

দিলীপকাকু বাবাকে জিগ্যেস করলেন, তুই তোর ছেলে-মেয়েদের সব বলিসনি?

বাবা বললেন, ওর দাদা আর দিদি জানে। ও এখনও অনেক ছোট, এখন ঠিক বুঝবে না।

দিলীপকাকু বললেন, ছোট মানে? টুবলুর বয়েস কত?

বাবা বললেন, সারে ন-বছর।

টুবলু তাড়াতাড়ি বললে, ন-বছর তিনমাস।

দিলীপকাকু বললেন, যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। এই বয়েসের ছেলে-মেয়েরা অনেক কিছু বোঝে।

তারপর টুবলুর হাত ধরে দিলীপকাকু বললেন, আয়, আমার পাশে বোস, তোকে একটা গল্প বলি। ছবিতে তোর দাদুকে দেখিস, তাঁর নাম জানিস তো?

টুবলু মাথা হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ, ইন্দ্রজিৎ সরকার।

দিলীপকাকু বললেন, বেশ। আর আমার বাবা, তিনিও তোর একজন দাদু। তাঁর নাম ছিল রামানুজ সেন। ওদের ডাক নাম রাম আর ইন্দ্র। যদিও রামানুজ কথাটার মানে লক্ষ্মণ। রামের ছোট ভাই। রামায়ণের গল্প তো জানিস। সেখানে ইন্দ্রজিৎ ছিল রাম-লক্ষ্মণের শত্রু, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে লক্ষ্মণের দারুণ লড়াই হয়েছিল। এই ইন্দ্রজিৎ আর রামানুজ কিন্তু ছিল দারুণ বন্ধু। এটা ওই দুই বন্ধুর গল্প।

বাবা বললেন, দু-জনেই ভালো ফুটবল খেলতেন।

দিলীপকাকু বললেন, হ্যাঁ, দু-জনেই ভালো খেলোয়াড় ছিলেন, পড়াশুনাতেও ফার্স্ট-সেকেন্ড না হলেও খুব একটা খারাপ ছিলেন না। দু-জনে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠলেন, স্কুল ছেড়ে কলেজে। ইন্দ্রজিৎ আগে চাকরি পেয়ে গেল, রামের তখনও চাকরি করার মন নেই, সে তখন একটা ফুটবল টিমের ক্যাপটেন।

বাবা বললেন. ইন্দ্রজিতের আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। একটি ছেলেও জন্মাল, সেই ছেলেটিই হচ্ছি আমি।

দিলীপকাকু বললেন, একদিন হয়েছে কী, অনেক রাত, পাড়াসুদ্ধ সবাই ঘুমিয়ে

আছে। অন্ধকার, কোথাও আলো জ্বলেছে না, এই সময় ইন্দ্রজিতের শোওয়ার ঘরের জানলায় টক টক শব্দ হল। ইন্দ্রজিৎ প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি। আরও কয়েকবার শব্দ হতেই বিছানা থেকে উঠে এসে জানলা খুলে ফেলল। দেখলেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রাম। সে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ, কারুকে ডাকিস না। দরজা খুলে দে, তোর সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে। বাবা বললেন, আমাদের বাড়ি ছিল বেলগাছিয়া। তখনও পাড়াটা ছিল বেশ নির্জন।

দিলীপকাকু বললেন, রাম ভেতরে আসবার পরে ইন্দ্র দেখল, রামের সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কপালের কাছে অনেকখানি কাটা, জামা-টামা ছিঁড়ে গেছে।

তা দেখে আঁতকে উঠে ইন্দ্র জিগ্যেস করল, এ কী? এরকম কী করে হল? তুই কার সঙ্গে মারামারি করতে গিয়েছিলি? সেই অবস্থাতেও হেসে রাম বলল, পুলিশের সঙ্গে। খুব জোর প্রাণে বেঁচে গেছি।

ইন্দ্র জিগ্যেস করল, পুলিশের সঙ্গে? কেন? রাম, তুই কি কোনও ডাকাতের দলে ভিড়েছিস নাকি?

রাম বলল, না, আমি ডাকাত নই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

বাবা বললেন, টুবলু ও কথাটার কি মানে বুঝবে? আর একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। জানিস টুবলু, সেই সময়টা পরাধীন আমল। তার মানে, ইংরেজরা আমাদের দেশটা শাসন করে। অনেক অত্যাচার করে। আমরাও স্বাধীনতা আদায় করার জন্য লড়াই শুরু করেছি। উনিশশো বেয়াল্লিশ সালের আগস্ট মাসে গান্ধীজী সাফসুফ জানিয়ে দিলেন, ইংরেজ সরকার, ভারত ছাড়ো। আর দেশের লোকদের বললেন, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! তার মানে, হয় স্বাধীনতা অর্জন করব, নয় মরব! তাই শুনে অনেক জায়গায় বিপ্লবীরা পুলিশের সঙ্গে সামনা-সামনি লড়াই শুরু করে দিয়েছিল।

দিলীপকাকু বললেন, দুই বন্ধুর মধ্যে রাম গোপনে সেই বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিল। প্রাণের বন্ধু ইন্দ্রকেও কিছু বলেনি। অন্য কারুকে জানাবার নিয়ম ছিল না। সেই রাত্তিরে আহত অবস্থায় এসে রাম সব জানাতে বাধ্য হল। মেদিনীপুরে সে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে অতিকষ্টে পালিয়ে এসেছে। এখন পুলিশ তাকে খুঁজছে, ধরতে পারলেই ফাঁসি দেবে। ইন্দ্রর হাত জড়িয়ে ধরে সে বলল, এখন কোথায় লুকোই বল তো?

কথাবার্তা শুনে ইন্দ্রর বউ জেগে উঠেছে।

বাবা বললেন, ইন্দ্রর বউ মানে কে বুঝলি তো টুবলু? আমার মা! আমার তখন মাত্র দেড় বছর বয়েস।

দিলীপকাকু বললেন, তারপর ইন্দ্রর বউ অত রাতে গরম জল করে দিল। তা দিয়ে রামের ক্ষতস্থানের রক্ত-টক্ত ধুইয়ে ওষুধ লাগিয়ে দেওয়া হল। ছেঁড়া-জামা-প্যান্ট ছেড়ে পরে নিল ইন্দ্রর পোশাক। দুদিন কিছু খায়নি, তখন রান্না করে তাকে খাওয়ানো হল, ডাল-ভাত-আলুসেদ্ধ আর ওমলেট। খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে ভোরবেলা রামকে নিয়ে ইন্দ্র চলে গেল ক্যানিং। সেখান থেকে সুন্দরবন। সাতজেলিয়া নামে একটা গ্রামে একজন চেনা মাছের ব্যবসায়ীর বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হল রামকে।

বাবা বললেন, পরদিনই পুলিশ এল ইন্দ্রর বাড়িতে। সারা বাড়ি সার্চ করে

তোলপাড় করে দিল। রামকে পেল না, কিন্তু ইন্দ্র ফিরতেই তাকে খপ করে ধরে নিয়ে গেল।

টুবলু বলল, তোমার তো তখন মাত্র দেড় বছর বয়েস। তোমার কী করে সেসব কথা মনে রইল?

বাবা বললেন, আমার কী করে মনে থাকবে? পরে আমার মায়ের কাছে শুনেছি।

দিলীপকাকু বললেন, পুলিশ জেনে ফেলেছিল, রাম আর ইন্দ্র খুব বন্ধু। রামের সন্ধান ইন্দ্র জানবেই। সে যে ইন্দ্রর বাড়িতে এসেছিল, রক্তমাখা ছেঁড়া জামা-কাপড়গুলো দেখেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ইন্দ্র কিছুতেই বন্ধুকে ধরিয়ে দেবে না। তার পেটের কথা টেনে বার করবার জন্য পুলিশ দেবে না। তার পেটের কথা টেনে বার করবার জন্য পুলিশ তার ওপর কতরকম অত্যাচার যে করতে লাগল, তা তুই কল্পনা করতে পারবি না। পা দুটো বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে রাখত।

বাবা বললেন, হাতের নোখের মধ্যে আলপিন ঢুকিয়ে দিত।

দিলীপকাকু বললেন, মুখে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিত। কিন্তু ইন্দ্রর এমনই মনের জোর। সে একটা কথাও বলেনি। প্রায় আধমড়া অবস্থায় ইন্দ্রকে জেলে ভরে রাখা হল।

বাবা বললেন, রাম অবশ্য বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে পারেনি। ইংরেজ-পুলিশ খুব ধুরন্ধর ছিল। একদিন ধরে ফেলল রামকে। তারপর বিচারে আরও অনেকের সঙ্গে ওদের দু-জনেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল। ওদের পাঠিয়ে দেওয়া হল বহরমপুর জেলে।

দিলীপকাকু বললেন, দুই বন্ধু একসঙ্গেই ছিল। কিন্তু তাদের মনে সুখ ছিল না। দেশ এখনও স্বাধীন হয়নি। দেশকে স্বাধীন করতেই হবে। তখন ওরা চুপি-চুপি মতলোব করতে লাগল, কী করে জেল থেকে পালানো যায়। আরও তিনজন বিপ্লবীর সঙ্গে ওরা দিনের পর দিন পরামর্শ আঁটতে লাগল। তারা প্রতিজ্ঞা করে ফেলল, কিছুতেই বছরের পর বছর জেলখানায় পচতে তারা রাজি নয়। তারা পালাবে, আবার দেশ উদ্ধারের কাজে লেগে পড়বে। একদিন সুযোগ পাওয়া গেল। সেটা ছিল একটা ছুটির দিন। ওরা লক্ষ করেছিল, ছুটির দিনগুলোতে খানিকটা ঢিলেঢালা ভাব থাকে। রাত্তিরবেলায় একজন মাত্র গার্ড ওদের সেলের বাইরে পাহারা দেয়। মাঝরাতে সেই গার্ডটার হাত-মুখ বেঁধে ফেলতে পারলে পাঁচিল টপকিয়ে বাইরে চলে যাওয়া যেতে পারে। সেই রকমই ব্যবস্থা হল। আগে থেকেই সেলের একটা চাবি তৈরি করে ফেলা হয়েছিল। পাঁচজন বিপ্লবী রাত্তির ঠিক একটার সময় বেরিয়ে এসে সেই গার্ডটাকে কাবু করে ফেলল।

টুবলু জিগ্যেস করল, তার হাতে বন্দুক ছিল না?

দিলীপকাকু বললেন, বন্দুক তো থাকবেই, কিন্তু সেটা সে তোলার সুযোগই পায়নি। ওরা পেছন থেকে এসে তার মুখ চাপা দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলল। মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দিল। সে আর চ্যাঁচাতে পারবে না। তারপর তারা ছায়ার মতন পা টিপে-টিপে ভেতরে মাঠটা পেরিয়ে চলে এল উঁচু পাঁচিলের কাছে। পাঁচিল কী করে ডিঙোবে? একমাত্র উপায়, একজনের কাঁধের ওপর উঠে একজন দাঁড়াবে। সে তখন পাঁচিলের ওপর হাত পেয়ে যাবে। প্রথমেই কাঁধ পেতে দিল ইন্দ্র।

বাবা বললেন, আমার বাবার গায়ে নিশ্চয়ই দারুণ জোর ছিল।

দিলীপকাকু বললেন, উহুঁ! নিখিল নামে এক একজন ছিল ওদের দলে, তার চেহারা আরও লম্বা-চওড়া। কিন্তু সে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল, তার পা কাঁপছিল। সেইজন্য ইন্দ্র কাঁধ পেতে দিয়ে প্রথমেই নিখিলকে পার করে দিল। তারপর একে-একে অন্যরাও।

টুবলু জিগ্যেস করল, শেষে যে থাকবে, সে কী করে পার হবে?

বাবা কিছু বলতে যেতেই দিলীপকাকু বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, বাকিটা আমাকে বলতে দাও। শোনো টুবলু, অন্য তিনজন তো পার হয়ে গেল, বাকি রইল, রাম আর ইন্দ্র। ওরা নিজেদের গায়ে জামা ছিঁড়ে একটা দড়ি পাকিয়ে ছিল। যে চার নম্বরে, সে উঠে গিয়ে দড়িটা ছুড়ে দেবে, শেষজন সেই দড়ি ধরে উঠে যাবে। রাম তখন বলল, ইন্দ্র তুই তো তিনজনকে কাঁধে নিয়েছিস, এবার তুই আমার কাঁধে উঠে ওপরে চলে যা! ইন্দ্র বলল, আমি তিনজনকে কাঁধে নিয়েছি, তোকেও পারব। আমি শেষে যাব! রাম কিছুতেই রাজি নয়। সে শেষে যেতে চায়। প্রায় ঝগড়া লেগে যাওয়ার জোগাড়। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে। তখন ইন্দ্র প্রচণ্ড ধমক দিল রামকে। একরকম জোর করে সে রামকে কাঁধে তুলে নিল। রাম ওপারে চলে গিয়ে ছুড়ে দিল দড়িটা।

দিলীপকাকু হঠাৎ চুপ করে গেলেন। মুখ নিচু করে ছিলেন বাবা।

টুবলু জিগ্যেস করল, তারপর কী হল? তারপর তবু কেউ কিছু বললেন না। বাবার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝড়তে লাগল।

টুবলু জিগ্যেস করল, দড়িটা এদিকে এল না?

দিলীপকাকু ভাঙা গলায় বললেন, দড়িটা ঠিক এসেছিল। ইন্দ্র সেটা ধরে উঠতে যেতেই পটাং করে ছিঁড়ে গেল, সে ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে। সেই শব্দ শুনেই ওয়াচ টাওয়ারের জ্বলে উঠল আলো। সেই আলো এসে পড়ল ইন্দ্রর গায়ে। ইন্দ্র বুঝতে পারল, তার আর পালাবার উপায় নেই। তখনো সে ভাবল, অন্য বন্ধুদের বাঁচাতে হবে। ওই জায়গায় সে দাঁড়িয়ে থাকলে গার্ডরা বুঝে যাবে সে ওইখান দিয়েই আরও কয়েকজন পালিয়েছে। রাম আর অন্য তিনজন বেশি সময় পাবে না। সেইজন্য ইন্দ্র মাঠের মধ্যে এঁকে-বেঁকে ছুটতে শুরু করল। বেজে উঠল পাগলা ঘণ্টা। অন্য গার্ডরা ছুটে এসে গুলি চালাতে লাগল। কিন্তু ইন্দ্র এঁকে-বেঁকে ছুটছে বলে তার গায়ে গুলি লাগছে না। প্রায় সাত মিনিট পরে একসঙ্গে তিনটে গুলি ফুঁড়ে গেল তার শরীর। সঙ্গে-সঙ্গে শেষ। প্রাণ থাকতে সে ধরা দেয়নি। এর মধ্যে অন্য চারজন অনেক দূর পালিয়ে গেছে

বাবা একটু চোখ মুছে বললেন, সেটা উনিশশো ছেচল্লিশ সাল। আর এক বছর পরেই দেশ স্বাধীন হয়েছিল কিন্তু জেলখানার মধ্যে বলে ওঁরা সেসব কিছু বুঝতে পারেননি।

দিলীপকাকু বললেন, তোমার দাদু আর চারজনের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। আমার বাবাকে না বাঁচালে আমার জন্মই হতো না। আমার বাবা এরপর যতদিন বেঁচে ছিলেন। সবসময় তাঁর বন্ধু ইন্দ্রজিতের নাম বলতেন আর কাঁদতেন।

বাবা বললেন, অনেক লোক বাবার ছবিকে প্রণাম করে। অনেক লোক করে না। ইনি তো শুধু আমার বাবা নন, ইনি একজন দেশপ্রেমিক। দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।

এরকম আরও কতজন দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, এখানকার মানুষ তাঁদের ভুলে গেছে। কিন্তু আমরা কি ভুলতে পারি।

ইন্দ্রজিৎকাকু বললেন, ছবির তো বয়েস বাড়ে না। আমরা বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তোমার দাদু ঠিক একরকম আছেন।

ছবিটা দেওয়ালের অনেক উঁচুতে। টুবলুর হাত যায় না সে একটা টুল নিয়ে এসে তার ওপব উঠে দাঁড়াল তারপর মাথাটা ঠেকিয়ে রাখল সেই ছবিতে।

রণজয়ের শহর-অভিযান

ঘুম থেকে উঠে একটা মস্ত হাই তুলে রণজয় বলল, ধুৎ আর এই জঙ্গলে থাকতে ভালো লাগে না! দিনের পর দিন একই রকমের সবকিছু একঘেয়ে হয়ে গেছে।

গুটুলি একটু দূরে বসে একটা ছুরি নিয়ে পেয়ারা গাছের ডাল কেটে-কেটে একটা গুলতি বানাচ্ছিল। সে মুখ তুলে জিগ্যেস করল, জঙ্গল ছেড়ে কোথায় যাবে?

রণজয় বলল, শহরে গিয়ে সিনেমা দেখব, ফুটবল ম্যাচ দেখব। দোকানের চা আর সিঙ্গারা খাব! ওঃ, কতদিন যে গরম-গরম সিঙাড়া খাইনি!

গুটুলি তুমি তো শহরে যেতে পারবে না। আমি বরং তোমার জন্য সিঙাড়া এনে দিতে পারি। আর আমি সিনেমা দেখে এসে তোমাকে সেই গল্পটা শোনাতে পারি। রণজয় চোখ বড়-বড় করে বলল, তুই সিনেমা দেখবি, আর আমি সেই গল্প শুনব? মারব এক গাট্টা! কেন, আমি শহরে যেতে পারব না কেন রে?

গুটুলি বলল, তুমি আট ফুট লম্বা মানুষ, আর তোমার গায়ের রং ফাউন্টেন পেনের কালির মতোন নীল। তোমাকে দেখলেই যে সবাই সবাই দৈত্য ভাববে!

রণজয় বলল, দৈত্য আবার কী? আজকালকার দিনে দৈত্য বলে কিছু আছে নাকি? মানুষ হঠাৎ বেশি লম্বা হয়ে যেতে পারে না? শহরে কি এমন কিছু নিয়ম করা আছে যে এর বেশি লম্বা লোক সেখানে যেতে পারবে না?

গুটুলি বলল, তুমি শুধু-শুধু আমাকে ধমকাচ্ছ কেন, ওস্তাদ? আমি কি কোনও শহরের মালিক? এর আগে তুমি আর আমি শহরে যাওয়ার চেষ্টা করেছি দু-একবার, লোকে ভয় পেয়ে পালিয়েছে, মনে নেই? শহরের লোকরা শুধু মাঝারি মাপের মানুষ পছন্দ করে। তুমি বেশি লম্বা হলে তোমাকে দেখে ভয় পায়, আর আমি খুব বেঁটে বলে আমার মাথায় সবাই চাঁটি মারে।

রণজয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল, এবার আমরা একটা বেশ বড় শহরে যাব। লোকে ভয় পেলে আমি তার কী করতে পারি। আমি তো ইচ্ছে করে কারুকে ভয় দেখাচ্ছি না, কারুর কোনও ক্ষতিও করছি না।

গুটুলি তবু বলল, কী দরকার ঝামেলার মধ্যে গিয়ে! এই জঙ্গলে তো আমরা বেশ আছি।

রণজয় দু-হাত দিয়ে গুটুলিকে শূন্যে তুলে প্রচণ্ড চিৎকার করে বলল, আমার ভালো লাগছে না। আমার ভালো লাগছে না! আমার কিছু ভালো লাগছে না!

সেই আওয়াজে গুটুলির কান ফেটে যাওয়ার জোগাড়। সে দুহাতে কান চেপে ধরল।

সন্ধে হয়ে এসেছে, একটু পরেই ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসবে। এর পর সারারাত ধরে এখানে করার কিছুই থাকে না। রণজয় দিনের বেলা লম্বা ঘুম দিয়েছে, রাত্তিরে তার ঘুমও আসবে না।

রঘু নামে যে ডাকাতটা ওদের রান্নাবান্না করে দিত, সে দিন সাতেক আগে পালিয়েছে। রঘুর যে গ্রামে বাড়ি, সেই গ্রামটা চেনে গুটুলি। ইচ্ছে করলেই তাকে আবার ধরে আনা যায়। কিন্তু রণজয় আর উৎসাহ বোধ করেনি। ধরে আনলেও সে আবার পালাবার চেষ্টা করবেই। ডাকাত কখনও রান্নাবান্নার কাজে সন্তুষ্ট থাকতে পারে?

গুটুলিকে কাঁধের ওপর বসিয়ে রণজয় লম্বা-লম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করল। শুকনো পাতার ওপর মচর-মচর শব্দ হতে লাগল। রণজয়ের পায়ের আওয়াজ পেলে হিংস্র প্রাণীরাও ভয়ে দূরে সরে যায়। একদিন একটা চিতাবাঘ রণজয়ের সামনে এসে পড়েছিল, তার পরেই কী জোর দৌড় লাগাল লেজ গুটিয়ে! যেন একটা ভীতু নেড়ি কুকুর!

এই জঙ্গলের প্রায় মাঝখান দিয়েই একটা হাইওয়ে চলে গেছে। সেটা রণজয় চেনে। রাত্তিরের দিকেও সেই রাস্তা দিয়ে অনেক ট্রাক যায় নানারকম মালপত্র নিয়ে। একবার রণজয় সেইরকম একটা চলন্ত ট্রাক থেকে একটা বস্তা তুলে নিয়েছিল। সেই বস্তাটায় ভর্তি ছিল আলু। রণজয় অনেকদিন আলুসেদ্ধ খায়নি, সেই বস্তাটা পেয়ে তার দারুণ আনন্দ হয়েছিল। পরপর তিন-চার দিন আলুসেদ্ধ খাওয়া হল। তারপর আর একদিন রণজয় আর একটা বস্তা তুলে নিল, সেটাতে কিন্তু ছিল লোহালক্কড়! আর একটা বস্তায় পেল সিমেন্ট! আলুব বস্তা আর পায়নি।

সেই রাস্তাটার কাছাকাছি এসে গুটুলি বলল, ওস্তাদ, শহর কত দূরে তার তো কোনও ঠিক নেই। সারারাত ধরে হাঁটবে নাকি? পায়ে ব্যথা হয়ে যাবে না?

রণজয় বলল, হেঁটে না গেলে, কে আমাদের গাড়ি করে নিয়ে যাবে?

গুটুলি বলল, কোনও লরির ড্রাইভারকে অনুরোধ করলেই তো হয়। সব লরি নিশ্চয়ই শহরে যায়?

রণজয় বলল, আমরা অনুরোধ করলেই শুনবে?

গুটুলি বলল, তুমি একটা লরি থামাও। আমি কথা বলব!

বড় রাস্তাটার পাশে একটা পাথরের আড়ালে ওরা দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। পরপর দুটো মারুতি আর ফিয়াট গাড়ি গেল, কিন্তু কোনও লরির দেখা নেই। যেদিন যেটা দরকার, সেটা কিছুতেই পাওয়া যাবে না। ছোট গাড়িতে বসতেই পারবে না রণজয়. তার বাস কিংবা লরি দরকার।

দু-ঘণ্টা দাঁড়াবার পর রণজয় যখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে তখন দূরে দেখা গেল এক জোড়া জোরালো হেডলাইট। হ্যাঁ, এবার একটা ট্রাক আসছে বটে।

ট্রাকটা ফাঁকা, পেছনে কোনও মালপত্র নেই, তাই আসছে খুব স্পিডে। রণজয় রেডি হয়ে রইল। কাছে আসতেই সে লম্বা হাত বাড়িয়ে পেছনটা চেপে ধরল।

কিন্তু সে ধরে রাখতে পারল না। হঠাৎ বাধা পেয়ে ট্রাকটা থরথর করে কাঁপতে লাগল, ইঞ্জিনে ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ হতে লাগল, আবার হুস করে বেরিয়ে গেল।

রণজয় আপশোসের সঙ্গে বলল, যাঃ।

ট্রাকের ড্রাইভারটি কিছু বুঝতে পারেনি। হঠাৎ ট্রাকটার এইরকম ব্যবহারে চিন্তিত হয়ে সে একটু দূরে গিয়ে ব্রেক কষল। তারপর নেমে দেখতে এল চাকাগুলো।

ড্রাইভারটা টর্চ জ্বেলে নিচু হয়ে চাকা দেখছে, অল্প বয়েসি ক্লিনার ছেলেটি তার সঙ্গে নেমেছে। রণজয় কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে জিগ্যেস করল, এই, এত দেরি করলি কেন রে? এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

ক্লিনার ছেলেটি মুখ তুলে রণজয়ের সেই বিশাল মূর্তি দেখেই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ভূ-ভূ-ভূ বলতে-বলতে মারল টেনে দৌড়। মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

ড্রাইভারটি সর্দারজি, সে এত সহজে ভয় পেল না, সে এক লাফে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে কোমর থেকে টেনে বার করল কৃপাণ।

রণজয় বলল, আরে, এ দেখছি ওই পুঁচকে একটা ছুরি নিয়ে আমার সঙ্গে লড়াই করতে চায়!

এবার গুটুলি রণজয়ের আড়াল থেকে সামনে এসে বলল, সর্দারজি, বাঁচে গা, না মরে গা?

এবার সেই সর্দারজির চোখ দুটো প্রায় বেরিয়ে আসার উপক্রম হল। একবার সে প্রকাণ্ড চেহারার রণজয়কে দেখল, আবার দেখল একরত্তি চেহারার গুটুলিকে।

গুটুলি বলল, ও সর্দারজি, তুমি লড়াই করলে মর যায়েগা আর লড়াই না করলে বাঁচে গা!

সর্দারজি তবু কৃপাণটা উঁচিয়ে ধরে রইল।

গুটুলি বলল, ছুরি খাপ মে রাখ দেও। হামলোগ ভূত না মানুষ। তুমি আমাদের শহরে পৌঁছে দেবে?

সর্দারজি এবার কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, মানুষ।

রণজয় বলল, হ্যাঁরে বাবা, মানুষ! একটু বেশি লম্বা হয়ে গেছি, তাতে কী হয়েছে? আমাদের কথা শুনে চল, তাহলে তোমার কোনও ভয় নেই।

গুটুলি বলল, তোমার শাকরেদটি কোথায় ভয়ে পালাল? ডাকো তাকে।

রণজয় ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে পড়ে বলল, ওঃ, কতদিন পরে গাড়িতে চাপছি। আমিও যে একসময় একটা ভদ্দরলোকের বাড়ির ছেলে ছিলাম, তা ভুলেই যাচ্ছিলাম প্রায়। একেবারে জংলি হয়ে গেছি!

গুটুলি আর সর্দারজি মিলে খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করল ক্লিনারটিকে। কিন্তু তার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না।

এবার সর্দারজি উঠে বসে রণজয়কে আবার ভালো করে দেখল। হাত বাড়িয়ে রণজয়ের গায়ে আঙুল ঘষল একবার। রং করা হয়নি, রণজয়ের গায়ের চামড়া সত্যিই ঘন নীল। মুখখানা নীল।

ড্রাইভারটি জিগ্যেস করল, এইসা ক্যায়সে হুয়া।

রণজয় বলল, সে অনেক লম্বা গল্প? তোমাকে চট করে বোঝানো যাবে না।

ড্রাইভারটি বলল, কুছ দাওয়াই খাকে হুয়া? হামকো দেও। আমার শরীরটাও তোমার মতন করে দাও।

রণজয় হেসে বলল, ওরে গুটুলি, ও যে আমার মতোন হতে চায়!

গুটুলি ড্রাইভারটির দাড়িওয়ালা থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে বলল, অত সোজা নয়, চাঁদু। এবার গাড়ি স্টার্ট দাও তো। গাড়িটা চলতে শুরু করার পর রণজয় বলল, ওরে গুটুলি, এরকম একটা নেংটি পরে শহরে যাব কী করে? শহরে সেজে-গুজে যাওয়া উচিত, তাই না? আগে একটা পোশাকের দোকানে যেতে হবে।

গুটুলি বলল, তোমার মাপের কোনও জামা-প্যান্ট কি কোনও দোকানে পাওয়া যাবে? দর্জি দিয়ে বানাতে হবে! আমার কোনও অসুবিধে নেই। যে কোনও দোকানেই বাচ্চাদের পোশাক পাওয়া যায়। সাত-আট বছরের ছেলেদের জামা আগার গায়ে লেগে যায়।

রণজয় বলল, আমি দর্জি দিয়ে জামা-প্যান্ট বানাব। স্পেশাল অর্ডার দিয়ে জুতো বানাব। আমি মোটেই আর জংলি সেজে থাকতে পারব না।

গুটুলি মুচকি হেসে জিগ্যেস করল, পয়সা কোথায় পাবে?

রণজয় বলল, ইচ্ছে করলেই তো আমি যে কোনও ব্যাঙ্ক লুট করতে পারি।

সর্দারজি চমকে উঠে বলল, ব্যাঙ্ক লুট? হাঁ-হাঁ, ইয়ে তো আচ্ছা বাত হ্য়। আগে একটা ব্যাঙ্কে নিয়ে যাব তোমাদের? রণজয় বলল, না! ইচ্ছে করলে ব্যাঙ্ক লুট করতে পারি বলেছি, কিন্তু করব না। আমি টাকা রোজগার করব! শহরে কতরকম কাজ থাকে।

সর্দারজি বলল, হাঁ-হাঁ, আমি আপনাদের কাজ দেব!

ট্রাক চলেছে অন্ধকার ভেদ করে। জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে ক্রমশ। আকাশে আজ চাঁদ নেই।

খানিকক্ষন চুপ করে থাকার পর রণজয় বলল, জানিস গুটুলি, আমি মহাশূন্যে অনেকগুলো গ্রহ ঘুরেছি। কতরকম রকেট চালিয়েছি। অথচ আমি গাড়ি চালানো শিখিনি। আমি ইস্টার-গ্যালাকটিক; মিসাইল চালাতে পেরেছি, আর এইরকম একটা ট্রাক চালাতে পারব না?

গুটুলি বলল, চেষ্টা করে দেখো না। পারতেও পারো।

ঠিক বলেছিস তো। কখনও চেষ্টা করে দেখিনি। একবার চেষ্টা করতে দোষ কী?

সর্দারজিকে সরে বসতে হল।

সর্দারজি, ব্রেক কষো! আমি একবার চালিয়ে দেখব! সর্দারজি প্রথমে কিছুতেই রাজি হতে চায় না। তখন রণজয় জোর করে সর্দারজির পা-দুটো তুলে দিল ওপরে।

নিজেই ব্রেকে একটা লাথি কষাল। সঙ্গে-সঙ্গে থেমে গেল ট্রাক। সর্দারজিকে পাঁজাকোলা করে তুলে পাশে সরিয়ে দিয়ে রণজয় নিজে বসল স্টিয়ারিং-এ।

তারপর বলল, দেখে নিয়েছি, এটা সুইচ, এটা গিয়ার, আর এটা অ্যাকসিলারেটার। আর ব্রেক তো সবাই চেনে। যে পাইলট প্লেন চালায়, সে কি গাড়ি চালাতে পারবে না? জয় মা-কালী! দেখা যাক কী হয়!

সুইচ দিয়ে অ্যাকসিলারেটারে চাপ দিতেই একটা ট্রাকটা হঠাৎ বিরাট জোরে ছুটতে শুরু করল।

সর্দারজি আর্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, রোকো! রোকো! মর যায়গা!

রণজয় অ্যাকসিলারেটারের ওপর পা আলগা করে বলল, প্রথমেই বেশি স্পিড হয়ে গেছে, এই তো? কমিয়ে দিচ্ছি! সেকেন্ড গীয়ার, থার্ড গীয়ার, ব্যস! এবার ঠিক আছে?

সত্যিই এবার ট্রাকটা বেশ স্বাভাবিকভাবে চলছে।

গুটুলি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

রণজয় বলল, গাড়ি চালানো তাহলে এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। ব্যস, এবারে শহরে গিয়ে জামা-কাপড় তৈরি করাব, কাজ করে টাকা রোজগার করব, সিনেমা দেখব, সিঙাড়া-কচুরি খাব, গাড়ি নিয়ে বেড়াব—

এর পর রণজয়ই ট্রাকটা চালাতে লাগল, সর্দারজি তাকে বলতে লাগল ডান দিকে না বাঁ-দিকে যেতে হবে।

প্রায় রাত একটার সময় দেখা যেতে লাগল পাকা বাড়ি-ঘর। অনেকটা শহরের মতন।

সর্দারজি বলল, এখানে থামবে। এখানে আমার ট্রাকে ডিজেল ভরে নিতে হবে। আমার চেনা একজনের পেট্রল পাম্প আছে। সেখানে ভালো খানাপিনা হবে।

রণজয় বলল, তা থামা যেতে পারে।

গুটুলি বলল, খিদেও পেয়েছে বেশ!

পেট্রল পাম্পের পাশে ট্রাকটা থামাবার পর সর্দারজি বলল, আপলোগ আগে বসুন। আমি পাম্পের মালিকের সাথে বাতচিত করে আসি। প্রথমেই আপনাকে দেখলে ভয় পেয়ে যাবে।

রণজয় বলল, সেটা ভালো কথা!

সর্দারজি নেমে ভেতরে চলে গেল।

পেট্রল পাম্পের পেছনের দিকে একটা লম্বা গুদামের মতন বাড়ি। কাছাকাছি আরও কয়েকটা দোকান রয়েছে, কিন্তু সেগুলো এখন বন্ধ। চতুর্দিক নিঝুম।

একটু পরেই সর্দারজির সঙ্গে দু-তিনজন লোক এগিয়ে এল এদিকে। তাদের মধ্যে একজনের পেটমোটা পিপের মতন চেহারা। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, কোথায়? কোথায় রে দৈত্য?

সর্দারজি ট্রাকের দরজা খুলে বলল, নেমে আসুন, বাবুজি!

রণজয় নেমে দাঁড়াতেই সবাই ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। অন্যদের একজনের হাতে একটা রাইফেল, অন্য একজনের হাতে একটা শাবল।

রণজয় বলল, নমস্কার।

গুটুলিও তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, নমস্কার।

পেটমোটা লোকটি বলল, ওরে বাবা! সত্যিই যে দেখছি দৈত্য! আট ফুট কী বললে সর্দারজি, তার চেয়ে বেশি লম্বা মনে হচ্ছে!

রণজয় যতদূর সম্ভব গলার আওয়াজ নরম করে বলল, আজ্ঞে, আমার হাইট আট ফুট পাঁচ ইঞ্চি। কিন্তু আমি দৈত্য নই। একটা বিশেষ কারণে আমার চেহারাটা বদলে গেছে! আমি লেখাপড়া জানি, ভদ্রঘরের সন্তান।

পেটমোটা লোকটি বলল, ঠিক মানুষের মতনই তো কথা বলে।

রণজয় আবার বলল, আমরা সত্যিই মানুষ! আমরা আপনাদের কোনও ক্ষতি করব না। এই আমার বন্ধু গুটুলি, তার চেহারা ছোট হলেও বুদ্ধি ছোট নয়।

সর্দারজি বলল, ভিতরে আসুন, ভিতরে আসুন। খানা তৈরি। এই শেঠজি আপনাদের দেখে খুব খুশি হয়েছেন।

পেটমোটা শেঠজি বলল, হাঁ-হাঁ, আসুন! খানা খেয়ে লিন।

এর পর রণজয় আর গুটুলির জন্য খাতির-যত্নের ধুম পড়ে গেল। লম্বা গোডাউনের মতন বাড়িটা একটা সিনেমা হল। সেটারও মালিক ওই শেঠজি। তাঁর আরও অনেক ব্যবসা আছে। একটা সার্কাস কোম্পানিও আছে তাঁর।

গরম-গরম রুটি আর আলুর তরকারি খেতে দেওয়া হল ওদের। গুটুলি খেল তিনখানা রুটি, রণজয় পঁয়ষট্টিটা রুটি শেষ করার পর বলল, আর পারছি না। পেট ভরে গেছে।

খেতে-খেতে রণজয় ওদের কাছে নিজের গল্প শোনাল। কী করে অন্য গ্রহের প্রাণীরা ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কী করে শরীরটা এভাবে বদলে গেল।

রণজয় শহরে এসে থাকতে চায় শুনে শেঠজি বলল, আপনারা দুজন আমার এখানেই থাকুন। আমি চাকরি দেব। প্রত্যেকদিন পেট ভরে খাবার পাবেন।

রণজয় খুব খুশি হয়ে বলল, বাঃ, তবে তো খুব ভালো। আপনি যা কাজ বলছেন, সব করে দেব। আর রোজ-রোজ সিনেমা দেখব। এখানে সিনেমা ক-টার সময় শুরু হয়?

শেঠজি বলল, সিনেমা দেখবেন? এখুনি চালিয়ে দিচ্ছি। শুধু আপনাদের দুজনের জন্য। যত ইচ্ছে সিনেমা দেখুন না!

সত্যি-সত্যি সেই রাত্তিরেই সিনেমা চালু হয়ে গেল। দর্শক মাত্র দুজন। হল অন্ধকার, পরদায় ফুটে উঠল একটা বিদেশি ছবি। বিকট গেরিলার মতন একটা প্রাণী জাপানের একটা শহর আক্রমণ করেছে। প্রথম থেকেই মারামারি।

রণজয় তবু লেখাপড়া শিখেছে। সে এইসব বিদেশি সিনেমাও একসময় দেখেছে কিছু-কিছু। গুটলি ঘামের যাত্রা ছাড়া আর কিছুই দেখেনি কখনো। সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম।

সে প্রথম-প্রথম দারুণ উৎসাহ নিয়ে দেখতে লাগল। সিনেমার পরদায় যখন আকাশের একটা প্লেন ভেঙে পড়ছে সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ভয়ের চোটে।

কিন্তু বেশিক্ষণ তার উৎসাহ রইল না। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। রণজয় দু-তিনবার ঠেলা দিয়ে তাকে জাগাবার চেষ্টা করেও কোনও লাভ হল না। কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারছে না গুটুলি।

রণজয় একাই দেখতে লাগল সিনেমা। অনেকদিন পর সে সত্যিকারের আনন্দ পাচ্ছে।

রণজয় এমনই মন দিয়ে সিনেমা দেখছিল যে পেছনে কোনও পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। হঠাৎ একটা মোটা শেকল এসে পড়ল তার বুকের ওপর। তারপর কেউ সেটা টেনে তার গলা বেঁধে ফলল।

চার-পাঁচজন লোক ঘিরে ধরল রণজয়কে।

পেটমোটা শেঠজী লাফাতে-লাফাতে বলল ফেলো! পা বেঁধে ফেলো। পালাতে না পারে।

সরু গোঁফওয়ালা একজন লোক বলল, এ তো গোরিলাদেব চেয়েও অনেক লম্বা! ভালো খেলা দেখানো যাবে।

রণজয় দারুণ দুঃখের গলায় বলল, এ কী শেঠজি, বাঁধলেন কেন? আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি?

শেঠজি বলল, ডেঞ্জারাস অ্যানিমাল। তোমাকে ছেড়ে রাখা যায়!

রণজয় বলল, অ্যানিমাল? আমি মানুষ! আমি বললাম, আমি আপনার এখানে চাকরি করব। আপনি তখন রাজি হলেন।

শেঠজি বলল, চাকরি তো করবেই। তুমি আমার সার্কাসের দলে চাকরি করবে। তোমাকে খাঁচায় ভরে রাখব। হাজার-হাজার লোক তোমাকে টিকিট কিনে দেখবে।

সরু গোঁফওয়ালা লোকটি বলল, এ তো মানুষের মতন কথাও বলে। একে বেশি কিছু শেখাতেও হবে না।

রণজয় তার দিকে ফিরে বলল, আমি মানুষ, মানুষের মতন কথা বলব না? আমি লেখাপড়াও শিখেছি।

সরু গোঁফওয়ালা লোকটি বলল, বা-বা-বা তাহলে তো আরও ভালো। ইংরেজি জানো?

শেঠজি বলল, আমাদের সার্কাস এবার কলকাতায় নিয়ে যাব। বিদেশে নিয়ে যাব। কথা বলা দৈত্য, ইংরেজি বলা দৈত্য, আর কেউ দেখাতে পারবে?

রণজয় গম্ভীরভাবে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন।

শেঠজি বলল, ছাড়া হবে না তোমায়, তোমায় বেঁধে রাখতেই হবে। এত বড় একটা প্রাণীকে খাঁচায় না রাখলে পুলিশ আপত্তি করবে। তোমার তো কোনও অসুবিধে নেই, পেট ভরে খেতে পাবে! পঞ্চাশখানা করে রুটি পাবে।

তারপর সে উঁকিঝুঁকি মেরে বলল, আরে, সেই বাঁটকুলটা কোথায় গেল? ওকেও ধরো! ওকেও কাজে লাগানো হবে। সঙ্গে-সঙ্গে গুটুলির ঘুম ভেঙে গেছে। সে চেয়ারের তলায় লুকিয়ে পড়েছে।

গোঁফওয়ালা লোকটা নিচু হয়ে দেখে বলল, ওই যে, ওই যে, ইঁদুরের মতন পালাচ্ছে!

শেঠজি বলল, ধর, ধর, ধর, ওকে ধর!

রণজয় চেঁচিয়ে বলল, গুটুলি, তুই পালা। ধরা দিবি না। তিন-চারজন লোক মিলে তাড়া করে গেল গুটুলিকে। কিন্তু ধরা সহজ নয়, ইঁদুর-বিড়াল খেলার মতন গুটুলি এঁকে বেঁকে এদিক-ওদিক ছুটে ওদের হাত এড়িয়ে পালাচ্ছে। একবার তাকে দেখা যাচ্ছে না। আবার তাড়া খেয়ে সে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে।

এরই মধ্যে কী করে যেন গুটুলি উঠে গেল স্টেজের ওপর। সিনেমাটা তখনও চলছে। পরদার সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল গুটুলি। দুজন লোক লাফিয়ে উঠে প্রায় তাকে ধরে ফেলল, টিকটিকির মতন তরতর উঠে যেতে লাগল একটা থাম বেয়ে। আর চ্যাঁচাতে লাগল, আমি পুলিশ ডাকব। পুলিশ ডাকব!

সরু গোফওয়ালা লোকটি রাইফেল তুলে আচমকা একটা গুলি করল সেদিকে।

শুধু শব্দ আর ধোঁয়া। গুটুলি ধুপ করে পড়ে গেল আর নড়ল না।

রণজয় ফ্যাকাশে গলায় বলল, মেরে ফেললে?

গোঁফওয়ালা বলল, ওই বেঁটেটাকে নিয়ে এতক্ষণ সময় নষ্ট হল। এই দৈত্যটাকে এক্ষুনি চালান করে দেওয়া উচিত।

রণজয় উঠে দাঁড়িয়ে কান্না-মেশানো গলায় বলল, মেরে ফেললে? বন্ধুকে তোমরা মেরে ফেললে? এবার আমি ছাড়ব না। তোমাদের আমি কোনও ক্ষতি করিনি। তোমরা আমাকে মানুষের মতন বাঁচতে দিতে চাও না।

দু-তিনবার ঝাঁকুনি দিতেই মট-মট করে ছিঁড়ে গেল হাতের শিকল। সে গলার শিকলটা হাত দিয়ে টানতে লাগল।

গোঁফওয়ালা লোকটা বলল, সাবধান! এদিকে এক-পা এগোবে না। হাত দুটো মাথার ওপর তোলো!

রণজয় তাদের কথা গ্রাহ্য না করে তুলে মারতে গেল তাকে, তারপর সে একজনকে শূন্যে তুলে মারল এক আছাড়। সরু গোফওয়ালা লোকটার দিকে এগিয়ে গেল! লোকটি বলল, মাথার ওপর হাত তোলো। নইলে তোমার বুকে গুলি করব। এক গুলিতে তুমি ছাতু হয়ে যাবে! শেঠজি বলল, মেরো, না, ওকে মেরো না! ওকে বাঁচিয়ে রাখলে অনেব রোজগার হবে।

রণজয় সরু গোফওয়ালার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তুমি আমার বন্ধুকে মেরেছ। তোমাকে আমি শেষ করব।

গোফওয়ালা লোকটি ভয় পেয়ে দড়াম করে চালিয়ে দিল গুলি।

ধোঁয়া সরে যাওয়ার পর দেখা গেল রণজয় এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে প্রচণ্ড রাগে।

শেঠজি আর দু-তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, গুলি লাগেনি!

রণজয় বলল, কোনও গুলি আমার শরীর ভেদ করতে পারে না।

তারপরেই যেন শুরু হয়ে গেল একটা প্রলয় কাণ্ড!

রণজয় এক-একটা চেয়ার তুলে ছুড়ে মারতে লাগল ওই লোকগুলোর দিকে। ওরা ভয়ের চোটে হুড়োহুড়ি করে পালাতে গিয়েও আছাড় খেয়ে পড়ে গেল জড়াজড়ি করে। রণজয় প্রত্যেককে তুলে-তুলে মাথা ঠুকে দিতে লাগল দেয়ালে।

তারা অজ্ঞান হয়ে গেলেও রণজয়ের রাগ কমল না। সে তবু ভাঙতে লাগল সব চেয়ার। সিনেমার পরদাটা ছিঁড়ে ফালা-ফালা করে ফেলল। তারপর গুটুলির কাছে গিয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, হায়, হায়, প্রিয় বন্ধু, তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে!

গুটুলি অমনি তড়াক করে উঠে বসে বলল, আমার গায়ে আসলে লাগেনি। আমি মটকা মেরে পড়েছিলাম।

রণজয় বলল, তুমি বাঁচে আছ! বাঁচালে আমাকে? তোমাকে ছাড়া আমি কী করে বাঁচতাম! কিন্তু এ কী হল? আমরা শহরে এলাম চাকরি করতে, আর এরা আমাকে খাঁচায় ভরে রাখতে চাইল?

গুটুলি বলল, শহর এরকমই। শহরে সবাই খাঁচার মধ্যেই থাকে। দেখছ না, বাড়িগুলোও কেমন খাঁচার মতন! চলো আমরা জঙ্গলেই যাই।

দুজনে বাইরে বেরুতেই দেখল, সেখানে বিরাট একটা ভিড় জমে গেছে!

সেই ট্রাক ড্রাইভার সর্দারজি অনেক লোককে জোগাড় করেছে এর মধ্যে। রণজয়কে দেখেই সে বলে উঠল, পাকড়ো, পাকড়ো! গোরিলা! দৈত্য!

রণজয় দুহাত তুলে বলল, ভাইসব, ভয় নেই। আমি গোরিলাও না, দৈত্যও না। আমি কারুর কোনও ক্ষতি করব না।

অনেকে একসঙ্গে ইট-পাথর ছুঁড়ে মারল তার দিকে।

রণজয় দু-তিনবার একই কথা বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ যেন তার কথা বুঝতেই পারছে না। রণজয় যখন চেঁচিয়ে কথা বলে, তখন মেঘের আওয়াজের মতন শোনায়।

জনতা এমন চ্যাঁচামেচি করছে যে রণজয়ের কথা কেউ শুনছেই না। কয়েকটা পাথরের টুকরো লাগল গুটুলির মাথায়। তার কপাল ফেটে রক্ত বেরুতে লাগল।

তখন রাগে অন্ধ হয়ে রণজয় একটা লম্বা বাঁশ তুলে নিয়ে বলল, আজ সবাইকে শেষ করব।

গুটুলি বলল, শুধু-শুধু মানুষ মেরে লাভ নেই, বন্ধু। চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সে এক দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল ট্রাকটায়। রণজয়ও বাঁশ ফেলে এসে ড্রাইভারের সিটে বসল। সদারজি ছুটে এসে বলল, আরে, আরে, আমার ট্রাক নিয়ে ভাগছে! পাকড়ো, পাকড়ো!

রণজয় হাত বাড়িয়ে সর্দারজিকে এক ধাক্কা দিতেই সে ছিটকে পড়ে গেল অনেক দূরে।

ট্রাকটা এবার গর্জন করে বেরিয়ে গেল। কিছু লোক পেছন-পেছন ছুটে এসেও ধরতে পারল না।

কিছুদূরে এসে, ফাঁকা রাস্তায় পড়বার পর রণজয় ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

গুটুলি বলল, দুঃখ করো না, বন্ধু। জঙ্গলই আমাদের ভালো।

রণজয় বলল, মানুষ কেন আমাদের দেখলেই মারতে আসে! শুধু চেহারার জন্য? আমরা কি কোনও দোষ করেছি?

গুটুলি বলল, দ্যাখো, জঙ্গলের পশু-পাখি, গাছ-পালা, তারা আমাদের ভালোবাসে, নদীর জলে তোমার আর আমার মুখের ছায়া পড়লেও নদী তো রাগ করে না।

রণজয় বলল, তা বলে কি আর আমরা কোনওদিন মানুষের সঙ্গে মিশতে পারব না? চিরকাল জঙ্গলে নির্বাসনে থাকতে হবে?

গুটুলি চুপ করে গেল। দুজনেরই মন খারাপ। সর্দারজি আর শেঠজির কথায় তারা খুব বিশ্বাস করেছিল। ওরা যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে, গুটুলিরা একবারও ভাবতে পারেনি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ করে গাড়ি চালাল রণজয়। সে যে কোন রাস্তায় যাচ্ছে তা জানে না। যে-কোনও একটা দিকে গেলেই হল। কোথাও একটা গভীর বন দেখলে সেখানে থামবে।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। হঠাৎ রাস্তার ধারের একটা গ্রামের নাম লেখা বোর্ড দেখে রণজয় বলে উঠল, আরে!

গুটুলি বলল, কী হল?

রণজয় বলল, গুটুলি, আমার আর এই দেশে থাকতেই ইচ্ছে করে না। এখানে একবার একটা জায়গায় যাব। যদি সেখানেও খারাপ ব্যবহার পাই, তাহলে আর কোনওদিন এদেশে ফিরব না।

গুটুলি জিগ্যেস করল, এখানে কোন জায়গায়?

রণজয় বলল, এসোই না।

ট্রাকটা সে একটা ছোট রাস্তায় ঢোকাল। তারপর অনেকগুলো বাঁক ঘুরে সে এসে থামল একটা বাগানের ধারে।

ট্রাক থেকে নেমে রণজয় গুটুলির হাত ধরে নিয়ে এল একটা পুকুরপাড়ে। কাছেই একটা ছোট দোতলা বাড়ি, সামনে ছোট্ট উঠোন, তার মাঝখানে তুলসিমঞ্চ।

রণজয় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই বাড়িটার দিকে।

গুটুলি জিগ্যেস করল, এটা কাদের বাড়ি?

রণজয় ধরা গলায় বলল, এই বাড়িতে আমি জন্মেছি। এখানে আমি বড় হয়েছি। এখান থেকেই অন্য গ্রহের মানুষরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কত কষ্ট করে আমি ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু আমার চেহারাটা বদলে গেছে। কেউ আমায় আর চিনতে পারেনি। সবাই আমাকে দেখে ভয় পায়। গ্রামের মানুষ আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। আমার দাদা আমাকে চিনতে পারলেও বলেছিল, তুই এখান থেকে চলে যা, রণজয়। তুই দৈত্য হয়ে গেছিস। মানুষের মধ্যে তুই আর থাকতে পারবি না!

বাড়ি থেকে সাদা শাড়ি পরা একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন উঠোনে। তুলসিমঞ্চের কাছে দাঁড়ালেন।

গুটুলি জিগ্যেস করল, উনি কে?

রণজয় বলল, আমার মা। কত দিন পর মাকে দেখলাম। আমার চেহারা আরও বদলে গেছে। আমি দিন-দিন আরও বেশি লম্বা আর মোটা হচ্ছি? মুখখানাও অন্যরকম যাচ্ছে।

গুটুলি বলল, তা হলে তোমার মা-ও কি তোমাকে চিনতে পারবেন না? একবার কাছে গিয়ে দেখোই না!

রণজয় বলল, মা-ও যদি আমায় চিনতে না পারে। যদি আমাকে দেখে ভয় পায়, তা হলে জীবনে আর কোনও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না। মানুষ দেখলেই খুন করব। সত্যি-সত্যি দৈত্য হয়ে যাব!

রণজয় এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গেল উঠোনে। তারপর ফিসফিস করে ডাকল, মা, মা!

মহিলাটি চোখ তুলে একবার সেই পাহাড়ের মতন চেহারাটা দেখেই ভয়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, ওমা! এ কে? ওরে বাবারে!

রণজয় বলল, মা, মা, আমি খোকন!

মহিলাটি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে গিয়েও আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। রণজয়ের মুখখানা ভালো করে দেখে, বললেন, খোকন? তুই আমার খোকন? কোথায় ছিলি? এতদিন?

মা ছুটে এসে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন রণজয়কে।

রণজয় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তারপর মায়ের কোলে মাথা রেখে একটা বাচ্চা ছেলের মতন কাঁদতে লাগল। তারপর মা হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তার চুলে।

আনন্দের চোটে গুটুলির চোখেও জল এসে গেল।
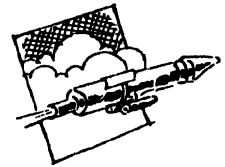
আজব লড়াই

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে রণজয় দেখল, তার হাত দুটো যেন কী দিয়ে বাঁধা। অথচ দড়ি বা শিকল-টিকল কিচ্ছু নেই। হাত দুটো ছাড়াতে গিয়েই সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। যেন দুটো ব্লেড তার হাতের চামড়া কেটে দিচ্ছে।

তার পা দুটোরও সেই অবস্থা। সে পা ফাঁক করতে পারছে না, কিন্তু কী দিয়ে যে পা বাঁধা তাও বোঝা যাচ্ছে না। রণজয় এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, তার পাশে গুটুলি নেই, কেউ নেই। মস্ত বড় একটা শিমূল গাছের তলায় সে আগে যেমন শুয়ে ছিল, সেইরকম ভাবেই শুয়ে আছে।

অতিকষ্টে সে উঠে বসল। হাত দুটোকে মুখের কাছে এনে সে দেখল, একটা চুলের মতন সরু কোনও সুতো দিয়ে তার কবজিদুটো বাঁধা হয়েছে, কিন্তু চুল নয়, সেই

সুতোটার রং নীল, তাই তার চামড়ার মধ্যে একবারে মিশে গেছে। রণজয় আর একবার একটু টানবার চেষ্টা করেই বুঝল, এই সুতো ছেঁড়ার সাধ তার নেই। টানতে গেলেই তার হাতের চামড়া কেটে যাচ্ছে।

রণজয় যেই বুঝতে পারল যে সে বন্দি, অমনি তার সারা গায়ে ঘাম এসে গেল। সাধারণ কোনও মানুষ তাকে বন্দি করতে পারে না, মোটা-মোটা লোহার শিকলও রণজয় এক হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলেছে এর আগে। কিন্তু সে এই সরু সুতো ছিঁড়তে পারছে না? এত সরু আর এত শক্ত সুতো কি পৃথিবীতে পাওয়া যায়?

উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। রণজয় চিৎকার করে ডাকল গুটুলি! গুটুলি!

কেউ সাড়া দিল না।

গুটুলি রণজয়ের প্রিয় বন্ধু, সে কখনো রণজয়কে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে না। নিশ্চয়ই তাকেও কেউ বন্দি করে নিয়ে গেছে।

রণজয়ের দারুণ খিদে পেয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠলেই তার খিদে পায়। আর বাচ্চা বয়েসের মতন, বেশি খিদে পেলেই তার কান্না এসে যায়, যদিও তার চেহারাটা এখন রূপকথার দৈত্যের মতন।

হঠাৎ পাতার ওপর খসখস শব্দ হতেই রণজয় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দুজন মানুষ সমান তালে পা ফেলে হেঁটে আসছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। তারা দুজনে চ্যাংদোলা করে ধরে আছে একটা হরিণকে। হরিণটা বেঁচে আছে, ছটফট করছে। ওরকম একটা জ্যান্ত হরিণকে ধরে রাখা সহজ নয়, কিন্তু লোক দুটো যেন হরিণটার ছটফটানি গ্রাহ্যই করছে না।

লোক দুটির গায়ের রং নীল!

রণজয়ের সব রোম খাড়া হয়ে গেল। এদের সে চিনতে পেরেছে। এরা সপ্তম গ্রহ বলয়ের প্রাণী, এর একবার রণজয়কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এরা আবার ফিরে এসেছে। লোক দুটি রণজয়ের কাছে এল না, তার পেছন দিকে জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল। একটু পরে সে দেখতে পেল সেই লোককে, তার এক হাতে একটা জ্যান্ত খরগোশ, অন্য হাতে একটা টিয়া পাখি। আশ্চর্য ব্যাপার এরা জ্যান্ত হরিণ, খরগোশ, টিয়া পাখি ধরছে কী করে?

এই লোকটি রণজয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। এর মাথায় একটিও চুল নেই, মুখে দাড়ি-গোঁপ নেই। ভুরু নেই, চোখের পল্লবও নেই। সে কিড়মিড় করে কী যেন বলল।

রণজয় ওদের গ্রহে একবার ঘুরে এলেও ওদের ভাষা বোঝে না। ওদের দু-একজনের কাছে একটা যন্ত্র থাকে, সেটা হাতে নিলে মনে-মনে কথা বললেও বোঝা যায়।

লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে অবশ্য বোঝা গেল, সে রণজয়কে তার সঙ্গে যেতে বলছে। কিন্তু রণজয় তো উঠে দাঁড়াতেই পারছে না।

লোকটি দুবার ধমক দেওয়ার পর রণজয়ের আরও কাছে এসে তার কোলের ওপর একটা পা দিয়ে দাঁড়াল। লোকটির পায়ের জুতো দেখলে মনে হয় স্টিলের তৈরি, কিন্তু রবারের মতন নরম।

হাত খোলা থাকলে রণজয় একটা থাপ্পড় দিয়ে লোকটাকে শত হাত দূরে পাঠিয়ে দিতে পারত। এত সাহস যে রণজয়ের গায়ে পা দেয়।

লোকটি রণজয়ের হাত বাঁধা সুতোটার একটা দিক খুঁজে নিল। তারপর সেটা ধরে টানতেই রণজয় আবার ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। লোকটি তা গ্রাহ্য না করেই সেই সুতোটা ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চলল রণজয়কে। রণজয় মাটিতে গড়াতে লাগল, মাঝে-মাঝে পাথর আর গাছের ডালপালায় তার সারা গা ছড়ে গেল, কিন্তু তার বাধা দেওয়ার কোনও উপায় নেই।

জঙ্গলটা যেখানে বেশ ঘন, সেখানে রয়েছে সেই গোল চকচকে একটা আকাশযান। এই রকেটটা রণজয় চেনে। ঠিক এই রকম রকেটে করেই নীল মানুষরা একবার তাকে নিয়ে গিয়েছিল মহাশূন্যে। আবার তাকে সেখানে যেতে হবে? তাহলে আর কি কোনওদিন ফেরা যাবে?

লোকটি সামনে এসে দাঁড়াতেই গোল রকেটের একটা গোল দরজা খুলে গেল। রণজয়ের মনে পড়ল, ওরা যে গ্রহে থাকে, সেখানে সবকিছুই গোল গোল।

দরজাটা খুলতেই লোকটা টিয়া পাখি আর খরগোশটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ভেতরে। তারপর রণজয়ের দিকে তাকাল।

রণজয়ের হাতের চামড়া কেটে রক্ত পড়ছে। সে বুঝতে পারল, বাধা দিয়ে কোনও লাভ নেই, তাতে শুধু তার কষ্টই বাড়বে। সে নিজেই ঢুকে পড়ল রকেটটার মধ্যে।

ভেতরটা যেন একটা চিড়িয়াখানা।

সেখানে একটা করে গরু, ঘোড়া, মোষ, হরিণ, নানা রকমের পাখি, একটা চিতাবাঘ, কয়েকটা সাপ, ব্যাঙ, ছাগল, প্রজাপতি, ফড়িং এইসব জন্তু-জানোয়ার, পোকা-মাকড়ে ভর্তি।

একটা পাতলা ধোঁয়ায় ভরে আছে ভেতরটা, তাতে মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ। সেই ধোঁয়ার জন্যই বোধহয় জন্তু-জানোয়ারগুলো সবাই এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, কেউ ছটফট করছে না।

এক কোণে বসে আছে গুটুলি। সে অজ্ঞান হয়ে যায়নি, কিন্তু রণজয়কে দেখেও কোনও কথা বলল না। শুধু তার চোখ দুটো বড় হয়ে গেল।

যে লোকটি রণজয়কে টেনে এনেছিল, সে এবার রণজয়ের হাত ও পায়ের সুতোর বাঁধন খুলে দিল। তারপর ধমক দিয়ে কী যেন বলল।

রাগে রণজয়ের পিত্তি জ্বলে গেল। এই লোকগুলো পৃথিবী থেকে নানারকম জন্তু-জানোয়ারের স্যাম্পেল নিয়ে যেতে এসেছে নিজেদের গ্রহে। তা বলে কি তারা মানুষও ধরে নিয়ে যাবে? পৃথিবীর মানুষকেও এরা জন্তু মনে করে?

এই লোকগুলো কেউই রণজয়ের মতন লম্বা নয়। কিন্তু রণজয় জানে যে, এদের মধ্যে কে যে রক্তমাংসের প্রাণী আর কে যে যন্ত্র-মানুষ, তা বোঝবার উপায় নেই. এই যন্ত্র-মানুষরাও একরকম নরম ধাতু দিয়ে তৈরি, তাই এদের হাত পা মানুষের মতনই মনে হয়। কিন্তু এদের গায়ে অসম্ভব শক্তি।

একটি মেয়ে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। তার হাতে একটি ছোট্ট গোল রেডিওর

মতন যন্ত্র। সেই যন্ত্রটা মুখের কাছে এনে সে কিছু বলল। রণজয় এবার পরিষ্কার বাংলায় শুনতে পেল, "এই যে পলাতক। আবার আমাদের দেখা হল, আমায় চিনতে পারো?"

রণজয় মেয়েটাকে চিনতে পেরেছে। মহাকাশের বহুদূরে, সৌরলোক থেকে কোটি-কোটি মাইল পেরিয়ে, এদের নীল রঙের গ্রহে রণজয় একসময় বন্দি ছিল। সেই সময় এই মেয়েটিই পাহারা দিত তাকে। ওদের গ্রহে ছেলেরা আর মেয়েরা সমান কাজ করে। এই মেয়েটির চোখে ধুলো দিয়েই রণজয় কোনওরকমে পালাতে পেরেছিল।

রণজয় বলল, 'আমাকে পলাতক বলছ কেন? আমি তো এই পৃথিবীরই মানুষ! তোমরা আমাকে বন্দি করেছিলে, আমি আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছি।'

মেয়েটি হেসে বললে, তুমি আর পৃথিবীর মানুষ নও। নিজের চেহারা কি তুমি দেখতে পাও না? তোমার গায়ের রং নীল! তুমি কত লম্বা! পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে তোমার কোনও মিল নেই আর। তুমি আমাদেরই একজন হয়ে গেছ। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো, আমাদের গ্রহে থাকবে। সেখানে তোমাকে কত আদর-যত্ন করব!

রণজয় বলল, আমার চেহারাটা বদলে গেলেও আমার মনটা রয়ে গেছে মানুষের মতন। আমি এই পৃথিবীকেই ভালোবাসি। আমার দেশকে ভালবাসি। এই পৃথিবীর গাছপালা, আলো-হাওয়া, জল সব আমার প্রিয়। তোমাদের ওখানে একটাও গাছ নেই। জল নেই। আমার ভালো লাগে না।

মেয়েটি বলল, কিন্তু তোমাদের এই পৃথিবীতে খাবার পাওয়া যায় না। এখনও কত মানুষ খেতে পায় না,। এখানে একদিকে বিশ্রী গরম, আর একদিকে বিশ্রী ঠান্ডা। এই পৃথিবীটা মোটেই ভালো গ্রহ নয়। আমাদের ওখানে তুমি যখন যা-খুশি চাও খেতে পাবে। যে-কোনও আরাম চাও, সব পাবে। তুমি আমাদের ওখানে গিয়ে আর কিছুদিন থাকলে আর কখনো এই বিচ্ছিরি, পচা পৃথিবীতে ফিরতে চাইবে না।

রণজয় বলল, ভালো হোক, খারাপ হোক, এই পৃথিবীতে আমি জন্মেছি। এই পৃথিবীই আমার প্রিয়। আমাকে কেন জোর করে নিয়ে যেতে চাইছ? আমি এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে চাই না।

মেয়েটি এবার জোরে হেসে উঠে বলল, এবার আর তুমি ফিরে আসতে পারবে না। নীল মানুষ, এবার তোমার মনটা আমরা বদলে দেব। পৃথিবীর কথা তোমার আর মনেই পড়বে না।

একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনে রণজয় বুঝতে পারল, এবার রকেটটা ছাড়বার উদ্যোগ করছে। আর বেশি সময় নেই। একবার পৃথিবীর মাটি ছেড়ে উড়তে শুরু করলেই এমন প্রচন্ড গতি এসে যাবে যে প্রায় চোখের নিমেষেই উড়ে যাবে মহাশূন্যে।

রণজয় মিনতি করে বলল, তোমরা সভ্য-শিক্ষিত প্রাণী, তবু তোমরা ডাকাতি করতে আসো কেন? মানুষকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া অন্যায়, তা তোমরা বোঝো না?

মেয়েটি বলল, অন্যায়? সে আবার কী? এ কথাটার মানেই তো আমরা জানি না। আমাদের যখন যেটা ইচ্ছে হয়, তখন সেটা করি!

রণজয়ের পাশের লোকটি তার নিজের ভাষায় কী যেন বলে রণজয়ের হাত ধরে

তাকে বসিয়ে দিতে গেল। সঙ্গে-সঙ্গেই সে হাতটা ছেড়ে দিয়ে যেন ব্যথা পেয়ে উঃ করে উঠল।

রণজয়ের হাতটা ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত আর ঘামে ভেজা। সেই হাতটা ধরেই লোকটা ছেড়ে দিয়েছে। রণজয়ের মনে পড়ে গেল, এরা কোনও তরল জিনিস সহ্য করতে পারে না। হঠাৎ জলের মধ্যে পড়ে গেলেই এরা মরে যায়। প্রথমবার রণজয় যখন দুঃখে কেঁদে ফেলেছিল, তখন তার চোখের জলের কয়েকটা ফোঁটায় ওদের একজনের হাত পুড়ে গিয়েছিল!

আর সময় নেই, আর সময় নেই! রকেটটা এক্ষুনি উড়বে! রণজয়ের কাছে একটাই মাত্র অস্ত্র আছে।

সে ঘুরে দাঁড়িয়েই পাশের লোকটির গালে থুঃ করে খানিকটা থুতু ছিটিয়ে দিল।

লোকটা বিকট একটা আর্তনাদ করে দমাস করে পড়ে গেল মেঝেতে। সেই থুতু যেন তার গায়ে বুলেটের মতন লেগেছে।

ওদের দলনেত্রী ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। সে তার নিজের ভাষায় অন্য লোক দুটিকে কী যেন আদেশ করল। সেই লোক দুটি রণজয়কে ধরবার জন্য এগিয়ে আসতেই রণজয় এক লাফে চলে গেল দেয়ালের দিকে। মুখ সরু করে সে খুব জোরে দুবার থুঃ-থুঃ করল। একটা ফসকে গেল, অন্য লোকটির গায়ে থুতু লাগতেই সে আগুনে পোড়া মানুষের মতন ছটফট করতে লাগল। বাকি লোকটি কোমরে হাত দিল একটা অস্ত্র তোলবার জন্য।

রণজয় মুখখানা ঝুঁকিয়ে ঠিক তার মুখের ওপর এক দলা থুতু ছুঁড়ে দিল। সেই লোকটি আকাশ-ফাটানো চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ওদের দলনেত্রী এবার কঠোর গলায় বলল, যথেষ্ট হয়েছে। ওহে পলাতক নীল মানুষ, তুমি এবার শান্ত হবে, না এই মুহূর্তে তোমাকে শেষ করে দেব?

সেই মেয়েটির হাতে একটা ছোট্ট গোল মতন অস্ত্র। রণজয় জানে, ওর থেকে ঝলকে ঝলকে নীল আগুন বেরোয়। সেই নীল আগুন মানুষ তো দূরের কথা, ইস্পাত পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারে।

রণজয়ের গলা শুকিয়ে গেছে। মুখে আর থুতু নেই। থাকলেও অতদূরে তার থুতু পৌঁছাতো না! আর কোনও উপায় নেই, এবার তাহাকে হার স্বীকার করতেই হবে। ওই গোল যন্ত্রটার সঙ্গে কোনও চালাকি চলে না।

মেয়েটি বলল, আস্তে-আস্তে বসে পড়ো। দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাও। এবার তোমাকে অজ্ঞান করে ফেলতে হবে দেখছি। তোমাকে ভালো কথা বললেও...

মেয়েটির কথা শেষ হল না, সে আঁ আঁ করে চিৎকার করে উঠল।

রণজয় দেখল, গুটুলি কখন চুপি-চুপি মেয়েটির পেছন দিকে চলে গেছে। এবার সে লাফিয়ে উঠে পেছন থেকে মেয়েটির মুখখানা ধরে তার দুই কানের মধ্যে থুতু ছিটিয়ে দিচ্ছে।

মেয়েটি মেঝেতে পড়ে যেতেই রণজয় এক লাফে গিয়ে রকেটের দরজাটা খুলে

ফেলল। রকেটটা সবেমাত্র মাটি ছাড়তে শুরু করেছে। রণজয় চিৎকার করে বলল, গুটুলি লাফিয়ে পড়! তারপর নিজেও সে ঝাঁপ দিল!

রণজয় আর গুটুলি দুজনেই পড়ল একটা বড় গাছের ওপর। তারপর গড়াতে-গড়াতে, ডাল-পালার মধ্যে দিয়ে খসে পড়ল মাটিতে। খুব বেশি তাদের লাগেনি।

গুটুলি বলল, ওস্তাদ, ওরা কি আবার ফিরে আসবে?

রণজয় বলল, ওই রকেট একবার শূন্যে উঠে গেলে ফিরে আসতে সময় লাগে। তার আগেই আমরা পালাব। দাঁড়া একটু জিরিয়ে নিই। এখন বুক ধড়ফড় করছে রে! এরকম ভাবে যে বাঁচতে পারব কল্পনাও করিনি!

গুটুলি থুঃ-থুঃ করে নিজের হাতে দুবার থুতু ছিটিয়ে বলল, ওস্তাদ, সত্যিই থুতুর এত শক্তি? কোনওদিন তো বুঝিনি!

রণজয় বলল, থুতু এমনি-এমনি খরচ করিস না! ভবিষ্যতে আবার কাজে লাগতে পারে!

খেলার সঙ্গী

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পায়ের শব্দেই মানুষ চেনা যায়। বাবা ফিরছেন অফিস থেকে। অভির বাবা বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ, তিনি কাজ করেন টেলিফোন অফিসে। অফিস থেকে ফেরেন অনেক দেরি করে। আবার বাড়িতে ফিরেও মেতে থাকেন কাজ নিয়ে।

তবে, বাবা প্রায় রোজই কিছু না কিছু জিনিস নিয়ে ফেরেন। কোনওদিন গরম সিঙাড়া, কোনওদিন আইসক্রিম, কোনওদিন সবেদা বা কমলালেবু।

বাবা বসবার ঘরে একবার উঁকি দিয়ে বললেন, কচুরি-তরকারি এনেছি, খাবি নাকি?

অভি খেলা করছিল কমপিউটারে। সে বুঝে গেল, এবার তাকে উঠতে হবে। কচুরি খাওয়ার জন্যে বড়-জোর দশ-পনেরো মিনিট, তারপরই পড়তে বসা। বাবা তখন বসবেন কমপিউটারে।

মা গান করেন, বাড়িতেও অনেক ছেলেমেয়েকে গান শেখান। এখন দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা ক্লাশ চলছে, সবাই মিলে একসঙ্গে গাইছে, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'।

বাবা বাড়ি ফিরলেই এই ক্লাস ছুটি হয়ে যায়।

এরপর খাওয়ার টেবিলে বসে জলখাবার খেতে-খেতে খানিকটা গল্প হয়। তারপর

বাবা বসে যান কমপিউটারে, মা ব্যস্ত হয়ে পড়েন সংসারের কাজে। রান্না করেন অবশ্য সুশীলা মাসি, তবু কতরকম কাজ থাকে, বিশেষ করে বারবার টেলিফোন।

অভি ক্লাশ এইটে পড়ে, কিন্তু বাড়িতে তার জন্য কোনও মাস্টারমশাই আসে না। অঙ্কে সে খুবই ভালো, ইতিহাস-ভূগোলেও ভালো নম্বর পায়, শুধু ইংরিজিতে একটু কাঁচা।

মা মাঝে-মাঝে এসে সাহায্য করেন অভিকে। মা যেমন ভালো গায়িকা, তেমনি ইংরিজিও জানেন খুব ভালো। এক সময় একটা স্কুলে ইংরিজি পড়াতেন, এখন ছেড়ে দিয়েছেন, এখন নিজেরই তো বাড়িতে গানের স্কুল।

এত ছেলেমেয়েকে গান শেখান মা, কিন্তু নিজের ছেলেকে গান শেখাতে পারলেন না। কয়েকদিন গানের ক্লাসে অভিকে জোর করে বসিয়েছিলেন। তারপর একদিন হতাশভাবে বললেন, যাঃ, আমার ছেলেটার দ্বারা গান হবে না। গলায় একদম সুর নেই।

বাবাকে মা বলেছিলেন, গিটার কিংবা সেতারের মতন কোনও যন্ত্রসংগীত শেখালে হয় অভিকে। একজন ভালো মাস্টার দরকার।

সে ব্যবস্থা এখনও হয়নি। কিন্তু একটা যন্ত্র অভি খুব ভালো পারে। কমপিউটার।

প্রথম-প্রথম বাবার কমপিউটারে হাত দিলেই মা এসে বকাবকি করতেন। যদি নষ্ট হয়ে যায়। বাবা কিন্তু আপত্তি করেননি। বাবা বলেছিলেন, কমপিউটার চট করে খারাপ হয় না। আর ছোটরা বড়দের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শিখে যায়।

এখন অভি ইন্টারনেট খুলতে পারে। অচেনা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলাও যায়, অবশ্য লিখে-লিখে। কী করে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর যে-কোনও জায়গা চলে আসতে পারে চোখের সামনে।

একবার কমপিউটারের সামনে বসলে অভির আর উঠতেই ইচ্ছে করে না।

কিন্তু বাবা বাড়িতে থাকলে অভি আর সুযোগ পায় না। তা ছাড়া ইস্কুলে যাওয়া, বিকেলে সাঁতার-কাটা, হোম টাস্ক করা আছে। তবু যখনই সময় পায় বসে পড়ে।

একদিন ছুটির দুপুরে অভি কমপিউটারে দাবা খেলছে, হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল।

এই দাবা খেলায় তো উলটোদিকে কোনও মানুষ থাকে না। কমপিউটার নিজেই খেলোয়াড়। অভি একটা চাল দিলে কমপিউটার মুহূর্তের মধ্যে উলটো চাল দিয়ে দেয়। একটু ভুল চলে দিলে আর উপায় নেই। কমপিউটার ফেরৎ নিতে দেবে না।

অভি এ পর্যন্ত কমপিউটারকে একদিনও দাবা খেলায় হারাতে পারেনি। যদিও তার বন্ধুরা কেউ পারে না তার সঙ্গে। আজকাল অভির বয়েসি অনেক ছেলেও দাবা খেলার কমপিটিশানে বিদেশে যায়। দিবেন্দু বড়ুয়া আর সূর্যকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের কত নাম হয়েছে। অভিরও ইচ্ছে সে একদিন বিদেশে যাবে। এর মধ্যে সে গোর্কি সদনে দুটো প্রতিযোগিতাতেও জিতেছে।

সেই দুপুরে, কমপিউটারের সঙ্গে দুবার হেরে যাওয়ার পরে অভি যখন আর একবার খেলা শুরু করতে যাচ্ছে, হঠাৎ কমপিউটারে একটি ছেলের মুখ ভেসে উঠল।

মুখখানা প্রথমে বেশ চেনা-চেনা মনে হল।

তারপরেই সে চমকে উঠল, আরেঃ। এ তো তার নিজেরই মুখ। আয়নায় যেমন দেখা যায়।

কিন্তু কমপিউটারে তো নিজের মুখ ফুটে উঠতে পারে না। এটা তো এমনি ছবি নয়, জ্যান্ত মুখ। মিটিমিটি হাসছে।

সে চেঁচিয়ে বলল, মা, শোনো, একবার দেখে যাও?

দুপুরে খাওয়ার পর মা'র অনেকক্ষণ খবরের কাগজ পড়া অভ্যেস। কাছেই বসেছিলেন তিনি। কাগজ পড়তে-পড়তেই অন্যমনস্কভাবে বললেন, কী?

অভি উত্তেজিতভাবে বলল, এখানে এসো। আমি নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছি।

মা কাগজ হাতে নিয়ে উঠে এসে অভির পাশে দাঁড়ালেন। কমপিউটারের পরদা থেকে এর মধ্যেই সেই মুখটা মুছে গেছে, সেখানে এখন দুটো গাড়ির রেস চলছে।

অভি বলল, যাঃ, চলে গেল। সত্যিই আমার মুখটা ফুটে উঠেছিল। একেবারে স্পষ্ট।

মা অভির দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে বললেন, চল, একটু শুয়ে নিবি।

অভি বলল, তুমি বিশ্বাস করছ না? সত্যি দেখেছি।।

মা বললেন, অনেকক্ষণ কমপিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ক্লান্ত হয়ে যায়। তাতে লোকে ভুলভাল দেখে। কমপিউটার কি আয়না যে নিজের মুখ দেখবি। ওটা অসম্ভব। এক যদি ছবি হয়, কেউ ছবি পাঠিয়ে দেয়।

অভি বলল, না, ছবি নয়। নড়াচড়া করছিল।

এর মধ্যে টেলিফোন বেজে উঠল। মা পাশের ঘরে যেতে-যেতে বললেন, আর খেলতে হবে না। এবার বন্ধ করে শুতে চলে যা—.

মা চলে যেতেই আবার ফিরে এল অভির মুখ।

অভি ভুরু কুঁচকোতেই সেই মুখটারও ভুরু কুঁচকে যায়। অভি জিভ ভ্যাঙালে সেও ভ্যাঙানো জিভ বার করে। অভি একটা চিমটি কাটল নিজের গালে, সেও চিমটি কাটল বটে, কিন্তু হাসতেও লাগল। অভি তখন হাসছে না।

তাহলে কি পৃথিবীতে কোথাও ঠিক তার মতন চেহারার একটা ছেলে আছে? তা হতেও পারে।

অভি জিগ্যেস করল, এই, তুমি কে? তোমার নাম কী?

সেই ছেলেটি বলল, অভিরূপ মজুমদার। ডাক নাম অভি।

অভি বলল, বাঃ, ওটা তো, আমারও নাম। তুমি আমার নাম চুরি করেছ?

সে বলল, না। তুমি আমার নাম চুরি করেছ।

অভি অবিশ্বাসের সুরে বলল, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?

সে বলল, ক্লাস এইট।

অভি আবার জিগ্যেস করল, কোথায় থাকো তুমি?

সে বলল, সে অনেক দূরে। সে জায়গাটার নাম দিকশূন্যপুর।

আবার অভি বেশ চমকে গেল কমপিউটার তো কথা বলে না। মানে গলার আওয়াজে কোনও উত্তর আসে না। সব প্রশ্নের উত্তর লেখায় ফুটে ওঠে।

কিন্তু এখানে সে ওই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছে কী করে?

আর কিছু জিগ্যেস করা গেল না। মা এ ঘরে ফিরে আসতেই মিলিয়ে গেল মুখটা।

মা বললেন, এখনও বসে আছ? বললাম না, বন্ধ করো। চলো, আমার পাশে আধঘণ্টা শোবে।

এরপর দুদিন আর কিছুই হল না। দেখা গেল না সেই মুখ। অভি কমপিউটারের সঙ্গে দাবা খেলে যথারীতি হারতে লাগল।

তৃতীয় দিন, বাবা অফিসের কাজে বাইরে গেছেন, মা গেছেন একটা গানের জলসায়। বাড়িতে অভি একা। সে পড়তে না বসে সন্ধেবেলা মনের আনন্দে খেলা করতে লাগল কমপিউটারে।

হঠাৎ ফিরে এল সেই মুখটি।

আজ সে নিজেই আগে জিগ্যেস করল, তুমি এখনও পড়তে বসোনি? বেশ মজা, তাই না?

অভি বেশ কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, সত্যি করে বলো তো, তুমি কে?

ছেলেটি বলল, বাঃ, সেদিন বললাম তো, আমার নাম অভিরূপ মজুমদার।

অভি দুদিকে মাথা নেড়ে বলল, না। তোমার চেহারাটা আমার মতন হতে পারে, কিন্তু নামটাও কী করে এক হবে?

ছেলেটি কিন্তু মাথা নাড়ল না। মুচকি হেসে বলল, এরকম হয়। অনেক কিছু হয়। এই বিজ্ঞানের যুগে কত কাণ্ডই না হচ্ছে।

অভি তবু অবিশ্বাসের সুরে বলল, তোমার বাবার নাম কী?

ছেলেটি বলল, প্রাণেশ মজুমদার। মায়ের নাম অরুণিমা। আমার মা খুব ভালো গান করেন। আমি অবশ্য গান গাইতে পারি না।

মিলে যাচ্ছে। সবকিছু মিলে যাচ্ছে। শুধু ছেলেটা থাকে অন্য জায়গায়। দিকশূন্যপুর না কী যে নাম বলেছিল জায়গাটার।

অভি বলল, তুমি ঝাল খেতে পারো?

ছেলেটি বলল, একটু-একটু, খুব বেশি না।

অভি বলল, তুমি কী খেতে ভালোবাসো? মাছ না মাংস?

ছেলেটি বলল, দুই-ই। তবে মাছের মধ্যে চিংড়ি মাছ আমার সবচেয়ে ফেভারিট।

অভি বলল, তুমি কখনো দার্জিলিং গেছ?

ছেলেটি বলল, হ্যাঁ।

অভি বলল, তুমি কী কী খেলতে ভালোবাসো?

ছেলেটি বলল, সাঁতার, শীতকালে টেবিল টেনিস, আর দাবা। দাবা খেলাই আমরা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। তুমিও তো দাবা খেল। আমাকে হারাতে পারবে?

অভি বলল, তুমি কেমন খেল, তা তো আমি জানি না। তবে অনেকেই আমার কাছে হেরে যায়। গোর্কি সদনে একটা কমপিটিশনে আমি জুনিয়ার গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।

ছেলেটি অবজ্ঞার হাসি দিয়ে বলল, ইঁস, ভারি তো চ্যাম্পিয়ন। ভালো খেলোয়াড় কেউ ছিলই না। আমার সঙ্গে লড়ে দেখো না। আমি বলে-বলে তোমায় হারাব।

অভিও হেসে বলল, তাই নাকি। দেখা যাক তাহলে।

অমনি পরদায় ভেসে উঠল একটা দাবার ছক। তার একপাশে বাবু হয়ে বসে আছে ছেলেটি। সে বলল, তুমি সাদা নেবে, না কালো? যেটা ইচ্ছে। তুমিই প্রথম চাল দাও।

ঠিক সাত মিনিটের মধ্যে হেরে গেল অভি।

সে রেগে গিয়ে বলল, তুমি কমপিউটারের সাহায্য নিয়েছ। কমপিউটারের সঙ্গে কেউ পারে?

ছেলেটি বলল, মোটেই না। আমি নিজে খেলছি। ঠিক আছে, আর এক দান হোক। এবারে তুমি দুটো ভুল চাল ফেরৎ নিতে পারবে। কমপিউটার তো সে সুযোগ দেয় না।

পরের দানে অভি হেরে গেল ন-মিনিটে।

এরপর থেকে শুরু হয়ে গেল ওদের দুজনের মধ্যে এক টানা প্রতিযোগিতা। যখনই সুযোগ পায়, অভি ওই ছেলেটির সঙ্গে দাবা খেলতে বসে। প্রত্যেকেবার সে হারে।

যত হারে, তত জেদ বেড়ে যায় অভির। ওকে একদিন না একদিন হারাতেই হবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ঘরে অন্য লোক ঢুকলেই ছেলেটি অদৃশ্য হয়ে যায়। অনেক খেলা থেমে যায় মাঝপথে।

একেবারে নিরিবিলি সময় পাওয়াই মুশকিল। মা আর বাবা দুজনেই বাড়িতে থাকবেন না, এমনও তো হয় খুব কম।

অভি ভোরবেলা উঠে কমপিউটার খুলতে লাগল।

একটা সুবিধা এই, মা দেরি করে জাগেন। তারপরেও অনেকক্ষণ অন্য ঘরে বসে গানের গলা সাধেন।

বাবা ঘুম থেকে উঠে অভিকে কমপিউটারের সামনে দেখলেও বকাবকি করেন না। বাবা বাথরুমে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান, সেখানে বসে খবরের কাগজ পড়েন। তারপর বসবার ঘরে এলেই অভি কমপিউটার ছেড়ে উঠে যায়।

এইরকম চলল মাসের পর মাস।

এখন আর অভির অন্য কোথাও বেড়াতে যেতেও ইচ্ছে করে না। ওই ছেলেটাকে একবার না হারাতে পারলে তার মনে শান্তি হবে না।

এর মধ্যে গোর্কি সদনে আর একটা প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়ে অভি সবকটা রাউন্ডে জিতে এল, অথচ এ ছেলেটাকে হারানো যাচ্ছে না কিছুতেই। প্রত্যেকেবার জিতে গিয়ে ছেলেটা যখন হাসে, রাগে অভির গা জ্বলে যায়।

এর মধ্যে ছেলেটার সঙ্গে নানারকম গল্পও হয়। সব ব্যাপারেই দুজনের খুব মিল, শুধু দাবা খেলার ক্ষমতা ছাড়া।

এক রবিবার দুপুরে বড়মামা নিয়ে এলেন অনেকগুলো প্রকাণ্ড সাইজের গলদা চিংড়ি।

সে চিংড়ির কী অপূর্ব স্বাদ। মাথায় হলদে রঙের ঘিলু। দাঁড়াগুলোও বড়-বড়। দারুণ মালাইকারি রান্না করলেন মা নিজে। অভি দু-দুটো চিংড়ি খেয়ে ফেলল।

সন্ধেবেলা বড়মামাকে নিয়ে মা-বাবা টিভিতে কী একটা বাংলা সিনেমা দেখছেন পাশের ঘরে। অভি এসে খুলে ফেলল কমপিউটার।

ছেলেটির মুখ দেখা যেতেই অভি জিগ্যেস করল, আজ দুপুরে কী খেয়েছ?

ছেলেটি হেসে বলল, তুমি বুঝি ভাবছ আমার চেয়েও ভালো-ভালো খাবার খেয়ে তুমি জিতবে। মোটেই না। আমিও আজ গলদা চিংড়ি খেয়েছি। পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো খাবার।

হঠাৎ অভির মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল।

সে বলল, তুমি একদিন আমাদের বাড়িতে আসবে?

ছেলেটি বলল, কেন?

অভি বলল, কেন, মানে, তুমি এলে আমরা সামনাসামনি অনেক গল্প করব। তুমি বই পড়তে ভালোবাসো? আমার অনেক বই আছে।

ছেলেটি বলল, কী করে যাব? আমি তো কলকাতায় থাকি না। আমার বাড়ি অনেক দূরে, দিকশূন্যপুর। তুমিই বরং একদিন এসো আমার বাড়িতে। আমার কাছেও অনেক বই আছে।

অভি বলল, এসো, একটু খেলি।

ছেলেটি বলল, এতবার হেরেও তোমার শিক্ষা হয়নি! বলেছি তো, আমার সঙ্গে তুমি পারবে না।

অভি বলল, তোমাকে যদি একবার না হারাতে পারি, তাহলে আমার নামই মিথ্যে, আমি খেলা ছেড়ে দেব। তুমি যদি আমাদের বাড়িতে আসতে পারতে, তাহলে মুখোমুখি বসে দাবার ছক পেতে খেলতাম।

সেই ছেলেটি বলল, তার মানে, তুমি আমাকে এখনও অবিশ্বাস করছ? তুমি ভাবছ, আমি কমপিউটারের সাহায্য নিয়ে তোমাকে চিটিং করছি? মোটেই না। আমি তিনসত্যি করে বলছি, পুরোটাই আমি নিজে-নিজে খেলি। তোমার মতন আমি মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাই না। বারবার হেরে গিয়ে যদি তোমার রাগ হয় তা বলে দাও, আমি আর আসব না। আমি আর খেলব না।

অভি বলল, না, না, আমি খেলব একদিন না একদিন তোমাকে হারাবোই এবার শুরু হোক!

সেবারেও হেরে গেল অভি।

বাবা কিংবা মা ব্যাপারটা কোনওদিনই জানতে পারলেন না। ওঁরা ঘরে এলেই যে ছেলেটি মুছে যায়।

এক-এক সময় অভি খেলায় এমনই তন্ময় হয়ে থাকে যে বাবা কিংবা মা ঘরে এলেন কিনা সে টেরও পায় না। কিন্তু ছেলেটা ঠিক টের পায়। খেলার মাঝপথে কমপিউটারের পরদা হঠাৎ সাদা হয়ে যায় কিংবা অন্য ছবি ফুটে উঠলেই অভি ঘাড় ফিরিয়ে দেখে মা কিংবা বাবা দরজা দিয়ে এ ঘরে ঢুকছেন।

একদিন এইরকম খেলার সময় তার মামাতো বোন রিনি এসে পড়েছিল। রিনি আর অভি প্রায় সমান-সমান। ওরা থাকে দক্ষিণেশ্বরে, তাই বেশি দেখা হয় না। তবে মাঝে-মাঝে আসে।

অভি তখন কমপিউটারে খেলা নিয়ে মেতে আছে, রিনি চুপিচুপি পেছন দিক থেকে এসে ওর চোখ টিপে ধরল।

তারপর বলল, বলো তো আমি কে?

এ আর বলা শক্ত কী? গলার আওয়াজটাও চেনা, আঙুলের ছোঁয়াটাও চেনা।

তাই অভি বলল, রিনি! কখন এলি?

রিনি বলল, এইমাত্র। তুই কমপিউটারের সাদা স্ক্রিনের সামনে বসে কী করছিলি? ঘুমোচ্ছিলি নাকি?

তার মানে রিনিকে দেখেও সে ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। অভি ছাড়া আর কারুর কাছেই সে দেখা দেবে না। এ তো বেশ মজার ব্যাপার।

চোখ থেকে রিনির আঙুল সরিয়ে নিয়ে সে দেখল, সত্যিই কমপিউটারের পরদাটা একেবারে সাদা।

রিনি হাসতে-হাসতে বলল, অনেকে ঘুমোয়। আমার দাদাও কমপিউটারে বসে কাজ করতে-করতে ঘুমে ঢুলে পড়ে।

অভি অবশ্য কোনওদিন ঘুমে ঢুলে পড়েনি।

আগে-আগে রিনি এলে তার খুব ভালো লাগত। দুজনে গল্প হতো কতরকম। রিনিদের বাড়িটা তো অভিদের মতন ফ্ল্যাটবাড়ি নয়। সেখানে সামনে অনেকখানি বাগান। অভি দক্ষিণেশ্বরে মামাবাড়ি গেলে সেই বাগানে ব্যাডমিন্টন খেলেছে।

আজ কিন্তু রিনির সঙ্গে গল্প তেমন জমছে না। অভি মনে-মনে ভাবছে, আবার কখন ওই ছেলেটার সঙ্গে খেলা করে। ওই অহংকারী ছেলেটাকে না হারিয়ে তার শান্তি নেই।

এর কয়েকদিন পরের এক বিকেলে আবার একটা দারুণ ব্যাপার হল।

অভি ইস্কুল থেকে ফিরেই কমপিউটার নিয়ে বসেছে। আজ আর সাঁতারে যাওয়ার কথা নেই। বাবা অফিস থেকে ফেরেননি, মা কোণের ঘরে গানের ক্লাস নিচ্ছেন।

খেলা শুরু হয়ে গেছে। অভি এক সময় জিগ্যেস করল, শোনো, তোমাদের ওই দিকশূন্যপুর জায়গাটা কেমন?

ছেলেটি বলল, ভারি সুন্দর। পাহাড় আছে, ঝরনা আছে, মেঘ আছে, কতরকম পাখি, আর সবুজ ধানের খেত।

অভি বলল, কত দূরে? দক্ষিণেশ্বরের থেকে দূরে? কিংবা ঝাড়গ্রাম?

ছেলেটি বলল, হ্যাঁ, তার চেয়েও দূরে।

অভি জানতে চাইল, কী করে সেখানে যেতে হয়?

ছেলেটি তাকে ধমক দিয়ে বলল, খেলায় মন দাও, নইলে এক্ষুনি কিস্তি হয়ে যাবে কিন্তু।

অভি বলল, অত সোজা নয়।

এটা ঠিক, ছেলেটি প্রত্যেকবারই অভিকে হারিয়ে দেয় বটে, কিন্তু আগের মতো অত সহজে সাত মিনিটে বা ন-মিনিটে পারে না। এক-এক সময় তাকেও বেশ মাথা ঘামাতে হয়।

একটু পরে অভি আবার জিগ্যেস করল, আর একটা কথা জিগ্যেস করি। ঘরে অন্য কেউ এলেই তুমি হাওয়া হয়ে যাও কেন?

ছেলেটি বলল, আমায় দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে? কমপিউটারে কারুর সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারে? এটা আমি একটা বিশেষ কায়দা বার করেছি। এখন তোমাকে ছাড়া আর কারুকে জানাইনি। এখন কেউ হঠাৎ দেখে ফেললে চ্যাঁচামেচি করবে। কী করে হল, কেমন করে হল, এই নিয়ে সোরগোল চলবে, ওসব কি ভালো লাগবে? একদিন সারা পৃথিবীকে একসঙ্গে এই আবিষ্কারের কথা জানাব। তখন শুধু তুমি আমার পাশে থাকবে।

তারপরই সে চেঁচিয়ে উঠল, এই. এই!

অভি বলে উঠলে, চেক! এবার?

সেই ছেলেটির রাজার ঠিক সামনে অভির মন্ত্রী আর একপাশে পজিশান নিয়ে আছে তার ঘোড়া। রাজার আর বাঁচার পথ নেই।

অভি বলল, কী, আর চাল দিতে পাববে?

ছেলেটি হতাশভাবে বলল, না।

অভি বলল, তাহলে তোমাকে হারিয়েছি? স্বীকার করছ?

ছেলেটি বলল, হ্যাঁ, স্বীকার করছি।

জয়ের আনন্দে অভির ইচ্ছে হল লাফিয়ে উঠতে। ঘরের মধ্যে দুহাত তুলে নাচতে।

কিন্তু নিজেকে সংযত কবে সে জিগ্যেস করল, আর এক দান খেলবে? আবার তোমাকে হারাব।

ছেলেটি কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই সিঁড়িতে শোনা গেল ভারি জুতোর শব্দ।

বাবা চেঁচিয়ে বললেন, অভি! অভি কোথায়?

অভির বুকটা কেঁপে উঠল। খারাপ কিছু হয়েছে নাকি? বাবা তো কখনো সিঁড়ি দিয়ে ডাকতে-ডাকতে ওঠেন না। গলাব আওয়াজটাও কেমন যেন অস্বাভাবিক।

মা-ও বেরিয়ে এসেছেন গানের ঘর থেকে।

বাবা ওপরে এসে উত্তেজিতভাবে বললেন, আজ কী হয়েছে জানো? তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না। একটু আগে আমার অফিসে কে ফোন করেছিলেন? স্বয়ং ক্রীড়ামন্ত্রী!

মা উৎকণ্ঠিভাবে বললেন, কেন?

বাবা অভির দিকে তাকিয়ে বললেন, এদিকে আয়।

অভি এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল। বাবা তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমাদের অভি জার্মানি যাবে। ক্রীড়ামন্ত্রী ফোন করে বললেন, জুনিয়র দাবা গ্রুপে আমাদের দেশের হয়ে খেলতে যাবে অভি, কমপিউটারে বারবার ওর নামই উঠেছে।

প্রথম খেলা হবে বার্লিনে, বাবা-মা দুজনেই যাবেন অভির সঙ্গে। মা তক্ষুনি টেলিফোনে এই ভালো খবরটা জানাতে লাগলেন আত্মীয়-বন্ধুদের।

অভি ভাবল, সেও খবরটা দেবে তার খেলার সঙ্গীকে।

কমপিউটারের পরদাটা সাদা হয়ে আছে। অভি অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু সেই ছেলেটিকে আর পাওয়া গেল না।

এরপর কয়েকদিন ধরে অভির জার্মানি যাওয়ার সব ব্যবস্থা হতে লাগল। পাসপোর্ট পেতে হবে, কিনতে হবে শীতের দেশের জামাকাপড়, সময় বেশি নেই।

এরই ফাঁকে-ফাঁকে সে কমপিউটারে খুঁজতে লাগল ছেলেটিকে। কিন্তু আর কিছুতেই তাকে ধরা যাচ্ছে না। দাবার বোর্ড দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে সে নেই।

আর কি কোনওদিন দেখা হবে না তার সঙ্গে?

দিকশূন্যপুর কী করে যেতে হয়, সেটাও শেষপর্যন্ত জানা হয়নি।

অভি মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর একটু বড় হয়ে সে নিজেই ঠিক খুঁজে বার করবে দিকশূন্যপুর। সেখানে দেখা করবে ঠিক তার মতন চেহারার ছেলেটির সঙ্গে। এই বন্ধুটিকে সে চিরকালের মতন হারিয়ে যেতে দেবে না।

নতুন পুকুরের জাগ্রত দৈত্য

কেয়া গাছের ঝোপের পাশে পর-পর দুদিন দুটো মোটা-মোটা সাপ দেখে বড়মামা ঠিক করলেন, সবকটা কেয়া গাছই কেটে ফেলবেন। কেয়া ফুল যখন ফোটে, দেখতে সুন্দর লাগে, গন্ধও খুব মিষ্টি। কিন্তু ওই গন্ধে নাকি সাপ আসে।

সাপ দেখলে তো ভয় হবেই।

কাছেই মিলি, বুবুন, টুকুনরা খেলা করে। এক-একদিন খেলতে-খেলতে সন্ধে হয়ে যায়। ওরা অবশ্য একদিনও সাপ দেখেনি।

বড়মামা দেখেছেন, শুধু তাই নয়, একটা সাপ তাঁর দিকে ফণা তুলে ফোঁস করেছিল। তাই তিনি লোক ডাকিয়ে সবকটা কেয়া গাছ তো কেটে ফেললেনই, আশেপাশের ঝোপ-ঝাড় সব পরিষ্কার করালেন। দেখা গেল, সেখানে দুটো বড়-বড় গর্ত। ওই গর্তেই নিশ্চয়ই সাপেদের বাসা। তা হলে তো সাপ দুটোকে বার করে মেরে ফেলতে হয়।

সাপ দেখার জন্য অনেক লোক ভিড় করে এসেছে। বড়মামা নিজে একটা শাবল নিয়ে কাজের লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন গর্ত খোঁড়ায়। বড় মামার লম্বা-চওড়া চেহারা, যেমন জেদী, তেমনই সাহসী মানুষ। ছেলে-মেয়েরা কৌতূহল চাপতে না পেরে খুব কাছে চলে আসতেই বড়মামা ধমক দিয়ে বলছেন, এই, সর, সরে যা সাপ দুটো লাফিয়ে উঠে এলে তখন আর পালাবার সময়ও পাবি না।

গর্ত খোঁড়া চলতেই লাগল, চলতেই লাগল, সাপের দেখা নেই। চতুর্দিকে অনেকগুলো গর্ত হয়ে গেল, তবু সাপেরা যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পাশেই একটা মজা পুকুর। পুকুরও ঠিক বলা যায় না, খানিকটা জলা জায়গা। নানারকম আগাছায় ভরা, বর্ষাকালেও ও-র হাঁটুর বেশি জল হয় না। খানিকটা দূরে একটা ভাঙা শিবমন্দির। এক সময় হয়তো এখানে একটা সত্যিই পুকুর ছিল, এখন ভরাট হয়ে গেছে। এখন আশেপাশের বাড়ির লোক ওখানে নোংরা-ময়লা ফেলে। গাছ হয়ে গেছে কতরকম।

বড়মামার ডাকনাম সোনা। একজন কাজের লোক বলল, ও সোনাভাই, সাপ দুটো যদি এই মজা-পুকুরে লুকোয়, খুঁজে পাবেন কী করে?

অন্য সবাইও সেই কথাই ভাবছে।

বড়মামা একটুক্ষণ কোমরে হাত দিয়ে চোখ কটমট করে তাকিয়ে রইলেন। যে-সাপ তাঁর দিকে ফোঁস করে ভয় দেখিয়েছে, তাকে তিনি ছাড়বেন না।

তিনি বললেন, সব জায়গাটাই খুঁড়ে ফ্যাল!

অতখানি জায়গা, ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে আরও কত গর্ত রয়েছে, খুঁড়ে ফেলা কি সোজাকথা?

বড়মামা বললেন, আরও দশজন লোক ঠিক কর। এই মজা-পুকুরটা আমি উদ্ধার করব। এখানে নতুন পুকুর হবে। এ কাজ আমাদের আগেই করা উচিত ছিল। এখানে সিমেন্টের ঘাট বাঁধিয়ে দেব। দুপুরে এই পুকুরে চান করব, আর বিকেলে ঘাটে বসে চা খাব!

সাপ খুঁজতে-খুঁজতে পুকুর।

পরদিন থেকে হই-হই, রই-রই কাণ্ড।

দশ-বারোজন লোক মিলে শুরু হল মাটি কাটা। যেন একটা উৎসব। ওরা আবার মাটি কাটতে-কাটতে গান গায়।

দেখতে-দেখতে কেমন বদলে গেল জায়গাটা।

কত কচু গাছ, আশশ্যাওড়া আর ভ্যারেণ্ডার ঝোপ-ঝাড় সাফ হয়ে গেল, চারধার ঢালু হয়ে তৈরি হতে লাগল পুকুর। কত ইঁদুর পালাল এদিক-ওদিক। সাপ কিন্তু দেখা গেল না, তারা নাকি চলে গেছে পাতালে। মিলিরা দিদিমার কাছে গল্প শুনেছে, পাতালে আছে নাগরাজ্য, সেখানে সাপেরা থাকে। মহাভারতের ভীম একবার জলে ডুবে চলে গিয়েছিল সেই নাগরাজ্যে।

মাটি-কাটা লোকদের মধ্যে একজনের নাম ভুলু মিঞা, সে খুব কাজে ফাঁকি দেয়। মাঝে-মাঝেই বিড়ি খায় আর কাদামাটির মধ্যেই একটুখানি শুয়ে ঘুমিয়ে নেয়। সে-ই কিন্তু একটা দারুণ কাণ্ড করে ফেলল।

পুকুর খোঁড়ার সাত দিনের দিন সে হঠাৎ এক সময় চেঁচিয়ে উঠল, সোনার কলসি! সোনার কলসি! গুপ্তধন পেয়ে গেছি রে!

সবাই কাজ ফেলে ছুটে এল।

যদিও কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না। একজন বলল, তুই কি আজ বিড়ির বদলে গাঁজা খেয়েছিস নাকি রে? কোথায় গুপ্তধন?

ভুলু মিঞা দারুণ উত্তেজিত ভাবে বলল, আমি শাবল চালাই আর ঠং-ঠং শব্দ হয়। সোনার কলসিতে লাগে। আমারে গুপ্তধনের ভাগ দিতে হবে কিন্তু!

তখন তিন-চারজন সেই জায়গাটায় শাবল আর কোদাল চালিয়ে দেখল, সত্যিই কী যেন একটা শক্ত জিনিসে লাগছে।

সবারই গুপ্তধনের কথা মনে হয়।

আগে এখানে পুকুর ছিল, শিবমন্দির ছিল, গুপ্তধন তো থাকতেই পারে। অনেকে যক্ষের ধনও পুঁতে রাখত এক সময়।

খবর পেয়ে বড়মামা ছুটে এলেন।

তিনি চারজনকে বেছে নিয়ে বললেন, ভালো করে, সাবধানে জিনিসটাকে খুঁড়ে তোলো। যদি গুপ্তধন থাকে, সবাই ভাগ পাবে।

ভুলু মিঞা বলল, আমি একটু বেশি পাব না?

অনেক চেষ্টায় যে জিনিসটা পাওয়া গেল, সেটা একটা দু-হাত লম্বা পাথর। জিনিসটা কী, তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে, সোনার কলসি মোটেই না।

বড়মামা ভুলু মিঞাকে জিগ্যেস করলেন, তুই সোনার কলসি কোথায় দেখলি রে?

ভুলু মিঞা চুপ। তার বন্ধু শিবু বলল, ও ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে।

পাথরটাকে ওপরে এনে অনেক করে ঘষে-ঘষে, জল দিয়ে ধোয়ার পর দেখা গেল, সেটা একটা পাথরের মূর্তি।

কোনও ঠাকুর-দেবতার মূর্তি ভেবে অনেকে মাটিতে কপাল ছুঁইয়ে প্রণাম করতে লাগল।

কিন্তু এটা আবার কী ঠাকুর। শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা হতেই পারে না। চেনা কোনও দেবতার মতনও নয়। দেখলে কেমন যেন ভয়-ভয় করে। মাথায় বাবড়ি চুল, মস্ত বড় চোখ, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, একটা হাত ভাঙা, আর একটা হাতে গদার মতন একটা কিছু।

দেখলে দেবতার বদলে দৈত্য কিংবা দানব বলে মনে হয়।

একটা কিছু যখন পাওয়া গেছে, তখন আরও অনেক কিছু পাওয়া যেতে পারে। আবার নতুন উদ্যমে শুরু হল খোঁড়াখুঁড়ি,। এরপর আরও কয়েকটা পাথরের টুকরো, সেগুলো এমনই ভাঙা যে কিছু বোঝাই যায় না, কয়েকটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি, মানুষের হাড়, ত্রিশূলের অংশ, এইসব উঠল। গুপ্তধন পাওয়া গেল না। তবে পাওয়া গেল কিছু পুরোনো আমলের তামার পয়সা, লোকে কিছু মানত করে জলে ছুঁড়ে ফেলত।

দশদিনের মধ্যে পুকুরের তলা থেকেও জল উঠতে লাগল, বৃষ্টিও নামল। ভরে গেল পুকুর, আর খোঁড়াখুঁড়ির প্রশ্নই রইল না।

বড়মামা সাঁতার কেটে এপার-ওপার করে এসে বললেন, রোজ সাঁতরাবো, বেশ ভালো ব্যায়াম হবে।

ছোটমামা বলল, এবার পুকুরে মাছ ছাড়তে হবে। তারপর আমি ছিপ ফেলে মাছ ধরব।

বড়মামা বললেন, মাছ ধরাও শিখতে হয়। নইলে তোর অবস্থা হবে, 'ছিপ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে!'

আশেপাশের অনেক বাড়ির লোক পুকুরটায় স্নান করতে আসে। সবাই খুশি হয়ে ধন্য-ধন্য করে বড়মামাকে। কাছাকাছি আর কোনও ভালো পুকুর নেই।

পাথরের মূর্তিটাকে নিয়ে এখন কী করা হবে?

ঠাকুর-দেবতার মূর্তি হলে পুজো করা উচিত। কিন্তু কোন ঠাকুর বোঝা না গেলে পুজো হবে কী করে? আর দৈত্য-দানব হলে তো পুজো করাটাই খারাপ।

সেটাকে পরিষ্কার করে, তেল-টেল মাখিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে বৈঠকখানার এক কোণে।

অনেক দেখতে এসে নানা কথা বলে।

কেউ বলে, এটা যক্ষ। কেউ বলে, বীরভদ্র। কেউ বলে, স্বর্গের দ্বারপাল। আবার কেউ বলে, আগেকার কোনও রাজার মূর্তি হতে পারে।

স্কুলের হেডমাস্টার করিম সাহেব অনেক কিছু জানেন।

তিনি একদিন এসে অনেকক্ষণ ধরে দেখে বড়মামাকে বললেন, সোনাবাবু, আগে পরীক্ষা করে দেখা দরকার, এটা কত দিনের পুরোনো। যদি পাঁচ-ছশো বছরের পুরোনোও হয়, তা হলে মূর্তিটা যারই হোক, তা ইতিহাসের সম্পদ। কোনও প্রাচীন মূর্তি মাটির তলা থেকে পাওয়া গেলে, তা কারুর বাড়িতে রাখার নিয়ম নেই। গভর্নমেন্টকে জানাতে হয়, গভর্নমেন্ট মিউজিয়ামে রাখে।

বড়মামা বললেন, কত দিনের পুরোনো, তা বুঝব কী করে?

করিম সাহেব বললেন, সরকারের লোকদের খবর দিতে হবে। তারা এসে দেখে যাবে।

করিম সাহেব শনিবার দিন সিউড়ি যাবেন, তিনি নিজেই খবর দিয়ে আসবেন।

এর মধ্যে করিম সাহেব জ্বরে পড়ে গেলেন, তাঁর আর সিউড়ি যাওয়া হল না।

মিলি যতবার বৈঠকখানা ঘর দিয়ে যায়, মূর্তিটার দিকে একবার তাকায়। ভয়ে তার বুক ছমছম করে।

তার যেন মনে হয়, মূর্তিটা রেগেমেগে তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

এমনি পাথরের মূর্তি, কিন্তু সন্ধেবেলা অন্ধকারে মনে হয় যেন,তার গা থেকে একটু-একটু আলো ফুটে বেরুচ্ছে।

শুধু মিলিরই এরকম মনে হয়। আর কেউ ভয় পায় না, আলোও দেখতে পায় না।

একদিন বিকেলবেলা মিলি সবেমাত্র স্কুল থেকে ফিরেছে, বৈঠকখানায় বইয়ের ব্যাগটা রাখতেই সেই মূর্তিটা যেন স্পষ্ট গম্ভীর গলায় ডেকে উঠল, এই মিলি, মিলি।

মিলি সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বুঁজে দৌড়।

ওদিকের বারান্দায় দিদিমাকে দেখেই তাঁকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠল।

প্রথমে সে কিছু বলতেই চায় না। তারপর বড়মামা এসে বারবার জিগ্যেস করতে লাগলেন, কী হয়েছে, বল? কী হয়েছে?

মিলির বাবা-মা থাকেন দিল্লিতে। সে মামাবাড়িতে থেকে পড়াশুনো করছে। সে এ বাড়ির খুব আদরের।

শেষপর্যন্ত আসল কথাটা শুনে বড়মামা হো-হো করে হেসে উঠলেন। মিলির মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, ওরে, পাথরের মূর্তি কোনওদিন কথা বলতে পারে না। ওদের তো ফুসফুস নেই। গলার মধ্যে নল নেই।

মিলিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন বৈঠকখানায়।

মূর্তিটার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, এই দ্যাখ, সলিড পাথর। মুখই নেই, কথা বলবে কী করে?

মিলি এখন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। সে আঙুল তুলে বলল, ওই দ্যাখো।

সেই পাথরের মূর্তিটার কাছেই রাখা ছিল একটা বাঁকুড়ার ঘোড়া। এখন সেটা উলটে পড়ে আছে মাটিতে।

কী করে পড়ল? মূর্তিটাই ধাক্কা দিয়ে ঘোড়াটাকে ফেলে দিয়েছে।

বড়মামা বললেন, এইবার বোঝা গেল। একে বলে কাকতালীয়। ঘোড়াটা পড়ে যাওয়ার শব্দ হয়েছে, তাতেই তোর মনে হয়েছে পাথরের মূর্তিটা কথা বলেছে।

ঘোড়াটা পড়ল কী করে? এমনি-এমনি?

ঘোড়াটা ঠিক মতন দাঁড়াতে পারে না, টিক-টিক করে। এর আগেও আরও দুবার পড়ে গিয়েছিল। দেখছিস না, একটা কান ভাঙা।

মিলির তবু বিশ্বাস হয় না।

আরও অনেকে এসেছে এ ঘরে। ছোটমামা মজা করে বলল, না বড়দা, মূর্তিটা বোধহয় সত্যিই মিলিকে ডেকেছে। রাক্ষসটার খিদে পেয়েছে বোধহয়।

বড়মামার ছেলে পিন্টু আরও দুষ্টু। সে বলল, না, না, রাক্ষস কেন হবে, ওটা তো রাজা নরসিংহদেবের মূর্তি। রাজার পছন্দ হয়েছে মিলিকে। সেই যে ছড়া আছে না, এলাটিং বেলাটিং সইলো, রাজা একটি বালিকা চাইল। কোনও বালিকা চাইল? মিলি সেনগুপ্তকে চাইল—

মিলি ছুটে চলে গেল সে ঘর থেকে।

তারপর থেকে মিলি ঠিক করেছে, সে আর একা কখনো বৈঠকখানা ঘরে ঢুকবে না। অন্যদের সঙ্গে এলেও মূর্তিটার দিকে চাইবে না। তবু চোখ চলে যায়। মনে হয় যেন সে আরও রেগে গেছে।

করিম সাহেবের জ্বর হয়েছে, তিনি সিউড়িতে খবর দিয়ে এসেছেন।

দু-একদিনের মধ্যেই সরকারি লোক এসে পড়বে।

তার মধ্যেই একটা কাণ্ড হল।

দিদিমার খুব পাতলা ঘুম। রাত্তিরে খুটখাট শব্দ হলেই তিনি জেগে ওঠেন।

মাঝরাত্তিরে তিনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, কে রে? কে রে?

ছোট মামা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনো করে ছাদের ঘরে। মায়ের গলা শুনে সঙ্গে-সঙ্গে এসে দাঁড়াল পাঁচিলের কাছে।

দেখতে পেল, বৈঠকখানা ঘর থেকে কে একটা লোক বেরিয়ে এসে দৌড়োচ্ছে।

ছোটমামা চেঁচিয়ে উঠল, চোর, চোর! বড়দা, পিন্টু, হারান, ওঠ, চোর পালাচ্ছে।

চোরটা ছুটছে, কিন্তু সোজাসুজি নয়। কেমন যেন এঁকেবেঁকে, যেন সে টলে-টলে পড়ে যাচ্ছে একবার রাস্তার এদিকে, আর একবার ওদিকে।

সবাই বেরিয়ে তাড়া করে যেতেই চোরটা ঝাঁপ দিল পুকুরে।

তারপর সে নিজেই আর্ত-চিৎকার করে উঠল, বাঁচাও, বাঁচাও, আমারে সুদ্ধু নিয়ে টানছে গো, মরি যাব, মরি যাব।

বড় টর্চের আলোয় দেখা গেল গভীর জলে খাবি খাচ্ছে চোরটা। সাঁতার না জেনে সে চুরি করতে এসেছে? পুকুরে ঝাঁপ দিল কেন?

বড়-মামা নিজেই সাঁতরে গিয়ে চোরটাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন।

তখন আর এক বিস্ময়।

এ চোর তো চেনা, সেই ভুলু মিঞা।

সে হাউ-হাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল, আমার কোনও দোষ নাই সোনাভাই, সে আমাকে টেনে এনেছে। নিজে আসি নাই। আমি বাপের জম্মে কখনো কিছু চুরি করি নাই। সে টেনে আনল জোর করে।

সে মানে কে? কে টেনে আনল?

ওই দানবটা! ওই ব্রহ্মদৈত্য।

কোনওরকমে ভুলু মিঞাকে শান্ত করার পর যা বোঝা গেল, তার কোনও মাথামুন্ডু নেই। ওই মূর্তিটা নাকি রোজই তাকে স্বপ্নে দেখা দেয়। ভয় দেখায়। আজ সে স্বপ্নে এসে বলল, কেন তুই আমাকে মাটির তলা থেকে তুলে আনলি? যেখান থেকে এনেছিলি, সেখানে রেখে আয়। নইলে তোর সর্বনাশ করব, তোর বউ-ছেলে-মেয়ে বাঁচবে না। তাই তো আমি দৌড়ে এসেছি ওঁকে পানিতে ফেলে দিতে। কিন্তু এমন নিমকহারাম, আমারেও টানছিল, আমারেও পানির নিচে নিয়ে মেরে ফেলতে চাইছিল গো! সোনাভাই আমাকে বাঁচালেন।

গরম দুধ খাইয়ে শান্ত করা হল ভুলু মিঞাকে। আর কিছু নয়, শুধু ওই পাথরের মূর্তিটাই সে চুরি করতে আসবে কেন? সাঁতার না জেনে কি কেউ জলে ঝাঁপ দেয়?

কিন্তু একটা পাথরের মূর্তিকে কেউ স্বপ্নে দেখলেও সেই মূর্তি কি ভয় দেখাতে পারে?

ছোটমামা বলল, পারবে না কেন? বেশি গাঁজা খেলেই ওরকম হয়।

পিন্টু বলল, স্বপ্ন-টপ্ন বাজে কথা। কারুর কাছ থেকে বোধহয় শুনেছে যে পুরোনো আমলের মূর্তির অনেক দাম হয়। তাই চুরি করে বেচতে চেয়েছিল।

কিন্তু পরদিন সকাল থেকে ভুলু মিঞা তার স্বপ্নের কথাই বলে বেড়াতে লাগল। সবাই বিশ্বাস করল তার কথা। সবাই ধরে নিল, দেবতা নয়, মূর্তিটা কোনও দৈত্যেরই। এবং জাগ্রত দৈত্য।

সরকারি লোকেরা আসার পর কেউ আর পুকুরে ডুব দিয়ে সে মূর্তি তুলতে রাজি হল না। সরকারি লোকেরাও আর বেশি আগ্রহ না দেখিয়ে ফিরে গেল।

এখন যারা পুকুরে স্নান করে, তারা জলে নামবার আগে একবার জাগ্রত দৈত্যের উদ্দেশে প্রণাম করে। সে অবশ্য কোনওদিন কারুর পা ধরে টানেনি।

রণজয় আর অলৌকিক শিশুরা

রণজয়ের জীবনে কোনও দিনের বেলা নেই। শুধু রাত্তির। কেননা, সারাদিন তাকে একটা অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে থাকতে হয়। কোনও মানুষের সঙ্গে দেখা হয় না। দিনের বেলা তার ওই ঘর থেকে বেরুবার উপায় নেই। বেরুবে কী করে? তাকে দেখলেই যে সবাই ভয় পায়। সেই যে একবার অন্য গ্রহের প্রাণীরা তাকে ছুঁয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে সে ক্রমাগত লম্বা হতে শুরু করেছে। এখন সে সাধারণ মানুষের প্রায় ডবল লম্বা, সব ঘরের ছাদে তার মাথা ঠুকে যায়। গায়ের রংটা আরও বেশি নীল হয়ে গেছে, চোখের মধ্যেও সাদা অংশ নেই, পুরোপুরি নীল, মাথার চুলও নীল।

তার এই প্রকাণ্ড চেহারা আর নীল রং দেখে সবাই মনে করে দৈত্য।

এক সময় তার দাদা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তখন রণজয় আশ্রয় নিয়েছিল জঙ্গলে। কিন্তু দিনের পর দিন কি কারুর জঙ্গলে থাকতে ভালো লাগে? রণজয় কিছুটা লেখাপড়া শিখেছে, তার বই পড়তে ভালো লাগে, সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে, ফুটবল খেলার খুব শখ। জঙ্গলে সেসব কিছু নেই, শুধু একঘেয়ে জীবন।

তারপর রণজয় আবার চুপি-চুপি বাড়িতে ফিরে এসে মায়ের কাছে কাকুতি-মিনতি করেছিল। মা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি অন্যাদের বলে দিয়েছেন, যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, রণজয়কে কেউ এ বাড়ি থেকে বিদায় করে দিতে পারবে না। চেহারা যেমনই হোক, তবু তো সে মায়েরই সন্তান।

কয়েকবার সে দিনের বেলা বাইরে বেরিয়েছে, কিন্তু সবাই তাকে দেখে ভয় পায়। দৌড়ে পালায়। পুলিশ ডেকে আনে। পুলিশরা তাকে গুলি করে মারতে চেষ্টা করে।

একদিন রণজয় গ্রামের বাজারের মধ্যে হঠাৎ হাজির হয়ে হাতজোড় করে করুণ গলায় বলেছিল, আপনারা আমাকে দেখে ভয় পাবেন না। আমিও আপনাদের মতন মানুষ। আমি কারুর ক্ষতি করি না। আমার চেহারা এরকম বিশ্রী হয়ে গেছে, সে তো আমার দোষ নয়।

কিন্তু রণজয়ের গলার আওয়াজটাও এমন বাজখাঁই আর ঘর্ঘরে হয়ে গেছে যে তার অনেক কথাই লোকে বুঝতে পারে না, মনে হয় যেন মেঘ ডাকছে। যেটুকু লোকে বোঝে, তাও বিশ্বাস করে না। রূপকথার গল্পে যে-রকম দৈত্যের ছবি আঁকা থাকে, রণজয়ের শরীরটা যে ঠিক সে-রকমই হয়ে গেছে। আগেকার দিনের দৈত্যগুলো বোধহয় ওই নীল গ্রহ থেকেই এসেছিল। মহাভারতে হিড়িম্বা রাক্ষসীর ছেলে যে ঘটোৎকচ, তার সঙ্গেও রণজয়ের খুব মিল।

রণজয়কে অনেকবার গুলি করে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। একদল লোক তাকে বন্দি করে রাখতে চেয়েছে চিড়িয়াখানায়। আর একবার এক সার্কাস কম্পানির মালিক তার হাত-পায়ে শেকল বেঁধে ধরে নিয়ে গিয়ে ভেবেছিল, তাকে নিয়ে সার্কাসের খেলা দেখানো হবে।

কিন্তু রণজয়কে বন্দি করে রাখা সোজা নয়। লোহার শেকল সে পটপট করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে সুতোর মতন। তার গায়ে ছুরি বেঁধে না। গুলি করলেও সে মরে না।

ওরকম অসুরের মতন শক্তি নিয়ে সে ইচ্ছে করলে অনেক কাণ্ড করতে পারত। এখানকার সব লোকদের ভয় দেখিয়ে সে থাকতে পারত রাজার মতন। টাকাওয়ালা লোকদের মারধোর করে কেড়ে নিতে পারত টাকাপয়সা। কিন্তু তার যে ওসব কিছু একেবারে ইচ্ছে করে না। অতবড় চেহারা, তবু তার মনটা যে খুব নরম। সে কারুকে আঘাত দিতে চায় না। কোনওরকম অন্যায় করতে চায় না। সে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বাঁচতে চায়।

তার সবচেয়ে বেশি দুঃখ, তার কোনও বন্ধু নেই।

দিনের বেলা তার ঘরে শুধু আসেন মা। তিনিই ওর খাবারদাবার দিয়ে যান। তার দাদার ছেলে পিকলু মাঝে-মাঝে লুকিয়ে উঁকি মারে। এ বাড়ির সবাইকে প্রতিজ্ঞা করানো হয়েছে, রণজয়ের কথা বাইরের কারুকে বলা চলবে না। পিকলুর বয়েস এগারো, সে সবসময় প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে না। ইস্কুলে কোনও ছেলের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি হলে সে চোখ পাকিয়ে বলে, জানিস, আমাদের বাড়িতে একটা পোষা দৈত্য আছে? তাকে বলে দিলে সে তোর ঘাড় মটকে দেবে। পিকলুর কথা অবশ্য কেউ বিশ্বাস করে না। সবাই হাসে।

একদিন দুপুরে মা খাবার নিয়ে এসে দেখলেন, আগের রাত্তিরের খাবার সব ঢাকা দেওয়া অবস্থায় পড়ে আছে। রণজয় ছুঁয়েও দেখেনি। সে এখন ঘুমিয়ে আছে।

রণজয়ের শরীরের মাপে খাট তো জোগাড় করা অসম্ভব, তাই সে মেঝেতেই শোয়। একদিকের দেয়ালে তার পা ঠেকে যায়, আর একদিকে মাথা। নাক দিয়ে এত জোরে নিশ্বাস বেরোয় যেন ছোটখাটো ঝড় বইছে।

মা রণজয়ের মাথার কাছে এসে বসে মাথায় হাত রেখে ডাকলেন, খোকা, এই খোকা ওঠ।

রণজয় চোখ মেলে তাকাল।

মা জিগ্যেস করল, তুই কাল রাত্তিরে কিছু খাসনি কেন? শরীর খারাপ হয়েছে? জ্বর তো নেই দেখছি।

রণজয় করুণ গলায় বলল, মা, আমার জ্বর হয় না। আমার খেতে ইচ্ছে করে না। আমার কিছুই ভালো লাগে না।

মা বললেন, খাবি না কেন? না খেলে শরীর দুর্বল হয়ে যাবে যে! ওঠ, খেয়ে নে।

রণজয় বলল, কেন আমাকে কয়েদির মতন এই ঘরের মধ্যে থাকতে হবে? আমি কী দোষ করেছি?

বাচ্চা ছেলের মতন সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

মা তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, কাঁদে না, সোনা, কেঁদে কী হবে।

তারপর নিজেই খুব জোরে কেঁদে উঠলেন। তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। রণজয়ের মাত্র একুশ বছর বয়েস, তাকে বাকি জীবন এইভাবেই কাটাতে হবে।? এই তার ভাগ্য!

মাকে কাঁদতে দেখে রণজয় নিজের কান্না থামিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল। খুব আলতো করে মায়ের একটা হাত ধরে বলল, না, না, তুমি কেঁদো না। আমি ঠিক হয়ে গেছি। একটা কিছু হবেই।

মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময় রণজয় ফিসফিস করে কথা বলে। জোরে কথা বললেই মায়ের কানে তালা লেগে যাবে। রণজয় কখনো রেগেমেগে একটা হুঙ্কার দিলে ঘরের দরজা-জানলাও কেঁপে ওঠে।

মাকে খুশি করার জন্য রণজয় শান্তভাবে সব খাবার খেয়ে নিল। সে বিশেষ কিছু খায় না। মাত্র পঞ্চাশখানা রুটি আর দশটা ডিমের ঝোল। অথবা এক হাঁড়ি ভাত আর তিনটে মুরগি।

তারপর রণজয় অপেক্ষা করে কখন দিন শেষ হয়ে রাত আসবে।

রাত্তির এগারোটার আগে সে বেরোয় না। তখন গ্রামের সব লোকই শুয়ে পড়ে। রণজয় তখন খোলামাঠে গিয়ে টাটকা বাতাসে নিশ্বাস নেয়। দৌড়োদৌড়ি করে শরীরের আড় ভাঙে। খেলা করতেও ইচ্ছে করে, কিন্তু একা-একা কি খেলা যায়?

রণজয়ের গায়ে যে কত শক্তি, তা সে নিজেই অনেক সময় মনে রাখতে পারে না। সে একটা তালগাছে হেলান দিলে গাছটা অমনি হেলে পড়ে, তাতে রণজয়ই চমকে যায়। একটা বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে সারাদিন কত লোক যাওয়া-আসা করে, কিন্তু রণজয় সেটার ওপর পা দিলেই সেটা ভেঙে পড়ে হুড়মুড়িয়ে। তখন অবশ্য রণজয়ই সেটা মেরামত করে দেয়। গ্রামের লোক অবাক হয়ে দেখে, ব্রিজটা রাতারাতি নতুন হয়ে গেছে, কে করেছে কেউ জানে না।

এ গ্রামে চুরি কিংবা ডাকাতি অনেক দিন বন্ধ। চোর বা ডাকাতরা আসবে কী করে, সারারাত ধরে রণজয়ই তো পাহারা দেয় গ্রামটা। একবার সে একটা ডাকাত দলের পাঁচ জনকে ধরে-ধরে নদীর জলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল।

রণজয়ের এক বন্ধু ছিল, তার নাম গুটুলি। সে দারুণ বেঁটে, মাত্র চার ফুট, কিন্তু খুব বুদ্ধি। সেই যে একবার অন্য গ্রহের প্রাণীরা ধরে নিয়ে গেল রণজয়কে, সেখান থেকে ফিরে আসার পর সে আর গুটুলিকে খুঁজে পায়নি। সেই গুটুলির জন্যে তার এখনও মন কেমন করে।

রণজয়ের সন্দেহ হয়, অন্য গ্রহের প্রাণীরা মাঝে-মাঝেই পৃথিবীতে আসে। তারা

পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে চায় না, দেখাও দিতে চায় না, আসে খুব গোপনে। রাত্তিরে তারা ঘুরে বেড়ায়। কিছু-কিছু জিনিস চুরি করেও নিয়ে যায়।

পুকুর কিংবা নদীর জল কমে গেলে মানুষ অবাক হয় না। সবাই ভাবে, একটা সময় পুকুর-নদী শুকিয়ে যায়, আবার ভরে যায় বর্ষাকালে।

রণজয়দের গ্রামের পাশে ছোট নদীটার নাম সরলা। এই নদীতেই রণজয় সাঁতার শিখেছে, এই নদীকে সে খুব ভালোবাসে। এক-এক রাত্তিরে সে এই নদীর ধারে এসে বসে থাকে। নদীর স্রোতের কুলুকুলু শব্দ ঠিক যেন, গানের মতন মনে হয়।

এক রাত্তিরে রণজয় দেখল, নদীর জল এক জায়গায় ফোয়ারার মতন হয়ে গেছে। ক্রমে ফোয়ারাটা উঁচু হতে লাগল, অনেক উঁচু। রণজয় ঘাড় তুলে দেখতে লাগল, ফোয়ারাটা উঁচু হতে-হতে যেন আকাশের মেঘ ছুঁয়ে ফেলেছে। হঠাৎ এক সময় সেটা থেমে গেল।

এটা কী হল? নিশ্চয়ই কেউ জল চুরি করছে। আকাশের অনেক গ্রহ-উপগ্রহেই এখনও জলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সেখানে যদি কোনও প্রাণী থাকে, তারা কি মাঝে-মাঝে পৃথিবী থেকে জল চুরি করতে আসে? এইরকম পৃথিবীর অনেক নদী থেকে যদি খানিকটা করে জল নিয়ে নেয়, তাহলে মানুষ টেরও পাবে না।

আর এক রাত্তিরে একটা মাঠের মধ্যে এসে রণজয় চমকে গেল। গত রাতেও মাঠটা ঘাসে ভরা ছিল। রণজয় তো জুতো পরে না, অত বড় পায়ের মাপে জুতো পাবে কোথায়? খালি পায়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটলে বেশ আরাম হয়। কিন্তু আজ রাতে সে মাঠে একটুও ঘাস নেই। যেন গোটা মাঠের ঘাস কেউ চেঁছে নিয়ে গেছে।

ঘাস তো খায় গরু-ছাগলে? অন্য কেউ ঘাস চুরি করবে কেন? কিন্তু এক রাতে এত বড় মাঠটার সব ঘাস চেঁছে নেওয়া তো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়!

আরও চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল দু-রাত্তির পরে।

রাত তখন দুটো-তিনটে হবে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। চতুর্দিকে ফটফট করছে জ্যোৎস্না। গুন-গুন করে গান গাইতে-গাইতে রণজয় হাঁটছে নদীর ধার দিয়ে। হঠাৎ এক জায়গায় সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাঙা মন্দিরের পাশে একটা জবা ফুলের গাছ চলতে শুরু করেছে। রণজয় কি ভুল দেখছে? গাছ কখনো চলতে পারে নাকি? চোখ রগড়ে রণজয় আবার ভালো করে দেখল?

গাছ তো নয়, একটা ভেড়া।

এখানে কোনও জবা ফুলের গাছ ছিল আগে দেখেনি রণজয়। জায়গাটা তার খুব চেনা। কিন্তু প্রথমে সে একটা জবা ফুলের গাছ দেখল, তারপর সেটা ভেড়া হয়ে গেল। এ কি ম্যাজিক নাকি? হঠাৎ এখানে একটা ভেড়া এলই বা কী করে?

ভেড়াটা মনের আনন্দে লাফাচ্ছে। রণজয় কৌতূহলী হয়ে চলল তার পেছন-পেছন। সাদা ধপধপে ভেড়া। একটু পরে সেটা হয়ে গেল নীল।

রণজয় লম্বা হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেলল ভেড়াটাকে।

সঙ্গে-সঙ্গে সেটা হয়ে গেল একটা বাচ্চা মেয়ে। এক বছরের শিশুর মতন। টলটলে দুটো চোখ। ঠোঁটে হাসি মাখা।

রণজয় জিগ্যেস করল, এই, তুই কে রে? তোর নাম কী?

বাচ্চা মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল।

তারপরই কে যেন রণজয়ের চুল ধরে টেনে তুলল মাটি থেকে। মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে, গাছপালা ছাড়িয়ে, অনেক ওপরে সে উঠে গেল। দুলতে লাগল শূন্যে।

এই অবস্থায় তাকে যে-কেউ দেখলে নির্ঘাৎ দৈত্য ভাববেই। অতবড় চেহারা নিয়ে সে যেন উড়ে আসছে আকাশপথে।

দৈত্যের বুক কিন্তু ভয়ে ধড়াস-ধড়াস করছে।

কে তাকে টেনে ধরল এইভাবে? শূন্যে সে ঝুলছেই বা কী করে?

রণজয় মাধ্যাকর্ষণের কথা জানে। কোনও মানুষ এক লাফে যতই ওপরে উঠুক, আবার সে ধপাস করে মাটিতে পড়বেই। মানুষের পক্ষে শূন্যে ঝুলে থাকা অসম্ভব। তার মানে, কেউ তাকে অদৃশ্য সুতো বা রশ্মি দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

বাচ্চাটাকে সে শক্ত করে ধরে আছে, যাতে হাত থেকে ফসকে না যায়। যদি অদৃশ্য সুতোটা ছিঁড়ে যায়, তা হলে রণজয়ও এত উঁচু থেকে পড়লে হাত-পা ভেঙে মরবে।

এরপর কেউ যেন তাকে বলল, বাচ্চাটাকে ছেড়ে দাও।

বলল মানে কী, কারুকে দেখাও গেল না, কোনও আওয়াজও শোনা গেল না. রণজয় নিজের মাথার মধ্যে ওই কথা শুনল।

রণজয় জিগ্যেস করল, তুমি কে?

মাথার মধ্যে উত্তর শুনল, তা জানবার দরকার নেই। তুমি বাচ্চাটাকে ছেড়ে দাও।

রণজয় বলল, এখান থেকে ছেড়ে দিলে ও নিচে পড়ে যাবে যে।

মাথার মধ্যে আবার শুনল, তা তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি ছেড়ে দাও।

রণজয় বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে সেই বাচ্চাটা উড়তে লাগল পাখির মতন। ঠিক যেমন দেবদূতের ছবি দেখা যায়। উড়তে-উড়তে সে মিলিয়ে গেল।

রণজয়ও নামতে লাগল আস্তে-আস্তে। কেউ যেন সুতো ঝুলিয়ে তাকে নামিয়ে দিচ্ছে। তার পা মাটিতে লাগতেই সে শুয়ে পড়ল। ভয়ে এখনও তার বুক ধক-ধক করছে।

এসব কথা তো কারুকে বলাও যাবে না। কেউ বিশ্বাস করবে না।

আরও কয়েক রাত পরে রণজয় ওইরকম বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দেখতে পেল অনেকগুলো। এক বছরের শিশুর মতন, কিন্তু হাঁটতে পারে, দৌড়তে পারে। যখন-তখন তারা গাছ হয়ে যায়, ভেড়া কিংবা বিড়াল হয়, কিংবা পাখির মতন ওড়ে।

রণজয় বুঝতে পারল, এরা নিশ্চিত অন্য গ্রহ থেকে আসে। আমাদের মা-বাবারা যেমন বাচ্চাদের পার্কে বেড়াতে নিয়ে যায়, সেইরকম সেই গ্রহের মা-বাবারাও তাদের ছেলেমেয়েদের পৃথিবীতে বেড়াতে আনে। এরকম গাছপালা, নদী বোধহয় তাদের গ্রহে

নেই। বাচ্চারা এখানে মনের আনন্দে খেলা করে। ওরা ইচ্ছেমতন চেহারা পালটায়। ওটাই ওদের খেলা।

রণজয় আড়াল থেকে বাচ্চাগুলোর খেলা দেখে। কারুকে ছোঁয় না। বাপরে বাপ, একবার একজনকে ধরে প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ওদের সভ্যতা অনেক উন্নত, ওরা মাধ্যাকর্ষণ জয় করতে পারে।

উন্নত সভ্যতা হলেও ওরা পৃথিবীর কোনও ক্ষতি করতে চায় না। কিছু-কিছু জল নিয়ে যায়, ঘাস নিয়ে যায়, আরও অন্য কোনও জিনিসও বোধহয় নিয়ে যায়, তার বদলে কিছু দিয়ে যায় কিনা কে জানে। মায়ের কাছে রণজয় শুনেছে যে এবারে এদিকে খুব ভালো ধান হয়েছে, আমও হয়েছে প্রচুর, হয়তো এ সবের জন্যে, অন্য গ্রহের প্রাণীদের কিছু কৃতিত্ব আছে।

কিছু দিক বা না দিক, ওদের আটকাবার ক্ষমতা তো রণজয়ের নেই। একবার যদি শূন্যে তুলে নিয়ে আছাড় দেয় তা হলেই শেষ। রণজয় আর ওদের ঘাঁটাতে চায় না।

বাচ্চাগুলোর খেলা দেখতে তার খুব ভালো লাগে।

ওদের মা-বাবাদের কিন্তু দেখতে পায় না রণজয়। নিশ্চয়ই বাচ্চাগুলোকে পাহারা দেয় কেউ না কেউ। তারা কি অদৃশ্য হয়ে থাকে?

পৃথিবীর কোনও লোকই জানে না গভীর রাতে, এখানকার বনে-জঙ্গলে, নদীর ধারে কতকগুলো ফুটফুটে শিশু খেলা করে, লাফায়, খলখল করে হাসে। আহা, ওরা কেন আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব করে নেয় না!

রণজয় লক্ষ করেছে, ওদের সবকটি শিশুই সমান। এক বছর বয়েস বলে মনে হয়, কেউ ছোট বা বড় নয়।

মাঝে-মাঝে রাত্তিরে খুব বৃষ্টি হয়। সারাদিন ঘরে বন্দি থাকে, তাই বৃষ্টি হোক বা না হোক, রাত্তিরে রণজয় বাইরে বেরুবেই। খুব ঝমঝমে বৃষ্টি হলে সে ভাঙা মন্দিরটার মধ্যে ঢুকে বসে থাকে। এই মন্দিরে কোনও ঠাকুর নেই, বহুদিন ব্যবহার হয়নি, দিন-দিন আরও ভাঙছে।

একদিন প্রায় দু-ঘণ্টা টানা খুব তেড়ে বৃষ্টি হল।

তারপর বৃষ্টি খানিকটা কমল বটে, কিন্তু একেবারে থামল না। মন্দিরে আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না, রণজয় বেরিয়ে পড়ল।

খানিকটা যাওয়ার পর এক ধরনের কুঁ-কুঁ শব্দ শুনে সে থমকে গেল।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা ঝোপের পাশে কী যেন নড়ছে।

কাছে গিয়ে দারুণ চমকে গেল। অন্য গ্রহের যেসব বাচ্চাদের সে দেখে, তাদেরই একটি। কিন্তু এ আবার আর্ধেকটা মেয়ের মতন, অর্ধেকটা পাখি। মুখটা মেয়ে। একটা হাতও ঠিক আছে, আর একটা হাত ডানার মতন, গাটা পাখির মতন, আবার পা দুটো ঠিক আছে। এ আবার কী কিম্ভূতকিমাকার চেহারা। সেটা একটু-একটু নড়ছে। আর কুঁ-কুঁ শব্দ করছে।

একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রণজয় ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারল।

বৃষ্টির জন্য অন্য বাচ্চাগুলো ফিরে গেছে। শুধু এই একটা যেতে পারেনি। ওদের পাহারাদার কি এর কথা ভুলে গেছে? এরকম ভুল তো হতেই পারে। এই বাচ্চাটাও পাখি হতে গিয়ে আটকে গেছে মাঝপথে। কোনও কারণে চেহারা বদলাবার ক্ষমতাও কাজ করছে না। তাই উড়ে যেতেও পারছে না।

কাছে গিয়ে রণজয় ভালো করে দেখল, বাচ্চাটা বৃষ্টিতে দারুণ ভিজেছে। সেই জন্যেই কাঁদছে?

এত বষ্টিতে ভিজলে মানুষদের ওইটুকু বাচ্চা ঠান্ডা লেগে মরে যেতে পারে। ওদেরও কি এমন ঠান্ডা লাগে?

ওঁকে ছুঁতে রণজয়ের ভয় করছে। আবার মায়াও হচ্ছে খুব।

দোনামোনা করতে-করতে সে বাচ্চাটাকে তুলেই নিল দু-হাতে। একটু অপেক্ষা করল। কেউ তাকে এবার চুলের মুঠি ধবে শূন্যে তুলে নিল না।

অন্যদিন বাচ্চাটা হাসছিল। দেখলে এই আর্ধেক মেয়ে-আর্ধেক পাখিটার ঠোঁট কুঁকড়ে গেছে, দু-চোখে ভয়ের চিহ্ন। এমন কাঁপছে, যেন মরেই যাবে।

বাচ্চাটাকে সাবধানে ধরে, রণজয় লম্বা এক দৌড়ে চলে এল নিজের ঘরে। বাচ্চাটাকে বিছানায় শুইয়ে সে তাড়াতাড়ি হারিকেন জ্বালল। তারপর এক টুকরো কাপড় সেই হারিকেনের গায়ে লাগিয়ে গরম করে সেঁক দিতে লাগল বাচ্চাটার গায়ে।

আস্তে-আস্তে বাচ্চাটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। রণজয়ের চোখের সামনে তার আর্ধেক পাখির ভাবটা মিলিয়ে গেল, সে হয়ে উঠল পুরোপুরি একটা বাচ্চা মেয়ে। রাত্তিরে খাবারের সঙ্গে রণজয়কে বড় এক বাটি দুধও দেওয়া হয়। দুধ খেতে তার ভালো লাগে না। তাই রোজ খায় না। আজকের দুধটা রাখা আছে। বাটিটা নিয়ে এসে রণজয় জিগ্যেস করল, কী রে সোনামণি, একটুখানি দুধ খাবি নাকি?

বাচ্চাটা কোনও উত্তর দেয় না। শুধু অবাক-অবাক চোখে চেয়ে রইল রণজয়ের দিকে—তার মুখের কাছে বাটিটা আনতেই সে দিব্যি চুক-চুক করে দুধ খেতে লাগল।

এবারে কী করা যায়?

বাচ্চাটাকে বাড়িতেই রেখে দিলে কেমন হয়? তার দাদার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলবে। তারপরেই ভাবল. সেটা খুব বিপজ্জনক। ওর অভিভাবকরা খুঁজে বার করবেই। তারপর কী ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবে কে জানে!

তার চেয়ে যেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছে, সেখানে রেখে আসাই ভালো।

বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, চল. বাড়ি যাবি?

বাইরে এসে দেখল, বৃষ্টি একেবারে থেমেছে এতক্ষণে। রাতও প্রায় শেষ।

কয়েক পা হাঁটতে না হাঁটতেই হঠাৎ খুব ঝড় উঠল। নুয়ে-নুয়ে পড়তে লাগল গাছপালা। ঘন-ঘন চমকাতে লাগল বিদ্যুৎ। রণজয় আবার ঘরে ফিরে যাবে কি যাবে না ভাবছে, একটা বিদ্যুতের শিখা সোজা নেমে এল তার·দিকে। বাচ্চাটাকে তার হাত থেকে তুলে নিয়ে আবার ওপর দিকে ঘুরে চলে গেল। ঝড়ও থেকে গেল তক্ষুনি।

রণজয় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমি তো ফেরৎ দিতে যাচ্ছিলাম, অত ঝড়-বিদ্যুৎ তোলার কি দরকার ছিল?

হাঁটতে-হাঁটতে শিবমন্দিরটার সামনে পৌঁছতেই সে দেখল, আকাশ থেকে একটা আলোর বিন্দু নেমে আসছে। তার খুব কাছে এসে সেটা শূন্যে দুলতে লাগল। যদিও সেটা একটা ছোট বালবের মতন, কিন্তু মনে হয় যেন জীবন্ত। যেন কিছু বলতে চায়। কিন্তু রণজয় তার মাথার মধ্যে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

বেশ জোরে-জোরেই রণজয় বলল, তুমি আবার কী চাও?

আলোটা দুলে উঠল।

রণজয় বুঝতে পারল না, বাচ্চাটাকে নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এরা কি তার ওপর রাগ করেছে, না কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়? কৃতজ্ঞতা জানানোই তো উচিত, সে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে তুলেছে।

অবশ্য মানুষ যাকে কৃতজ্ঞতা বলে ওরা কি সেরকম কিছু বোঝে? ওদের ভাবনা হয়তো অন্যরকম।

রণজয় শিবমন্দিরটার ভেতর ঢুকে দাঁড়াল, যাতে কোনও সুতো বা রশ্মি দিয়ে বেঁধে তাকে ওপরে না তুলতে পারে। ছাদ ফুঁড়ে তো আর তুলতে পারবে না। সে বুঝে গেছে, এদের কাছে গায়ের জোর দেখিয়েও কোনও লাভ নেই।

সেই আলোটা কিন্তু যাচ্ছে না, ঠিক যেন তার দিকে একটা চোখ তাকিয়ে আছে।

রণজয় হাতজোড় করে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের কোনও ক্ষতি করব না। তোমাদের বাচ্চারা এখানে খেলা করতে আসে, আমি ধরব না কারুকে।

এবার রণজয় তার মাথার মধ্যে শুনতে পেল, কে যেন বলছে, তুমি আমাদের গ্রহে যাবে? তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। তুমি আমাদের একটি শিশুকে বাঁচিয়েছ, তোমাকে আমরা ওখানে অনেক যত্নে রাখব।

রণজয় বলে উঠল, না, না, না। আমি আর অন্য কোথাও যেতে চাই না। এর আগে দুবার আমাকে যেতে হয়েছে। আমার সহ্য হয়নি। আমার এই পৃথিবীই ভালো।

এবার আলোটা মিলিয়ে গেল শূন্যে।

তারপর মনে হল, আকাশ থেকে থোকা-থোকা ফুলের মতন কী যেন নামছে। আরও কাছে এলে দেখা গেল, ফুল নয়, বাচ্চা ছেলে-মেয়ে। সকলের মুখে হাসি। তারা রণজয়কে ঘিরে নাচতে লাগল হাত তুলে তুলে।

ঠিক যেন দেবশিশু। সত্যি, এরাই কি দেবশিশু? কী সুন্দর দেখতে বাচ্চাগুলোকে। হাসছে, লাফাচ্ছে।

রণজয়ের মনে হল, এত সুন্দর দৃশ্য সে সারা জীবনে আর দেখেনি।

ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই বাচ্চাগুলো সব উড়ে গেল পাখি হয়ে।

তাহলে ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে মানুষ যে পাখির গান শোনে চতুর্দিকে, তার সবগুলো কি সত্যিই পাখি, নাকি এরকম কিছু দেবশিশু মিশে থাকে পাখিদের মধ্যে?

হতেও তো পারে।

পঞ্চমশক্তি

বিকেলবেলাটা যে এমন সুন্দর ঝকঝকে হয়ে উঠবে, আশাই করিনি। সকাল থেকে ছিল একঘেয়ে বৃষ্টি আর কুয়াশা। আর সে কী ঘন কুয়াশা! আমাদের দেশে এমন কুয়াশা কখনও দেখিনি। চার-পাঁচ হাত দূর থেকে একটা গাড়ি চলে গেলেও বোঝা যায় না।

ছুটির দিন। ভাস্কর আমাকে এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছিল! কিন্তু সকাল বেলা ওইরকম আবহাওয়া দেখে মনে হয়েছিল, এর মধ্যে আর কোথাও বেরুনো যাবে না। তিনদিন আগে আমি ভাস্করের লন্ডনের বাড়িতে পৌঁছেছি, কোথাও ঘোরাঘুরি করা হয়নি, শুধু আড্ডাই চলছে বাড়িতে বসে-বসে।

বিকেলবেলা রোদ উঠল, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

ভাস্কর বললে, চল, তা হলে বেরিয়ে পড়া যাক। সবাই তো বিলেতে এসে রাজা-রানির বাড়ি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম আর মাদাম তুসোর মোমের পুতুলগুলো দেখে। তোকে আমি এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে সাধারণত কেউ যায় না। সারাজীবন সে জায়গাটার কথা ভুলতে পারবি না।

আমি জিগ্যেস করলাম, কোন জায়গা?

ভাস্কর রহস্যময় ভাবে হেসে বললে, এখন বলব না। আগে চল তো।

গ্যারাজ থেকে ভাস্কর ওর লাল রঙের গাড়িটা বার করল। আমি ওর পাশে বসে সীট-বেল্ট বেঁধে নিলুম।

রোদ উঠেছে বলে রাস্তায় একসঙ্গে অনেক গাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। এ দেশে রোদ খুব বেশি দিন দেখা যায় না বলে এ দেশের লোকেরা এমন দিনে বাড়িতে বসে থাকতে চায় না।

এইরকম দিনে ট্রাফিক জ্যামও হয় খুব।

ভাস্করের খুব জোরে গাড়ি চালানো অভ্যেস। জ্যামে আটকে পড়লে ও খুব অস্থির হয়ে ওঠে।

আমি এদেশে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসেছি। আমার কোনও ব্যস্ততা নেই। এদেশে তো আর গাড়ির মধ্যে বসে থাকলেও গরম লাগে না। বাইরে ফিনফিনে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আমাদের দুজনের গায়েই ওভার কোট।

হাইওয়েতে পড়তে-পড়তেই অনেকটা সময় লেগে গেল। তারপর গাড়িটা ছুটল সত্তর মাইল স্পিডে।

এক জায়গায় লেখা লিঙ্কনশায়ার। ভাস্কর বড় রাস্তা ছেড়ে গাড়িটা বেঁকিয়ে দিল সেদিকে। এর মধ্যেই প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে।

আমি জিগ্যেস করলুম, লিঙ্কনশায়ারে কী আছে? তা ছাড়া সন্ধে হয়ে গেল, এখন আর কিছু কি দেখা যাবে?

ভাস্কর বলল, আমরা যাচ্ছি একটা গাছ দেখতে। সন্ধে হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই।

আমি অবাক হয়ে বললুম, একটা গাছ দেখতে এত দূর আসা?

ভাস্কর বলল, 'উলসথ্রপ' ম্যানর', এই নামটা কি তোর চেনা-চেনা মনে হচ্ছে?

আমি দুবার উচ্চারণ করলুম, উলসথ্রপ ম্যানর! উলসথ্রপ ম্যানর! একটু যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় শুনেছি বা পড়েছি এই নামটা, তা মনে পড়ল না।

ভাস্কর বলল, তুই ভুলে গেছিস। কলেজ-জীবনে তুই-ই আমাকে একখানা বই পড়তে দিয়েছিলি।

গাড়িখানা এসে থামল খুব পুরোনো আমলের একটা বাড়ির সামনে। পেছন দিকে একটা বাগান।

ভাস্কর কিন্তু বাড়িটার গেটের দিকে গেল না। আমাকে বলল, চল, আগে বাগানটা দেখে আসি। পেছন দিকে একটা গেট আছে আমি জানি!

আমি মনে-মনে খানিকটা হতাশই হয়ে উঠেছিলুম। এ কোথায় নিয়ে এল ভাস্কর? একটা অতি সাধারণ পুরোনো বাড়ি, আর বাগানটাও এমন কিছু না? এই দেখতে এত দূর আসা?

বাগানের মধ্যে ঢুকে একটা বেঁটে মতন গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভাস্কর প্রথমে বড় একটা নিশ্বাস টেনে বলল, আঃ!

তারপর সেই গাছতলায় কী যেন খুঁজতে লাগল।

আমি জিগ্যেস করলুম, এটা কী গাছ রে?

ভাস্কর বলল, এখনও চিনতে পারছিস না? এটা একটা আপেল গাছ। মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত দুটো গাছের মধ্যে এটা একটা।

আমি তখনও বুঝতে না পেরে বললুম, সবচেয়ে বিখ্যাত দুটো গাছ? কোনটা-কোনটা?

ভাস্কর এবার সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললে, কলেজে পড়ায় সময় তুই আমাকে সবসময় জ্ঞান দিতিস! এবার চান্স পেয়ে আমি তোকে একটা জ্ঞান দিই? ইতিহাসের অতি বিখ্যাত গাছ একটা হচ্ছে, যে গাছের নীচে বসে কপিলাবস্তুর এক রাজকুমার, তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ, তিনি গৌতম বুদ্ধ হয়েছিলেন। সেটার নাম হচ্ছে বোধিবৃক্ষ। সেই গাছটা আছে বিহারের বোধ গয়ায়। আর এটা হচ্ছে নিউটনের আপেল গাছ।

তখনই আমার মনে পড়ে গেল। উলসথ্রপ ম্যানর হচ্ছে নিউটনের জন্মস্থান।

মনে পড়ল এবং সঙ্গে-সঙ্গে আমার সারা শরীরে একটা রোমাঞ্চ হল। এই সেই আপেল গাছ? এই বাগানে নিউটন শুয়েছিলেন একদিন। হঠাৎ গাছ থেকে একটা আপেল খসে পড়ল মাটিতে। নিউটন সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। গাছের ফল সবসময় সোজা পড়ে মাটিতে। কখনো ডানদিকে কিংবা বাঁদিকে বেঁকে যায় না। পৃথিবীর কেন্দ্রের একটা শক্তি তাকে টানে।

সেই থেকে তিনি আবিষ্কার করলেন গ্র্যাভিটেশান, অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব!

কী বিরাট সেই আবিষ্কার! এই প্রকৃতির অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা গেল ওই

মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব দিয়ে। চাঁদটা পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে ওই জন্যে। চাঁদ আর পৃথিবী একসঙ্গে সূর্যের চারপাশে বছর-বছর একইরকম ভাবে ঘুরছে ওই জন্যে। আবার সব কটা গ্রহ নিয়ে সূর্যও ঘুরছে এই গ্যালাক্সিতে, আবার এই মহাবিশ্বে, অনন্ত আকাশে সমস্ত গ্রহ-তারাপুঞ্জই পরস্পরকে এইভাবে টেনে রেখেছে।

আমার ঘোর ভাঙিয়ে দিয়ে ভাস্কর বললে, নিউটন জন্মেছিলেন ১৬৪২ সালে। অতদিন একটা আপেল গাছ তো আর বাঁচে না। আসল গাছটার ডাল কেটে কেটে গ্র্যাফটিং করে করে গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। এটার কথা অনেকেই জানে না।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভাস্কর মাটি থেকে একটা আপেল কুড়িয়ে আনল।

এখন আপেল পাকবার সময় হয়েছে। আপেল এত সস্তা যে অনেকেই খেতে চায় না। এরকম গাছ থেকে অনেক আপেল খসে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে এদেশে।

ভাস্কর আপেলটায় এক কামড় দিয়ে বলল, এঃ, বাজে খেতে! নিউটন নিশ্চয়ই এ আপেল খাননি কখনো।

আমিও আপেলটার অন্য দিকে একটা কামড় দিয়ে দেখলুম, সত্যিই কষা-কষা স্বাদ। গন্ধটাও ভালো না।

একটা সাধারণ আপেল গাছ বিজ্ঞানের কী বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে।

বাগানের একপাশে আরও কয়েকজন লোক রয়েছে। তার মধ্যে একজন বসে আছে একটা হুইল চেয়ারে। কম্বল দিয়ে গা ঢাকা। খুব কাশছে লোকটি। মনে হয় খুবই অসুস্থ। এই ঠান্ডার মধ্যে একজন অসুস্থ লোককে এখানে নিয়ে এসেছে কেন কে জানে!

আরও একটুক্ষণ বাগানে কাটিয়ে, বাড়িটা ঘুরে দেখে আমরা বেরিয়ে এলাম। আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। এদেশের আবহাওয়া এরকমই! কখন যে রোদ উঠবে, আর কখন তুষারপাত শুরু হবে, তার কোনও ঠিক নেই।

গাড়িতে উঠে ভাস্কর বলল, আজ রাতে লন্ডনে না ফিরে গিয়ে একটা কাজ করা যেতে পারে। এখানেই রাতটা থেকে যাবি? এখানে বেশ সুন্দর ছোট্ট-ছোট্ট সরাইখানা আছে।

আমার কোনও আপত্তি নেই। ভালোই হবে, একটা বিলিতি সরাইখানায় থাকার অভিজ্ঞতা হবে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ভাস্কর বলল, কলেজে পড়ার সময় তুই আমাকে আইজ্যাক নিউটনের একটা জীবনী পড়তে দিয়েছিলি। তখনকার একটা ঘটনা আমার মনে আছে। বইখানা একবার আমার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। আমি ঝুঁকে বইখানা বাঁ-হাতে দিয়ে তুললাম। তুই তখন বললি, এই ভাস্কর, তুই এই যে অবহেলায় বাঁ হাত দিয়ে বইটা তুললি, তার মানে তুই এই পৃথিবীর পুরো মাধ্যাকর্ষণ টান অগ্রাহ্য করলি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টান হচ্ছে, ৬,০০০,০০০,০০০, ০০০.০০০,০০০,০০০,০০০ কিলোগ্রাম; কতগুলো শূন্য, তোর মনে আছে, সুনীল?

আমি হাসতে-হাসতে বললুম, না রে! মনে নেই টাটকা-টাটকা বইখানা পড়ছিলুম তো। তোর তো বেশ মনে থাকে দেখছি!

ভাস্কর বলল, সেই থেকে আমি নিউটনের ভক্ত হয়ে গেছি। এখন সময় পেলেই

বিজ্ঞানের বই আর পত্র-পত্রিকা পড়ি। নিউটনের সম্পর্কে নতুন কিছু বেরুলে কেটে রেখে দিই।

আমরা এসে উঠলুম ছোট্ট একটা সরাইখানায়। ওপর নিচে চারখানা মেটে ঘর। প্রত্যেকটা ঘর ভারি চমৎকার সাজানো। দেখলে মনে হয়, দুশো-তিনশো বছর আগেকার ইংল্যান্ড। এক কোণে ফায়ার প্লেস জ্বলছে। দেয়ালে পুরোনো আমলের ছবি। ম্যান্টলসিপের ওপর দুটি ছোট-ছোট শ্বেতপাথরের মূর্তি। একটা গ্যালিলিও আর একটা নিউটনের। গ্যালিলিও যেদিন মারা যান, সেদিনই নিউটন জন্মেছিলেন। কী আশ্চর্য যোগাযোগ। বিজ্ঞানের জগতে এঁরা যেন পিতা আর পুত্র।

আমাকে ঘরে বসিয়ে রেখে ভাস্কর নিচে গেল খাবার -দাবারের কথা বলে আসতে। অন্য হোটেলের মতন এখানে কোনও বেয়ারা নেই, বেল দিয়ে কাউকে ডাকা যায় না। এক স্বামী-স্ত্রী সরাইখানাটি চালান, কিছু দরকার হলে তাঁদের কাছ থেকে চেয়ে আনতে হয়।

ভাস্কর ফিরল বেশ দেরি করে।

চোখ বড়-বড় করে বলল, নিউটনের বাড়ির বাগানে আমরা যে হুইল চেয়ারে বসা একজন অসুস্থ লোককে দেখলুম, সেই লোকটিও এই জায়গায় এসে উঠেছে। উনি কে জানিস? উনি হলেন জেমস পেট্রেল!

আমি জিগ্যেস করলুম, তিনি কে ভাই?

ভাস্কর বলল, তুই জেমস পেট্রেল-এর নাম শুনিসনি?

আমি আবার দুদিকে মাথা নাড়ালুম।

ভাস্কর বলল, তুই এফ্রাইস ফিসবাখ-এর নাম শুনেছিস নিশ্চয়ই!

আমি কাঁচুমাচু মুখে বললুম, তাও শুনিনি রে! এরা খুব বিখ্যাত লোক বুঝি?

ভাস্কর বলল, এফ্রাইস ফিসবাখ বিজ্ঞানের জগতে একটা ঝড় তুলে দিয়েছেন। আমেরিকার ইন্ডিয়ানাতে পারভিউ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটা পরীক্ষা করে নিউটনের থিয়োরিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। এঁরা দাবি করেছেন যে প্রকৃতিকে একটা পঞ্চম শক্তি আছে।

আমি বলুলম, পঞ্চম শক্তিটাই বা কী ব্যাপার? আমার ঠিক ধারণা নেই রে! আমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম না?

ভাস্কর ধমক দিয়ে বললে, আজকাল সবকিছু বিজ্ঞানের খবর রাখা উচিত। বিজ্ঞানের জোরেই মানুষের শক্তি আজ কোথায় পৌঁছেছে। প্রকৃতির যে চারটি শক্তি প্রকাশিত হয়ে গেছে, তা তুই জানিস তো।

আমি বললুম, এক সময় পড়েছিলুম বটে, ভালো মনে নেই। একটু সোজা করে বুঝিয়ে দে।

ভাস্কর বলল, প্রথমটাই হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এই যে একটা জিনিস আর একটা জিনিসকে টানছে, কিন্তু কীভাবে টানছে তা আজও ভালো করে বোঝা যায়নি। দ্বিতীয় হল ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম তার মানে বিদ্যুত-চুম্বক আলো একসঙ্গে। তৃতীয় হচ্ছে সেই প্রবল শক্তি যা, পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলোকে একসঙ্গে ধরে রাখে, আর চতুর্থ হল রেডিও অ্যাকটিভ ধ্বংসের যে শক্তি।

আমি বললুম, আর একটু সহজ করে বোঝানো যায় না?

ভাস্কর বললে, আর বোঝাতে পারছি না। বই দেব, পড়ে নিস। এবার আসল কথাটা শোন। ওই ফিসবাখ দাবি করেছেন, মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত আর একটা শক্তি আছে। অ্যান্টি গ্যাভিটি ফোর্স। সেই পঞ্চম শক্তি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা চলছে। এখনও পুরোপুরি কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। জেমস পেট্রোল কিছুদিন আগে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি প্রমাণ করে দেখিয়ে দেবেন! কিন্তু তারপরেই ভদ্রলোক দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বোধহয় বাঁচবেন না।

অ্যান্টি গ্র্যাভিটি ফোর্সটা ঠিক কীরকম বলত?

খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি! এক্ষুনি আমাদের নিচে খেতে যেতে হবে। পরে আর খাবার পাওয়া যাবে না। চল। যেতে-যেতে বলি। মনে কর, একটা কাঠের বল আর একটা লোহার বল, এ দুটোকে যদি ওপর থেকে ফেলা যায়, তা হলে কোনটা আগে নিচে পড়বে?

এটা আমি জানি ভাই। গ্যালিলিওর এক্সপেরিমেন্টের মতন! লোহার বলটা ভারি বলে আগে পড়বে বলে মনে হয়। কিন্তু কোনও বায়ুশূন্য জায়গা থেকে যদি ফেলা যায়, তা হলে দুটোই একসঙ্গে নামবে। কারণ, মাধ্যাকর্ষণ দুটোকেই সমানভাবে টানছে।

এতদিন লোকে তাই জানত। কিন্তু এখন কিছু-কিছু বৈজ্ঞানিক বলছেন, সবসময় দুটো সমান ভাবে নাও পড়তে পারে। মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত একটা কোনও শক্তি আছে, যা কোনও-কোনও জিনিসকে ওপর দিকে টানে।

এসব আমার মাথায় ঢুকছে না। তা ওই জেমস পেট্রেল নামে বৈজ্ঞানিকটি অসুস্থ অবস্থায় এখানে এসেছেন কেন?

সঙ্গে ওর স্ত্রী এসেছেন। আরও দুজন শিষ্য এসেছেন। ওঁদের কাছে শুনলাম, জেমস পেট্রেল, নিউটনের থিয়োরির খুঁত ধরে যে প্রমাণ দেবেন, তা এখানেই ওই আপেল গাছের তলাতেই দেখাতে চেয়েছিলেন। তাহলে সারা পৃথিবীতে ওঁর নাম ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু উনি সে সময় পেলেন না। পরীক্ষা সম্পূর্ণ হল না। তাই উনি নিউটনের কাছে হার স্বীকার করে এখানে মরতে এসেছেন।

আহা রে!

আমরা নেমে এলাম খাওয়ার ঘরে।

এখানে তিনটি টেবিল। এর পাশের টেবিলে হুইল চেয়ার নিয়েই বসেছেন জেমস পেট্রেল, তাঁর পাশে তাঁর স্ত্রী, আর দুজন লোক। পর দিকের টেবিলে বসে আছে একা একজন মানুষ। খানিকটা পাশ ফিরে তার মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু মাথা ভর্তি-চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছ, বিচারকদের উইমার মতন।

মাঝখানের টেবিলটা খালি, আমরা বসলাম সেখানে।

খাবার-দাবার আগে থেকেই সাজানো রয়েছে টেবিলের ওপর। আমরা কৌতূহলী হয়ে দেখতে পেলাম জেমস পেট্রেলকে। ওর মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে, কিছুই খেতে পারলেন। না। বোঝা যাচ্ছে অবস্থা খুবই খারাপ, এই অবস্থায় ওঁকে এই খাওয়ার টেবিলে আনার কোনও মানে হয়?

বোধহয় আমাদের মনের কথা বুঝতে পেরেই ওই পাশের টেবিল থেকে জেমস

পেট্রেলের একজন শিষ্য ফিসফিস করে বললেন, উনি কিছুতেই ঘরে থাকতে চাইছেন না। জেদ ধরেছেন, এখানেই বসবেন।

আমরা খাবারে মনোযোগ দিলুম। অন্য টেবিলের একা ব্যক্তিটি এদিকে একবারও তাকাচ্ছেন না। তার মুখও দেখা যাচ্ছে না।

আমি ভাস্করকে জিগ্যেস করলুম, ওই লোকটি কে।

ভাস্কর বলল, কী জানি। আগে দেখিনি, লোকটা কীরকম অভদ্র, পেছন ফিরে আছে আমাদের দিকে।

হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ শুনে আমরা চমকে উঠলুম।

জেমস পেট্রেল চেয়ার থেকে পড়ে গেছেন মাটিতে। আমরা সবাই উঠে গেলুম তাঁর কাছে।

জেমস পেট্রেলের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, ঘনিয়ে এসেছে তাঁর সময়। তিনি ফিসফিস করে বললেন, আমাকে আপেল গাছতলায় নিয়ে চলো।

ওঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন ডাক্তার, তা বোঝা গেল, তিনি একটা স্টেথোসকোপ আরও কী সব যন্ত্রপাতি চট করে এনে পরীক্ষা করে দেখলেন জেমস পেট্রেলকে।

তারপরও তিনিও হতাশভাবে বললেন, ওঁর শেষ ইচ্ছে পালন করাই ভালো। আর কোনও আশা নেই।

জেমস পেট্রেলকে যখন ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাড়ির কাছে, তখন অন্য টেবিলের সেই বড় চুলওয়ালা লোকটি এসে বলল, আমিও কি যেতে পারি আপনাদের সঙ্গে।

কেউ হ্যাঁ-ও বলল না, না-ও বলল না।

আমি আর ভাস্করও খাবার খেতে-খেতে উঠে এলাম। জেমস পেট্রেলের জীবনের শেষ দৃশ্যটি দেখার জন্য আমাদেরও খুব কৌতূহল হল। আহা, একজন বৈজ্ঞানিক গভীর দুঃখ নিয়ে মরতে যাচ্ছেন। জ্ঞান সম্পূর্ণ হল না।

উলসথ্রপ ম্যানর-এর বাগানে বেশ ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে এই রাতেও। জেমস পেট্রেলকে শোওয়ানো হয়েছে সেই বিখ্যাত আপেল গাছটার নিচে। ওর এখনও জ্ঞান আছে। উনি ফিসফিস করে বলছেন, আইজাক নিউটন, আপনি আমাদের সব বৈজ্ঞানিকদের গুরু। তবু আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আপনার যোগ্য শিষ্য হওয়ার আশা করেছিলাম। কিন্তু সময় পেলাম না। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

এর মধ্যে কে যেন বেশ জোরে চেঁচিয়ে বলল, এক মিনিট, এক মিনিট।

সেই বড়-বড় চুলওয়ালা লোকটা এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে। ওভার কোটের পকেট থেকে বার করল একটা মস্ত বড় টর্চ।

জেমস পেট্রেলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সেই লোকটি খুব পুরোনো ধরনের ইংরিজিতে বললে, দাউ মাস্ট নট ল্যামেন্ট, জেমস পেট্রেল তুমি একজন সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক, নিউটনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তুমি উচিত কাজই করেছ। তোমার থিয়োরিও মিথ্যে নয়। এই দ্যাখো!

লোকটি আপেল গাছের ওপরের দিকে জোরালো টর্চের আলো ফেলল।

তখন দেখা গেল একটা অদ্ভুত দৃশ্য।

সেই মুহূর্তেই গাছ থেকে খসে পড়ল একটা আপেল। কিন্তু সেটা পড়তে-পড়তেও ঝুলে রইল এক জায়গায়। থেমে গেল। আর পড়ছে না।

লোকটি বললে, দেখতে পাচ্ছ, জেমস পেট্রেল? অ্যান্টি গ্র্যাভিটি! আছে।

মুমূর্ষু জেমস পেট্রেল ফিসফিস করে বললেন, অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!

তাড়াতাড়ি তার মাথাটা ঢলে পড়ল একদিকে। আপেলটাও পড়ে গেল মাটিতে।

ডাক্তারটি বলল, সব শেষ!

কিন্তু সেই লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে আর দেখা গেল না। সে ভিড়ের মধ্যে মিশে এর মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে!

জেমস পেট্রেলের মৃতদেহ সরাবার জন্য সময় গেল খানিকটা। অনেকেই এর মধ্যে সেই লোকটির খোঁজ করল, কিন্তু কোথাও আর পাওয়া গেল না তাকে। সে সরাইখানাতেও ফিরে যায়নি। সেখানে তার কোনও জিনিসপত্রও নেই। সে শুধু সেখানে খেতে এসেছিল।

আমাদের ঘরে ফিরে আসার পর আমি ভাস্করকে জিগ্যেস করলাম, ব্যাপারটা কী হল বল তো? নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না।

ভাস্কর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, কী আর হবে! অলৌকিক তো কিছু না। এটা বিজ্ঞানও নয়। অ্যান্টি গ্র্যাভিটি ফোর্স বলে কিছু থাকলেও আপেল শূন্যে ঝুলে থাকবে না ওরকমভাবে। এটা ম্যাজিক। ও লোকটা নিশ্চয়ই একজন ম্যাজিশিয়ান।

আমি বললুম, কিন্তু লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়?

ভাস্কর বলল, সবাইকে একটা স্টান্ট দিয়ে লোকটা ব্যাপারটার ব্যাখ্যা চাইত! ম্যাজিক! ম্যাজিক! ম্যাজিশিয়ানরা কখনো তাদের খেলার ব্যাখ্যা দেয় না।

আমি বললুম, আমি কিন্তু ঠিক ম্যাজিক বলে মানতে পারছি না। এতগুলো লোক মিলে দেখলুম...আচ্ছা ভাস্কর, তুই লোকটার নাক লক্ষ করেছিলি?

ভাস্কর বলল, নাক? লোকটার নাক দিয়ে কী হবে?

আমি বললুম, কেমন যেন ফোলামতন নাক। অনেকটা বড়। মাথায় ওরকম ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। বিচারকদের উইগের মতন। ছবিতে নিউটনের চেহারাটা ঠিক এইরকম না?

ঝট করে আমার দিকে ফিরে ভাস্কর জিগ্যেস করল, তুই কী বলছিস রে, সুনীল?

আমি বললুম, স্বয়ং নিউটনই আসেননি তো? একজন বৈজ্ঞানিক মনের দুঃখ নিয়ে মরে যাচ্ছে, তাই তিনি শেষ মুহূর্তে এসে সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন।

ভাস্কর বলল, তোর মাথা খারাপ। নিউটন ফিরে আসবেন কী করে। তুই কি ভূত-টুতে বিশ্বাস করিস নাকি?

আমি হেসে বললুম, হ্যামলেটের সেই লাইনগুলো মনে নেই? দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ হোরেসিও...এই পৃথিবী ও বিশ্বলোকে এখনও এমন অনেক কিছু আছে, যা মানুষ কিংবা বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না। তাই না?
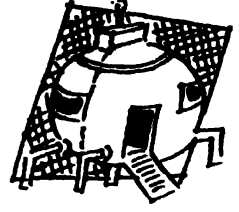
অদৃশ্য পাখি

জোনাকিরা অদৃশ্য হতে পারে না। জোনাকির আলো জ্বলে-নেভে। আলোটা না থাকলে ওদের দেখা যায় না। আবার চেষ্টা করলে দেখাও যায়। আর জোনাকিদের অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা নেই।

মশারা কি সত্যি-সত্যি অদৃশ্য হয়? এই একটা মশা গায়ের ওপর বসল, মারতে গেলেই কোথায় মিলিয়ে গেল। আর দেখা যায় না। কিন্তু অদৃশ্য হয় না বোধহয়। অত ছোট একটা প্রাণী, তাও মাঝে-মাঝে চোখে দেখা যায় না। মশারির মধ্যে মশা ঢুকলে তো অদৃশ্য হতে পারে না। আলো জ্বাললে মশারা যতই লুকোবার চেষ্টা করুক ঠিক মার খেয়ে মরে।

কিন্তু পাখিটাকে নিয়ে হীরু খুব ধাঁধায় পড়েছে।

ক্লাস সেভেনের ছাত্র হীরু, সে ক্লাসের পড়ার বইয়েব বাইরে অনেক বই পড়েছে, তার এক সেট ছোটদের এনসাইক্লোপিডিয়াও আছে। কোথাও পাখিদের অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতার কথা লেখা নেই।

তাহলে এ পাখিটা যায় কোথায়?

প্রথর্মবার দেখেই হীরু চমকে উঠেছিল।

তাদের বারান্দার কার্নিসে এসে বসেছিল পাখিটা। ওরকম পাখি হীরু আগে কখনো দেখেনি।

হীরুদের বাড়ির পেছনেই শেঠ জানকীরামের বিশাল প্রাসাদ। সেই প্রাসাদ ঘেরা বাগান, তাতে নানা রকমের বড়-বড় গাছ। শেঠ জানকীরামের মেয়ে চম্পার খুব গাছের শখ, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে গাছ এনে লাগানো হয়েছে সেই বাগানে। পুরো বাগানটা উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

হীরুদের ছাদ থেকে কিন্তু সেই বাগানটা দেখা যায়।

হীরুর বাবা বলেন, ওই বাগানটা আমাদেরও বলা যেতে পারে। আমরা জায়গা করে বাগান করিনি। আমাদের সে ক্ষমতাও নেই, কিন্তু বাগানটার সব শোভা তো উপভোগ করতে পারছি। ওদের বাগানে ফুল ফোটে, আমরা গন্ধ পাই।

বিদেশ থেকে গাছ আনতে হয়েছে, কিন্তু পাখি আনার দরকার হয় না। শেঠ জানকীরামের বাড়িতে পাখি পোষা হয় না। কিন্তু বাগান থাকলেই পাখি আসে। কতরকম পাখি, বুলবুলি, টিয়া, ফিঙে, মৌটুসী, মুনিয়া। কাক-শালিখ-চড়াই তো আছেই।

কিন্তু এই পাখিটা অন্যরকম। অনেকটা ঘুঘুর মতন দেখতে। তবে গায়ের রং একেবারে ঝকঝকে হলুদ, ঠিক যেন সোনার মতন। হীরু বইতে পড়েছে যে নীল রঙের ঘুঘু হয়। খানিকটা ছাই-ছাই রঙের কিংবা খানিকটা সাদা রঙেরও হয়। কিন্তু হলুদ ঘুঘুর কথা কোনও বইতে নেই। ঘুঘর চেয়ে ঠোঁট লম্বা। অনেকটা লম্বা, প্রায় হাঁসের মতন।

প্রথম দিন বারান্দার কার্নিসে পাখিটাকে দেখে হীরু অবাক হয়েছিল। পড়তে-পড়তে চোখ চলে গিয়েছিল তার দিকে। চোখাচোখি হল হীরুর সঙ্গে।

উঠে যেই ভালো করে দেখতে যাবে, অমনি পাখিটা আর নেই।

কোথায় গেল? ওড়ার তো একটা শব্দ হবে। উড়তে দেখাও গেল না। এই বসে ছিল এই নেই।

হীরু বারান্দায় গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারল। নিচের দিকেও যায়নি। হীরুর মনে একটা খটকা রয়ে গেল।

তিনদিন পর হীরু পাখিটাকে দেখতে পেল তার জানলার ওদিকে। ছুটির দিন বেলা এগারোটা। গায়ে রোদ পড়ে পাখিটার রং একেবারে ঝলমল করছে।

হীরুর মাও তখন মেঝেতে খবরের কাগজ বিছিয়ে পড়ছিলেন সেই ঘরে। কাগজ কিংবা বই পড়বার সময় মায়ের চশমা লাগে না। কিন্তু দূরে দেখার জন্য লাগে।

হীরু বলল, মা, দ্যাখো, দ্যাখো, কী সুন্দর পাখিটা।

মা মুখ তুলে বললেন, কই?

হীরু বলল, এই যে, জানলার ওপাশে? দেখতে পাচ্ছ না?

মা বললেন, চশমা? আমার চশমাটা কোথায় গেল?

কাগজের তলা থেকে চশমা খুঁজে পরতে-পরতে পাখিটা অদৃশ্য। হীরুর মা বললেন, কই রে, দেখতে পাচ্ছি না তো!

হীরু বললে, এই তো এখানে বসে ছিল। কোথায় গেল?

মা বললেন, উড়ে গেছে।

মায়ের চেয়ে হীরু জানালার অনেক কাছে বসে আছে। ঘুঘু পাখি উড়ে গেলে ডানায় ঝটপট শব্দ হয়। হীরু কোনও শব্দ শোনেনি আজও।

মাকে সে কথা বললে মা বিশ্বাস করবে না।

এর পরের বার শুধু অবাক হওয়া নয়। রীতিমতোই ঘাবড়ে গেল হীরু।

সেদিন মা আর হীরু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। মায়ের চোখে চশমা। শেঠ জানকীরামের বাগানে অনেক ফুল ফুটেছে। কাছাকাছি একটা বড় গাছের একেবারে মগডালে ফুটেছে এক ধরনের লাল টকটকে ফুল। ওগুলোর নাম আফ্রিকান লিলি। তার পাশেই একটা অস্ট্রেলিয়ার অ্যাকেশিয়া গাছ। অনেকগুলো শালিক কিচির-মিচির করছে সেখানে।

মায়ের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে হঠাৎ পাশ ফিরে রেলিং-এর এক কোণে বসা পাখিটাকে দেখতে পেল।

হীরু ফিসফিস করে বললে, মা, এবার সেই পাখিটাকে দেখো।

মা বললেন, কই, কই?

হীরু বলল, ওই যে ডান দিকে। এরকম হলুদ রঙের পাখি তুমি দেখেছ আগে?

মা বললেন, কই রে, কোন পাখিটার কথা বলছিস!

মা এদিক-ওদিক

পাখিটা এতই কাছে যে দেখতে না পাওয়ার কথাই নয়। হীরু বলল, এই যে আমার আঙুলের সোজা। এদিকেই তাকিয়ে আছে।

পাখিটা সত্যিই হীরুর দিকে তাকিয়ে আছে।

মা বললেন, তুই কী বলছিস রে, হীরু । আমি তো ওখানে পাখি-টাখি দেখছি না!

হীরুর শরীর এবার ঝিমঝিম করে উঠল।

পাখিটাকে তাহলে সে একাই দেখছে, আর কেউ দেখতে পায় না?

এবার হীরুর চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল পাখিটা। উড়ল না, নিচে ঝাঁপ দিল না। হীরু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তার মধ্যেই পাখিটা মিলিয়ে গেল কোথায়?

হীরু মায়ের হাত চেপে ধরে বলল, মা, মা, পাখিটা এখানে সত্যিই ছিল। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। বিশ্বাস করো।

মা ঝর-ঝর করে হেসে ফেললেন।

ছেলের মাথার ওপরে হাত দিয়ে বললেন, খুব আমাকে ঠকাতে শিখেছিস, তাই না! আজ কি এপ্রিল মাসের পয়লা তারিখ?

হীরু আর কিছু বলল না। সে নিজেই বুঝতে পারছে যে একটা পাখি অদৃশ্য হয়ে গেল, এই কথাটা বোকার মতো শোনাল।

সে দৌড়ে বাথরুমে চলে গেল, সেখানেও থরথর করে কাঁপতে লাগল।

এরপর আরও এরকম তিনবার হল। বারান্দায়, ছাদে। মা কিংবা অন্য কেউ রয়েছে কিন্তু তারা পাখিটাকে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু হীরু দেখছে। সত্যি-সত্যি দেখছে। কল্পনা নয়। যেমন সে পাশে দাঁড়ানো মাকে দেখতে পাচ্ছে, তেমনি দেখছে পাখিটাকে। অথচ অন্য কেউ দেখে না কেন?

চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে পাখিটা যেন বুঝিয়ে দিয়ে যায়, সে অন্য কোনও পাখির মতো নয়।

হীরু খুব ভালোই জানে যে পাখি কখনো অদৃশ্য হতে পারে না। পৃথিবীতে যত জিনিস আছে, তার মধ্যে হাওয়া আর শব্দই শুধু চোখে দেখা যায় না।

তা হলে কি পাখিটা এ পৃথিবীর নয়? মহাকাশ দিয়ে উড়ে এসেছে, অন্য কোনও গ্রহ থেকে?

হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে। রহস্যময় মহাশূন্যে কত কী আছে কে জানে!

কিন্তু পাখিটা আর কেউ দেখতে পায় না। শুধু হীরু দেখতে পায় কেন?

হীরু এখন মাঝে-মাঝে আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখে কি আলাদা কোনও শক্তি আছে? কই, সে তো অন্য আর কিছু দেখতে পায় না। ভূতের গল্প পড়তে-পড়তে এক-একদিন তার মনে হয়, সত্যি কি ভূত বলে কিছু আছে? এতদিন একটা ভূতকে (দূর থেকে) দেখতে পেলে মন্দ হতো না।

নাঃ, ভূত-টুতও সে কখনো দেখেনি।

তারপর হীরু বুঝল, পাখিটা ইচ্ছা করে তাকেই দেখা দেয় বলে সে দেখতে পায়। দু-এক মিনিটের বেশি সে থাকে না।

একদিন খুব ভোরবেলা হীরু হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখল, পাখিটা বসে আছে জানালার কাছে। পাখিটাকে দেখে মনে হয়, যেন এইমাত্র স্নান করে এল।

পাখিটা চেয়ে আছে হীরুর দিকে। প্রত্যেকবারই এরকমভাবে সে হীরুকে দেখে। তবে কি সে হীরুকে কিছু বলতে চায়? তার কি এমন কোনও কথা আছে, যা হীরুকেই শুধু বলবে?

হীরু পাখিটার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কে? তুমি কোথা থেকে এসেছ?

পাখিটা যেন হীরুর কথা ঠিক বুঝতে পারল। সে ডেকে উঠল। টুইংক! টুইংক!

ভারি মিষ্টি সেই ডাক। কিন্তু হীরু তো সেই ভাষা বুঝতে পারল না। সে শুধু তাকিয়ে রইল পাখিটার দিকে।

পাখিটা ঠিক ওই রকম ভাবেই আরও কয়েকবার ডাকল। ঠিক যেন কথা বলার মতন, কিন্তু অন্য কোনও ভাষায়।

হীরু জিগ্যেস করল, কী বলছ? কী বলছ?

পাখিটা তক্ষুনি অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে আর কখনও আসেনি।

ঠিক সাতবার হীরু দেখেছিল পাখিটাকে।

ক্লাস সেভেনে পড়ার সময়, বারো বছর, পাঁচ মাস বয়সে হীরুর কাছে একটা সোনার রঙের আশ্চর্য পাখি কেন সাতবার এসেছিল, তা হীরু আজও জানে না। পাখিটা কী বলতে এসেছিল তাকে, আজও সে বুঝতে পারেনি।

তবু হীরু এখনও সেই উত্তরটা খুঁজে যাচ্ছে। সারা জীবন খুঁজে যাবে।

সেই অদ্ভুত লোকটা

এক-একটা মানুষের কিছুতেই বয়েসটা ঠিক বোঝা যায় না। চল্লিশও হতে পারে, পঁয়ষট্টিও হতে পারে। ঠিক এই রকমই একটা লোক বসে থাকে পার্ক সার্কাস ময়দানে। প্রত্যেক শনিবার। লোকটি পরে থাকে একটা সরু পাজামা আর একটা রঙ-চঙে জোব্বা। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। চোখে চশমা, মাথায় একটা চ্যাপ্টা টুপি।

গনগনে রোদের মধ্যেও লোকটি পার্কের বেঞ্চে দুপুরবেলা বসে থাকে। এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে ঘাসের দিকে।

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় দীপু মাঝে-মাঝে পার্ক সার্কাস ময়দানের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে। লোকটিকে দেখে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। একই রকম পোশাক, প্রত্যেক শনিবার ঠিক একই জায়গায় বসে কেন এই মানুষটা? সব সময় ও একলা থাকে, কেউ ওর পাশে বসে না।'

একদিন ছুটির পর বৃষ্টির মধ্যে স্কুল থেকে বেরিয়েছে দীপু। পার্কের রেলিং টপকে দৌড় লাগাতে গিয়েই আছাড় খেয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে ছড়িয়ে পড়া বইপত্রগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে, এমনসময় দেখল, একটু দূরের বেঞ্চে সেই দাড়িওয়ালা, কালো চশমা-পরা লোকটা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

দীপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লোকটা হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকল।

দীপুর এখন মোটেই বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে লোকটার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এই লোকটাই বা শুধু-শুধু এখানে বসে বৃষ্টিতে ভিজছে কেন?

দীপুর কৌতূহল হল। সে এগিয়ে গেল লোকটার কাছে।

লোকটি বলল, ইস্‌টুম, কিস্‌টুম, দ্রুখ্-দ্রুখ্?

এ আবার কীরকম ভাষা? এই লোকটা কি কাবুলিওয়ালা নাকি? চেহারা দেখে তো তা মনে হয় না। লোকটির রোগা-পাতলা চেহারা। দীপু কখনও রোগা কাবুলিওয়ালা দেখেনি।

দীপু বলল, কেয়া? হাম নেই জান্তা!

লোকটা এবারে দুটো আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলো, হিন্দি? বাংলা?

দীপু বলল, বাংলা।

এবারে লোকটা ভাঙাভাঙা উচ্চারণে বলল, বেশ কথা! হামি বাংলা জানে। এই লিজিয়ে খোঁকাবাবু, চকলেট খাও!

লোকটা তার জোব্বার পকেট থেকে একটা আধভাঙা চকলেটের টুকরো বার করে দীপুর দিকে এগিয়ে দিল।

দীপুর হাসি পেল। লোকটা কি তাকে ক্লাস সিক্স সেভেনের ছেলেদের মতন বাচ্চা ছেলে পেয়েছে? ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুমের ওষুধ মেশানো চকলেট খাইয়ে তারপর চুরি করে নিয়ে যাবে? দীপু এখন ক্লাস নাইনে পড়ে। সে ইচ্ছে করলে এই রোগা লোকটাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারে।

দীপু বলল, আমি চকলেট খাবো না। আপনি আমায় ডাকলেন কেন?

লোকটা চকলেটটা নিজের মুখে ভরে দিয়ে বলল, তুম্‌হার নাম তো দীপক মিত্রা আছে, তাই না?

দীপু একটু অবাক হল! লোকটা তার নাম জানল কী করে? লোকটা তার সঙ্গে ভাব জমাতেই বা চাইছে কেন?

তবু সে বলল, মিত্রা নয়, মিত্র। আমি আর বৃষ্টিতে ভিজতে পারছি না। কী বলতে চান চটপট বলুন!

লোকটা হঠাৎ সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে ফেলল। তারপর বলল, তুম্‌হাকে আমার

খুব ভালো লাগল। তুমি হামার বাড়িতে যাবে? বেশি দেরি হবে না। স্রেফ আধা ঘন্টা থাকবে?

দীপুর মনে হল, এ লোকটা তো তাহলে সত্যিই ছেলেধরা। স্কুলের কাছে বসে থাকে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছেলেদের নিয়ে যেতে চায়।

দীপুদের স্কুলের ক্লাস এইটের ছেলে অর্ণব সরকার গত মাসে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তাকেও কি এই লোকটা ধরে নিয়ে গেছে নাকি?

দীপুর কিন্তু একটুও ভয় হল না। সে বলল, আমাকে আপনার বাড়ি নিয়ে যাবেন? কেন? আমি মাছ খাই না, শুধু মাংস খাই। আলু সেদ্ধ আর ডিম সেদ্ধ একসঙ্গে মেখে খাই। দুধ আর কোকো মিশিয়ে খাই। এসব খাওয়াতে পারবেন?

লোকটা হা-হা করে হেসে উঠে বলল, বেশ তো, আমি তুমাকে মুরগ-মশল্লাম খাওয়াব। ঠান্ডা লস্যি খাওয়াব। যদি তুমি একঠো কাম করতে পার!

ধ্যাৎ? বলে দীপু আবার চলতে শুরু করল। লোকটা তখনও হাসতে লাগল জোরে-জোরে।

দীপু আর পেছন ফিরে তাকাল না।

একটুখানি যেতে না যেতেই কোথা থেকে একটা মস্তবড় কুকুর তেড়ে এল দীপুর দিকে। গলায় বেল্ট বাঁধা একটা অ্যালসেশিয়ান। কারুর বাড়ির পোষা কুকুর, হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে।

দীপু এমনিতে কুকুরকে দেখে ভয় পায় না। কিন্তু এই কুকুরটা তেড়ে আসছে তার দিকেই। পার্কে আর কোনও লোকজন নেই। কুকুরের সঙ্গে ছুটেও পারা যায় না। দীপু তাড়াতাড়ি আর একটা বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াল।

কুকুরটাও সেখানে এসে যেই দীপুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, অমনি একটা লাল রঙের দড়ির ফাঁস এসে পড়ল কুকরটার গলায়।

দীপু দেখল সেই কালো চশমা পরা লোকটাই দড়ি ছুঁড়ে কুকুরটাকে বেঁধে ফেলেছে। তাবপর কুকুরটাকে টানতে-টানতে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে লোকটা তার গলা থেকে ফাঁস খুলে দিল, তারপর কুকুরটার মাথায় একটা চাপড় মেরে বলল, যা, ভাগ!

অতবড় কুকুরটা এখন দারুণ ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

লোকটা আবার দীপুর দিকে হাতছানি দিয়ে বলল, ইধারে এসো, দীপকবাবু!

দীপু বলল, থ্যাঙ্ক ইউ! আমার বাড়ি ফেরার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভয় নেই, দীপকবাবু! এক মিনিট ঠারো! একটা কথা বলি । তোমাকে একঠো চীজ দিতে চাই। বহুত দামি চীজ।

দামি চীজ, মানে দামি জিনিস? সেটা আমাকে দেবেন কেন?

দেব, তুমাকে আমার পছন্দ হয়েছে সেইজন্য। তার বদলে তুমাকেও একটা কাজ করতে হোবে। যাবে, আমার বাড়িতে?

না। স্কুল থেকে ঠিক সময়ে বাড়ি না ফিরলে আমার মা চিন্তা করবেন। তা ছাড়া আমি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি। সামনেই আমার পরীক্ষা—

ঠিক আছে, বৃষ্টি হামি থামিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো—এক, দো, তিন—।

হাতের সেই লাল রঙের দড়িটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লোকটা পাঁচ পর্যন্ত গুনে বলল, এই দেখো, বৃষ্টিতে বেঁধে ফেলেছি হামি, এবারে রোদ উঠবে।

বৃষ্টি সত্যিই থেমে গেল। যদিও আগে থেকেই একটু কমে আসছিল।

দীপু হেসে বলল, আপনি বুঝি কুকুরের মতন বৃষ্টির গলাতেও দড়ি বাঁধতে পারেন? হে-হে-হে! আপনি-আপনিই বৃষ্টি কমে গেছে!

লোকটা বলল, তুমাকে আমি আর একটো চীজ দেখাচ্ছি। তুমি এই দড়িটাতে হাত দাও!

দীপু সাবধান হয়ে গিয়ে বলল; না, আমি দড়িতে হাত দেব না!

ঠিক আছে। ওই গাছটায় হাত দাও!

কেন? তাতে কী হবে?

দিয়ে দেখো না।

লোকটা তার হাতের দড়িটা দিয়ে গাছটার গায়ে একবার মারল। তারপর দীপু সেই গাছটার গায়ে হাত ছোঁয়াতেই দারুণ চমকে উঠল। দীপুর সারা শরীরটা ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠেছে! ঠিক কারেন্ট লাগলে যেমন হয়।

গাছের গায়ে তো কখনও কারেন্ট থাকতে পারে না! এই লোকটা তাহলে ম্যাজিক দেখাচ্ছে দীপুকে!

ঠিক দীপুর মনের কথাটা বুঝতে পেরেই লোকটা বলল, এসব ম্যাজিক নেহি, ম্যাজিক নেহি! আসল জিনিস আছে। আর একটা দেখবে? ওই দেখো, আশমান দিয়ে একঠো এরোপ্লেন যাচ্ছে। যাচ্ছে তো?

দীপু ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, প্রায় তাদের মাথার ওপর দিয়েই একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে।

সেই লোকটা লাল দড়িটা ছুঁড়ে দিল শূন্যের দিকে, তারপর বলল, যাঃ!

প্লেনটা অমনি অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবারে গা ছমছম করে উঠল দীপুর। এ কার পাল্লায় পড়ল সে! এই সময় পার্কটা এত ফাঁকাই বা কেন? লোকটা যদি দীপুকেও ওই দড়িতে বেঁধে ফেলে?

দীপু শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, কী হল প্লেনটার? ধ্বংস হয়ে গেল?

না-না, ধ্বংস হবে কেন? তা হলে তো ভিতরের আদমিগুলোও মরে যাবে। আমি তো কোনও মানুষ মারি না। আমি শুধু তোমার আঁখ থেকে মুছে দিলাম এরোপ্লেনটাকে। শোনো দীপকবাবু, আমি তুমাকে যে চীজ দেব বলছিলাম, তা কোনও আনসান্‌ চীজ নয়। তুমাকে দেব আসলি চীজ, তা হল জ্ঞান। তুমি আমার কাছ থেকে এই জ্ঞান যদি নাও, তবে তুমি আন্ধারেও দেখতে পাবে, আগুন লাগলে হাত পুড়বে না, তিনদিন কিছু না খেলেও ভুখা লাগবে না, আরও অনেক কিছু পারবে।

ঠিক আছে, শিখিয়ে দিন।

আভি তো হবে না। দু-এক ঘন্টা টাইম লেগে যাবে। তার আগে যে তুমাকে একঠো কাম করতে হবে।

কী কাজ বলুন?

তুমি আমাকে একটা দাওয়াই খাওয়াবে।

দাওয়াই, মানে ওষুধ?

হাঁ-হাঁ। আমার বাড়িতে সেই ওষুধ আছে। খুব দামি হেকিমি ওষুধ। পাঁচ ফোঁটা তাজা রক্ত মিশিয়ে সেই ওষুধ তৈয়ার করতে হয়। চৌদ্দ-পনের বছরের বুকের রক্ত। তুমি সেইটুকু রক্ত আমাকে দেবে?

রক্ত?

হাঁ, মাত্র পাঁচ ফোঁটা! আসলে হয়েছে কি জানো, আমি তো শুধু রোদ্দুর খাই! রোদ্দুর না থাকলেই আমি দুব্‌লা হয়ে যাই। তখন ওই দাওয়াই খেতে হয়।

আপনি রোদ্দুর খান?

হাঁ, দীপকবাবু! আমি কিছু খাবার খাই না। রোদ্দুর খেলেই আমার শরীর খুব তাজা থাকে! মুশকিল হয় এই বর্ষাকালে। এক-একদিন রোদ্দুরই থাকে না, শুধু মেঘ! শুধু বৃষ্টি! তখন আমি দুব্‌লা হয়ে যাই।

আপনি তো ইচ্ছে করলেই বৃষ্টি থামিয়ে দিতে পারেন। বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়ে রোদ খাবেন!

আরে বাপ রে বাপ! সে কী কখনো হয়! বর্ষাকালে যদি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, তবে কত ক্ষতি হবে! চাষ-বাস হবে না। ধান-গম হবে না। কত লোক না খেয়ে মরবে। আমার একেলার সুখের জন্য কি আমি বৃষ্টি বন্ধ করতে পারি? তুমি আমায় একটু দাওয়াই খাইয়ে দাও! স্রেফ পাঁচ ফোঁটা রক্ত!

দীপু খানিকক্ষণ হাঁ করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, এখন আপনার বাড়ি যাব, অনেক দেরি হয়ে যাবে, আমার মা খুব চিন্তা করবেন! আমি কাল যদি আপনার বাড়ি যাই? কাল মাকে বলে আসব যে একটু দেরি হবে।

কাল? ঠিক আসবে?

হ্যাঁ, আসব! আপনি ভাববেন না যে, আমি পাঁচ ফোঁটা রক্ত দিতে ভয় পাই! আমি আজকে এখন বাড়ি যাব।

তা হলে এসো কালকে!

দীপু বারবার পেছনে তাকাতে-তাকাতে চলে গেল পার্কটা পেরিয়ে। লোকটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি নেমে গেল আবার।

দীপু অবশ্য এই ঘটনাটা বাড়িতে কারুকে বলল না। কিন্তু লোকটা তাকে দারুণ-দারুণ ম্যাজিক শিখিয়ে দেবে ভেবে সে খুব উত্তেজিত হয়ে রইল। পাঁচ ফোঁটা রক্ত তো অতি সামান্য ব্যাপার।

সেদিন বিকেল থেকে সারা রাত বৃষ্টি হল। পরের দিনও সেই রকম বৃষ্টি। সেদিন রবিবার, দীপুর ইস্কুল বন্ধ। তবু বিকেলের দিকে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার নাম করে সে চলে এল সেই পার্কে। সেই লোকটা নেই। এত বৃষ্টির মধ্যে কেউই পার্কে আসেনি। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে এল দীপু।

এরপর পর-পর কয়েকদিন চলল খুব বৃষ্টি। আকাশে রোদই ওঠে না। দীপুর খালি মনে হয়, সেই লোকটা কিছু না খেয়ে আছে। আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। ওষুধ খাবে কী করে। অন্য কোনও ছেলে কি পাঁচ ফোঁটা রক্ত দেবে?

বৃষ্টির জন্য ইস্কুল বন্ধ রইল দু-দিন। তার পরের শনিবার দীপু ছুটির পরেই দৌড়ে এল পার্কে। লোকটা আজও বসে নেই তার সেই নিজের জায়গাটায়। কিন্তু সেই বেঞ্চটার ওপরে একটা লাল রঙের দড়ি পড়ে আছে।

এটা কি সেই ম্যাজিকের দড়ি? লোকটা দীপুর জন্য রেখে গেছে? কিন্তু দীপু সেই দড়িটা ছুঁয়ে কিছুই করতে পারল না। লোকটা তো তাকে তার সেই জ্ঞান কিংবা ম্যাজিক শিখিয়ে যায়নি!

লোকটিকে আর কোনওদিন দেখতে পায়নি দীপু।

হীরে কি গাছে ফলে?

রানীগঞ্জ স্টেশনে নেমে আরও সতেরো মাইল দূরে বিশ্বমামার মামার বাড়ি। জিপ গাড়ি ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই। একটা জিপ গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আসলে স্টেশনের বাইরে ছিল চার-পাঁচখানা জিপ গাড়ি। সেখান থেকে একজন ড্রাইভার এগিয়ে এসে বিশ্বমামার সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, আসুন স্যার!

ড্রাইভারটিকে বিশ্বমামা আগে দেখেননি। সেও বিশ্বমামাকে কখনো দেখেনি। তবু সে এত লোকের ভিড়ে বিশ্বমামাকে চিনল কী করে?

ড্রাইভারকে সে জিগ্যেস করতেই সে বলল, এ তো স্যার খুব সোজা! বউদি বলে দিয়েছেন, দেখবে একজন লম্বা মতন লোক, গায়ের রং খুব ফরসা, আর নাকটা, গন্ডারের শিং-এর মতন। আর সঙ্গে থাকবে দুটি বাচ্চা ছেলে!

বিলুদা বললে, গন্ডারের মতন নাক? ভাগ্যিস উনি বলেননি হাতির শুঁড়ের মতন!

বিশ্বমামা নিজের লম্বা, চোখা নাকে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, গন্ডারের শিং-এর মতন নাক তো খারাপ কিছু নয়! আর তোদের যে বাচ্চা ছেলে বললেন।

বিলুদা বললে, একটু ভুল বলেছে। আমি বাচ্চা নই, নীলু বাচ্চা! ড্রাইভারটির

নাম বাস্তা সোরেন। সে সাঁওতাল হলেও বাংলা বলে জলের মতন। ইংরিজিও খানিকটা জানে। বছর পঁয়তিরিশেক বয়েস হবে। বেশ হাসিখুশি মানুষটি।

রানীগঞ্জ ছাড়িয়ে জিপ গাড়িটা যেতে লাগল একটা সরু রাস্তা দিয়ে। সরু তো বটেই, তা ছাড়াও রাস্তার অবস্থা ভালো না, এবড়ো-খেবড়ো মাঝে-মাঝে বড়-বড় খানা-খন্দ। এখনও এখানে-সেখানে জল জমে আছে। আমরা চলেছি লাফাতে-লাফাতে। তাতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। বেড়াতে বেরুনোটাই আনন্দের ব্যাপার।

একটু পরেই রাস্তাটা ঢুকে গেল একটা জঙ্গলের মধ্যে। কত রকম গাছ। আমি কিংবা বিলুদা অতশত গাছ চিনি না। বিশ্বমামা আমাদের গাছ চেনাতে লাগলেন। শাল, মহুয়া, জারুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া আরও কত কী? অনেক গাছে ফুল ফুটে আছে। আমরা অনেক গল্পে এইসব গাছের নাম পড়ি। কিন্তু জারুলের সঙ্গে শিমূলের কী তফাত তা জানি না।

বিশ্বমামা বললেন, জানিস তো এরমধ্যে অনেক গাছই আমাদের দেশের নয়। বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। এই দ্যাখ না। এই যে কৃষ্ণচূড়া। কী সুন্দর নাম। এই গাছ আনা হয়েছে ম্যাডাগাসকার থেকে। এখন আমাদের দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

বিশ্বমামা যে গাছটাকে কৃষ্ণচূড়া বলে দেখালেন, বাস্তা সোরেন সে দিকে তাকিয়ে বললেন, ওটা তো গুলমোহর।

বিশ্বমামা আমার দিকে ফিরে বললেন, অ্যাই নীলু, বল তো গুল মানে কী?

আমি উত্তর দিতে পারলুম না।

বিশ্বমামা বললেন, তোরা কথায়-কথায় এত গুল মারিস, আর গুল কথাটার মানেই জানিস না? বিলু তুই জানিস?

বিলুদার অবস্থাও আমার মতন।

বিশ্বমামা বললেন, গুল মানে ফুল। বাস্তা যে বলল গুলমোহর, সেটা ঠিক নয়। আমরা যে গুলকে বলি কৃষ্ণচূড়া, হিন্দিতে তাকেই বলে গুলমোর। মোহর নয় মোর। মোর মানে ময়ূর। ময়ূরের পাখার মতন ফুল। রংটা না মিললেও ফুলটা দেখতে অনেকটা ময়ূরের পালকের শেষ দিকটার মতন। কৃষ্ণের মাথায় একটা ময়ূরের পালক থাকে, তাই বাংলায় বলি কৃষ্ণচূড়া আর হিন্দিতে গুলমোর।

মুখ ফিরিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা বাস্তা। তোমরা পলাশকে কী বলো?

বাস্তা একটু চিন্তা করে বললে, আমি তো পলাশই বলি ইংরিজিতে বলে ফ্লেইম অফ দা ফরেস্ট!

বিশ্বমামা বললেন, ঠিক বলেছ তো! যখন একসঙ্গে অনেক পলাশ ফুল ফোটে, তখন সমস্ত জঙ্গল যেন জ্বলতে থাকে। বাংলায় কিন্তু পলাশের আর একটা নাম আছে। নীলু আর বিলু, যদি সেই নামটা বলতে পারিস, ফিরে গিয়ে তোদের একদিন চাইনিজ রেস্তোরাঁয় খাওয়াব।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে বাস্তা জিগ্যেস করল, কী নাম? বাংলায় অন্য কী নাম আছে?

বিশ্বমামা বললেন, কিংশুক। সংস্কৃত কথা। কোথায় পলাশ আর কিংশুক! এই কিংশুক নামটা কিন্তু খুব মজার। চেনা-জানা আর কোনও ফুলের এরকম নাম নেই।

গাড়িটা একটা গর্তে পড়ে প্রচণ্ড জোরে লাফিয়ে উঠল। সামনের সিটে ঠুকে গেল বিলুদার কপাল।

বাস্তা বলল, আর বেশি দেরি নেই। ওই তো কারখানার চিমনি দেখা যাচ্ছে।

হাত দিয়ে কপাল ঘষতে-ঘষতে বিলুদা জিগ্যেস করল, কিংশুক নামটা কেন মজার?

বিশ্বমামা বললেন, এটা নামই নয়, এটা একটা প্রশ্ন। কিম শুক? কিছু বুঝলি?

বিলুদা বললে, কী করে বুঝব, আমি কি সংস্কৃত পড়েছি নাকি?

বিশ্বমামা বললেন, সংস্কৃত পড়ার দরকার নেই। মাঝে-মাঝে বাংলা অভিধান দেখলেই এসব জানা যায়। শুক মানে জানিস তো?

আমি বলে উঠলাম, আমি জানি, আমি জানি, এক রকম পাখি!

বিশ্বমামা বললেন, কী পাখি?

আমি বললাম, গল্পের বইতে শুক আর সারি এই দুটো পাখির নাম পড়েছি।

বিশ্বমামা বললেন, গল্পের বইয়ের কথা ছাড়, আমরা যাকে টিয়া পাখি বলি, আগেকার দিনে তাকেই বলা হতো শুক পাখি। এখন পলাশ ফুলের ডগার দিকটা লক্ষ করে দেখবি, অনেকটা টিয়া পাখির ঠোঁটের মতন। তাই একসময় কোনও এক কবি মনে-মনে প্রশ্ন করেছিলেন, কিম শুক? সত্যিই কি শুক বা টিয়া পাখির মতন? সেই থেকে কিংশুক নাম হয়ে গেছে।

বাস্তা জিগ্যেস করল, স্যার, আপনি বুঝি বোটানি পড়েছেন?

বিশ্বমামা বললেন, কখনো না। আমি ডিকশনারি পড়ি।

একটু পরেই আমরা পৌঁছে গেলাম বিশ্বমামার মামার বাড়ি। আমার মায়েরও মামাবাড়ি। সুতরাং আমাদের দাদুর বাড়ি। কিন্তু এই দাদুকে আমরা কখনও দেখিনি।

দাদুর নাম জগদীশ, বিশ্বমামা তাকে ডাকেন জগুমামা বলে। বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ, বুড়ো বলে মনে হয় না। তিনি এখানে একটা ছোটখাটো কারখানা তৈরি করেছেন, এখানেই থাকেন, শহরে বিশেষ যান না। তাঁর স্ত্রীকে বিশ্বমামা বলেন নতুন মামি। সুতরাং আমাদের কাছে তিনি হয়ে গেলেন নতুন দিদিমা।

কী যত্নই যে করতে লাগলেন তিনি। সবসময় আমাদের নতুন-নতুন কী খাওয়াবেন সেই চিন্তা। বিশ্বমামা উৎসাহের সঙ্গে বলেন, নতুন মামি আরও খাওয়াও, তোমাদের এখানে খেতেই তো এসেছি।

কারখানাটা একটু দূরে, জঙ্গলের ধার ঘেঁষে জগুদাদুর বাংলো। অনেকগুলো ঘর। সামনে বাগান। পেছনে একটা পুকুর। হাঁস, মুরগি, গরু আছে নিজস্ব।

বাস্তা সোরেনকে আমরা প্রথমে ড্রাইভার ভেবেছিলাম। পরে বুঝলাম সে এখানকার প্রায় ম্যানেজারের মতন। জগু দাদুর ডান হাত বলা যায়। এই বাস্তাদা জিপ গাড়ি নিয়ে সকাল-বিকেল আমাদের অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে আনে। বাস্তাদার বাড়িও কাছেই। বাস্তাদার

একটি সাত-আট বছরের ছেলে আছে, তার নাম জাম্বো, তার সঙ্গে আমাদের খুব ভাব জমে গেল।

এই জাম্বোই এই গল্পের নায়ক।

জাম্বো কথা খুব কম বলে, খেলতে ভালোবাসে।

প্রত্যেকদিন সকালে ওর সঙ্গে আমরা ফুটবল খেলি একটা রবারের বল নিয়ে। সেই বলটা নিয়েই আবার ক্রিকেটও খেলা হয়। অন্য বল নেই।

জাম্বো আবার নিজে ছবি আঁকে। ওদের বাড়ির সামনে একটা সিমেন্ট বাঁধানো চাতাল আছে। সেই চাতালের ওপর খড়ি দিয়ে আঁকে বড়-বড় ছবি। ওর আঁকার হাত আছে, শেখালে ও একদিন ভালো শিল্পী হতে পারবে।

জাম্বো সাধারণ ছবি আঁকে না। ঘোড়া এঁকে দুটো ডানা জুড়ে দিয়ে বলে পক্ষীরাজ। মানুষ এঁকে তার মস্তবড় কুলোর মতন কান জুড়ে দিয়ে বলে অন্য গ্রহের মানুষ। জাম্বোর যখন ছবি আঁকার ইচ্ছে হয়, তখন সে খেলতেও চায় না।

আমাদের সঙ্গে জাম্বো মাঝে-মাঝে বেড়াতে যায়। আবার এক-একসময় যায় না, তখন ছবি আঁকে।

একদিন আমরা একটা পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তাদের বাড়িতে বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছি চা খাওয়ার জন্যে। জাম্বো ছবি আঁকছে চাতালে।

বারান্দায় ডান দিকে একটা মস্ত বড় উনুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে। ওটা সবসময় জ্বলে। নেভাতে দেখিনি কখনো। ওই উনুনে চায়ের জন্য জল চাপানো হয়েছে।

বিলুদা বলল, বাস্তাদা, তোমাদের এখানে কয়লা খুব সস্তা, তাই তোমরা সবসময় উনুন জ্বালিয়ে রাখো। দেশলাই কাঠির খরচ বাঁচাও।

বাস্তাদা হেসে বলল, সস্তা মানে কী, আমাদের সব কয়লা তো বিনা পয়সায় বলতে গেলে!

বিশ্বমামা জিগ্যেস করলেন, বিনা পয়সায় কেন? কাছাকাছি অনেক কয়লার খনি আছে। কেউ বুঝি তোমাদের বিনা পয়সায় কয়লা দেয়?

বাস্তাদা বলল, অন্য কেউ দেবে কেন? আমাদের নিজেদেরই তো কয়লার খনি আছে।

বিশ্বমামা বললেন, জগুমামার কয়লা খনি আছে শুনিনি তো! কোথায় সেটা?

বাস্তাদা বলল, সে মজার ব্যাপার শোনেননি? আপনার জগুমামা গত বছর ওঁর বাংলোর পেছনে একটা পুকুর খোঁড়াচ্ছিলেন। এখানে তো শক্ত পাথুরে মাটি, পুকুর খোঁড়া সহজ নয়। চার ফুট খুঁড়তে না খুড়তে ঠং-ঠং করতে লাগল। কোদাল, গাঁইতি চালিয়ে মজুররা ক্লান্ত হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল তলা থেকে মাটির বদলে বেরুচ্ছে কয়লা। বেশ ভালো জাতের কয়লা। সরাসরি উনুনে এনে জ্বালানো যায়। পুকুরের বদলে আমরা পেয়ে গেলাম একটা কয়লার খনি!

বিশ্বমামা বললেন, সত্যিই তো মজার ব্যাপার! কিন্তু এখন কয়লাখনি সব গভর্নমেন্ট নিয়ে নেয় না?

বাস্তাদা বললে, সরকারের লোকদের জানানো হয়েছে। আপনার জগুমামা কখনো বে-আইনি কাজ করবেন না। সরকারি লোক এসে পরীক্ষা করে দেখে বলেছে, কয়লা পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু জায়গাটা বেশি বড় নয়। ওই পুকুরের মাঝেই। ওইটুকু জায়গাতে কী করে যেন কয়লা জমে আছে। এইটুকু কয়লা খনি সরকার নিতে চায় না। আমরাই ব্যবহার করতে পারি। ওই কয়লাতে আমাদের আরও তিন-চার বছর চলে যাবে।

বিলুদা বলল, তাই দেখছি ওই পুকুরটায় কীরকম কালো-কালো নোংরা জল।

বাস্তাদা বলল, একটুখানি মোটে জল আছে। পাম্প করে তোলা যায়। তারপর আমরা দরকার মতন কয়লা কেটে নিই।

এরপর চা খেতে-খেতে আমরা কয়লার গল্প ছেড়ে অন্য গল্প করতে লাগলাম।

এক সময় বিশ্বমামা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখি তো, আমাদের জাম্বো সাহেব কী ছবি আঁকছে।

আমরাও দেখতে পেলাম।

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে জাম্বো খড়ির বদলে একটা খসখসে পাথরের মতন জিনিস দিয়ে বড় করে কী যেন আঁকছে।

বিশ্বমামা জিগ্যেস করলেন, আজ কীসের ছবি আঁকা হচ্ছে জাম্বো?

জাম্বো গম্ভীর ভাবে বলল, এটা একটা গাছ! আর এই যে ফুলগুলো দেখছ, এগুলো সব এক-একটা হীরে।

আমি বললাম, সোনার গাছে হীরের ফুল!

বিলুদা ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে বলল, গাছে হীরে ফলেছে। তাও এক-একটা হীরে তালের মতন বড়।

বিশ্বমামা ধমক দিয়ে বললেন, হাসছিস যে! গাছে কি হীরে ফলে না?

বিলুদা ইয়ার্কি করে বলল, ফলে বুঝি? তুমি দেখেছ? কোথায়, কামস্টাটকা না ম্যাডাগাস্কায়।

বিশ্বমামা জাম্বোর হাতের পাথরটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, ওটা একবার দেখি তো জাম্বো।

সেটা হাতে নিয়ে তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে মেঝেতে দাগ কাটতে লাগলেন। অনেকটা শ্লেট-পেন্সিলের মতন দাগ পড়ল।

বিলুদা বলল. ওটাও হীরে নাকি?

বিশ্বমামা বললেন, না, এটা গ্র্যাফাইট। কাকে গ্র্যাফাইট বলে জানিস?

তারপরেই লাফিয়ে উঠে বললেন, এক্ষুনি জগুমামার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

দৌড়ে ও বাংলোতে গিয়ে বিশ্বমামা বললেন, জগুমামা, জগুমামা, তোমাকে একটা অনুরোধ করব? কালকেই অনেকগুলো মজুর লাগিয়ে তোমার পুকুরের সব কয়লা কাটিয়ে ফেলতে পারবে? কয়লা ওপরে জমা করে রাখলেও তো নষ্ট হয় না।

জগুদাদু বললেন, কেন, সব কয়লা একসঙ্গে কাটাতে হবে কেন?

বিশ্বমামা বললেন, আমার বিশেষ অনুরোধ। আমি একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করব।

জগুমামা আপত্তি করলেন না। বিশ্বমামা নাম করা বৈজ্ঞানিক। তিনি নিতান্ত বাজে কথা বলবেন না। যখন সব কয়লা তুলে ফেলতে বলছেন নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

কিন্তু মুশকিল হল, বিশ্বমামা কিছুতেই তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বলবেন না। আমাদের কাছে বারবার বলতে লাগলেন, গাছে হীরে ফলে না? সোনার গাছে হীরের ফুল!

বিলুদা বলল, কয়লা সব শেষ হলে তারপর বুঝি হীরের খনি বেরুবে?

বাস্তাদা বলল, এদিকে এত খনি আছে রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, আসানসোল, কোনও খনিতে কখনো হীরে বেরিয়েছে বলে শুনিনি!

পরদিনই পঞ্চাশ জন মজুর কাজে লেগে গেল। বিশ্বমামা নিজে তদারকি করতে লাগলেন কাজের। সবসময় ওদের মধ্যে লেগে রইলেন। নিজে হাত লাগান মাঝে-মাঝে। ওঁর জামা-কাপড় সব কয়লার গুঁড়ো লেগে একেবারে কালো ভূত হয়ে গেল।

চারদিন পর দেখা গেল কয়লার স্তর খুব গভীর নয়। নিচে পাওয়া যাচ্ছে নরম মাটি। সব কয়লা তুলে ফেলার পর সেই নরম মাটি ফুঁড়ে পরিষ্কার জল বেরুতে লাগল। এবার সেটা সত্যিকারের একটা পুকুর হয়ে গেল।

আমি আর বিলুদা বিশ্বমামাকে চেপে ধরে বললুম, কোথায় গেল তোমার সোনার গাছ আর হীরের ফুল?

বিশ্বমামা মুচকি হেসে বললেন, আমার জগুমামা একটা পুকুর কাটাতে গিয়ে কয়লা দেখে থেমে গিয়েছিল। আমি কয়লা সব তুলিয়ে পুকুরটা পুরো করে দিলুম। কয়লাও পাওয়া গেল। পুকুরও পাওয়া গেল, ব্যাস।

জগুদাদু বললেন, আমি তাতেই খুশি। বেশ করেছিস বিশ্ব। একটা পুকুরের বড় দরকার ছিল। তাতে মাছ চাষ করব। পরের বার এলে তোদের পুকুরের মাছ খাওয়াব।

বিশ্বমামা বললেন, দাঁড়াও জগুমামা, এই বিলু আর নীলু নামে গবেট দুটোকে একটা জিনিস দেখাই। গাছে হীরে ফলে না! তবে এটা কী?

ফস করে পকেট থেকে তিনি একটা পাথরের টুকরো বার করলেন। তার একটা দিক চকচক করছে, আলোতে ঝিলিক দিয়ে উঠল।

জগুদাদু অবাক হয়ে বললেন, এ তো দেখছি সত্যিই একটা হীরে! কোথায় পেলি?

বিশ্বমামা বললেন, তোমার পুকুরে। আমি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলুম, প্রত্যেকটা কয়লার টুকরো যাচাই করে দেখেছি। এই একটাই পাওয়া গেছে। একটা অন্তত না পেলে ভাগনে দুটোর কাছে আমার প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যেত।

আমাদের দিকে ফিরে বললেন, এবার বুঝলি তো? গাছ লক্ষ-লক্ষ বছর মাটির তলায় চাঁপা পড়ে গেলে কয়লা হয়ে যায়, তা জানিস তো? সেই কয়লা থেকে গ্র্যাফাইট, তার থেকে হীরে। তাহলে গাছ থেকেই হীরের জন্ম নয়?

জগুদাদু বললেন, এদিককার কোনও খনিতে কখনো কেউ পায়নি। তুই কী করে বুঝলি, এখানে হীরে থাকতে পারে!

বিশ্বমামা বললেন, আমাদের জাম্বোর হাতে গ্র্যাফাইটের টুকরোটা দেখে। অবশ্য গ্র্যাফাইট থাকলেই যে হীরে থাকবে তার কোনও মানে নেই। তবু একটা চান্স নিলাম। ক্ষতি তো কিছু ছিল না।

হীরের পাথরটা হাতে নিয়ে আমরা সবাই নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগলাম। সত্যি-সত্যি হীরে!

বিশ্বমামা বললেন যে, এখন অনেক কাটাকুটি করতে হবে। ঠিক মতন কাটতে না পারলে এর থেকে জেল্লা বেরোয় না। তবে এটা যে আসল হীরে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

বিলুদা বললে, গ্র্যাফাইট থেকে যদি হীরে হয়, তাহলে গ্র্যাফাইটে খুব চাপ দিয়ে আরও হীরে বানানো যায় না?

বিশ্বমামা বললেন, না রে, গবেট, সম্ভব নয়। কয়লা জিনিসটা আসলে কী? কার্বন। গ্র্যাফাইটও কার্বন, হীরেও কার্বন। কিন্তু এদের পরমাণুর বিন্যাস আলাদা-আলাদা। প্রকৃতির খেয়ালেই এরকম হয়, আমাদের সাধ্য নেই পরমাণু বিন্যাস বদলাবার।

তারপর বিশ্বমামা বললেন, জগুমামা, এ হীরেটা যে আবিষ্কার করেছে, তারই পাওয়া উচিত। যদিও তোমার পুকুর থেকে উঠেছে।

জগুদাদু বললেন, তুই নিতে চাস তো নে, আমার আপত্তি নেই।

বিশ্বমামা বললেন, আমি কেন নেব? আমি তো আবিষ্কার করিনি। সে কৃতিত্ব জাম্বোকে দিতে হবে। জাম্বো যদি একটা গাছে হীরের ফুল না আঁকত, তাহলে ব্যাপারটা আমার মাথাতেই আসত না। দেখো, বিজ্ঞানের বড়-বড় তত্ত্বের চেয়েও মানুষের কল্পনা কত শক্তিশালী। ওইটুকু একটা ছেলে, একটা গ্র্যাফাইটের টুকরো পেয়েই হীরের ফুল আঁকছিল কেন? এই হীরেটা আমরা জাম্বোকেই উপহার দেব।

সবাই মিলে আমরা ডাকতে লাগলুম, জাম্বো, জাম্বো—।

রাত্তিরবেলা একা একা

বাড়িটা ভাঙাচোরা হলেও দোতলার একখানা ঘর মোটামুটি বাসযোগ্য আছে। একটা জানলায় কিছুই নেই, অন্য জানলাটায় লোহার শিক দেওয়া। দেওয়ালে চুনবালি খসে গেছে অনেক জায়গায়।

মেঝেটা বেশ নোংরা আর কোণে-কোণে মাকড়সার জাল বুনেছিল, সেগুলো আমরা পরিষ্কার করে দিয়েছি, বিশ্বমামা তবু লম্বা নাকটা কুঁচকে বললেন, আরশোলার নাদির গন্ধ বেরুচ্ছে। এই গন্ধে আমার ঘুম আসবে না।

বিশ্বমামা তার বিখ্যাত নাকে এমন সব গন্ধ পান, আমরা পাই না। এ ঘরে ঢুকেই বিশ্বমামা মাকড়সার গন্ধ পেয়েছিলেন, যদিও মাকড়সার গায়ে কোনও গন্ধ থাকে কি না, তা জানি না আমরা কেউ। যাই হোক, জলে ফিনাইল মিশিয়ে ঘরটা ধুয়ে-মুছে দেওয়া হল।

চরণদাদার বাড়ি থেকে একটা খাটিয়া এনে পেতে দেওয়া হল এই ঘরে। তার ওপর ধপধপে ফরসা চাদর। একটা কুঁজো ভর্তি জল। ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি নেই।

এ বাড়িটার নাম মল্লিকবাড়ি। এককালে মল্লিকরা ছিল এই গ্রামের জমিদার। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে তারা এ গ্রাম ছেড়ে পাকাপাকি চলে গেছে শহরে। তারপর থেকে বাড়িটা একটু-একটু করে ধ্বংস হচ্ছে। এখন দূর থেকে পোড়োবাড়ির মতো দেখায়। তবু আজকালকার দিনে কোনও বাড়ি খালি পড়ে থাকে না। কেউ না কেউ এসে দখল করে নিতই। কিন্তু সন্ধের পর এ বাড়ির ধারে-কাছে কেউ আসে না। ভূতের ভয়। এমনকী এই গ্রামে জটাধারী নামে একটা পাগল আছে, সে পর্যন্ত এখানে থাকতে পারেনি। সেই জটাধারী একবার এই দোতলার ঘরে শুতে এসে হঠাৎ বাবারে-মারে বলে চিৎকার করতে-করতে দৌড়ে পালিয়েছিল।

বিংশ শতাব্দী শেষ হতে চলল, এখনও ভূতের ভয়? ভূত বলে কিছু আছে নাকি?

চরণদাদা এই গ্রামের স্কুলের হেড মাস্টার। লেখাপড়া জানা মানুষ। এক সময়ে ভালো ফুটবল খেলতেন, একবার নন্দাদেবী পাহাড়ে অভিযানে গিয়ে চূড়ায় উঠেছিলেন। সেই চরণদাদা বললেন, আরে আমিও কি ভূতে বিশ্বাস করতুম নাকি? আমাকে রাত্তিরবেলা শ্মশানে যেতে বল, আমি একা-একা চলে যাব। কিন্তু এই মল্লিকবাড়িটায় সত্যি-সত্যি কী যেন আছে। আমি নিজে দেখেছি।

বিশ্বমামা জিগ্যেস করেছিলেন, তুমি কী দেখেছ নিজের চোখে?

চরণদাদা বললেন, বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে আমি একবার ওখানে রাত কাটাতে গিয়েছিলাম। পারিনি। রাত্তির দশটা-এগারোটা পর্যন্ত কিছুই হয়নি। যেই বারোটা বাজল, ও বাড়িতে কোনও ঘড়ি নেই, থাকতেই পারে না। তবু একটা দেয়াল ঘড়িতে ঢং-ঢং করে বারোটা শব্দ পাওয়া গেল পাশের ঘরে। তারপরেই পায়ের শব্দ। হঠাৎ দেখি ঘরের মধ্যে একটা লোক, বেশ দামি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। কিন্তু তার পাঞ্জাবি রক্তে ভেসে যাচ্ছে, মেঝেতেও টপ-টপ করে পড়ছে রক্ত। মুখখানা একেবারে থ্যাতলানো, একটা চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। একেবারে বীভৎস দৃশ্য! আমি প্রথমে ভাবলুম, চোখের ভুল, ভালো করে চোখ কচলে দেখলুম। সত্যিই একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমি আর থাকতে না পেরে এক দৌড়। পরের দিন গিয়ে দেখি, মেঝেতে রক্তটক্ত কিছু নেই, পাশের ঘরে ঘড়িও নেই। এটা কী করে ব্যাখ্যা করব তা আমি এখনও জানি না। সেই দৃশ্যটা ভাবলে এখনও আমার বুক কাঁপে।

বিশ্বমামা জানতে চাইলেন, নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনও গল্প আছে? পুরোনো জমিদার বাড়ি, ওইভাবে কেউ খুন-টুন হয়েছিল।

চরণদাদা বললেন, সে গল্প আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। ওই বাড়িতে

জমিদারের ছোট ছেলেটি ছিল দারুণ অত্যাচারী। কত প্রজার বাড়ি-ঘর সে জ্বালিয়ে দিয়েছে তার ঠিক নেই। একবার এক গোমস্তার ওপর রাগ করে তার গলা টিপে মেরে ফেলেছিল। তারপর সেই গোমস্তার ভাই একটা রাইফেল নিয়ে গুলি চালিয়ে দেয়। গুলিটা লেগেছিল মুখে। সেই ছোট কুমারের অতৃপ্ত আত্মাই ফিরে-ফিরে আসে প্রতিশোধ নিতে।

বিশ্বমামা বললেন, অর্থাৎ গল্প হল সত্যি। পুরোনো ভাঙা-বাড়ি সম্পর্কেই এইরকম একটা-একটা গল্প থাকে। অনেক দিন ধরেই শুনতে-শুনতে মনে হয় সত্যি। কেউ প্রথমেই একবার রটিয়ে দেয় যে ওই রকম একটা ভূত দেখেছে, তারপর অন্যরা সেইকথা ভাবতে-ভাবতে ভূত দেখে ফেলে। ভূত হল, মনে-মনে তৈরি করা ভূত!

চরণদাদা বললেন, কিন্তু আমি যে নিজে দেখেছি।

বিশ্বমামা বললেন, তা তো দেখতেই পারো। মরুভূমিতে গিয়ে মরীচিকা দেখে না? তাও তো নিজের চোখেই দেখে। একলা-একলা অনেকক্ষণ ধরে একটা কথা ভাবলে, সেটা হঠাৎ চোখের সামনে দেখা যেতেই পারে। এটা হচ্ছে মনের ছবি। আসলে সত্যি নয়!

চরণদাদা বললেন, তুমি ওই বাড়িতে একলা থাকতে পারবে রাত্তিরে?

বিশ্বমামা বললেন, সে তো আমি তোমার কাছে শুনতে-শুনতেই ঠিক করে ফেলেছি। আজ রাত্তিরে গিয়ে থাকব। একবার লোকের ভয় ভেঙে গেলে। তোমরা ওই বাড়িটা সারিয়ে-টারিয়ে ইস্কুল করতে পারো, কিংবা হাসপাতাল।

আমি আর বিলুদা বায়না ধরেছিলুম, বিশ্বমামার সঙ্গে থাকব। আমাদেরও ভূত দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।

বিশ্বমামা গম্ভীরভাবে বললেন, না, নিলু আর বিলুকে সঙ্গে নেওয়া যাবে না। তিনজনে মিলে আড্ডা মারলে মনটা একাগ্র হয় না। আর কিছু দেখা যায় না। যত ভূতের গল্প শোনা যায়, লক্ষ করে দেখবি, সবাই একা-একা ভূত দেখে। অনেকে মিলে একসঙ্গে ভূত দেখা যায় না।

রানীগঞ্জ থেকে ফেরার পথে আমরা চরণদাদাদের গ্রামে এসেছি বেড়াতে। এখানকার আম খুব বিখ্যাত। আর চরণদাদার বাড়ির পেছনের পুকুরে রয়েছে বড়-বড় গলদা চিংড়ি। চরণদাদা হঠাৎ মত পালটে বললেন, না, থাক, বিশ্ব, তোমার যাওয়ার দরকার নেই। কী দরকার ওসব ঝঞ্ঝাটে।

বিশ্বমামা বললেন, তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি? আমার ব্যাপারে ভয়ের কী আছে? আমি যাচ্ছি একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে। যদি সত্যি-সত্যিই একটা ভূত দেখতে পাই, তাহলে নতুন করে আবার বিজ্ঞানচর্চা শুরু করতে হবে। আমি জানি, ভূত বলে কিছু থাকতে পারে না। মরা মানুষের পক্ষে আবার শরীর ধারণ করা ফিজিকসের নিয়ম অনুযায়ী অসম্ভব। ভূতটাকে দেখলেই জাপটে ধরে দেখতে হবে, সত্যি-সত্যিই তার শরীর আছে না সবটাই কল্পনা।

চরণদাদা বললেন, সে যদি তোমার কোনও ক্ষতি করে?

বিশ্বমামা বললেন, ভূতে আবার কী ক্ষতি করবে? লোকে ভূত দেখে ভয় পায়,

ভয়ে পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে হাত-পা ভাঙে, কিন্তু ভূত কি কারুকে ছোঁয়? সেরকম তো শোনা যায় না?

চরণদাদা বললেন, জটাধারীর নাকি গলা টিপে ধরেছিল।

বিশ্বমামা বললেন, সে তো একটা পাগল! সে যা খুশি বলতে পারে। নাঃ, শেষে ভূতের পক্ষে মানুষকে ছোঁওয়া সম্ভব নয়। একজন ফরাসি বৈজ্ঞানিক স্বয়ং শয়তানকে দেখে কী বলেছিলেন জানো না! বাইবেলের যে শয়তান, তার মাথায় দুটো শিং আছে, পায়ে আছে ঘোড়ার মতন ক্ষুর। বৈজ্ঞানিকটি তাঁর বাড়ির বাগানে সেই শয়তানকে দেখে বললেন, ওহে শয়তান, তুমি তো মানুষের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না? মিছিমিছি তোমাকে দেখে এতকাল লোকে ভয় পেয়েছে কেন? তোমার মাথায় শিং আর পায়ে ক্ষুর, অর্থাৎ তুমি গোরু-ঘোড়ার মতন তৃণভোজী প্রাণী। মানুষকে কামড়াবার ক্ষমতা তো তোমার নেই!

সুতরাং বিশ্বমামার জন্যে সেই মল্লিকদের বাড়িতে রাত কাটাবার সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। আটটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্বমামা বিশেষ একটা কবিতার বই, একটা টর্চ ও একটা হ্যাজাক বাতি নিয়ে রওনা হওয়ার আগে বললেন তোমাদের একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি। মাঝরাত্তিরে তোমরা কেউ ভূত সেজে আমাকে ভয় দেখাতে যেও না। অনেক সময় চোর-ডাকাতরা, নিজেদের একটা আস্তানা গোপন রাখার জন্য এইসব বাড়িতে লুকিয়ে থেকে অজ্ঞ লোকদের ভয় দেখায়। সেরকম কেউ যদি আসে, তার কপালে বিপদ আছে। আমি সঙ্গে রিভলবার রেখেছি, সেরকম কিছু দেখলেই গুলি করব।

আমরা খানিকদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিলুম বিশ্বমামাকে। দরজা দিয়ে উনি একাই ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরে দোতলার ঘরটার ভাঙা জানলায় দেখা গেল হ্যাজাকের আলো। বিশ্বমামা জানলার কাছে দাঁড়ালেন, আমরা দেখতে পেলুম ওঁর সিলুয়েট মূর্তি।

চরণদাদার বাড়ি খানিকটা দূরে, সেখান থেকে মল্লিকবাড়ি দেখা যায় না। কিন্তু রাত ন'টার পরই গ্রামের অধিকাংশ বাড়ির আলো নিভে যায়, দূর থেকেও বিশ্বমামার হ্যাজাকের আলোটা একটু-একটু চোখে পড়ে। একটু পরেই সারা গ্রাম নিস্তব্ধ। কুকুরের ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

বিশ্বমামা বললেন, আমাদের রাত জেগে অপেক্ষা করার দরকার নেই। উনি সারা রাত কবিতা পড়ে কাটিয়ে দেবেন, যাতে ভূতের চিন্তা মাথায় না ফেরে। কবিতা পড়ার সময় অন্য কোনও চিন্তা মাথায় আসে না। যদি ঘুম এসে যায় সেজন্য সঙ্গে নস্যি রেখেছেন, নস্যি টেনে ঘুম তাড়াবেন।

আমরা শুয়ে-শুয়ে গল্প করতে লাগলাম। চরণদাদার পাহাড়ে চড়ার গল্প। পাহাড়েও নাকি অনেকে ভূতের ভয় পায়। যদি কেউ বেশ অনেক ঘণ্টা একা বসে থাকে, তা হলেই ওই ভয়টা এসে চেপে ধরে। যেসব অভিযাত্রী সেই পাহাড়ে উঠতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে, তাদের কারুকে-কারুকে দেখা যায় চোখের সামনে। চরণদাদা অবশ্য সেরকম কিছু দেখেননি। আর কোথাও তিনি অবশ্য ভূতের ভয় পাননি, শুধু এই মল্লিকবাড়িতেই—

বিলুদা আমাকে জিগ্যেস করল, নিলু, তুই পারবি এরকম বাড়িতে একা থাকতে?

আমি বললুম, একা? তা পারব না। অন্যদের সঙ্গে পারব। নিজের বাড়িতেই একা-একা শুতে এক-একদিন ভয় করে!

চরণদাদা জিগ্যেস করলেন, বিলু তুমি পারবে?

বিলুদা বলল, বিশ্বমামাটা বড্ড গোঁয়ার। কেন আমাদের সঙ্গে নিল না? আমি রাত্তিরে কোনও অচেনা বাড়িতে একলা থাকার কথা ভাবতেই পারি না। আমি ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু ভয় পাই! একটা কঙ্কাল কখনো হাঁটতে পারে না জানি, তার চোখ নেই, সে দেখতে পারে না, তার মাথায় ঘিলু নেই, সে চিন্তা করতে পারে না, তার পেশি কিংবা স্নায়ু নেই, সে হাত-পা নাড়তে পারবে না, এসবই জানি, তবু রাত্তিরে চোখের সামনে একটা কঙ্কাল দেখতে পেলে সব ভুলে গিয়ে ভয় পেয়ে যাব।

আমি জিগ্যেস করলুম, ক'টা বাজে?

চরণদাদা বালিশের তলা থেকে হাতঘড়ি বার করে নিয়ে দেখে বললেন, সওয়া বারোটা।

আমি বললুম, দূরে বিশ্বমামার হ্যাজাক বাতিটা যে মিটমিট করছিল, সেটা আর দেখা যাচ্ছে না!

বিলুদা বলল, চুপ-চুপ! কীসের যেন শব্দ শোনা যাচ্ছে না দূরে?

চরণদাদা বললেন, বিশ্বর গলা নাকি? সবাই মিলে আমরা উঠে পড়ে ছুট দিলুম মল্লিকবাড়ির দিকে।

বেশি দূর যেতে হল না, খানিকটা গিয়েই দেখা গেল বিশ্বমামা টর্চ জ্বেলে দৌড়ে আসছেন এদিকে।

আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন, বাপরে বাপ! উফ! ওখানে টেঁকা যায়?

চরণদাদা ব্যগ্র হয়ে জিগ্যেস করলেন, দেখলে? তুমিও তাহলে দেখতে পেলে?

বিশ্বমামা বললেন, কী দেখব!

ভূত! মানে সেই ছোট কুমারকে, রক্ত মাখা মুখ।

ধ্যুৎ! যত সব গাঁজাখুরি গল্প! ভূত বলে কিছু আছে নাকি? আমি মন দিয়ে কবিতা পড়েছি, তাই ওসব আজেবাজে চিন্তাও আমার মাথায় আসেনি। ভূত তাড়াবার খুব ভালো ওষুধ হচ্ছে কবিতা পড়া!

তাহলে পালিয়ে এলে কেন?

ভয়ের চোটে!

তুমি ভয় পেয়েছ? তাহলে, তুমিও শেষপর্যন্ত ভয় পেলে!

পাব না কেন? ভূতের ভয় নেই, তা বলে অন্য কিছুতে ভয় পাব না, তা কী বলেছি?

কীসের ভয় পেলে?

বারোটার পরেই ওগুলো এল! রিভলবার থাকলেও, কোনও কাজে লাগল না। কামান দেগেও ওদের শেষ করা যায় না।

কামান দেগেও শেষ করা যায় না? কী? ও বুঝেছি, মশা মারতে কামান দাগা!

না, মশা নয়, আরশোলা! আমি বই পড়ছিলাম হঠাৎ শুনি ফরফর শব্দ। আরশোলা উড়ছে। প্রথমে একটা-দুটো তারপর অসংখ্য। মাঝে-মাঝে আরশোলার সারা ঘর উড়ে বেড়াবার শখ হয়, গায়ে এসে পড়ে। কোথা থেকে এতো আরশোলা এল কী জানি। আরশোলা গায়ে বসলে আমার ঘেন্নায় মরে যেতে ইচ্ছে করে! ওখানে আর থাকব কী করে!

আরশোলা মাঝে-মাঝে ওড়ে বটে। কিন্তু অত আরশোলা।

সকালবেলা ওই ঘর ঝাঁট দিয়ে অনেক আরশোলার নাদি ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেই রাগেই বোধ হয় ওরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল।

বিলুদা বলল, বিশ্বমামা হঠাৎ অত আরশোলা, ভূতই তবে আরশোলার রূপই ধরে আসেনি তো?

বিশ্বমামা ধমক দিয়ে বললেন, ফের বাজে কথা। ভূত আবার কী? আরশোলা হচ্ছে আরশোলা!

বিলুদা বলল, তোমার তাহলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাটা পুরো হল না বলো! সারারাত না থাকলে...এক কাজ করলে হয়, কাল রাতে একটা মশারি টাঙিয়ে তুমি আবার থাকতে পারো। মশারি থাকলে মশা বা আরশোলা কিছুই করতে পারবে না।

বিশ্বমামা বললেন, আর হবে না। আমার জরুরি কাজ আছে। কাল ভোরবেলাই কলকাতায় ফিরে যেতে হবে।

আমাদের এখানে আর তিনদিন থাকার কথা ছিল। হঠাৎ বিশ্বমামার কী জরুরি কাজের কথা মনে পড়ল জানি না। ভূত নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ব্যাপারেও তার আর কোনও উৎসাহ দেখা গেল না।

মেঘচোর

পুরন্দর চৌধুরী চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে ফেলে বললেন. অসীমা এবার আমি তোমাকে এমন একটা দৃশ্য দেখাব, যা তোমার আগে পৃথিবীতে কেউ কখনও দেখেনি। এরকম দৃশ্য কেউ কল্পনাও করেনি।

ছোট একটা রকেট আকাশের এক জায়গায় গোল হয়ে পাক খাচ্ছে। কমপিউটারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কমপিউটারই রকেটটাকে ঘোরাচ্ছে।

দুটি মাত্র আসন। পাশাপাশি বসে আছেন, পুরন্দর ও অসীমা। পুরন্দরের মুখখানা

ফরসা ও একেবারে গোল প্রায় চাঁদের মতন, তাঁর চোখের মণি দুটো নীল! তাঁর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। বৃষ্টি-বিজ্ঞানী হিসেবে সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম। সাহারা মরুভূমিতে তিনি একমাসে একশো ইঞ্চি বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছেন। এজন্যে তাঁর প্রশংসা যত হয়েছে, নিন্দেও হয়েছে প্রায় ততটাই।

মেঘ থেকে ইচ্ছেমতন বৃষ্টিপাত ঘটানো এখন আর নতুন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু তিনি অন্য দেশ থেকে মেঘ তাড়িয়ে এনে সাহারায় বৃষ্টি ঝরিয়েছেন। সেই দেশে এবার বৃষ্টি কম হবে। একে মেঘ-চুরি বলা যায়। রাষ্ট্রসংঙ্ঘে অনেকগুলি দেশ দাবি তুলেছে যে মেঘ-চুরি আইন করে বদলানো দরকার।

অসীমার বয়েস সাতাশ। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে। পুরন্দর চৌধুরী বোস্টন শহরে একটা আবহাওয়ার বিষয়ে আলোচনায় যোগ দিতে এসেছিলেন। সেখানে অসীমার সঙ্গে তাঁর হঠাৎ আলাপ হয়। অসীমা নিজেই পুরন্দর চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল।

সেই আলোচনা সভায় কারপভ নামে একজন বৈজ্ঞানিক পুরন্দরকে মেঘ-চোর বলে গালাগালা দেওয়ায় তিনি এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে চিৎকার করে কিছু বলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান।

যখন তিনি চোখ মেললেন, তখন তিনি দেখলেন তাঁর মাথার কাছে বসে আছে এই সুন্দরী মেয়েটি। সে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

এই দুনিয়াব পুরন্দর চৌধুরীর আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। তিনি বিয়েও করেননি। বিদেশে একটি অচেনা বাঙালি মেয়েকে তাঁর সেবা করতে দেখে তিনি অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিলেন, তুমি কে?

অসীমা বলেছিল, আপনি আমায় চিনতে পারবেন না কিন্তু আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মেয়ে।

পুরন্দর প্রথমে বিশ্বাস করেননি। তাঁর একটি ভাই ছিল ঠিকই, কিন্তু সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে পঁচিশ বছর আগে! সেই ভাইয়ের নাম ছিল দিকবিজয়।

অসীমা বলেছিল, আমার বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে যাননি, তিনি দেশ ছেড়ে ঘুরতে-ঘুরতে শেষপর্যন্ত আলাস্কায় এসে সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। বিয়ে করেছিলেন একটি এস্কিমো মেয়েকে। তিনিই আমার মা। আমার বাবার বাঁ-চোখের ভুরুর ওপর একটা কাটা দাগ ছিল, খুব ছোটবেলায় আপনিই তাঁকে একবার স্কেল দিয়ে ওইখানে মেরেছিলেন তাই না? আমার বাবা কিন্তু আপনাকে খুব ভালোবাসতেন, মৃত্যুর আগেও আপনার কথা বলেছিলেন।

বিদেশে এসে এমনভাবে একজন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়কে খুঁজে পেয়ে পুরন্দর চৌধুরী দারুণ খুশি হয়ে উঠেছিলেন। তারপর তিনি আর আসীমাকে ছাড়তে চাননি। তাঁর নিজস্ব রকেটে তিনি অসীমাকে নিয়ে বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আবহাওয়ার নানারকম রহস্য দেখাচ্ছেন।

ঘুরতে-ঘুরতে এখন ওঁরা এসেছেন আলাস্কার আকাশে। অসীমা তার বাবা-মায়ের

সঙ্গে যেখানে থাকত, সে জায়গাটাও দেখা হয়ে গেছে। সেখানে অবশ্য এস্কিমোদের ইগলুর বদলে এখন বড়-বড় এয়ারকন্ডিসানড বাড়ি উঠেছে। পুরন্দর চৌধুরী বললেন, নিচের দিকে তাকিয়ে দেখো, ওটা কী দেখছ বলতে পারো?

অসীমা বলল, দেখতে পাচ্ছি একটা সোনালি রঙের পাহাড়। চূড়ায় বরফের ওপর রোদ পড়েছে বলে সত্যিই সোনার মতন ঝকঝক করছে।

ওই পাহারটার নাম জানো?

অসীমা ইতিহাসের ছাত্রী হলেও ভূগোলও বেশ ভালোই জানে। সে বলল, আমি আলাস্কার এত দূরে কখনো আসিনি বটে, তবে এই পাহাড়টার নাম মাউন্ট চেম্বারলিন। তার পাশেই যে কুয়াশায় ঢাকা হ্রদ, তার নাম লেক শ্রেভার।

পুরন্দর খুশি হয়ে বললেন, বাঃ! এবার তোমাকে আমি যা দেখাব, তা কিন্তু তুমি কাউকে বলতে পারবে না। সারা পৃথিবীতে দারুণ হই-চই হবে এই নিয়ে, কিন্তু তুমি মুখ খুলতে পারবে না। ব্যাটা কারপভ কীরকম জব্দ হয় এবার দেখো।

অসীমা মৃদুভাবে বলল, বৈজ্ঞানিকদের উচিত নয়, কিন্তু একজন আর একজনকে জব্দ করা।

বোকাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, তাদের জ্ঞান কতটুকু! আমাকে মেঘ-চোর বলে, এত সাহস? আমি অন্যায়টা কী করেছি? সাইবেরিয়া থেকে মেঘ এনেছি সাহারায়। সাইবেরিয়ায় অত বরফ, সেখানে বৃষ্টি না হলে ক্ষতি কী আছে?

অসীমা বলল, কিন্তু একবার এরকম শুরু করলে, তারপর যদি যে-কোনও দেশ অন্য দেশের মেঘ চুরি করতে শুরু করে? মনে করুন, ইন্ডিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের ঝগড়া হল, তখন আপনি পাকিস্তান থেকে সব মেঘ উড়িয়ে নিয়ে চলে এলেন। তখন সে দেশের মানুষের কী অবস্থা হবে?

আমি পৃথিবীর মানুষকে আর একটা জিনিস শিখিয়ে দিয়ে যাব। যাতে ওরকম মেঘ চুরি হলেও কোনও ক্ষতি হবে না। যাক গে, সে কথা পরে। তুমি তো ইতিহাসের ছাত্রী, পৃথিবীতে শেষ তুষার-যুগ কবে এসেছিল জানো?

এটা ঠিক ইতিহাসের বিষয় নয়, প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। তবু আমি এটা জানি। শেষ হিমযুগ হয়েছিল তেরো হাজার বছর আগে।

ঠিক বলছ? এই লেক শ্রেভার তৈরি হয়েছিল সেই সময়ে। মাউন্ট চেম্বারলিনের বরফ গলা জল এই লেকে এসে জমে। আবার এই জল বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়ে মাউন্ট চেম্বারলিনের চূড়ায় গিয়ে আবার বরফ হয়ে যায়। এই সাইকেল চলছে।

যেমন সমুদ্রের জল মেঘ হয়ে উড়ে যায়। আবার মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে সমুদ্র ভরাট হয়।

ওটা তো ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের মতন হল। আসল বৃষ্টির হিসেবটা তোমাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সারা বছরে পৃথিবী থেকে কত জল বাষ্প হয়ে মেঘে উড়ে যায় জানো? পঁচানব্বই হাজার কিউবিক মাইল। তার মধ্যে আশি হাজার কিউবিক মাইলই যায় সমুদ্র থেকে। আবার ঠিক আশি হাজার কিউবিক মাইলই বৃষ্টি হয়ে সমুদ্রে ফিরে আসে। আর মাত্র পনেরো হাজার কিউবিক মাইল বৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীর এত মানুষ, জীবজন্তু,

গাছপালা সব বেঁচে আছে। প্রকৃতির হল এটাই নিখুঁত হিসেব। কিন্তু এবার মানুষের সংখ্যা দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং মানুষের জন্যে বেশি বৃষ্টি দরকার।

আপনি এখানে আমাকে কী দেখাবেন বলেছিলেন?

হ্যাঁ। এই যে নিচে দেখছ লেক শ্রেভার, এখানে একটা মজার ব্যাপার ঘটছে। এখানে যতখানি জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। ঠিক ততখানি বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসছে না। কিছুটা কম ফিরে আসছে। অর্থাৎ হ্রদটা একটু-একটু করে শুকোচ্ছে। আমি হিসেব করে দেখেছি, এই হ্রদটা পুরোপুরি শুকোতে আরও দশ হাজার বছর লাগবে।

আপনি কী করে জানলেন? ঠিক দশ হাজার বছর লাগবে?

অঙ্কের হিসেব। তুমি পৃথিবীর যে-কোনও পাহাড়, নদী, পুকুর, খাল-বিলের কাছে আমায় নিয়ে যাও, আমি অঙ্ক কষে বলে দেব, সেখান থেকে কত জল বাষ্প হচ্ছে আর কত জল বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসছে। এই অঙ্ক আমার থেকে ভালো আর কেউ জানে না। কারপভও কিছুটা জান, তবে আমার চেয়ে কম।

আমি তো ইতিহাস পড়ি, অঙ্ক আমার মাথায় বিশেষ ঢোকে না।

ইতিহাসেও তো অঙ্ক লাগে। অবশ্য সাধারণ যোগ-বিয়োগ। আচ্ছা ইতিহাসের ছাত্রী, তুমি আটলান্টিস নামে লুপ্ত সভ্যতার কথা জানো? সেটা কোথায় ছিল বলো তো?

এটাও কিন্তু ইতিহাসের বিষয় নয়। আটলান্টিসের ব্যাপারটা গ্রিক লেখকদের জল্পনা-কল্পনা। অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি হয়েছে, এখনও কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি ঠিকঠাক।

আমি যদি বলি এই লেক শ্রেভারের তলাতেই চাপা পড়ে আছে?

সেটা দশ হাজার বছর পরে জানা যাবে।

পুরন্দর চৌধুরী হা-হা করে হেসে উঠলেন। ছোট্ট একটা মশলার কৌটো খুলে একটা লবঙ্গ খেয়ে বললেন, তুমি একটা নেবে নাকি?

অসীমাও একটা লবঙ্গ নিল।

পুরন্দর চৌধুরী বললেন, তুমি আর আমি কেউই তো দশ হাজার বছর বাঁচব না। ততদিনে পৃথিবীতে মানুষই থাকবে কিনা সন্দেহ! দশ হাজার বছর তো দূরের কথা, আমি দশ বছরও অপেক্ষা করতে রাজি নই!

অসীমা চোখ বড়-বড় করে বলল, তাহলে কি আপনি এই লেকটা খুঁজে দেখতে চান? এর তো প্রায় সবটাই বরফে ঢাকা!

পুরন্দর মাথা নেড়ে বললেন, খোঁড়াখুঁড়ি তো তোমাদের কাজ! আমি জল নিয়ে কারবার করি। জল কি খুঁড়তে হয়? এই যে এত বড় একটা লেক পড়ে আছে এখানে, এটা অপ্রয়োজনীয়, তাই না? কোনও মানুষ এখানে আসে না। দশ হাজার বছর ধরে লেকটা নিজে-নিজে শুকোতই, অত দিন অপেক্ষা না করে এখনই এটাকে শুকিয়ে ফেললে কেমন হয়?

এতবড় লেকটা শুকোবেন কী করে? সেই জল ফেলবেন কোথায়?

মেঘ করে ছড়িয়ে দেব! সেই মেঘ কারপভের দেশে পাঠিয়ে দেব। ও খুব মেঘ-মেঘ বলে চ্যাঁচামেচি করছিল যে!

এই বিশাল হ্রদের জল যদি মেঘ হয়ে যায়, সেই মেঘ থেকে অন্য জায়গায় বৃষ্টি হবে। একসঙ্গে হঠাৎ বৃষ্টি বেড়ে গেলে পৃথিবীর দারুণ কোনও ক্ষতি হয়ে যাবে না।

কী আর হবে! সাইবেরিয়ায় বড়জোর এক ইঞ্চি বেশি বরফ জমবে!

অসীমা হেসে ফেলে বলল, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। এতবড় লেক কি শুকিয়ে ফেলা যায়?

পুরন্দর বললেন, বড়-বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যখন প্রথম হয়, তখন সবাই অবিশ্বাস করে। তোমাকে আর একটি ছোট্ট ঘটনা বলি। ঘটনাটা ছোট কিন্তু তার ফলটা হয়েছিল বিরাট। দশ লক্ষ বছরেরও কিছু বেশি আগে, এই পৃথিবীর উত্তাপ হঠাৎ একটু কমে গিয়েছিল। এরকম হয়। পৃথিবীর উত্তাপ মাঝে-মাঝে কমে-বাড়ে। মাঝে-মাঝে এই ধরো—দশ-পনেরো হাজার বছর পরে-পরে। আমি যে-বারের কথা বলছি, সেবারে পৃথিবীর উত্তাপ কমেছিল মাত্র তিন থেকে চার ডিগ্রি ফারেনহাইট। সেন্টিগ্রেটের হিসাবে খুব বেশি হলে দুই পয়েন্ট দুই। অতি সামান্য, তাতেই গোটা উত্তর আমেরিকাটা বরফে ঢেকে গিয়েছিল। কোথাও-কোথাও বরফ জমে গিয়ে ছিল এক হাজার ফিট উঁচু। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? এটা কিন্তু প্রমাণিত সত্য!

অসীমা বলল, আপনার কথা অবিশ্বাস করব কেন? আমি ভাবছিলুম, আপনি আমাকে ছেলেমানুষ ভেবে ঠাট্টা করছেন!

না এসব ঠাট্টার ব্যাপার নয়। এবার বুঝলে তো পৃথিবীর উত্তাপ একটুখানি কমে গেলেই কী কাণ্ড হয়? সেইরকম পৃথিবীর উত্তাপ যদি খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়া যায়। তা হলেই সব বরফ গলতে শুরু করবে। আগে এই তাপ কমা-বাড়াটা সূর্যের ওপর নির্ভর করত। এখন মানুষই তা পারে। যেসব পাগলগুলো অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা জমিয়ে রেখেছে, সেগুলো যদি একসঙ্গে ফাটাতে শুরু করে তাহলে পৃথিবীর সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!

সেকথা জানি! এতবড় লেকটাকে বাষ্প করে দেওয়ার জন্য আপনিও একটা অ্যাটম বোমা ফাটাবেন নাকি।

আমি ওসব বোমা-টোমায় বিশ্বাস করি না! আমি পুরন্দর চৌধুরী, আমার আবিষ্কার সবসময় মৌলিক। আলাস্কার এই চেম্বারলিন পাহাড়ের কাছে জনমনুষ্য নেই। এখানেই হবে আমার আবিষ্কারের পরীক্ষা। শুধু তুমি থাকবে তার সাক্ষী। তুমি আমার ভাইয়ের মেয়ে, তাই তোমাকে এই মহান দৃশ্য দেখার সুযোগও দিচ্ছি। দশ হাজার বছর পরে যে হ্রদটার শুকিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেটাকে আমি নিশ্চিহ্ন করি দেব পাঁচ মিনিটে।

সত্যিই কী তা সম্ভব!

এক্ষুনি দেখতে পাবে!

এতবড় লেকটার জল বাষ্প হয়ে গেলে যে বিরাট মেঘ হবে, তার ধাক্কায় আমাদের রকেট টিকতে পারবে?

আমরা মেঘলোকের অনেক উঁচুতে উঠে যাব! মেঘ আর কতটা উঠতে পারে!

তারপর এতবড় মেঘকে আপনি সাইবেরিয়ায় পাঠাবেন?

সবটা নাও পাঠাতে পারি, কিছু-কিছু বিক্রিও করতে পারি। যেসব দেশে বৃষ্টি কম, তাদের কয়েক টুকরো দেওয়া যেতে পারে।

ততদিন আপনি এই মেঘ জমিয়ে রাখবেন কোথায়?

উড়িয়ে নিয়ে বেড়াব? এক দেশ থেকে আরেক দেশে উড়ে যাবে। যেকোনও দেশের ওপর দিয়েই মেঘ উড়ে যাওয়া তো বে-আইনী নয়!

কিন্তু এই মেঘের সঙ্গে অন্য দেশের মেঘ উড়ে যেতে পারে না?

তা পারে অবশ্য! জানো অসীমা, এতবড় একটা জলভরা মেঘ যদি আমাদের অধিকারে থাকে, তাহলে সেই মেঘখানাকে উড়িয়ে-উড়িয়ে আমরা পৃথিবীর সব মেঘ একসঙ্গে জুড়ে নিতে পারি। তখন কোথায় কখন বৃষ্টি হবে, তা আমি ঠিক করছি। আমি হব আকাশের দেবতা ইন্দ্র। আমার নাম পুরন্দর, তার মানে জানো তো? যে-কজন বৈজ্ঞানিক আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে, আমার নামে নিন্দে রটিয়েছে, তাদের দেশে আমি ইচ্ছে করলে এক ফোঁটাও বৃষ্টি না দিতে পারি! বিশেষ করে ওই কারপভকে আমি একবার শিক্ষা দিতে চাই!

অসীমা হঠাৎ মুখ নিচু করে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

পুরন্দর একটু রেগে গিয়ে বললেন, এখনও বুঝি তোমার সন্দেহ হচ্ছে!

অসীমা বলল, না তা নয়। আপনি পঁচানব্বই হাজার কিউবিক মাইল লম্বা এক বিশাল মেঘ নিয়ে আকাশে-আকাশে ফেরিওয়ালার মতন ঘুরছেন আর সব কটা দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীকে জিগ্যেস করছেন বৃষ্টি নেবে? বৃষ্টি নেবে? এটা ভাবতেই কীরকম মজা লাগছে?

পুরন্দর বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। এটা মজারই ব্যাপার। আমি সত্যি-সত্যি অবশ্য সেরকম কিছু করব না। আমি তো মেঘের ব্যবসাদার নই। মানুষের ক্ষতি করতেও চাই না। শুধু ওই কারপভ আমাকে মেঘ-চোর বলেছে, ওর দেশে আমি এই প্রকাণ্ড মেঘটা পাঠিয়ে দিয়ে বলব, এই নাও ধার শোধ! সাইবেরিয়ায় কয়েক ইঞ্চি বরফ বেড়ে যাবে!

অসীমা বলল, কিন্তু সাইবেরিয়ার যাওয়ার আগেই যদি এই মেঘ কোথাও ভেঙে পড়ে। কোনও দেশকে ভাসিয়ে দেয়?

পুরন্দর বললেন, সেরকম একটু ঝুঁকি আছে ঠিকই। এই কৃত্রিম মেঘের চরিত্র কী হবে তা বলা যায় না,। তবে নতুন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সময় এরকম একটু ঝুঁকি নিতেই হয়। অবশ্য আমার যতদূর ধারণা, আমি মেঘটাকে ঠিক চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব!

মনে করুন, সাইবেরিয়ার দিকে না গিয়ে এই মেঘটা আপনার দেশ কলকাতার আকাশের ওপর ভেঙে পড়ল তাহলে সেই শহরের অবস্থা কী হবে?

এরকম জল ভরা টলটলে মেঘ হঠাৎ ভেঙে পড়লে কলকাতার অর্ধেক বাড়ি ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু সেরকম অবস্থা আমি হতেই দেব না। মেঘটা এদিক-ওদিক গেলেই আমি পাঠিয়ে দেব কোনও নির্জন জায়গায়!

এবারে তিনি নিচু হয়ে তাঁর বসবার জায়গায় তলা থেকে একটি ফাইবার গ্লাসের বাক্স বার করলেন। সেই বাক্সের মধ্যে ফুটবলের সাইজের একটা ধাতব বল।

সেই বলটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, এটা দেখছ, অসীমা। এটা আমার নিজের তৈরি। মার্কারির সঙ্গে আরও এগারোটি ধাতু মিশিয়ে তৈরি হয়েছে এই নতুন অ্যালয়। এর গুণ হচ্ছে জলের ছোঁয়া লাগলেই এটা গরম হতে শুরু করে। তারপর উত্তাপ এমন বাড়বে যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। দ্যাখো, হাত দিয়ে দ্যাখো, বাতাসে যে জলকণা আছে, তাতেই এটা গরম হতে শুরু করেছে। সেই জন্যেই এটাকে এয়ারটাইট অবস্থায় রাখতে হয়!

অসীমা হাত দিয়ে দেখল, সত্যিই বলটা বেশ গরম।

পুরন্দর বললেন, আমার হিসেব অনুযায়ী জলের মধ্যে মেশবার পর পাঁচ মিনিটেই এর উত্তাপ এত বাড়বে যে গোটা লেকটারই বরফ গলে গিয়ে বাষ্প হয়ে যাবে! তারপর আমরা দেখব ওর তলায় আটলান্টিস আছে কিনা! দুরকম আবিষ্কারই হবে, কী বল!

অসীমা জিগ্যেস করল, আমরা মেঘলোকের ওপরে উঠে গেলে মেঘের তলায় কী আছে তা দেখব কী করে?

আপনার এই গোল ধাতুটা কী একবার গরম হয়েই নষ্ট হয়ে যাবে?

না-না-না, এর ধ্বংস নেই। এটা যতবার ইচ্ছে ব্যবহার করা যাবে। সব জল শুকিয়ে গেলেই এটা আস্তে-আস্তে আবার ঠান্ডা হতে শুরু করবে। এইবার তাহলে শুরু হোক!

অসীমা তার কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট রিভলবার বার করে বলল, পুরন্দর চৌধুরী, ওই বলটাকে আপনি আবার ওই এয়ারটাইট বাক্সে ঢোকান। এবার আমাদের ফিরে যেতে হবে!

দারুণ অবাক হয়ে চোখ কপালে তুলে পুরন্দর বললেন, এ কী অসীমা? তুমি ওটা তুলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, কেন?

অসীমা বলল, আপনার দিকে অস্ত্র তুলতে হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত। কিন্তু না হলে আপনি আমার কথা শুনতেন না। প্রকৃতিকে ধ্বংস করা একটা অপরাধ। আলাস্কার একটি লেক শুকিয়ে সাইবেরিয়ায় এত বড় একটা মেঘ পাঠালে প্রকৃতিতে মহা বিপর্যয় শুরু হয়ে যাবে। ডক্টর কারপভের ওপর রাগ করে আপনি পৃথিবীর ক্ষতি করতে চাইছেন।

পুরন্দর এক ধমক দিয়ে বললেন, বোকা মেয়ে! ওটা সরিয়ে রাখো! পাঁচ মিনিটে এত বড় একটা মেঘ সৃষ্টি করার রেকর্ড করব আমি। তার সঙ্গে তোমার নামটাও থাকবে আমার ভাইঝি হিসেবে।

আমি আপনার ভাইঝি নই! আমি কারপভের মেয়ে।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ, আমার মা বাঙালি মেয়ে।

তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে? তুমি একটা স্পাই।

ঠিক মিথ্যে বলিনি। আমার বাবা আপনাকে বড় ভাইয়ের মতন শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তিনি বলেন, আপনি এক দেশের মেঘ অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে পাগলামি করছেন। সমুদ্র থেকে খাল কেটে সাহারায় জল আনা হচ্ছে, অন্য দেশের মেঘ আনার দরকার নেই!

তুমি, তুমি আমার এমন একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার নষ্ট করে দিতে চাও? তুমি আমার ওপর গুলি চালাও, আমাকে মেরে ফেলে, তবু এই গোলাটা আমি হ্রদে ফেলবই। আমি মরে গেলেও পৃথিবীর লোক জানবে যে পুরন্দর চৌধুরী কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিল।

অসীমা একবার বাইরের দিকটা দেখে নিয়ে পুরন্দরের দিকে স্থিরভাবে চেয়ে রইল।

পুরন্দর রকেটের একটা অংশ খুলতে যেতেই অসীমা বলল, ওটা খুলবেন না। তাহলে আমরা গুঁড়ো হয়ে যাব!

আমি এটা বাইরে ছুঁড়বই!

ছুঁড়ুন তাহলে। কিন্তু জানলা-টানলা খুলবেন না। এই সকেটের মধ্যে ফেলুন, নিচের পর-পর কয়েকটা ভালব খুলে গিয়ে এটাকে বাইরে বার করে দেবে!

তার মানে? তুমি কী বলছ? জানলা খুলব না কেন?

ডক্টর পুরন্দর চৌধুরী আপনি আবহাওয়া-বিজ্ঞানী। আমি কিন্তু শুধু ইতিহাসের ছাত্রী নই। কমপিউটারেই আমার বিশেষ আগ্রহ। আগে থেকে প্রোগ্রাম করে রেখেছিলাম। কমপিউটার এখন রকেটটাকে বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে পৃথিবীর অনেক ওপরে নিয়ে এসেছে। লেকটাকে কি আর দেখতে পাচ্ছেন? এখান থেকে আপনার বলটা ছুঁড়লেও লেকে পড়বে না। বলটা আস্তে-আস্তে ঠান্ডা হয়ে আসছে না?

পুরন্দরের মুখটা হাঁ হয়ে গেল। এই সুন্দর চেহারার মেয়েটার মাথায় এতসব বুদ্ধি! বায়ুমণ্ডলের বাইরে তাঁর অ্যালয়টা অকেজো!

অসীমা বলটা পুরন্দরের হাত থেকে নিয়ে ফেলে দিল সকেটে। তারপর বলল, ওটা মহাশূন্যেই থাক। কোনও দিন জলের ছোঁয়া পাবে না। পৃথিবীর জল যেমন আছে তেমন থাকুক।

সাধুবাবার হাত

সন্তু বাড়ি থেকে, বেরিয়ে কলেজে যাওয়ার জন্য বাসে উঠতে যাবে, এই সময় একটি বেশ জবরদস্ত চেহারার সাধু তার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। সাধুটির মাথায় জটা, মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। বেশ লম্বা চেহারা, পরনে একটা গেরুয়া আলখাল্লা।

মেঘের ডাকের মতন গম্ভীর গলায় ভাঙা-ভাঙা বাংলায় বললেন, 'এই লেড়কা, কুথা যাচ্ছিস? কলেজে? আজ তোর কলেজে যাওয়া হোবে না। গেলে তোর খুব বিপদ হোবে! যা-যা, ঘরে ফিরে যা!'

সন্তু শুনে হাসল, একজন সাধুর কথা শুনে সে কলেজে যাওয়া বন্ধ করবে, এমন ছেলেই সে নয়।

কলেজে গেলে যদি তার বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তো সে আরও বেশি করে যাবে। বিপদের গন্ধ পেলেই তার মন চনমন করে ওঠে।

সে বলল, 'আচ্ছা সাধুবাবা, নমস্কার। তোমার কথা যদি মিলে যায়, তাহলে তোমাকে পরে একদিন মিষ্টি খাওয়াব! এখন চলি।'

হন-হন করে পা চালিয়ে সে এগিয়ে গেল মোড়ের দিকে। দূরে বাস আসছে। হঠাৎ সন্তু পকেটে হাত দিল। এই রে, সে তো পয়সা আনেনি। জামা বদলেছে একটু আগে, আগের জামার পকেটে পয়সাগুলো রয়ে গেছে। বাসে উঠলে সে ভাড়া দিতে পারত না।

আবার তাকে ফিরে আসতে হল, বাড়ির সামনে সেই সাধুবাবা দাঁড়িয়ে অন্য একটি লোকের হাত দেখছেন সন্তুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। ভাবখানা যেন এই, কী বলেছিলুম না, কলেজে যেতে পারবি না!

সন্তু মনে-মনে ঠোঁট উলটে বলল, বাসভাড়া নিতে ভুলে গেছি, এটা আবার একটা বিপদ নাকি? কী আর হতো, বড় জোর মাঝখানে বাস থেকে নামিয়ে দিত! এক্ষুনি আমি আবার পয়সা নিয়ে কলেজে যাব।

বাড়িতে ঢুকে সন্তু আগের জামাটা খুঁজতে গিয়ে দেখল, সেটা সে ভুল করে বাথরুমে ছেড়ে এসেছে, আর মা এখন বাথরুমে ঢুকে বসে আছেন।

তাহলে একটু দেরি করতে হবে। কলেজের ফার্স্ট পিরিয়ডটা বোধহয় আর করা হবে না।

এই সময় ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

সন্তু টেলিফোনের রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই ওদিক থেকে ভেসে এল তার বন্ধু জোজো-র গলা।

জোজো বলল, 'কী রে, তুই কলেজে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়িসনি তো, যাক ভালো করেছিস। আজ কলেজ ছুটি হয়ে গেছে!'

সন্তু চমকে উঠে বলল, 'অ্যাঁ? কলেজ ছুটি? কেন?'

জোজো বলল, 'আমাদের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মারা গেছেন হঠাৎ। আমি গিয়ে দেখি নোটিস ঝুলছে। তুই বাড়িতে থাক, আমি দুপুরবেলা যাচ্ছি তোর কাছে।'

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে সন্তু একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে রইল। ব্যাপারটা কী হল? রাস্তার একজন সাধুবাবা তাকে দেখে একটা কথা বললেন, অমনি সেটা মিলে গেল? পুরোটা মেলেনি, অর্ধেকটা। সত্যি তো তার কলেজে যাওয়া হল না।

দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখল, সাধুবাবা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে একজন লোকের হাত দেখছেন।

কৌতূহলী হয়ে সন্তু সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

ধুতি-পাঞ্জাবি করা মাঝবয়সি এক ভদ্রলোকের হাত ধরে সাধুবাবা বলছেন, তুম্ যব ছোটা থা, একবার তোমার পা ভেঙে গেল? ঠিক কি না?

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, সাধুবাবা, পা ভেঙেছিল। দু-মাস বিছানায় শুয়ে ছিলাম।'

সাধুবাবা মাথা নেড়ে আবার বললেন, 'এখন তোমার পেট মে দরদ্ আছে। পেট বেথা করে মাঝে-মাঝে? ঠিক কি না? শনি বক্রি আছে, শনি কাটাতে হবে?'

লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে পেটের ব্যথায় খুব কষ্ট পাই।'

'তুম নোকরি করো...না বেওসা? হাঁ-হাঁ, হাতে লেখা দেখছি বেওসা!'

'হ্যাঁ সাধুবাবা, আমি ছোটখাটো একটা ব্যবসা করি। তবে ইদানীং আমার ব্যবসার...!'

'তুমার এক বন্ধু, জিগরি দোস্ত, তুমাকে চোট দিয়েছে। তোমার বেওসা ক্ষতি করে দিয়েছে।'

লোকটি এবারে কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলল, 'হ্যাঁ, সাধুবাবা, আমার এক বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার ব্যবসার সর্বনাশ করে দিয়েছে!'

সাধুবাবা গম্ভীরভাবে বললেন, 'শনি বক্রি আছে। আংটি ধারণ করতে হবে।'

সন্তু রীতিমতন অবাক। সাধুবাবা প্রত্যেকটি কথা মিলিয়ে দিচ্ছেন কী করে? হাত দেখে এরকম বলা যায়? কাকাবাবু তা একদিন তাকে বলেছিলেন যে হাত দেখার ব্যাপারটা একেবারে গাঁজাখুঁরি? আংটি বা মাদুলি ধারণ করাটাও নিছক কুসংস্কার।

সন্তু মুখ তুলে দেখল, কাকাবাবু ও বাড়ি থেকে বেরুলেন তক্ষুনি। সে ডেকে উঠল, 'কাকাবাবু, এদিকে এসো, একবার দ্যাখো!'

সাধুবাবাকে দেখে কাকাবাবু হাসিমুখে কাছে এসে বললেন, কী , আংটি বিক্রি করার চেষ্টা হচ্ছে বুঝি?

সন্তু তাড়াতাড়ি বললে, 'কাকাবাবু, এই সাধুবাবা হাত দেখে যা বলছেন সব মিলে যাচ্ছে!'

সন্তুর কথায় মন না দিয়ে কাকাবাবু ধুতিপরা ভদ্রলোকটিকে বললেন, 'ও মশাই, সাধুবাবাজী আপনার হাত দেখে কী-কী বলেছে? ছোটবেলায় আপনার একবার হাত কিংবা পা ভেঙেছিল? আপনার পেটে কিংবা বুকে ব্যথা? আপনার অফিসের চাকরি কিংবা ব্যবসার অবস্থা এখন ভালো নয়? একজন বন্ধু আপনার ক্ষতি করেছে।'

এবারে সন্তু আর সেই ভদ্রলোক দুজনেই স্তম্ভিত! কাকাবাবু এসব কথা জানলেন কী করে?

কাকাবাবু বললেন, 'মশাই, ছেলেবেলায় কার না একবার হাত-পা ভেঙেছে। আমাদের সবারই ওরকম হয়। অনেক বাঙালিরই পেটের রোগ থাকে, মুখ দেখেই বোঝা যায়। চাকরি কিংবা ব্যবসার ব্যাপারেও সকলেরই কিছু না কিছু অভিযোগ থাকে। বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাওয়াও এমন কিছু নতুন কথা নয়। বিশেষ করে আপনাদের বয়েসেই বেশি হয়!'

সাধুবাবা কটমট করে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুম কেয়া বোলতা হ্যায়? তুম ভাগো হিয়াঁসে!'

কাকাবাবু একটু ভয় পাওয়ার ভান করে বললেন, 'ওরে বাবা, ভস্ম করে দেবে নাকি?'

সাধুবাবা বললেন, 'তুম আপনা রাস্তামে যাও! তুম্ জানো, আমি কে আছি? আমি মানুষের অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব কুছ দেখতে পারি?'

কাকাবাবু ধুতিপরা ভদ্রলোকের দিতে তাকিয়ে বললেন, 'এইসব আংটির পাথর-টাথরের সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের কোনও যোগ নেই, বুঝলেন? এটা আমার কথা নয়, পঁচাত্তর জন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক এই কথা বলেছেন। পেটের রোগ কিংবা ব্যবসার রোগ আংটিতে সারে না!'

সাধুবাবা এবারে কাকাবাবুর কাঁধে এক চাপড় মেরে বললেন, 'বেওকুফ, তুই আমার কথা অবিশ্বাস করছিস! তুই দেখবি আমার ক্ষমতা? দ্যাখ!'

সাধুবাবা এবারে নিজের মাথার জটা থেকে কয়েকটা চুল ছিঁড়লেন পট করে। তারপর ধুতিপরা ভদ্রলোকটিকে ধমকে বললেন, 'ফুঁ দেও! ফুঁ দেও!'

ভদ্রলোকটি ভয় পেয়ে ফুঁ দিলেন সেই চুলে কয়েকবার। সাধুবাবা তারপর হাতটা একবার ঘুরিয়ে কাকাবাবুর মুখের সামনে এনে মুঠো খুললেন।

দেখা গেল সেই মুঠোতে চুল নেই, রয়েছে খানিকটা ছাই!

সাধুবাবা হুংকার দিয়ে বললেন, 'দেখ-দেখ? মাথার চুল ছাই হয়ে গেল।'

কাকাবাবু বললেন, 'এ তো অতি সাধারণ ম্যাজিক। আমিও ওরকম দু-একটা ম্যাজিক জানি। ওসব থাক। সাধুবাবাজী, তুমি যে লোকজনের হাত দেখে বেড়াও তোমাকে দু-একটা প্রশ্ন করি। তুমি জাপানের হিরোসিমা-নাগাসাকির নাম শুনেছ? ওই দুটো শহরে অ্যাটম বোমা পড়েছিল। অ্যাটম বোমা ফাটার কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েক লক্ষ লোক মারা যায়। এখন বলো তো, ওই সব লোকের হাতে কি লেখা ছিল যে তারা একসঙ্গে মারা যাবে?'

সাধুবাবা বললেন, 'কেয়া অ্যাটম বোম। বোম ভোলানাথ!'

কাকাবাবু বললেন, 'ও, তুমি অ্যাটম্ বোমা কী তা জানো না! ঠিক আছে, ট্রেন কাকে বলে জানো তো? গত সপ্তাহে ট্রেন দুর্ঘটনায় যে আড়াই শো লোক মারা গেল,তাদের কি হাতে লেখা ছিল যে তারা একই দিনে এক সঙ্গে মরবে?'

সাধুবাবা ধমক দিয়ে বললেন, 'ওসব বাত ছোড়ো! তুমার হাত দেখে আমি যদি সব কুছ বলে দিতে পারি?'

কাকাবাবু বললেন, 'আমার হাত দেখার দরকার নেই। তোমার হাতটা বরং দেখি তো?'

কাকাবাবু খপ করে সাধুবাবার বাঁ-হাতটা চেপে ধরে উৎফুল্ল ভাবে বললেন, বাবা, হাতে সব লেখা আছে দেখছি! বাড়ি কোথায় ছিল বিহারে, তাই না?

সাধুবাবা আপত্তি করতে পারলেন না। মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেল।

কাকাবাবু আবার বললেন, যব লেড়কা থা, একবার হাত ভেঙেছিল না?

সাধুবাবা মাথা দুদিকে জোরে-জোরে নেড়ে বললেন, 'নেহি! নেহি মিলা!'

কাকাবাবু বললেন, 'ও হাত না, পা! পা ভেঙেছিল! ঠিক না?'

সাধুবাবা এবারে হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন।

কাকাবাবু, বললেন, 'দাঁড়াও-দাঁড়াও, আরও বলছি। তুমি যে সাধু হবে, তা তোমার হাতেই লেখা আছে দেখছি। কেন সাধু হলে? আচ্ছা সাধুবাবা তোমাদের গ্রামে একটা খুন হয়েছিল না? সত্যি কথা বলো...

সাধুবাবা এবারে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উলটো দিকে ফিরে এক দৌড় লাগালেন। মিলিয়ে গেলেন চোখের নিমেষে।

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন হো-হো করে।

ধুতিপরা লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কাকাবাবুকে জিগ্যেস করলেন, 'ও মশাই, আপনি যা বললেন, তা সত্যি নাকি? আপনি কী করে জানলেন? হাত দেখে বলে দিলেন, ওদের গ্রামে খুন হয়েছে?'

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, 'আন্দাজে! সব আন্দাজে বলেছি!'
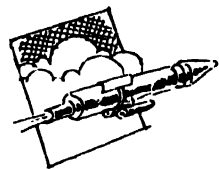
লাল জঙ্গল

চান করবার জন্যে বাথরুমে ঢুকলেই দিপুর প্রায় এক ঘণ্টা লেগে যায়। মা, বাবা, দিদি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই সময় সকলেরই ইস্কুল-কলেজ-অফিস যাওয়ার তাড়া। এখনকি বেশিক্ষণ বাথরুম আটকে রাখলে চলে? দিদি আর মা ঘুরে ফিরে বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলেন, এই দিপু, তোর হল? এতক্ষণ কী করছিস? এইবার বেরো!

দিপু কোনও উত্তর দেয় না।

বাথরুমে ঢুকলেই দিপু নানারকম স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। স্বপ্ন তো যে-কোনও জায়গাতেই দেখা যায়। তবু বাথরুমের ছোট্ট ঘরটায় দরজা-জানলা বন্ধ করে জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখার যেন বেশি সুবিধে হয়। মাথার ওপর শাওয়ারটা খুলে দিয়ে সে সামনের সাদা দেওয়ালের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তখন দেওয়ালটা হয়ে যায় ছায়াছবির পর্দা। দিপু তার ওপরে মনে-মনে সিনেমা বানায়!

কল্পনায় দিপু সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আকাশে উড়ে বেড়াতে। প্লেনে, হেলিকপ্টারে বা প্যারাসুটে নয়, এমনকী পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপেও নয়। দিপু নিজেই একটা উড়ন্ত যান তৈরি করে ফেলেছে মনে-মনে। কাগজে সেই উড়ন্ত যানটার ছবিও সে এঁকেছে অনেকবার; বড়মামাদের বাড়িতে দিপু একটা পোরসিলিনের বাথটাব দেখেছিল। পুরোনো আমলের জিনিস, বাইরেটা বেশ কারুকার্য করা। দিপুর উড়ন্ত যানের

তলাটা ঠিক ওই বাথটাবের মতন, আর ওপরটা কাচ দিয়ে ঢাকা। সেই কাচের দেয়াল প্রায় দু-মানুষ লম্বা, ভেতরে সিঁড়ি আর দুটি জানলা আছে।

দিপু যখনই ইচ্ছে করে তখনই এই উড়ন্ত যানটা তার কাছে এসে উপস্থিত হয়। তারপর সে ঘুরতে বেরোয়। কোনওদিন এভারেস্টের চূড়ায়, কোনওদিন সমুদ্রের বুকে কোনও দ্বীপে।

মনে-মনে উড়ে বেড়াতে-বেড়াতে দিপু বুঝতে পারে যে ভূগোল বইতে বা ম্যাপে কোনও উল্লেখ নেই এমন অনেক জায়গাই এখনও পৃথিবীতে আছে। যেমন এই তো গতকালই দিপু নেপালের ওপর দিয়ে উড়তে-উড়তে ধওলাগিরি শৃঙ্গ পেরিয়ে একটা উপত্যকা দেখতে পেল, যেখানে সবকটা গাছের রং লাল। এর আগে কেউ তো পুরোপুরি লাল রঙের একটা জঙ্গলের কথা বলেনি।

দিপু অনেকক্ষণ ছিল সেই উপত্যকায়।

সেই জঙ্গলে দিপু অতিকায় পাখির মতন এক ধরনের রহস্যময় প্রাণীও দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা হল না। তার আগেই দিদি ধাক্কা মেরে দিল বাথরুমের দরজায়।

কল্পনার জগতে যে কোনও ম্যাপ থাকে না, সেইটাই যা মুস্কিল। তার পরের দিন দিপু আর সেই লাল জঙ্গলটা খুঁজে পায় না। তার রকেট চালিয়ে সে নেপালের পাহাড়ি উপত্যকায় অনেক ঘোরাঘুরি করল কিন্তু সেই লাল জঙ্গলের কোনও চিহ্নই নেই। সেটা কোথায় হারিয়ে গেছে।

শুধু বাথরুমে কেন, স্কুলের ক্লাসে বসে কিংবা ঘুড়ি ওড়াবার জন্য ছাদে গিয়েও দিপু এমন অনেক কিছু দেখতে পায় যা অন্য কেউ দেখে না। যেমন সে একদিন দেখেছিল তাদের ভূগোলের টিচারের দুটি ডানা আছে।

ভূগোলের টিচার জ্যোতিপ্রকাশবাবু পড়ান বেশ ভালো, কিন্তু মানুষটি কেমন যেন অদ্ভুত। তিনি ক্লাসে পড়ানো ছাড়া আর একটাও অন্য কথা বলেন না। কখনও হাসেন না। প্রায়ই জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন বাইরের দিকে। যেন তাঁর মন পড়ে আছে অন্য কোথাও।

দিপু একদিন দেখল, ছুটির পর জ্যোতিপ্রকাশবাবু স্কুলের পেছনের দিকে দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আস্তে-আস্তে তাঁর দু-হাতের পাশ দিয়ে দুটি ডানা ফুটে বেরুল। বেশ বড় ডানা। বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মতন। গরুড়ের যেমন ডানা আছে, হাতও আছে, সেইরকম।

ভূগোলের টিচারের সেরকম ডানা দেখে সে আশ্চর্য হয়নি। এরকম তো হতেই পারে।

কিন্তু জ্যোতিপ্রকাশবাবু সেই ডানা মেলে ওড়বার উদ্যোগ করে একবার পেছন ফিরে তাকালেন। অমনি দিপুর সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়ে গেল।

তিনি সঙ্গে-সঙ্গে গলা খাঁকারি দিয়ে ডানা গুটিয়ে ফেললেন, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন নিচে।

দিপু ঠিক করেছিল ভূগোলের স্যারের সঙ্গে এই ডানার বিষয়ে একদিন আলোচনা করবে। তিনি যদি শিখিয়ে দেন যে কী করে ডানা গজাতে হয়, তাহলে বেশ হয়।

কিন্তু দিপু সে সুযোগ আর পেল না। কয়েকদিন পর থেকেই জ্যোতিপ্রকাশবাবু স্কুলে আসা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। তারপর জানা গেল তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। তাঁর বাড়ির লোকও কেউ বলতে পারে না যে তিনি কোথায় চলে গেছেন বা কোথায় যেতে পারেন। পুলিশে খবর দিয়েও কোনও লাভ হল না।

একমাত্র দিপু জানে ভূগোলের টিচারের কী হয়েছে। জ্যোতিপ্রকাশবাবু মাঝে-মাঝেই গোপন ডানা মেলে অনেক দূরে-দূরে বেড়াতে যেতেন। একদিন ওইরকম কোথাও গিয়ে ফেরার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন। কিংবা এবারে যেখানে গেছেন সেই জায়গাটাই এত পছন্দ হয়ে গেছে যে আর ফিরে আসতে মন চাইছে না।

এই কথা বললে অবশ্য কেউ বিশ্বাস করবে না। দিপুকে ভাববে পাগল কিংবা গুলবাজ। কিন্তু দিপু যে একদিন নিজের চোখে ভূগোলের টিচারের ডানা বেরুতে দেখেছে।

আর একদিন দিপু ছাদে বসে আছে একা। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। দুটো শালিক কার্নিসে বসে কিচির-মিচির করছে। বিকেল হয়ে আসছে, আকাশের মেঘ রং বদলাচ্ছে। দিপু প্রায়ই এই সময়টায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। তার ধারণা হঠাৎ মেঘের আড়ালে কোনও একদিন একটা কিছু দেখা যাবে।

সেরকম কিছু দেখতে পেল না অবশ্য, কিন্তু একসময় সে শুনতে পেল, একটা শালিক আর একটা শালিককে বলছে, আর বলিস না... আর বলিস না, ওই ছেলেটা সব বুঝতে পেরে যাবে।

দিপু চমকে তাকাল। শালিকরা ওই কথা বলছে কেন? সে কী বুঝতে পারবে? শালিকদের বুঝি গোপন কথা থাকে?

তারপর সে আরও চমকে গেল এইজন্য যে, শালিকটা মানুষের ভাষায় কথা বলে উঠল কী করে?

সে উঠে দাঁড়াতেই শালিক দুটি তার দিকে তাকিয়ে ঠিক যেন মুচকি হেসে পিড়িং করে উড়ে গেল।

দিপু খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল। শালিকরা মানুষের ভাষা শিখে নিতে পারে? মানুষের কাছাকাছিই তো ওরা থাকে। রোজ মানুষের কথা শোনে। কিন্তু কোন জিনিসটা ওরা দিপুর কাছ থেকে গোপন করতে চাইছিল?

এই ঘটনাটাও দিপু কারুকে জানাতে পারেনি। যে কেউ শুনলেই বলবে, দিপু ভুল শুনেছে।

এইসব রহস্যময় ব্যাপারের চেয়েও বাথরুমের দেয়ালটাকে সিনেমার পর্দার মতন করে নিয়ে দিপু যখন কল্পনার জগতে উড়ে যায়, তখন সে অনেক বেশি আনন্দ পায়।

তার বাথটাবের মতন আকাশ যানটিকে সে এক-একদিন নতুনভাবে সাজায়। কাচের গোল ঘরটাতে আগে সিঁড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না। একদিন সে সিঁড়িটার গায়ে লতানে গাছ জড়িয়ে দিল। লাল গাছ নয় অবশ্য, সবুজ।

চার্লি-চ্যাপলিনের একটা পোস্টার-ছবি দিপুর খুব প্রিয়। একদিন সেই ছবিটাকেও রকেটে নিয়ে নিল।

দিপুর একটা মুস্কিল হয়ে গেল পুজোর ছুটিতে।

বাবা সবাইকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন মধ্যপ্রদেশে। মা, বাবা, দিদি আর সে। ছোটমামা দন্ডকারণ্যে চাকরি নিয়েছেন, তিনিই নেমন্তন্ন করেছেন।

দিপুর অবশ্য ট্রেনে বেড়াতেও খুব ভালো লাগে। সবচেয়ে ভালো লাগে রাত্তির বেলা। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটে যায় ট্রেন। সামনে কী আছে কেউ জানে না। রাত্তির বেলা চলন্ত ট্রেনে ঘুম আসে না, দিপু জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরে।

রায়পুরে নেমে নেওয়া হল একটা জিপ। তারপর অনেক দূরের পথ। যেতে-যেতে জঙ্গল, পাহাড় কত কী পার হয়ে যেতে হল।

প্রায় গোটা একবেলা পার করে ওরা পৌঁছলো জগদলপুরে। সেখানে ছোটমামা অপেক্ষা করছিলেন।

এককালে বাস্তার নামে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই জগদলপুর ছিল তার রাজধানী। এখন তো আর রাজাদের রাজত্ব নেই, আর বাস্তার এখন মধ্যপ্রদেশের একটি জেলা। জগদলপুরকে দেখেও আগেকার রাজধানীর কিছুই চেনা যায় না, শুধু পুরোনো দু-একটা বাড়ি চোখে পড়ে।

শহরটা দেখে বাবার পছন্দ হল না। তিনি ছোটমামাকে বললেন, এ কোথায় নিয়ে এলে? এই যে শুনেছিলুম তুমি মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে থাকো?

ছোটমামা হেসে বললেন, জঙ্গলে থাকলে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারের চাকরি করা যায়? ঠিক আছে, চিন্তা করবেন না। জামাইবাবু, আপনাদের জন্য আমি জঙ্গলে থাকারই ব্যবস্থা করে রেখেছি।

জগদলপুরে দু-দিন থেকে ওরা চলে এল সেখান থেকে বাইশ মাইল দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক বাংলোতে। বাংলোটি বেশ সুন্দর। সামনে বাগান, পেছন দিকে পাহাড়।

জায়গাটা সকলেরই বেস পছন্দ হল, অসুবিধে হল শুধু দিপুর। এই বাংলোর সবই ভালো, শুধু বাথরুমটা অন্ধকার।

আগেকার দিনের তৈরি বাড়ি, বাথরুমটাও শোওয়ার ঘরের মতন বড়। কিন্তু তাতে জানলা নেই। ওপরের দিকে আছে স্কাই-লাইটের কাচ। কিন্তু ক'দিন ধরেই আকাশ মেঘলা বলে আলো আসে না। এ বাংলোতে ইলেকট্রিসিটিও নেই যে লাইট জ্বালা যাবে।

স্নান করতে গিয়ে দিপু বাথরুমের দেয়ালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু দেয়ালটা ভালো দেখা যায় না বলে সেটা সিনেমার পর্দা হয়ে ওঠে না।

স্নানের আগে কিছুক্ষণ বাথটাবের মতন আকাশযানে শূন্যে উড়ে আসা দিপুর অভ্যাস। এখন আর সেটি হচ্ছে না। দিপু কিছুতেই তার আকাশযানকে দেখতে পাচ্ছে না। এমনকী চোখ বুঁজলেও সে দেখতে পায় না।

এরজন্য দিপুর যে কী কষ্ট তা অন্য কেউ বুঝবে না!

একদিন গেল, দুদিন গেল, তৃতীয় দিন তো সারাদিনই টিপির-টিপির বৃষ্টি। দিপুর

মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেছে। অন্য কারুর সঙ্গে তার কথা বলতেই ইচ্ছে করছে না।

বৃষ্টির দিনে দিদি স্নান করে না। বাবাও বাদ দিয়ে দেন। সুতরাং বাথরুম বেশিক্ষণ আটকে রাখলে কোনও অসুবিধেই নেই। কিন্তু স্নান করতে এসে দিপুর কান্না পেয়ে গেল।

বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করলে এমন অন্ধকার হয়ে গেল যে দিপু প্রায় নিজেকেই দেখতে পায় না, দেয়াল দেখবে কি? আজও সে উড়তে পারবে না! আকাশযানটা কি কলকাতা ছেড়ে বাইরে এসে আর দিপুর দখলে থাকবে না?

দিপু সেই অন্ধকারের আবছা দেয়ালের সামনেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খুব মন দিয়ে আকাশযানটার কথা ধ্যান করতে লাগল। ওকে আসতেই হবে এখানে।

কিন্তু কিছুতেই আসছে না। দিপু দেয়ালে কোনও ছবি দেখতে পাচ্ছে না।

বাথরুমের দরজাটা খুলে দিল, তাতে একটু আলো হল। দিপু আবার তীব্র মনোযোগ দিয়ে তার বাথটাব আকাশযানটার কথা চিন্তা করতে লাগল বেশ খানিকক্ষণ ধরে। তাতেও সে ব্যর্থ হল। নোনাধরা দেওয়ালটাতে শুদু ফাটা-ফাটা দাগ, তাতে কোনও ছবিই ফোটে না।

সেদিন দুপুর তিনটের সময় খেয়ে-দেয়ে সবাই যখন একটু শুয়েছে, দিপু একা বেরিয়ে পড়ল বাংলো থেকে। বৃষ্টি তখনও পড়ছে, তবু দিপুর ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ যেন তাকে ডাকছে, যেতেই হবে।

বাংলোটার সামনের রাস্তা পেরুলেই জঙ্গল। প্রথমে পাতলা-পাতলা, তারপর গভীর।

দিপু ঢুকে পড়ল সেই জঙ্গলের মধ্যে। দূরে দড়-দড় করে জলের শব্দ হচ্ছে। ওখানে একটা ছোট ঝর্ণা আছে। সেখানেই যেন যেতে হবে দিপুকে।

ঝর্ণার কাছে জঙ্গলটা একটু ফাঁকা। দিপু দূর থেকে দেখল, ঝর্ণার পাশে তার বয়েসি একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

দিপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ছেলেটি হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকল।

আরও কাছে গিয়ে দিপু দারুণ অবাক হয়ে বলে উঠল, এ কি!

ছেলেটি শুধু যে দিপুর সমবয়েসী তাই-ই নয়, তাকে অবিকল দিপুর মতনই দেখতে। মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত পুরোপুরি মিল আছে।

ছেলেটি একটু হেসে বলল, কেমন আছো দিপু?

দিপু বলল, তুমি..তুমি..মানে...তুমি কে? আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

ছেলেটি বলল, মোটেই স্বপ্ন দেখছ না। গায়ে চিমটি কেটে দ্যাখো। আমি তোমার প্রতিভাস।

দিপু বলল, তার মানে?

ছেলেটি বলল, তুমি প্রতিভাস গ্রহের নাম শোনওনি? তোমরা, পৃথিবীর মানুষরা বড্ড পিছিয়ে আছো?

দিপু তবু কিছু বুঝতে পারছে না। সে অনেক অদ্ভুত, অলৌকিক দৃশ্য দেখে, কিন্তু এটা সে মেনে নিতে পারছে না কিছুতেই। ছেলেটি কি অন্য গ্রহ থেকে এসেছে? তা আসতে পারে। তাতে এত আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে, কিছুদিন পরে অন্য গ্রহতেও যাবে। অন্যান্য গ্রহের মানুষ বা অন্য কোনও প্রাণী থাকলে তারাও পৃথিবীতে আসতে পারে। কিন্তু এর চেহারা দিপুর মতন হবে কী করে? এমনকী পোশাক পর্যন্ত একরকম!

ছেলেটি যেন দিপুর মনের কথা বুঝতে পারল।

সে হেসে বলল, শুধু চেহারা আর পোশাকই এক নয়, আমার নামও দিপু।

দিপু বলল, তা হলে এটা নির্ঘাৎ স্বপ্ন।

ছেলেটি বলল, মোটেই স্বপ্ন নয়। তোমাদের পৃথিবীতে যা-যা আছে, আমাদের প্রতিভাস গ্রহে অবিকল সেই সবই আছে। আমাদের অবশ্য দু-চারটে জিনিস আছে, সেগুলো তোমরা মাঝে-মাঝে কল্পনা করে পুষিয়ে নিচ্ছ। যেমন...

ছেলেটি হঠাৎ থেমে গিয়ে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

দিপুর প্রথমে একটু ভয় লাগছিল, এবারে সে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির গায়ে হাত রাখল। হ্যাঁ, রক্ত-মাংসেরই মানুষ—স্বপ্ন নয়, ছায়া নয়।

দিপু বলল, ব্যাপারটা কী হচ্ছে, একটু বুঝিয়ে দাও তো!

অন্য দিপু বলল, অত বুঝে কী হবে? ধরে নাও না, ঠিক তোমার মতন আর একজন কেউ অন্য কোথাও আছে। তোমার বাবার মতন, তোমার মা, দিদি, ছোটমামা সকলেরই মতনই এক-একজন আমাদের ওখানে আছে।

—সত্যি?

—আমি তো মিথ্যে কথা বলতে এখানে আসিনি। বরং তোমাকে একটু সাহায্য করতে এসেছি।

—কী সাহায্য?

—আমার একটা শূন্য যান আছে, সেটা ঠিক বাথটাবের মতন দেখতে। ওপরে কাচের গোলঘর, ভেতরে সিঁড়ি।

—অ্যাঁ! কী বলছ তুমি?

—আমার ওই শূন্য যানটিকে তুমি প্রায়ই কল্পনা করতে। আজ তুমি এমন তীব্রভাবে কল্পনা করছিলে যে আমার যানটা কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। জানো তো, খুব মন দিয়ে কোনও কিছু চাইলে তো ঠিকই পাওয়া যায়। তোমার জন্য ওটা আমি নিয়ে এসেছি।

—ওটা মানে?

—আমার বাথটাব আকাশ-যান। দেখবে এসো। দিপুর হাত ধরে অন্য দিপু নিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

একটা ফাঁকা জায়গায় পড়ে আছ পোর্সিলিনের বিরাট একটা বাথটাব, তার ওপরে

কাচের গোল ঘর। ভেতরে কাঠের সিঁড়ি, তাতে লতানো গাছ জড়ানো। কাচের দেওয়ালে সাঁটা একটা চার্লি চ্যাপলিনের পোস্টার।

অন্য দিপু তার দরজা খুলে দিপুকে বলল, চলো, একটু ঘুরে আসা যাক!

দিপু বলল, এখনও বলছ আমি স্বপ্ন দেখছি? তোমার আকাশযানে আমার ঘরের চার্লি চ্যাপলিনের ছবি কী করে এল?

অন্য দিপু বলল, এটা এমন আর কী শক্ত কাজ! তুমি যে-যে জিনিস খুব বেশি চাও কল্পনায়, সেটা আমি তৈরি করে নিই। তোমাকেও সেরকম করতে হয়। যেমন, আমি যখন খুব কল্পনা করি যে-কোনও পাখি মানুষের ভাষায় কথা বলছে, তখন তুমি সেটা সত্যি-সত্যি শুনতে পাও।

—আমি এখন বিশ্বাস করতে পারছি না।

—বিশ্বাসের দরকার নেই। কোথায় ঘুরে আসতে চাও বলো!

—তুমি আমাকে লাল জঙ্গল দেখাতে পার?

অন্য দিপু চমকে উঠে বলল, আবার লাল জঙ্গল! একবার দেখেছিলে, তাতে শখ মেটেনি?

মোটে একটুখানি দেখেছিলুম।

—ওই যথেষ্ট। না, লাল জঙ্গল থাক, চলো, অন্যকোথাও যাই। উত্তর মেরুতে যাবে?

—সেখানে তো খুব শীত। কেন, লাল জঙ্গলে যেতে চাইছ না কেন?

—সে বড় সাংঘাতিক জায়গা। সেখানে গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। তুমি তো যাওনি, আমি গিয়েছিলুম একদিন, তুমি শুধু কল্পনায় দেখেছ। আমি অতি কষ্টে ফিরিয়ে এনেছি নিজেকে!

—সেখানে ভয়ের কী আছে? খুব বড়-বড় পাখি দেখেছিলুম।

—ওগুলো পাখি নয়। লাল জঙ্গলে ভয়ের কিছু নেই। বিপদও নেই। কিন্তু কিছু একটা জাদু আছে। চুম্বকের মতন টেনে রাখে।

—যদি যেতে হয় তো আমি ওখানেই যাব।

—তুমি দেখছি ঠিক আমারই মতন জেদি। চলো তা হলে। কিন্তু খুব সাবধান। যখন ফিরতে বলব, তখনই ফিরবে।

দুজনে ভেতরে ঢুকতেই আকাশ-যানটা আকাশে উঠে গেল। কোনও ইঞ্জিন নেই, মেশিনঘর নেই, ওটা ইচ্ছাশক্তিতে চলে।

জঙ্গল, পাহাড়, নদী পেরিয়ে সেটা মুহূর্তে বহু দূরে চলে গেল। বহু উঁচুতে উঠে তারপর আস্তে-আস্তে নামতে লাগল নিচের দিকে।

অন্য দিপু বলল, ব্যস, আর নয়। এবার চেয়ে দ্যাখো।

দিপু দেখল, নিচের পাহাড়ি উপত্যকা থেকে একটা লাল আভা আসছে শুধু। গাছগুলোকে ভালো দেখা যাচ্ছে না।

দিপু বলল, আর একটু নিচে নামো।

—না থাক, আর দরকার নেই।

—গাছগুলোকে যে দেখতেই পাচ্ছি না!

—বেশি নিচে নামব না কিন্তু।

আর-একটু নিচে নামার পর দেখা গেল বড়-বড় গাছ। টকটকে আগুনের মতন লাল তাদের পাতার রং। মাঝখান দিয়ে একটি নদী বইছে, তার জলের রং সোনালি। সেই নদীর ওপরে উড়ছে কয়েকটা খুব বড়-বড় পাখি।

দিপু জিগ্যেস করল, ওগুলো কি পাখি?

—ওটা পাখি নয়, মানুষ।

—অ্যাঁ! কী বলছ?

—ঠিকই বলছি। চলো, ফিরে যাই।

—না, আর একটু নিচে নামব।

দুজনের দুরকম কথায় আকাশ-যানটা মজার ব্যবহার করতে লাগল। যেই একজন বলে ফিরে যাই, অমনি সেটা ওপরে উঠতে শুরু করে। আর যেই অন্যজন বলে নিচে নামবো, অমনি আকাশ-যানটা আপনি-আপনি নেমে যায় আবার।

একবার অনেকখানি নিচে নেমে এসে দিপু সেই মানুষ পাখিগুলোর মুখ দেখতে পেল। তার মধ্যে একটি মুখ তার খুব চেনা। তাদের সেই ভূগোল টিচার জ্যোতিপ্রকাশবাবু!

দিপু চেঁচিয়ে উঠল, স্যার!

অন্য দিপু বলল, ডেকো না। ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে নেই!

দিপু বলল, আমি নিচে নামব। ওঁদের সঙ্গে কথা বলব।

—না।

—হ্যাঁ, আমি যাবোই। আমি ফিরতে চাই না।

—তোমাকে লাল জঙ্গলের জাদুতে টেনেছে। ফিরে চলো।

—চুপ করো। তোমার কথা শুনতে চাই না।

আকাশ-যানটা ওদের কথা অনুযায়ী একবার উঠছে, একবার নামছে।

একবার খুব নিচে নেমে আসায় দিপু আনন্দে চেঁচিযে উঠাল—আমি জিতে গেছি। এবারে আমরা লাল জঙ্গলের মাটিতে নামব।

—তাহলে তোমার কল্পনাশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে, তাই চাও?

—অ্যাঁ! কী বললে?

—এখানে কারুর স্মৃতি থাকে না। ওই পাখি-মানুযগুলো ফেরাব রাস্তা ভুলে গেছে সেইজন্য। এখানে কেউ কিছু কল্পনা করে না। এখানে বাথরুমের দেয়াল নেই।

দিপু বলে উঠল, তা হলে নিচে নামব না। এবার আমরা ফিরব।

অন্য দিপুও চেঁচিয়ে উঠল, ফিরব, ফিরব!

আকাশ-যানটা আবার শোঁ-শো করে ওপরে উঠে গেল।
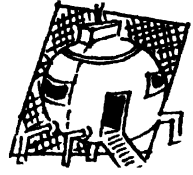
রাক্ষুসে পাথর

বুড়ো মাঝি বলল, বাবু বেড়াতে এসেছেন, বেড়িয়ে ফিরে যান। ওই দ্বীপে যাবেন না, ওখানে দোষ লেগেছে।

আমরা একটু অবাক হলাম। দোষ লেগেছে মানে কী? দ্বীপের আবার দোষ লাগে কী করে?

বিমান বলল, বুড়ো কর্তা, তুমি যা টাকা চেয়েছ, তাই দিতে আমরা রাজি হয়েছি। তবু তুমি আমাদের নিয়ে যাচ্ছ না কেন? ওই দ্বীপে কি আছে?

বুড়ো মাঝি তার সাদা দাড়ি চুলকোতে-চুলকোতে বলল, কিছুই নেই, সেই কথাই তো বলছি। শুধু-শুধু ওখানে গিয়ে কী করবেন?

বুড়ো মাঝি হাল ধরেছে, আর দাঁড় বাইছে তার নাতি। এই নাতির বয়েস তো চোদ্দ বছর হবে। ওর নাম সুলতান, সে কেমন যেন ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

বুড়ো মাঝি যতই 'না' বলছে, ততই আমাদের জেদ চেপে যাচ্ছে। একটা সাধারণ দ্বীপ, সেখানে কীএমন ভয়ের ব্যাপার থাকতে পারে? কত জাহাজ যাচ্ছে এখান দিয়ে, সেরকম কিছু থাকলে সবাই জানতে পারত!

হলদিয়াতে বিমানের দাদা চাকরি করে। আমি আর বিমান কয়েক দিনের জন্য এসেছি এখানে বেড়াতে। হলদিয়া জায়গাটা বেশ সুন্দর। নতুন বন্দর, নতুন শহর গড়ে উঠেছে। চারদিকে সবই নতুন-নতুন বাড়ি আর অনেক ফাঁকা জায়গা। শহরটার একদিকে গঙ্গা আর একদিকে হলদি নদী।

সকালবেলা নদীর ধারে জেলেরা মাছ বিক্রি করতে আসে। আমরা সেই মাছ কিনতে গিয়েছিলুম। ঘাটে অনেকগুলো নৌকো বাঁধা দেখেই আমাদের মনে হল, একটা নৌকো ভাড়া করে নদীতে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়। একজন মাঝিকে জিজ্ঞেস করতেই সে রাজি হয়ে গেল। তিরিশ টাকা দিলে সে যতক্ষণ ইচ্ছে আমাদের ঘুরিয়ে আনবে।

আমি আর বিমান দুজনেই সাঁতার জানি, সুতরাং আমাদের জলের ভয় নেই। বিমান তো সুইমিং কমপিটিশনে অনেকবার প্রাইজ পেয়েছে।

আমি আগেই শুনেছিলাম যে হলদিয়ার কাছে একটা দ্বীপ আছে, তার নাম আগুনমারির চর। আগে সেই চরটা মাঝে-মাঝে ডুবে যেত, আবার মাঝে-মাঝে জেগে উঠত। এখন আর ডোবে না। এখন সেখানে গাছপালা জন্মে গেছে। কোনও মানুষজন অবশ্য সেখানে এখনও থাকে না।

নৌকো দেখেই আমার ওই দ্বীপটার কথা মনে এসেছিল। নতুন দ্বীপ মানেই তো নতুন দেশ। ওখান থেকে ঘুরে এলেই একটা নতুন দেশ দেখা হয়ে যাবে। অনেকদিন বাদে, যখন ওই দ্বীপেও অনেক ঘরবাড়ি হয়ে যাবে, কলকারখানা বসবে, তখন আমরা বলব—জানো, যখন আমরা আগুনমারিতে গিয়েছিলুম, তখন এসব কিছু ছিল না, শুধু গাছপালা আর...

গাছপালা ছাড়া আর কী আছে সেই দ্বীপে? বুড়ো মাঝি ভয় পেয়ে যাচ্ছে কেন?

নৌকোয় চড়বার সময় মাঝিদের কক্ষনো চটাতে নেই। সেইজন্য আমি অনুনয় করে বললুম, ও বুড়ো কর্তা, বলো না সেখানে কী আছে? কেন আমাদের যেতে বারণ করছ?

বুড়ো মাঝি বলল, কিছু নেই তো বলছি গো বাবু। শুধু কয়েকটা গাছ আর বালি, আর ওই শামুক, ঝিনুক ভাঙা।

বিমান বলল, তাহলে আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাইছ না কেন? সেখানে কি ভয়ের কিছু আছে?

বুড়ো মাঝি বলল, আকাশে মেঘ দেখো না বাবু! এখন আর অতদূরে যাওয়া ঠিক নয়। এই কিনারায়-কিনারায় থাকা ভালো!

বিমান বলল, তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ পেয়েছ? সামান্য মেঘ, এতে কখনো ঝড় ওঠে? তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাও না তাই বলো!

আমি বুড়ো মাঝির নাতিকে জিজ্ঞেস করলুম, সুলেমান, তুমি গেছো সেই দ্বীপে? সেখানে ভয়ের কিছু আছে?

সুলেমান তার দাদুর দিকে তাকাল একবার। তারপর বলল, কিছু দেখাও যায় না, তবে সেখানে গেলে যেন মনটা কেমন-কেমন করে। মনটা খারাপ হয়ে যায়।

এ তো আরও অদ্ভুত কথা, একটা দ্বীপে গেলে মন খারাপ হয়ে যায়! আমি আর বিমান দুজনেই হেসে উঠলুম। তা হলে তো যেতেই হবে সেখানে।

বুড়ো মাঝিকে বললুম, তুমি যদি না নিয়ে যেতে চাও তো আমাদের ফেরত নিয়ে চলো। আমরা অন্য নৌকা ভাড়া করব।

বুড়ো মাঝি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, সে টাকা ফেরত দেওয়া পাপ। তবে চলেন নিয়ে যাই। পরে যেন আমাকে দোষ দিবেন না। ওরে সুলেমান, ভালো করে টান।

আকাশে মেঘ আছে বটে কিন্তু জমাট কালো নয়। সেই মেঘের ছায়া পড়েছে জলে। রোদ নেই, বেশ ছায়া-ছায়া ছিল। নদীতে বড়-বড় ঢেউ। এখানে নদী প্রায় সমুদ্রের মতন। ওপার দেখাই যায় না। পাশ দিয়ে জাহাজ কিংবা স্টিমার গেলে আমাদের নৌকোটা দুলে-দুলে উঠছে।

খানিকক্ষণ পরে বুড়ো মাঝি ডানদিকে হাত তুলে বলল, ওই যে দ্যাখেন, আগুনমারির চড়া! দেখলেন তো?

আমি আর বিমান দুজনেই ঘাড় ফেরালুম। মনে হল নদীর বুকেই যেন কয়েকটা গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মাটি দেখা যাচ্ছে না।

বুড়ো মাঝে বললে, দেখা হল তো? এবারে নৌকো ঘোরাই?

আমি আর বিমান একসঙ্গে বলে উঠলুম, সে কি, আমরা কাছে যাবো না?

—কাছে গিয়ে আর কী করবেন? আর তো দেখার কিছু নাই!

বিমান এবারে বেশ রেগে বলল, তোমার মতলব কী বলো তো, বুড়ো কর্তা? ওই দ্বীপে কি তোমার কোনও জিনিসপত্তর আছে? ওখানে আমাদের যেতে দিতে চাও না কেন?

বুড়ো মাঝি আমতা-আমতা করে বলল, দেখা তো হলই, আরও কাছে গিয়ে লাভটা কী?

বিমান বললে, লাভ-লোকসানের কথা নয়। আমরা ওই দ্বীপে নেমে হাঁটতে চাই।

বুড়ো মাঝি এবারে খুব জোরে হাল ঘোরাতেই নৌকোটা তরতরিয়ে এগিয়ে গেল। দ্বীপটার একেবারে কাছে পৌঁছে নৌকোটার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বুড়ো মাঝি বলল, এবারে নামুন।

সেখানটায় অন্তত একহাঁটু জল, তারপর কাদামাটি। বিমান বলল, আর একটু এগোও, এখানে নামব কী করে?

বুড়ো মাঝিও এবার রাগে গড়গড়িয়ে বললে, আপনাদের বাবু এখানেই নামতে হবে। আমার নৌকো ওই চরের মাটি ছোঁবে না। ও মাটি অপয়া।

বিমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি বললুম, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা এখানেই নামব।

জুতো খুলে রাখলুম নৌকোয়। তারপর হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে নেমে পড়লুম জলে। ছপ-ছপ করে এগিয়ে গেলুম দ্বীপটার দিকে। বুড়ো মাঝি নৌকোটাকে আরও গম্ভীর জলের দিকে নিয়ে গিয়ে ঝপাং করে নোঙর ফেলে দিল।

দ্বীপটাতে ছাড়া-ছাড়া গাছপালা রয়েছে। তারপর ধূ-ধূ করছে বালি। সেই বালিতে কোথাও-কোথাও ঘাস হয়েছে। একটা খড়ের চালাঘরও রয়েছে একপাশে। সেই ঘরে কিন্তু কোনও মানুষ নেই।

কাদামাখা পায়ে ওপরে উঠে আমরা বালিতে পা ঘষে নিলুম। বিমান বলল, একটা কিছু ফ্ল্যাগ সঙ্গে নিয়ে এলে হতো! তাহলে সেই ফ্ল্যাগটা পুঁতে আমরা এই দ্বীপটা দখল করে নিতুম!

আমি বললুম, তা কী করে হবে? আগেই তো এখানে মানুষ এসেছে—দেখছিস না, ঘর রয়েছে?

আমরা ঘরটার কাছে গিয়ে দেখলুম, তার মধ্যে পাতা আছে খাটিয়া। আর চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে শুকনো গোবর। জায়গাটায় বিচ্ছিরি গন্ধ।

বিমান বলল, এখানে লোকেরা গরু চরাতে আসত, কিন্তু গরুগুলোকে নিয়ে আসত কী করে?

আমি বললুম, বড়-বড় নৌকোয় করে নিয়ে আসত। আমি নৌকোয় গরু-মোষ পার করতে দেখেছি।

—তারা এখন আর আসে না কেন?

—বর্ষাকাল এসে গেছে, সেইজন্য এখন আসে না। এ তো সোজা কথা।

—দ্বীপটা কীরকম চুপচাপ লক্ষ করেছিস? কোনও শব্দ নেই!

—মানুষজন নেই, শব্দ হবে কী করে? তবু আমি কিন্তু একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কান পেতে শোন।

দুজনেই চুপ করে দাঁড়ালুম। সত্যি খানিকটা দূরে গাছপালার আড়াল থেকে মাঝে-মাঝে একটা ফোঁস-ফোঁস শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কেউ যেন নিশ্বাস ফেলছে খুব জোরে। কোনও মানুষ অবশ্য অত জোরে নিশ্বাস ফেলতে পারে না।

বিমানের মুখটা শুকিয়ে গেল। চোখ বড়-বড় করে বলল, ওটা কীসের শব্দ বল তো সুনীল? সাপ নাকি?

আমি বললুম, সাপ অত জোরে ফোঁস-ফোঁস করে?

— সমুদ্রে বড়-বড় অজগর সাপ থাকে শুনেছি। সমুদ্র থেকে যদি এখানে চলে আসে, ওই জন্যই বোধয় মাঝিরা এখানে আসতে ভয় পায়!

— একটা অজগর সাপ থাকলেও সেটাকে মেরে ফেলতে পারত না! চল এগিয়ে গিয়ে দেখি।

— সঙ্গে লাঠি-ফাটি কিছু একটা আনলে হত।

— ভয় পাচ্ছিস কেন, সাপ তো আর তাড়া করে এসে কামড়াতে পারে না।

ডানদিকে খানিকটা দূরে দু-তিনটে বড়-বড় গাছের পাশে কিছুটা জায়গা ঝোপঝাড়ের মতন। শব্দটা আসছে সেদিক থেকেই।

আমরা গুটি-গুটি পায়ে এগোলুম সেদিকে। শব্দটা মাঝে-মাঝে থেমে যাচ্ছে। কাছাকাছি গিয়ে আমিই ভয় পেয়ে বিমানের হাত চেপে ধরলুম। ঝোপের মধ্যে কী যেন বিশাল একটা জন্তু রয়েছে।

বিমান বললে, ওটা তো একটা মোষ। কাত হয়ে শুয়ে আছে।

এবারে আর একটু এগিয়ে আমরা মোষটার মাথাটা দেখতে পেলাম। দেখলেই বোঝা যায়, মোষটা মরে যাচ্ছে। মোষটার দু-চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। ওরকম করুণ চোখ আমি কখনও দেখিনি। মোষটা মাঝে-মাঝে নিশ্বাস ফেলছে, তখন তার পেটটা ফুলে উঠছে। ওইটুকুতেই বোঝা যায় যে ও বেঁচে আছে।

আমি বললুম, এতবড় একটা মোষ — কী হয়েছে ওর? সাপে কামড়েছে?

বিমান বলল, অসুস্থও হতে পারে। মোষেরাও তো অসুস্থ হয়।

— কিন্তু কোনও লোকজন নেই। একলা-একলা একটা মোষ এখানে পড়ে আছে!

— মোষের মালিক বুঝতে পেরেছে, ও আর বাঁচবে না। সেইজন্য ওকে ফেলে রেখে চলে গেছে।

আমরা আর ঝোপটার মধ্যে না ঢুকে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলুম। যতবার মোষটার নিশ্বাসের শব্দ শুনেছি, ততবার মনটা খারাপ লাগছে।

বিমান বলল, একটা জিনিস লক্ষ করেছিস, এখানে গাছের পাতাগুলো কেমন যেন শুকনো-শুকনো! এখন বর্ষাকালে তো গাছের পাতা শুকিয়ে যায় না!

আমি বললুম, গাছগুলোর ছাল খসে পড়ছে অনেক জায়গায়। এখানে তো জল নোনা, তাই বোধহয় গাছের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না।

বিমান বলল, বাজে কথা বকিস না! সুন্দরবনে অত গাছ রয়েছে না! সেখাকার জল তো আরও বেশি নোনা। এখানকার গাছগুলোর বোধহয় কিছু একটা রোগ হয়েছে। ওটা কী রে?

—ওটা তো একটা পাথর।

—আশ্চর্য তো! খুবই আশ্চর্য ব্যাপার!

—কীসের আশ্চর্য?

—তুই বুঝলি না? গঙ্গা নদীর দ্বীপে পাথর আসবে কী করে?

—কেন?

—এখানে কি কোথাও পাথর আছে? এদিকে কি কোথাও পাহাড় আছে? এখানে অতবড় একটা পাথর কে নিয়ে আসবে?

পাথরটা এমনিতেই খুব সাধারণ। একটা মাঝারি ধরনের আলমারির সাইজের। যে-কোনও পাহাড়ি জায়গায় গেলে এরকম পাথরে চাঁই পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু নদীর ওপরে একটা নতুন দ্বীপে ওরকম পাথর তো দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক নয়!

আমরা পাথরটার কাছে গেলুম। সেটার গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। আমি পাথরটার গায়ে হাত দিয়ে বললুম, সমুদ্রের তলায় অনেক জায়গায় ডুবো পাহাড় থাকে। হয়তো গঙ্গার এখানটাতেও ডুবো পাহাড় আছে। দ্বীপটা তৈরি হবার সময় পাথরটা উঠে এসেছে।

বিমান হাঁটু গেড়ে বসে বলল, তোর কী বুদ্ধি! পাথর কি হালকা জিনিস যে জলের উপরে ভেসে উঠবে! তা ছাড়া দ্যাখ, এর তলায় কিছু ঘাস চাপা পড়ে আছে। এই দ্বীপটা হবার পর কেউ পাথরটা এখানে এনেছে। কিন্তু শুধু-শুধু এতবড় একটা পাথরকে এখানে বয়ে আনবে?

আমি পাথরটার গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে বললুম, উল্কা নয় তো! অনেকসময় উল্কার টুকরো পৃথিবীতে এসে পড়ে!

বলতে-বলতে আমি মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলুম।

বিমান দারুণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কী হল, সুনীল? কী হল তোর?

আমি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসলুম। আমিও অবাক হয়ে গেছি খুব। কী হল কিছু বুঝতে পারছি না। এরকম তো আমার কখনো হয় না।

বিমান আমায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে লাগল, কী হল রে, কী হল?

আমি বললুম, জানি না। হঠাৎ কেমন মাথাটা ঘুরে গেল।

—চুপ করে বসে থাক, উঠিস না।

—আমার কিছু হয়নি।

—তবু বসে থাক। একটা জিনিস দ্যাখ, সুনীল, এই পাথরের নিচের ঘাসগুলো দ্যাখ? কেমন যেন খয়েরি হয়ে গেছে! ঘাস চাপা পড়লে হলদে হয়ে যায়, কিন্তু খয়েরি! তুই কখনও খয়েরি ঘাস দেখেছিস?

—এ বোধহয় অন্য জাতের ঘাস।

—পাশের এই গাছটা দ্যাখ। এই গাছটার গা-টা লাল। আমি লালরঙের গাছও কখনো দেখিনি।

—বিমান, ওই যে মোষটা মরে যাচ্ছে, ওর জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

—আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে রে। এমনি-এমনি একটা মোষ মরে যাচ্ছে, ইস! মোষটাকে ওর মালিক কেন ফেলে গেল!

—বিমান, আমার ইচ্ছে করে এখানে শুয়ে পড়তে।

—মন্দ বলিসনি। এখানে খানিক্ষণ শুয়ে-শুয়ে কাটিয়ে দিলে বেশ হয়।

—যদি নৌকোটা চলে যায়?

—ইস! গেলেই হল, পুরো পয়সা দিয়েছি না! তাছাড়া যদি যায় তো চলে যাক। আমরা এখানেই থেকে যাবো।

হঠাৎ আমি লাফিয়ে উঠে পড়লুম। দারুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠলুম, বিমান, বিমান, এই পাথরটা জ্যান্ত!

বিমান বলল, কী বলছিস? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

—না রে, আমি সত্যি দেখলুম, পাথরটা নড়ে উঠল!

—কী বলছিস যা-তো? পাথরটা নড়বে কী করে?

—আমি স্পষ্ট দেখলুম, পাথরটার পেটের কাছে একবার যেন চুপসে গেল, আবার ফুলে উঠল। ঠিক ব্যাঙের মতন।

—দূর! পাথরের আবার পেট কী? তুই ভুল দেখেছিস!

—মোটেই ভুল দেখিনি।

বিমান গিয়ে পাথরটার গায়ে হাত দিতেই আমি বিমানের অন্য হাতটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনলুম ওকে। আমার বুকের মধ্যে দুম-দুম আওয়াজ হচ্ছে। ওই পাথরটার গায়ে হাত দিয়েই আমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম। ওই পাথরটার কিছু একটা ব্যাপার আছে।

দূরে শুনতে পেলুম, বুড়ো মাঝি আর সুলেমান চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ডাকছে, বাবু! বাবু!

আমি বললুম, চল বিমান, নৌকায় ফিরে যাই।

বিমান বলল, নাঃ, এক্ষুণি যাব না। এখানে শুয়ে থাকব বললুম যে!

—না, আমার মোটেই ভালো লাগছে না। চল নৌকায় ফিরে যাই।

বিমানকে প্রায় জোর করেই আমি টানতে-টানতে গিয়ে চললুম। তারপর নৌকায় উঠে বুড়ো মাঝিকে বললুম, চলো, শিগগির চলো।

নৌকায় উঠে বিমান লম্বা হয়ে শুয়ে রইল। তার চোখদুটো ছলছল করছে। ভাঙা গলায় বলল, আমার কিছুই ভালো লাগছে না রে!

সুলেমান আমাদের দিকে চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে আছে। আমি তাকে জিগ্যেস করলুম, ওই দ্বীপে গেলে তোমাদের কী হয় বলো তো?

সুলেমান বলল, কী জানি, বাবু! ওখানে গেলেই মনটা যেন কেমন-কেমন করে! কাজ করতে ইচ্ছে করে না। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

বুড়ো মাঝি বলল, বাবু, আগে তো আমরা ওই চরে যেতাম। বেশি ঝড়-বৃষ্টি হলে ওখানে নৌকো বেঁধে চালাঘরটায় বসে জিরোতাম। অনেক লোক আগে ওখানে গরু-মোষ চরাতে আসত। এখন আর কেউ যায় না।

—কেন যায় না বল তো?

—ওখানে গেলেই শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। গরু-মোষগুলোও আলসে হয়ে পড়ে। কেমন যেন মনমরা লাগে।

—আমাদেরও সেইরকম লাগছিল। কিন্তু কেন হয় ওরকম বল তো?

—কী জানি! গাছপালাগুলোও কেমনধারা শুকিয়ে যাচ্ছে, দেখলেন না? ও দ্বীপে খারাপ নজর লেগেছে!

—ওখানে একটা বড় পাথর আছে, দেখেছ! আগে ওটা ছিল?

—না, আগে ছিল না। ওই তো মাসখানেক ধরে দেখছি।

—কী করে পাথরটা ওখানে এল?

—কেউ তা জানে না। কেউ-কেউ বলে, ওটা আকাশ থেকে খসে পড়েছে।

আমার মাথাটা এখনও দুর্বল লাগছে। আমি আর কথা বলতে পারলুম না। শুয়ে পড়লুম বিমানের পাশে।

হলদিয়ায় ফিরে এসে আমরা দুজনেই সোজা চলে গেলুম বিছানায়। রাত্তিরে কিছু খেতেও ইচ্ছে করল না। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে নানা দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলুম। তার মধ্যে বারবারই দেখতে লাগলুম সেই পাথরটাকে। ঠিক একটা ব্যাঙের মতো। তার পেটটা একবার চুপসে যাচ্ছে, একবার ফুলছে। একটা জ্যান্ত পাথর। আমি শিউরে-শিউরে উঠতে লাগলুম।

সকালবেলা বিমানের দাদা, স্বপনদা, জিজ্ঞেস করলেন, তোদের কাল কী হয়েছিল? সন্ধ্যে থেকে খালি ঘুমোচ্ছিলি?

স্বপনদাকে সব কথা বলতেই হল। স্বপনদা সবটা শুনে হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, গাঁজাখুরি গল্প বলার আর জায়গা পাসনি! একটা জ্যান্ত পাথর...সেটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে মন খারাপ হয়ে যায়, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে! দূর, যতসব!

বিমান বলল, দাদা, আমি পাথরটাকে নড়তে দেখিনি, সুনীল দেখেছে। কিন্তু আমারও ওখানে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল।

—বেশ করছিল। শুয়ে থাকলেই পারতিস।

—তাহলে আমাদেরও নিশ্চয়ই ওই মোষটার মতন অবস্থা হত।

আমি বললুম, স্বপনদা নৌকোর মাঝিরাও কেউ ওই দ্বীপটায় এখন যেতে চায় না। ওরাও ভয় পায়। পুলিশে একটা খবর দেওয়া দরকার।

স্বপনদা বললেন, পুলিশও তোদের কথা শুনে আমার মতন হাসবে। দেখবি, মিঃ দাসকে ডাকব?

হলদিয়ার এস.ডি.পি.ও. মিঃ দাস স্বপনদার বন্ধু। স্বপনদা তাঁকে টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন। বললেন, মিঃ দাস, একবার আমার বাড়িতে চলে আসুন, ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাবেন, আর একটা মজার গল্প শোনাব!

দশ মিনিটের মধ্যেই মিঃ দাস এসে গেলেন। তিনি বললেন, শুধু এক কাপ চা

খাব। বড্ড কাজ পড়েছে, এক্ষুনি যেতে হবে। কাল রাত্তিরে একটা লঞ্চ ডুবি হয়েছে গঙ্গায়।

স্বপনদা বললেন, বসুন, বসুন। কাল দুপুরে এই দুই শ্রীমান নৌকো ভাড়া করে গিয়েছিল আগুনমারির চরে। সেখানে নাকি ওদের এক সাঙ্ঘাতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। ওরা দুজনে...

স্বপনদাকে থামিয়ে দিয়ে পুলিশ সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা দুজনে কাল আগুনমারির চরে গিয়েছিলে? আশ্চর্য ব্যাপার! ওই দ্বীপটার পাশেই তো কাল রাত্তিরে লঞ্চটা ডুবেছে! ঝড়-বৃষ্টি কিছু নেই, শুধু-শুধু একটা লঞ্চ ডুবে যাওয়া খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!

স্বপনদা জিগ্যেস করলেন, কেউ মারা গেছে?

পুলিশ সাহেব বললেন, নাঃ। মরেনি কেউ। সবাইকে উদ্ধার করা গেছে। আমাদের পুলিশের লঞ্চ খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছোয়। কিন্তু লঞ্চটা যে কী করে ডুবল, তা ওরা কেউ ঠিক-ঠিক বলতে পারছে না। সবাই বলছে, কী যেন হল কিছুই জানি না, হঠাৎ একটা ধাক্কাতে লঞ্চটা কেঁপে উঠল, তারপরই হুড়মুড়িয়ে জল ঢুকতে লাগল।

স্বপনদা বললেন, লঞ্চটা একদম ডুবে গেছে বলতে চান?

পুলিশ সাহেব বললেন, হ্যাঁ। সেটা তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। ওই লঞ্চের একজন খালাসি শুধু অদ্ভুত একটা গল্প বলছে। আগুনমারির চর থেকে একটা মস্ত পাথর নাকি উড়ে এসে প্রচণ্ড জোরে লঞ্চটাকে ফুটো করে দেয়! এরকম গাঁজাখুরি কথা কেউ শুনেছে? গঙ্গার ওপরে দ্বীপ, সেখানে পাথর আসবে কী করে? যদি-বা পাথর থাকে, সেটা কেউ না ছুঁড়লে এমনি উড়ে আসবেই বা কী করে?

স্বপনদা বললেন, এরাও ওই দ্বীপে একটা বড় পাথর দেখেছে বলছে!

পুলিশ সাহেব বললেন, ভোরবেলা আমি আমাদের লঞ্চে সেই দ্বীপটা ঘুরে দেখে এসেছি। সেখানে পাথর-টাথর কিছু নেই। মানুষজনদের কোনও চিহ্ন নেই। একটা মরা মোষ রয়েছে দেখলুম।

আমি আর বিমান চোখাচোখি করলুম। আগুনমারির চরের পাথরটাই যে লঞ্চটাকে ডুবিয়েছে, তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই!

পরিশিষ্ট

উপন্যাস

তিন নম্বর চোখ ঃ প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। আনন্দবাজার পত্রিকার 'সাপ্তাহিক আনন্দমেলা'র সোমবারের পৃষ্ঠায়। পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স।

আকাশ দস্যু ঃ প্রথম প্রকাশিত হয় 'আনন্দমেলা' পূজাবার্ষিকীতে। ১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে। প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং।

বাকি তিনটি উপন্যাস—**'অন্ধকারে সবুজ আলো' 'মহাকালের লিখন'** এবং **'ইচ্ছাশক্তি'** পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

গল্প সংকলন

নীল মানুষের সংসার ঃ 'নীল মানুষ'কে নিয়ে কয়েকটি গল্পের এই সংকলন ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয় নির্মল বুক এজেন্সি থেকে। বহুদিন ছাপা নেই।

নীল মানুষের কাহিনি ঃ নীল মানুষ-এর আরেকটি বই ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয় শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ থেকে। এই বইটিও এখন পাওয়া যায় না।

বিশ্বমামার গোয়েন্দাগিরি ঃ বিশ্বমামাকে নিয়ে কয়েকটি গল্পের এই সংকলনের প্রকাশক শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ।

এছাড়া এই বইয়ের অন্যান্য গল্প-কাহিনিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ছোটদের বিভিন্ন পত্র পত্রিকা--শুকতারা, দেবসাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকী, কিশোর ভারতী, কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি পত্রিকায়। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত ৩টি খণ্ডে 'কিশোর সাহিত্য-সমগ্র'-তে বেশ কিছু লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বাকি লেখাগুলি খুঁজে পাওয়া গেছে উপরিউক্ত পত্র পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা থেকে। লেখাগুলি বিভিন্ন সময়ের—বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে নব্বই দশকের শেষভাগ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। কল্পবিজ্ঞান লেখার সময়ে নানান চরিত্র বেছে নিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কখনও নীল মানুষ, কখনও বিশ্বমামা, কখনও রণজয়, দীপ...কোনও এক বা দুই চরিত্রতে সীমাবদ্ধ নয়। বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়—আগামী যুগ থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের ছোট-ছোট বিষয় নিয়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প শুনিয়েছেন।

'কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র'-তে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যাবতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক গল্প-উপন্যাস একত্রে পরিবেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংকলনের কাজে আমাদের সহায়তা করেছেন শ্রীশুভাশিস ঘোষ।

সম্পাদক, পত্র ভারতী